শিশু-ভারতী

[ছোটদের বিশ্বকোষ]

সম্পাদক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

—:০:—

বিষয়-বিভাগ

অজ্ঞাতের সন্ধানে
অমর জীবন
আমাদের দেশ
আলো
আলোক চিত্র
উদ্ভিদ্ জীবন
কবিতা-চয়ন
কি ও কেন?
খাদ্য-শস্য
গল্প ও কাহিনী
জল
জাতীয় সঙ্গীত
জীব-জগৎ
দর্শন
দেশ-বিদেশের কথা
ধাঁধা ও হেঁয়ালি
পৃথিবীর ইতিহাস
পৃথিবীর পুণ্যপীঠ
পৃথিবীর যুগবিভাগ
বিশ্ব-সাহিত্য
ব্যায়াম-বিধি
ভূ বিজ্ঞান
মানবের জীবন ধারা
রাজনৈতিক আদর্শ
শব্দ
শরীর ও স্বাস্থ্য
শিক্ষার ইতিহাস
শিল্প-কথা
সাহিত্য
সীবন-শিক্ষা

———

চতুর্থ খণ্ড, ১৬ হইতে ২০ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১২০১ হইতে ১৬০০
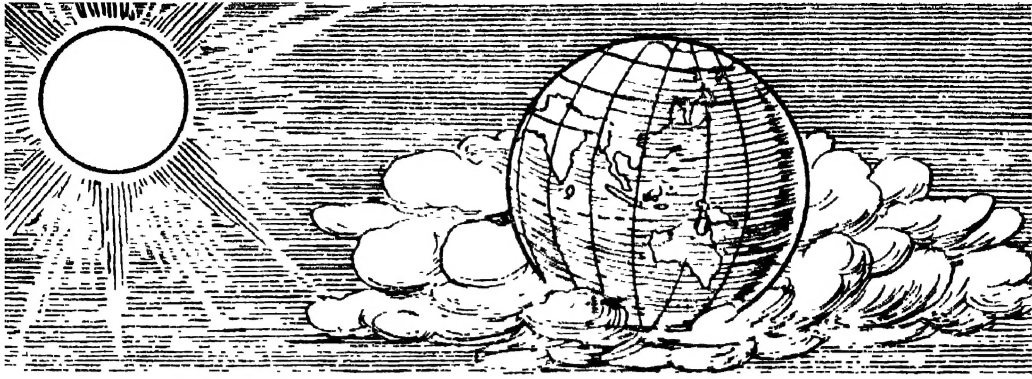
এখানে সংক্ষিপ্তভাবে চতুর্থ খণ্ডের বিষয় বিন্যাস ও সূচীপত্র দেওয়া হইল। সমুদয় খণ্ড সম্পূর্ণ হইলে স্বতন্ত্ররূপে বিস্তারিত সূচীপত্র (Index) দেওয়া হইবে।

চতুর্থ খণ্ডের সূচীপত্র

নটরাজ বা নটেশ

[illegible] এই মূর্ত্তিটি দাক্ষিণ ভারতের ধাতব কাজের
সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।

কারু শিল্প

(ধাতব শিল্প)

৯৭২ পৃষ্ঠার পর

কারু শিল্পের কথা বলিতে যাইয়া আমরা পূর্ব্বের কাঠের কাজের বিষয় বলিয়াছি। এখন তোমাদিগকে ধাতুনির্ম্মিত শিল্পকলার কথা বলিব। ধাতব শিল্পের প্রচলন মানব-সমাজে যে কখন এবং কবে প্রথম হইয়াছিল, তাহা কেহই সঠিকভাবে বলিতে পারেন না। তবে অনুমান করা হয় যে, স্বর্ণই, সব ধাতু অপেক্ষা মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কেননা প্রাচীনতম গ্রন্থে স্বর্ণের উল্লেখ ভারতবর্ষের এবং গ্রীক্ কবিদের কাব্যে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে স্বর্ণালঙ্কারের কথা আছে। অজন্তা গুহার মধ্যে যে সকল চিত্র আছে, তাহা দেখিয়া প্রাচীন ভারতে অলঙ্কারের কিরূপ প্রাচুর্য্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারি। সে সময়ে সোনার কাজ খুব ভাল হইত। রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থে হিরণ্ময়ী সীতামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আমরা যদি রামায়ণকে ইতিহাস মনে না করিয়া কাব্য বলিয়াও মনে করি তাহা হইলেও উহার রচনা কালে যে স্বর্ণকারগণ মনুষ্যবৎ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীনতম সোনা-রূপার কাজ সাউথ কেনসিংটন যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ঐখানে জেলালাবাদের নিকটবর্ত্তী বিমারনের দ্বিতীয় সংখ্যক বৌদ্ধ-স্তূপে পাওয়া একটি সোনার কৌটা ও রূপার থালা আছে। সোনার কৌটাটির সহিত কতকগুলি তাম্রমুদ্রা ছিল। তাহা হইতে স্থির হইয়াছে যে, স্তূপটি প্রায় খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ ৫০ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিশরের প্রাচীনতম সভ্যতার যা-কিছু নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই, তার মধ্যে স্বর্ণই প্রধান। সেখানে স্বর্ণনির্ম্মিত বহু দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। স্বর্ণের আদর হওয়ারও বহু পূর্ব্ব হইতেই মানুষের গহনা পরার সখের বিষয় জানা যায় এবং তখন তাহারা নানা প্রকার জন্তুর হাড়, ফলের বীজ, ঝিনুক, পাথর প্রভৃতির দ্বারা গহনা তৈয়ারী করিয়া পরিত। এখনও আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানের অসভ্য অধিবাসীদের মধ্যে জন্তুর হাড় প্রভৃতি গহনার আকারে পরিবার রীতি দেখা যায়
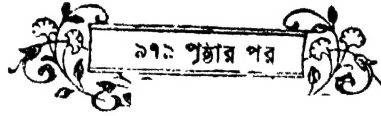
গোড়ায় আমি লৌহ-শিল্পের কথাই বলিব। মানুষ প্রথমে পাথরের তৈয়ারী (flint) অস্ত্র, লাঙ্গল, কুঠার প্রভৃতির ব্যবহার শিখিয়াছিল। পরে ধীরে ধীরে নানা ধাতুর ব্যবহার শিখিল এবং লোহার সন্ধান পাইল। বুঝিতে পারিল, পাথর, তামা প্রভৃতি অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া লৌহই সকলের চেয়ে বেশী কার্যকরী ধাতু।

'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন,
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে'

কবি রবীন্দ্রনাথের এই গানে সে যুগের কথাই মনে করাইয়া দেয়।

লৌহের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন যুগে যুগে মানুষ সভ্য ও উন্নত হইতে আরম্ভ করিল, দেশের পর দেশ জয় করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিল, তেমনি নানা দিক্ দিক্ দিয়া লৌহের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিল। তোমরা আজ এই যে এত কল-কব্জা দেখিতেছ, এঞ্জিন, হাওয়া গাড়ী, হাওয়াই জাহাজ ও যন্ত্রপাতি দেখিতেছ, তাহা একদিনে আবিষ্কৃত হয় নাই। মানুষ ক্রমশঃ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকারে লৌহদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল। পৃথিবীর অর্দ্ধেকের উপর রেলপথ বা লৌহ-পথ নির্ম্মাণ করিল। আমরা এখানে যে সব লোহার কাজের কথা বলিব, তাহা হস্তে-গঠিত মানুষের কারিগরীর বিষয়, কল-কারখানায় গড়া জিনিষের কথা নয়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শিল্পকলার নিদর্শন, যাহা মোহেন্-জো-দাড়ো বা হারাপ্পায় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে পাথরের তৈয়ারী বাসনের পাশেই তাম্র-নির্ম্মিত বাসন পাওয়া গিয়াছে, লোহার তৈয়ারী দ্রব্যাদির কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, সে সময়ে তাহারা পাথরের তৈয়ারী জিনিষ ও তামার তৈয়ারী দ্রব্যাদিই শুধু ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল। সোনা, রূপা, তামা, টিন, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর নমুনা মোহেন-জো-দাড়োতে পাওয়া গিয়াছে। সেখানে সোনা, রূপা ও হাতীর দাঁতের ও পাথরের নানা প্রকারের গহনার ব্যবহার ছিল। ঐ সব গহনার নমুনাও সেখানে অনেক পাওয়া গিয়াছে।

মোহেন জো-দাড়োতে প্রাপ্ত অলঙ্কার

মোহেন্ জো-দাড়োতে বা হারাপ্পায় লৌহের চিহ্ন পাওয়া না গেলেও আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লৌহ-শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন পাই, দিল্লীর লৌহস্তম্ভ হইতে। দিল্লীর লৌহস্তম্ভ ২৪ ফুট দীর্ঘ এবং ওজন ৬½ টন। ইহা প্রায় ১৭০০ বৎসরের প্রাচীন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লেসেট্‌লিয়ে(Lechatliei) সোরবোন্ বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের বক্তৃতায় ভারতবর্ষের ইস্পাতের আশ্চর্য্যজনক গুণের অতীব সুখ্যাতি করিতেন। এ বিষয়ে পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ফার্গুসন সাহেব যে কথা বলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক। তিনি বলেন,—"এই লৌহস্তম্ভটি কতদিনের পুরাতন, তাহা অদ্যাবধি নির্ভুলরূপে নির্ণীত হয় নাই। ইহার উপর খোদাই করা কিছু লেখা আছে, কিন্তু তাহার তারিখ নাই।" ইহার বর্ণমালার গঠন হইতে প্রিন্সেস ইহাকে তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করেন। ভাওজী কিন্তু সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া ইহাকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষের বা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম অংশের বলেন। ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা লৌহস্তম্ভের গায়ের খোদিত লিপি পড়িয়াছেন। এই লিপি পড়িয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, ইহা রাজা চন্দ্রবর্ম্মার সময় খোদিত হইয়াছিল। চন্দ্রবর্ম্মা মহারাজ চক্রবর্ত্তী সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক ৩৪০ খৃষ্ট অব্দে ছিলেন বলিয়া নিঃসন্দেহে স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেই হিসাবে এই স্তম্ভটির বয়স ন্যূনপক্ষেও প্রায় সতের শ বৎসরেরও প্রাচীন। আমাদের বিশ্বাসও এইরূপ—ইহা খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দিল্লীর লৌহস্তম্ভ

হিন্দুগণ সেই কত বৎসর আগে এত বড় একটি বৃহৎ লৌহস্তম্ভ প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বস্তুতঃই বিস্ময়ের বিষয়। ইউরোপের লোকেরা সেকালে এত বড় লৌহস্তম্ভ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দুদের এই বিরাট লৌহস্তম্ভটি বাস্তবিকই আশ্চার্য্য কীর্ত্তি।

ইংল্যাণ্ডের ধাতু সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট বিদ্যাবিৎ রবার্ট হ্যাডফিল্ড এই লৌহস্তম্ভটি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে,—"এই আশ্চর্য্যজনক লৌহস্তম্ভটির এই মাত্র ব্যাখ্যা হইতে পারে যে, ইহা বোধ হয় ছোট ছোট অংশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে জোড়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জোড়ের কোনও চিহ্নই গাত্রে বিদ্যমান নাই।" এই লৌহস্তম্ভটি বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত রূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। অঙ্গার ০·০৮০, সিলিকন ০·০৪৬, গন্ধক ০·০০৬, ফসফোরাস ০·১১৪, ম্যাঙ্গানিস্ ০, লৌহ ৯৯·৭২%—আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭·৮১।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শত শত বৎসরের রৌদ্র-বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে থাকিয়াও দিল্লীর এই লৌহস্তম্ভটির গায়ে কোনও মরিচা পড়ে নাই।

কণারকের বিরাট লৌহ "কড়িকাঠগুলি," সোমনাথের অলঙ্কারযুক্ত কবাটগুলি ও নরবড়ের (Narvara) ২৪ ফুট দীর্ঘ লৌহ কামানটি ধাতুবিদ্যায় হিন্দুদের পারদর্শিতার চমৎকার প্রমাণ।

আধুনিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও ফার্ণেসের (Furnace) অর্থাৎ তন্দুরের সাহায্যে যাহা সম্ভব, তাহা তখনকার কালে শিল্পীরা যে কি ভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিবার বিষয়।

হায়দ্রাবাদ ষ্টেটের অন্তর্গত গুলবর্গার লৌহনির্ম্মিত বিরাট কামানটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছবিতে ঠিক বোঝা না গেলেও এটি যে একটি বিরাট ব্যাপার, তা'

তোমরা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পার। প্রাচীন বাহমনী রাজ্যের (খৃঃ ১৩৪৭-১৫১৮) গুলবর্গা রাজধানী ছিল। ১৪২২ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজধানী যখন পরিত্যক্ত হয়, তখন হইতেই এই কামানটি ঐখানেই পড়িয়া আছে; তাহাকে স্থানচ্যুত করা হয় নাই; করিবার চেষ্টা হইয়াছিল কি না, তাহাও জানা যায় না। এইরূপ আরও একটি অদ্ভুত কামানের পরিচয় দিব। এটি বিজাপুরের প্রসিদ্ধ কামান। ইউসুফ আদিল শাহের বিজাপুর রাজধানী ছিল (খৃঃ ১৪৯০-১৬৮৬) এবং এই কামানটি ঢালা হইয়াছিল ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে কামানটির মুখটি ব্যাঘ্রাকৃত এবং ইহার ঢালাইয়ের মধ্যে যথেষ্ট কারিগরীর পরিচয় পাওয়া যায়। পাশের চিত্র হইতে তাহার অনেকটা আভাষ পাইবে।
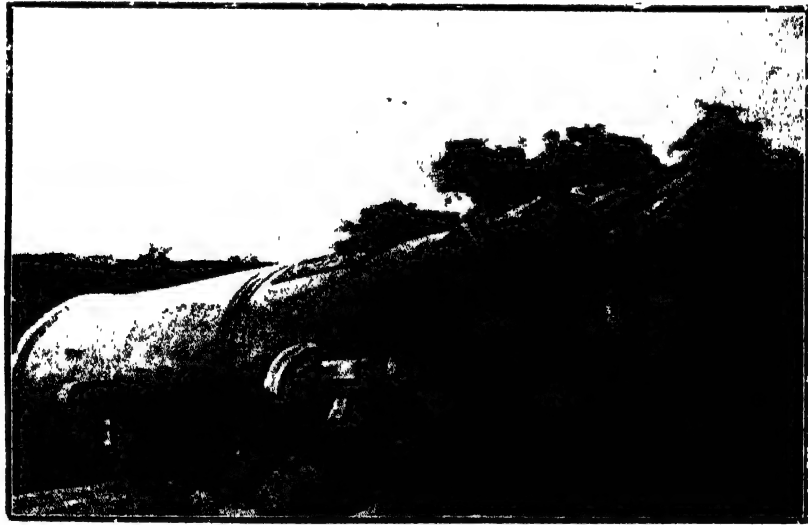
একটি প্রাচীন কামান

আমাদের দেশে লোহার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে লোহার উপর কারুকার্য্যেরও ঝোঁক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার ফলে, আমরা দেখিতে পাই যে, বন্দুক, কামান তরোয়াল, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রের উপরও নানা প্রকারের কারুকার্য্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। আমরা যে ছবিগুলি দিলাম এগুলিতে দুই তিন প্রকারের কারু-কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

লোহার উপর সরু রূপা বা সোনার তার বসানোকে "কোফ্‌তের" বা "কোফ্‌তগিরি" কাজ বলে। ইহার প্রণালী খুব সহজ কিন্তু বিশেষ অভিজ্ঞতা না জন্মিলে তাহা সহজে তৈয়ারী করা যায় না। একটি লৌহনির্ম্মিত পাত্রের উপর উখা বা ছেনি দিয়া ক্রমাগত আঁচড় কাটিয়া যাইতে হয়। এইরূপ আঁচড়

বিজাপুরের আদিল শাহের কামান। ইহা ১৫৫১ সালে ঢালা হইয়াছিল

কাটিতে কাটিতে যখন লৌহ-পাত্রটির গা বেশ উব্‌ড়া-খুবড়া হইয়া যায়, তখন সেটিকে অল্প আগুনের আঁচে বসাইয়া খড়ি দিয়া নক্সা আঁকিয়া তাহার উপর একটি লৌহ-শলাকা দিয়া হাতে করিয়া চাপ দিয়া বসাইয়া যাইতে হয়। আগুনের তাপে এবং লৌহ-শলাকা দ্বারা হাতের চাপ পাইয়া রূপার সূক্ষ্ম তার গলিয়া গিয়া লোহার পাত্রটিতে আঁটিয়া বসিয়া যায়। তারপর সেটিকে পালিস করিয়া লইলেই "কোফ্‌তের কাজ" হইল কোফ্‌তগিরি ছাড়াও "তাহনিশাঁ।" "জার্‌নিশাঁ" এই দুই প্রকারের লোহার বাসনে রূপার তার বসানোর রীতি প্রচলিত আছে। এগুলি প্রায় উক্ত প্রকারের প্রণালীতেই তৈয়ারী হয়। কেবল এই দুই উপায়ে কবিতে গেলে তাহ্‌নিশাঁর বেলায় মোটা ও চওড়া এবং জারনিশাঁর বেলায় সরু তারের প্রয়োজন হয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই লোগার পাত্রে খোদাই করিয়া নক্সা পূর্ব্বেই কাটিয়া রাখিতে হয়। আর ঐ খোদাই-করা নক্সার অংশের মধ্যেই সোনা বা রূপার তার বা পাত বসাইতে হয়।

নিজাম হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত বিদর অর্থাৎ প্রাচীন বিদর্ভ নগরে বাহমনী রাজ্যের যখন শেষ সুলতান রাজত্ব করিতেন, তখন হইতেই সেখানে এক প্রকার দস্তার উপর রূপা-বসানো কাজের প্রচলন ছিল। ক্রমশঃ এই কাজ 'বিদর' বা বিদরী নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই কাজ লক্ষ্ণৌ, পূর্ণিয়া ও মুর্শিদাবাদেও চলিত ছিল। ইহা মোগল আমলের একটি সৌখীন শিল্পে পরিণত হইয়াছিল। সামাদান, (বাতিদান) আফ্‌তাবা (জলপাত্র) আব্‌খোরা (পাত্র) এলাচ ও পানদান প্রভৃতি সামগ্রী এইরূপ বিদ্‌রী কাজের তৈয়ারী হইত। বিদ্‌রীর হুঁকারও প্রচলন এখনো লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে আছে। এখন ক্রমশঃ বিদেশী সস্তা দ্রব্যের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের এই

পাঞ্জাবের তাহনিশাঁ ও জারনিশার কাজ

পাঞ্জাবের
রূপার তার বসানো লোহারকা

সকল প্রাচীন শিল্পকলা লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখনো আজব ঘরে (Museum) ও

প্রাচীনকালের কয়েকটি পিতলের বাসন—
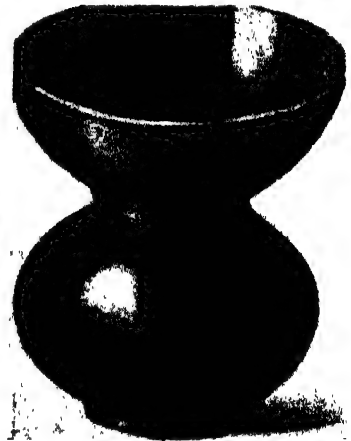
দেশীয় রাজ্যের রাজ-প্রাসাদে এইরূপ কারিগরীর পরিচয় আমরা পাই অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে।

জয়পুরের "শিলা-খানায়" শস্ত্রাগারে এখনো যে সব প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্র আছে, সে-গুলি দেখিলে বোঝা যায় যে, কেবল কারি-গরীর দিকে নহে—ধাতু-বিজ্ঞানের দিকেও প্রাচীনকালে অনেক উন্নতি হইয়াছিল। নানাপ্রকার ধাতুর মিলন দ্বারা ইস্পাত প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি করা হইয়া-ছিল। এমন ইস্পাতের তরবারী তৈয়ারী হইত যে, মোচড় দিলে বেতের ন্যায় গুটাইয়া যাইত কিন্তু ভাঙিত না এবং মরিচা পড়িয়া খারাপ হইয়াও যাইত না। নানাস্থানে এখনও এইরূপ তরবারী দেখিতে পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশের বাসন-কোসনের মধ্যে যে কারু-নৈপুণ্য আছে, তাহার উপর কারিগরী করিবার ক্ষমতা আছে কাহার ? আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির পোষাকের যেরূপ পরিবর্ত্তন বেশী কিছু হয় নাই, সেইরূপ তাহাদের হাতের ব্যবহার্য্য গৃহস্থালীর যে-সব ঘটীবাটী থাকে, সেগুলিরও বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাসন-কোসনগুলি যেমন সাধারণ গৃহস্থালীর বাসন কোসনের গঠনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য হয় নাই, তেমনি আবার মানুষের গতিশীল মন অপরদিকে কখনো স্থির থাকিতে পারে নাই। তাই দেখা যায় যে, নানাপ্রকারের বাসন-কোসনের উপর কারিগরীর দ্বারা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা আবহমানকাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য, কতকগুলি জিনিষের গঠন-প্রণালী হয় ত

পাঞ্জাবের
রূপার তার বসানো লোহার কাজ

তিব্বতী প্রাচীন জলাধার

যাঁহারা প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহাদের ব্যবহারোপযোগিতা এবং সৌন্দর্য্য এই উভয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মনোযোগী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য দু-একটি বাসন বিদেশ হইতে আমরা বেমালুম ধার করিয়াছি এবং ক্রমশঃ সেগুলির চেহারারও বদল করিয়া লইয়াছি। যেমন, চায়ের কেট্‌লি, গেলাস, খুন্‌চেপোষ (ট্রে) প্রভৃতি। এগুলি বিদেশী জিনিষ হইলেও আমাদের দেশীয় শিল্পীরা তাহাদের গঠন-তারতম্যের দ্বারা নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। বিদেশ হইতে আনীত বিজয়ী বিদেশীদের কাছ হইতে আমরা কখনো কখনো পাইয়া থাকিতে পারি ; কিন্তু সে-সব প্রণালী দেশের আব্‌হাওয়ার সহিত এরূপ জড়িত হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে বিদেশী গন্ধ ধরা বড়ই কঠিন। অবশ্য, বিদেশী বলিতে আলেক-জাণ্ডার ছাড়া, সেকালে অন্যান্য সবই প্রায় এশিয়াবাসী বিজেতা এবং তাহাদের সঙ্গে এদেশের শিল্পীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও আছে।

হিমালয়ের উত্তরে খোটানের অতি প্রাচীন শিল্পকলার আবিষ্কার হওয়ায় জানা

গিয়াছে যে চীন, জাপান ও কোরিয়ায় বৌদ্ধ-শিল্পী প্রবেশ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। পারস্য ও তুর্কিস্থানের ভিতরও তাহার প্রবেশাধিকার লাভ ঘটিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতির দ্বারা দেশের সঙ্গে দেশের এইরূপ আদান-প্রদান পৃথিবীর সর্ব্বত্রই হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। তাই

নেপালী পিলসুজ

আমরা দেখি যে, ভারতবর্ষেও এই প্রকার নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তাহার শিল্প-সাধনা অগ্রসর হইয়াছে। ভারতের এক একটি প্রদেশে তাহার আদর্শ সেখানকার শিল্পকলায়, বিশেষভাবে কারুকলায় আজও কখনো কখনো আমরা দেখিতে পাই।

প্রাচীনতম পিতলের কারুকার্য্যের নিদর্শন আমরা দক্ষিণভারতের বিজয়নগরস্থ ও অন্যান্য প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে রক্ষিত পিলসুজ বা খাসদান ও প্রদীপগুলির কারিগরীর মধ্যে দেখিতে পাই। নটরাজ প্রভৃতি
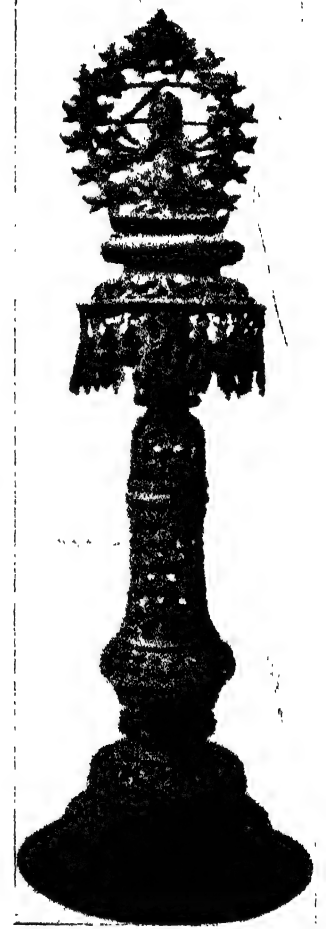
নেপালী বাসন

নানাপ্রকার ঢালাই-করা পিতলের প্রাচীন মূর্ত্তিগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা এখানে যে চিত্রটি দিতেছি, ইহা নেপালের একটি মন্দিরের দীপ। ইহাতে গণেশ ও দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই দীপটির উপর নানা প্রকারের কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া

যায়। প্রথমতঃ, এটিতে ঢালাই ও গড়াইয়ের কাজ আছে, তারপরে ইহাতে

জয়পুরের তত্ত্বতাবাসী থালি

ছেনি দিয়া ছিদ্র করিয়া এক একটি নক্সাকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌএর তৈয়ারী থালির উপর চেতাইএর কাজ

তার উপর উৎকীর্ণ করা অর্থাৎ 'চেতাই' করা হইয়াছে। এই সকল কাজ হাতের তৈয়ারী এবং ইহাই ভারতের কারুশিল্পের একটি বিশেষত্ব। এইরূপ কারিগরীর কাজ মাদ্রাজের প্রাচীন মন্দির প্রভৃতির বাসন-কোসনে খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। ওখানে তামার উপর রূপা ও সোনার নানা প্রকারের দেব-দেবীর ছবি উৎকীর্ণ অর্থাৎ চেতাইয়ে তৈয়ারী দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তর ভারত কাশী, মুরাদাবাদ, কাশ্মীর

মাদ্রাজী গহনা

কচ্ছ, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে পিতল, তামার ও দস্তার কারুশিল্পের নানা প্রকারের উৎকর্ষ দেখা যায়। আমরা কতকগুলি জয়পুরের

ও লক্ষ্ণৌ শিল্পবিদ্যালয়ের তৈয়ারী বাসন ও আববাব্‌পত্রের ছবি দিলাম। প্রত্যেক স্থানের শিল্পকলায় সেস্থানের একটি কিছু বিশেষত্ব নক্সাগুলির ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিতে

রূপার তত্ত্বাবাসী থালি বা ট্রে

দেখা যায়। যেমন, জয়পুরের কারিগরীর খোদাইয়ের উপর লাক্ষার বর্ণে এবং নক্সার ভিতর ময়ূর 'মড়ুবীর' অর্থাৎ সূক্ষ্ম মণ্ডন কাজের বাহাদুরী পরিলক্ষিত হয়। মুরাদাবাদের শিল্প দ্রব্যাদির মধ্যে জয়পুরের তুলনায় অভিনবত্ব কিছু না থাকিলেও নক্সা দেখিলে চিনিয়া লওয়া যায়। কাশীর

জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের পিতলের কাজ

কাজে লাক্ষার রঙের প্রচলন নাই রাম-সীতা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তিগুলিই তাহার নক্সার বিশেষত্ব। কাশ্মীরী কারুশিল্পে আঙ্গুর পাতা ও কল্কার নক্সাই বেশী দেখা যায়।
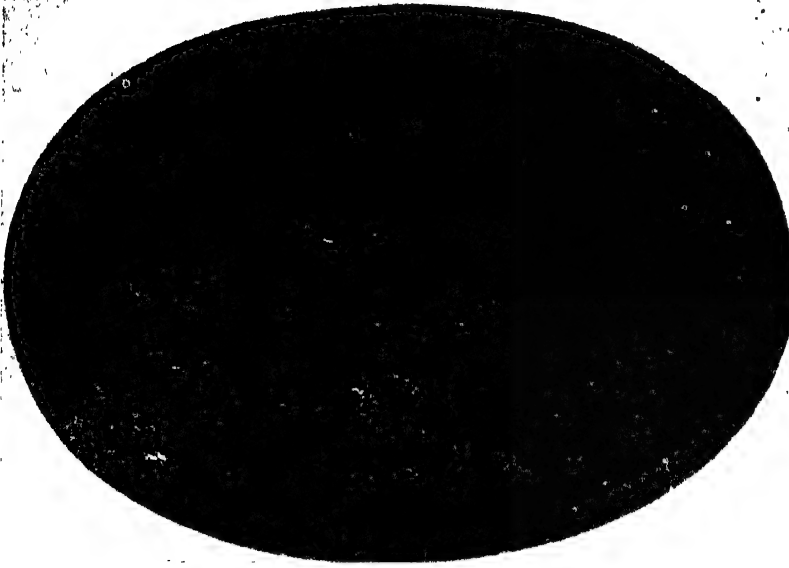
তত্ত্বাবাসী থালির এবং খুন্‌চেপোষের প্রচলন অনেক কাল হইতেই আমাদের দেশে আছে। বিবাহে, পূজায় এইরূপ থালির উপর নানান উপচার সাজাইয়া আত্মীয় স্বজনকে ভেট পাঠাইবার প্রথা বহুকালের। এই সব থালির আকার খুব বড় হইত এবং তাহার উপরে নানা প্রকারের কারুনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। জয়পুরের তৈয়ারী এইরূপ একটি

থালির ছবি দেওয়া হইল। ইহাতে সূর্য্য, রাশিচক্র প্রভৃতির চিত্র উৎকীর্ণ আছে এই প্রকার থালাগুলি বৈঠকখানায় বা গোল কামরায় কাঠের পায়ার উপর বসাইয়া সাজাইয়া রাখার রীতি আমরা বিলাত হইতে আজকাল আমদানী করিয়াছি এবং তাই সাহেবী কায়দায় বৈঠকখানা সাজাইতে আমরা পুনরায় এই দেশী জিনিষগুলির কদর করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

ধাতু শিল্পের কাজের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে মিনার কাজ। এই মিনাকারার কাজের জন্য জয়পুর সুপ্রসিদ্ধ। পিতলের বাসনের উপর যে লাক্ষা রঙের উপর মিনার কাজের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহা তাহা নহে। পিতলের উপর লাক্ষার রঙে মিনা করা হয়, আর আসল মিনার কাজ হইল রঙীন কাঁচের মত রঙ্ সোনা বা রূপার উপর খোদাই করিয়া বসাইয়া তাহা আগুনের উত্তাপে পাকা করা। এইরূপ অনেক কাজ

জয়পুরী বাসনের নক্সার কাজ
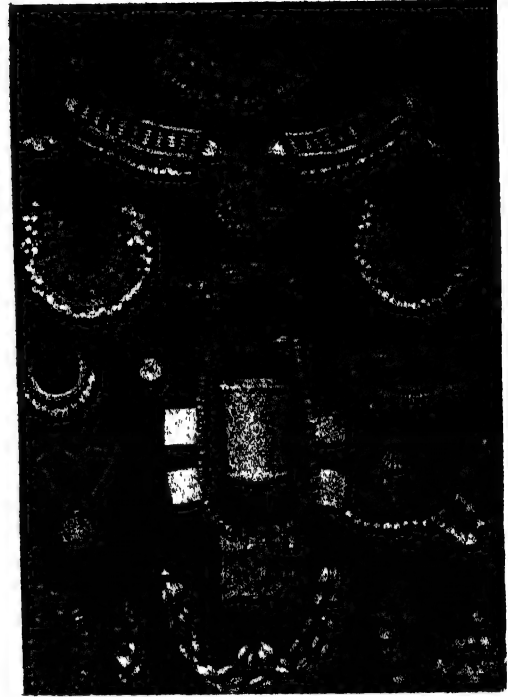
পাঞ্জাবের সাধারণ গহনা

কাশ্মীরী রূপার কাজ
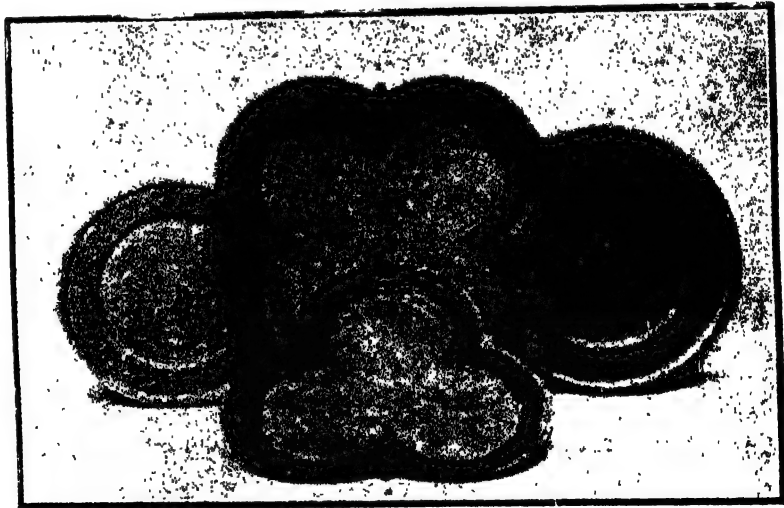
ইউরোপেও অতি প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ফরাসী দেশে ও ইটালিতেই

ইহার বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হইয়াছিল। আমাদের দেশে নিম্নলিখিত স্থানে এইরূপ মিনার কাজ করা হইয়া থাকে। যথা—জয়পুর আলোয়ার, দিল্লী, ভবানীপুর (কলিকাতা), কাশী, (সোনার উপর মিনাকারী) মূলতান, ভাওয়ালপুর, কাশ্মীর, কাঙ্গড়া, কুলু, লাহোর, সিন্ধু-হায়দ্রাবাদ, করাচী, আবোতাবাদ, নূরপুর, লক্ষ্ণৌ, কচ। আর এক প্রকারের মিনার কাজ হইয়া থাকে, যাহাতে মিনার রঙের প্রলেপের উপর জালিকাটা সোনার কাজ বসানো হইয়া থাকে। এরূপ কাজ একমাত্র প্রতাপগড় এবং তাহারই নিকটবর্ত্তী রাৎলামেই হইয়া থাকে।

মিনার কাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নমুনা

মিশরের প্রাচীন গহনা—সোনা ও পাথরের তৈয়ারী

পাওয়া যায় তুরাণী রাণীর গহনায়। কায়রো মিউজিয়ামে তাহা আজও রক্ষিত আছে। প্রথম অহমেসের পত্নী আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৭০০তে এই গহনা পরিধান করিয়াছিলেন। অতএব এই মিনার কাজের প্রাচীনত্ব সহজেই প্রমাণিত হয়। সবচেয়ে পুরাতন ভারতীয় মিনাকারীর কাজ পাওয়া যায় আকবরের সময়কার মানসিংহের হাত রাখিবার মিনার কাজওয়ালা সোনার দণ্ডটি। এই দণ্ডটির উপরের অংশটি মরকত পাথরের এবং তাহা সুন্দর ভাবে মণিমাণিক্যখচিত। আর মিনাকারীর মধ্যে জন্তু, গাছপালা, লতা-পাতা প্রভৃতির নক্সাকাটা আছে; এই দণ্ডটির মিনাকারী কাজ আজও উজ্জ্বল আছে। মনে হয়, বুঝি এইমাত্র শিল্পী উহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ইহাই জয়পুরের মিনাকারীর একটি বিশেষত্ব। উহা কখনো মলিন হয় না। ইউরোপ বা পারস্যে যে সব মিনার কাজ হয়, জয়পুরের কাজ এক পক্ষে সে-গুলিকেও ছাপাইয়া যায়—তার উজ্জ্বলতার জন্য এবং বিশেষ করিয়া লালবর্ণের অপূর্ব্ব সমাবেশের জন্য। মিনার কাজ সাধারণতঃ মণিমাণিক্যখচিত জড়োয়ার গহনার নীচের অংশেই করিতে দেখা যায়। তবে তবক-মাদুলী প্রভৃতিতেও মিনার কাজের বিশেষ প্রচলন ছিল। জয়পুর যেরূপ সোনার উপর লাল রঙের মিনার জন্য প্রসিদ্ধ, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর এবং লাহোর রূপার উপর নীল ও সাদা রঙের মিনার জন্যে তেমনি প্রসিদ্ধ ছিল। এখন মিনাকারীর কাজের প্রচলন কমিয়া যাওয়ায় ক্রমশঃ এই সুন্দর সৌখীন শিল্পটি লোপ পাইতে বসিয়াছে।

এইবার গহনার গঠনের কথা তোমাদের বলিব। গহনার প্রতি মানুষের আবহমান কাল হইতেই অনুরাগের কথা তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গহনা মানুষের এত প্রিয় যে, কখনো কখনো ফুলের রচিত গহনা পরিতেও মানুষে ছাড়ে না। ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এখনো নানা প্রকারের ফুলের রচা গহনা পরার রেওয়াজ আছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এইরূপ পুষ্পাভরণের বর্ণনা যথেষ্ট পাওয়া যায়। সোনারূপার গহনাগুলির গঠন বেশীর ভাগ পুষ্পপত্র হইতেই লওয়া। ভারতবর্ষের প্রাচীন গহনা মাত্রেই পদ্মফুলের নক্সা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের লোকেরা পৃথিবীর আকার পদ্মের মতন স্থির করিয়াছিল এবং হিমালয় হইতে সিংহল ও আফগানিস্থান হইতে কম্বোজ পর্য্যন্তই তখনকার দিনের নির্দ্ধারিত ভূগোল। এই পদ্মের নক্সার সঙ্গে আমরা দেখি কীর্ত্তিমুখ, সর্প, মকর, হংসমিথুন প্রভৃতি কতকগুলি অতি প্রিয় নক্সাও ভারতের প্রাচীন গহনায় স্থান পাইয়াছিল। ক্রমশঃ মোগল আমলে ডালিমফুল, আঙ্গুর, কল্কা, গোলাপের নক্সা দেখা দিয়াছিল। চীন দেশের যেমন ড্রাগনের অর্দ্ধ-সর্পাকৃতি অর্দ্ধ-মকরভাবের ছবি সকল নক্সার কাজে তাহারা ব্যবহার করে, প্রাচীন ভারতীয় গহনায়ও ঐরূপ চিহ্নসকল স্থান পাইয়াছিল। নানারূপ মুদ্রাচিহ্ন দ্বারা নানা বিষয় মানুষ ব্যক্ত করিয়া থাকে। সেইরূপ নক্সার মধ্যে নানান্ মাঙ্গলিক মুদ্রারও প্রচলন তখন ছিল। যেমন (১) সপ্তনদী—যথাঃ—গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, কাবেরী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, সরস্বতী, (২) হিমালয় ও অরণ্যানী, (৩) সূর্য্য, (৪) পুর্ণকুম্ভ, (৫) মঙ্গলঘট, (৬) পুষ্প, (৭) সাপের ফণা, (৮) স্বস্তিক, (৯) শঙ্খ, (১০) তুলাদণ্ড, (১১) ছত্র, (১২) অস্ত্র, (১৩) কর্ণফুল, (১৪) ধান্যাধার বা কুন্কে—এই চৌদ্দটি প্রধান মাঙ্গলিক চিহ্নস্বরূপ পূজার বাসন প্রভৃতিতে, দেবতাদের গহনা প্রভৃতির নক্সায় ব্যবহার হইতে দেখা যায়।

গহনার কাজ সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম, যে সকল গহনা "গড়াই" হয় কেবল "জড়োয়ার" অর্থাৎ মণি-মাণিক্যখচিত করিবার জন্য তৈয়ারী করা হয়। দ্বিতীয় প্রকার হইল—যাহা কেবল স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত। এই সকল গহনার গায়ে উৎকার্ণ করিয়া অর্থাৎ চিতাই (অর্থাৎ চিৎ করিয়া উল্টা দিক দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া উঁচু করিয়া নক্সাগুলিকে উঠাইয়া দেওয়া) এইরূপ করিয়া নির্ম্মিত গহনা মাদ্রাজ অঞ্চলেই বেশী ব্যবহৃত হয়। বেণীবন্ধ ও নীবিবন্ধের গহনার উপর এইরূপ 'চেতাই' কাজ হইয়া থাকে। তাহা ভিন্ন অন্য প্রণালী যাহা আছে, তাহার প্রচলন কটক, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলেই প্রসিদ্ধ। ইহাকে তারের কাজ বলে। রূপার বা সোনার সূক্ষ্ম তার পাকাইয়া পাকাইয়া নানা প্রকারের গঠন রচনার দ্বারা গহনা গড়ার কাজকেই "ফিলিগিরি" বা তারের কাজ বলে। উড়িষ্যা দেশে ছোট ছোট ছেলেরাই প্রধানতঃ এই কাজ করিয়া থাকে। সূক্ষ্ম কাজে ছোট ছেলেদের চোখ ও হাত সহজে চলে বেশী। এই তারের কাজ চীন-দেশেও বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের অনেক শিল্পকলাও যে সেখানে গিয়াছিল, তাহা জানা যায় এবং তারের কাজও যে ঠিক সেরূপে সে দেশে যায় নাই, তাহাও ঠিক বলা শক্ত।

জড়োয়ার কাজের চূড়ান্ত কারুনৈপুণ্য ভারতবর্ষের রাজন্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় হইয়াছিল এবং প্রাচীনকালে ভারতের উপর বিদেশী রাজাদের আক্রমণের উহাই প্রধান

কারণ ছিল। মোগল যুগের জড়োয়া কাজের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হইল "ময়ূর সিংহাসন" বা ময়ূরাসন। ইউরোপে নেপোলিয়ানের সিংহাসনটি ছিল সোনার গিল্টি করা একটি চেয়ার তার মধ্যে এতটুকু সৌন্দর্য্য নাই। পারস্যের সৌখীন রাজা সা আব্বাস একটির পর

কয়েকপ্রকার মাদ্রাজী গহনা

একটি সিংহাসন গড়ানো সত্ত্বেও তাঁহার কোনটিই যে মনঃপূত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। এই সা আব্বাসের সময় পারস্যের চিত্রকলারও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সম্রাট শাহজাহান তাঁহার ময়ূর-সিংহাসনের জড়োয়ার কাজের ঝলকে আর সকল রাজাদের সিংহাসনকেই হার মানাইয়াছিলেন। শাহজাহানের মত সৌখীন সম্রাট্ পৃথিবীতে আর দু'জন জন্মিয়াছিলেন কি না, জানি না। যিনি তাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহারই এই রাজাসন রচনা-সার্থক হইয়াছিল। টাভার্ণিয়ার (Tavernier) বিলাতের একজন তখনকার কালের জহুরী—১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী-নগরীতে আসেন। তিনি উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান এবং সিংহাসনটির খুঁটিনাটি মাপ-

তিব্বতদেশের চায়েব বাসন
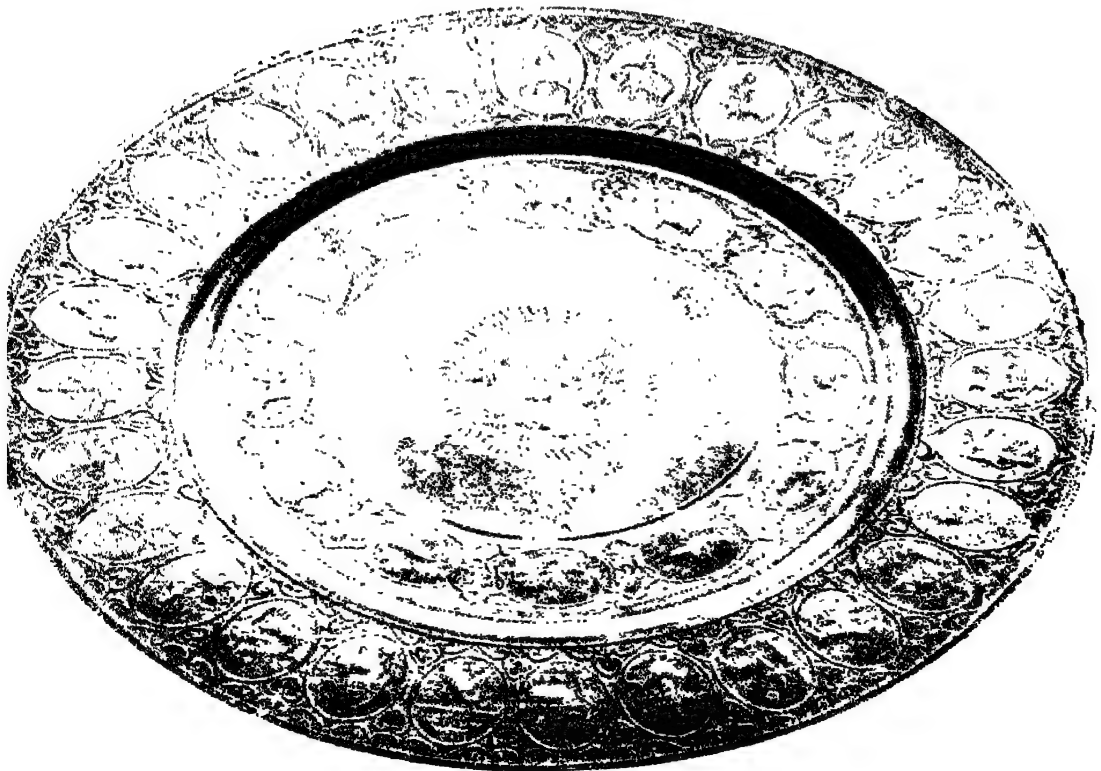
জয়পুরী তত্তাবাসী থালি
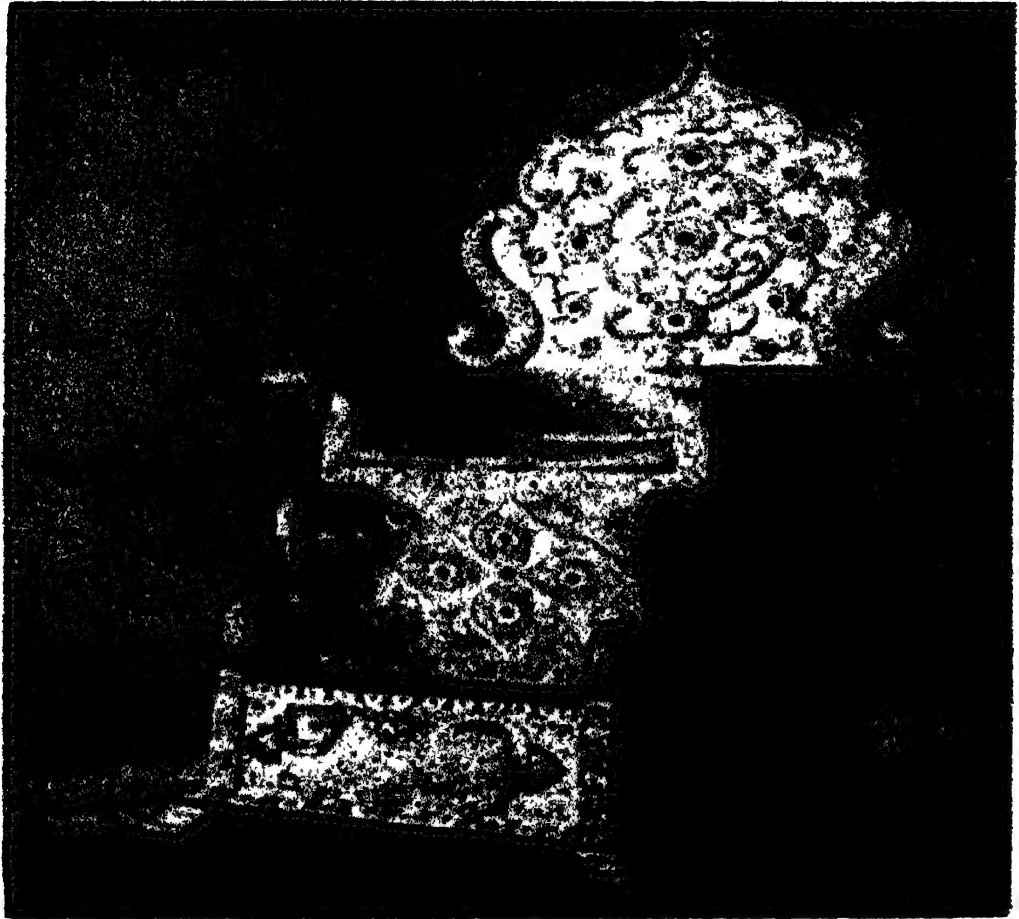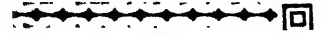
জোক ও বিবরণ লিখিয়া যান। ময়ূর-সিংহাসনটিতে শেষ মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ অধিষ্ঠান করার সময় (১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে) পারস্যের রাজা নাদির শাহ সেটি লইয়া যান এবং এখন পারস্য দরবারে সেটির রূপ বদল হইয়া গিয়াছে। নাদির শাহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মণি কোহিনূরটিও দিল্লী হইতে লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সেটি এখন পারস্য রাজাদের উপযোগী করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গঠিত হওয়ায় পূর্ব্বের সে সৌন্দর্য্য নাই। আমরা যে ছবিটি দিলাম, তাহা এখনকার ময়ূর সিংহাসনের একটি চিত্র। ইউরোপীয় পরিব্রাজক বার্ণিয়ার (Bernier) মোগল দরবারের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা কালে সম্রাটের গলার গহনা প্রভৃতির যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এক প্রকার রূপকথার কাহিনীর মত মনে হয়। কিছু কিছু মোগল গহনা, গোয়ালিয়ার, বরোদা, জয়পুর রাজন্যদের কাছে ছড়াইয়া আছে বলিয়া জানা যায়।

উৎকীর্ণ বা চেতাইয়ের কাজ বেশীর ভাগ রূপার উপর রাজদরবারের আসাসোটা, ছত্র, দণ্ড প্রভৃতি দরবারী আসবাবের উপর দেখা যায়। নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে কানের ও নাকের গোল গোল নানাপ্রকার গহনার মধ্যে চেতাইএর কাজ দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত ছাড়া অন্যত্র মাথার চিরুণীর উপর এই প্রকার উৎকীর্ণ (চেতাই) কাজের রেওয়াজ বাঙলা দেশেও আছে।

তারকাশির কাজ ক্রমশঃ আমাদের দেশে অচল হইয়া আসিতেছে। কেননা, সাধারণতঃ এ কাজ এত সূক্ষ্ম যে, ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা এক দুরূহ ব্যাপার। এ কাজ অল্প দিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। তবে আধুনিক কালে আবার রূপার তারের কাজের তৈয়ারী গহনার আদর হইতে দেখা যাইতেছে। ইহাতে মনে হয়, পুনরায় দেশের একটি লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার হইবে। ভারতবর্ষে এক সময়ে ধাতব শিল্পের যে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, এখানে সেই কথাই বলিলাম। বারান্তরে অন্য কথা বলিব।

কাজলরেখা

(পূর্ব্ববঙ্গের রূপকথা)

১১৩৯ পৃষ্ঠার পর

চম্পানগরের হীরাধর সাধু, আর বিজয়নগরের চন্দ্রধর সাধু—দুই রাজ্যের সদাগর।

হীরাধরের এক পুত্র—রত্নেশ্বর; চন্দ্রধরের এক কন্যা কাজলরেখা। রূপে-গুণে দুইজনেরই তুলনা নাই। কিন্তু হইলে কি হয়? কপালের লেখা দুই-জনেরই মন্দ।

রত্নেশ্বরের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন কোথা হইতে হঠাৎ একদিন এক সন্ন্যাসী হীরাধরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী রত্নেশ্বরকে দেখিয়াই বলিলেন 'এ ছেলের আয়ু বার বছর।'

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল। হীরাধর সন্ন্যাসীকে ধরিয়া পড়িলেন ছেলের কপালের লেখা তাঁহাকে যেমন করিয়াই হোক খণ্ডন করিয়া দিতে হইবে।

এ ছেলের আয়ু বার বছর

সন্ন্যাসী বলিলেন 'কপালের লেখা খণ্ডায় কে? তবে আমি একটা যজ্ঞ করিতে পারি। যজ্ঞের ফলে, আয়ু ফুরালেও ছেলের প্রাণ আরো বার বছরের মধ্যে বেরুবে না। এই বার বছরের মধ্যে এর গায়ে যদি চন্দ্রসূর্য্যের আলো না লাগে, আর এক লাখ সূচ ফুটিয়ে হাওয়ার পথ বন্ধ ক'রে রাখা যায়, তা হ'লে শরীরও এর তাজা থাকবে। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের কোনো প্রাণীর এর মুখ দেখাও মানা। তবে যদি এমন কোনো ঝিয়ারীর নাকের নিঃশ্বাস এর গায়ে লাগে যার বিয়ে হয়নি অথচ বিধবার লক্ষণ আছে, তাহ'লেই এ বেঁচে উঠবে।'
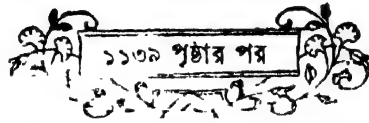
সন্ন্যাসীর কথায় হীরাধর যজ্ঞের জোগাড় করিলেন। সন্ন্যাসী যজ্ঞ করিয়া রত্নেশ্বরের হাতে একটা হীরার আংটি পরাইয়া দিলেন

এদিকে চন্দ্রধরের কন্যা কাজলরেখা তখন পাঁচ বছরের। চন্দ্রধর কোলের মেয়ে কোলে থাকিতেই বিয়ে দিবেন ঠিক করিয়াছেন, এমন সময় কোথা হইতে হঠাৎ একদিন এক সন্ন্যাসী তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী কাজলরেখাকে দেখিয়াই বলিলেন—'বিয়ের জল গায়ে পড়লেই এ মেয়ে বিধবা হবে।'

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল। চন্দ্রধর সন্ন্যাসীকে ধরিয়া পড়িলেন মেয়ের কপালের লেখা তাঁহাকে খণ্ডন করিয়া দিতে হইবে।

সন্ন্যাসী বলিলেন—'কপালের লেখা খণ্ডায় কে? তবে আমি একটা যজ্ঞ করতে পারি। যজ্ঞের ফলে, বার বছর এ মেয়ে স্বামীর ঘর করতে পারবে। চন্দ্রসূর্য্যের অদেখা বনের মধ্যে এর স্বামী জোটানো চাই; আর মরা হোক, জ্যান্ত হোক, সেই স্বামীর সঙ্গে সেই বনেই থাকা চাই। সেখানে স্বামীর সঙ্গে থেকেও যদি এ বিধবার মত থাকে, আর স্বামীও বার বছরের মধ্যে স্ত্রী বলে পরিচয় না পায়, তবেই এ জন্ম এয়োস্ত্রী হ'তে পারবে।'

সন্ন্যাসীর কথায় চন্দ্রধর যজ্ঞের জোগাড় করিলেন। সন্ন্যাসী যজ্ঞ করিয়া কাজলরেখার হাতে একটি সোনার আংটী পরাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার পরে দুই বৎসর বাদে সত্যসত্যই রত্নেশ্বরের আয়ু ফুরাইল। হীরাধর ছেলের গায়ে এক লাখ সূচ বিঁধাইয়া হাওয়ার পথ বন্ধ করিলেন। তারপর চন্দ্রসূর্য্যের অদেখা এক বনের মধ্যে এক মন্দির বানাইয়া তাহার মধ্যে তাহাকে রাখিয়া দিলেন

পাঁচ বছরের কাজলরেখা তখন সাত বছরের হইয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রধর মেয়ের বিয়ের ভাবনায় অস্থির। সন্ন্যাসী বলিয়াছেন—চন্দ্রসূর্য্যের অদেখা বনের মধ্যে তাহার স্বামী জোটানো চাই; আর মরা হোক, জ্যান্ত হোক, সেই স্বামীর সঙ্গে সেই বনেই তাহার থাকা চাই। কোথায় সে বন, আর কোথায়ই বা এমন বর জোটে! চন্দ্রধর এইরূপ নানা চিন্তায় অস্থির হইয়া সাত ডিঙ্গা সাজাইয়া মেয়েকে সঙ্গে লইয়া বরের খোঁজে বিদেশে চলিলেন।

সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া চন্দ্রধরের সাত ডিঙ্গা চলিয়াছে। চন্দ্রধর এক রাজার রাজ্য ছাড়াইয়া আর এক রাজার রাজ্যে যান। যেখানেই বনজঙ্গল দেখেন সেখানেই নামিয়া পড়েন—মেয়ের কপালে যদি সেখানে তাহার বর জোটে! কিন্তু রাজ্যের পর রাজ্য ঘোরাই সার. চন্দ্রসূর্য্যের অদেখা বনের খোজ মিলে না, কাজলরেখার বরও জোটে না।

এক দিন দুইদিন তিনদিন করিয়া তিনশ চৌষট্টি দিন কাটিয়া গেল। তিনশ পয়ষট্টি দিনের দিন সাত ডিঙ্গা সাত বাঁকা এক নদীর সাতবাঁক ঘুরিয়াছে, চন্দ্রধর হঠাৎ দেখেন—নদীর পারে এক গভীর বন, আর সেই গভীর বনের মাঝে লতাপাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় এক মন্দিরের চূড়া! চন্দ্রধর ডিঙ্গা থামাইয়া তখনই নদীর ধারে নামিলেন। তারপর কাজলরেখাকে সঙ্গে লইয়া বনের দিকে চলিলেন।

চন্দ্রসূর্য্যের অদেখা সত্যসত্যই সে এক মহাবন সেই মহাবনের মাঝে লতাপাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় শুধু মন্দিরের চূড়াটি। কিন্তু সে মন্দিরের কাছে আগাইবার পথ কই? চন্দ্রধর এদিক দিয়া যান—দেখেন গাছের পর গাছের সারি, ওদিক দিয়া যান—দেখেন কাঁটা জঙ্গলের বেড়া,—কোন দিকে হাঁটার পথ নাই। নিরুপায় হইয়া চন্দ্রধর কাজলরেখার হাত ধরিয়া বনের পাশে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

এমন সময় হাঁক-ডাক ছাড়িয়া আকাশের দেবতাও ছুটিয়া আসিলেন। হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া শোঁ শোঁ শব্দে ঝড় উঠিল। মাথার উপর কড় কড় করিয়া বাজ ডাকে, চোখের সামনে মড় মড় করিয়া গাছ ভাঙ্গে—স্থির হইয়া দাঁড়ায়ই বা কাহার সাধ্য! চন্দ্রধর ছুটিতে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। কাজলরেখা বাপের হাত হইতে ছিটকাইয়া গিয়া পড়িল। তারপর ঝড়ের মাঝে যে যেদিকে পারে ছুটিয়া চলিল।

কাজলরেখা কোনপথ দিয়া কোথায় যায়, খেয়াল নাই। ছুটিতে ছুটিতে খানিকদূর গিয়া সামনে দেখে এক মন্দির। মন্দিরের দরজায় হাত দিতেই কপাট খুলিয়া গেল। কাজলরেখা তাড়াতাড়ি সেই মন্দিরের মধ্যে

মন্দিরের মধ্যে গিয়া সে দেখে—সোনার পালঙ্কের উপর শোওয়া পরম সুন্দর এক কুমার! কুমারের শিয়রে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে। সেই প্রদীপের আলো পড়িয়া তাহার মুখে চাঁদের লহর খেলে। কুমারকে দেখিয়া কাজলরেখার চোখের পলক পড়ে না—একদৃষ্টে সে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল—

এদিকে কাজলরেখা মন্দিরে ঢুকিতেই মন্দিরের কপাট যে আপনা আপনি বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে, সেদিকে তাহার দৃষ্টিই নাই।

কিছুদূর ছুটিয়া আসিয়া চন্দ্রধরের হুঁস হইল—

সোনার পালঙ্কের উপর শোওয়া পরমসুন্দর এক কুমার

কাজলরেখা কই? মেয়ের খোজে তখনই তিনি বনের মধ্যে ফিরিয়া চলিলেন।

চন্দ্রধর কোন পথ দিয়া কোথায় যায়, খেয়াল নাই ছুটিতে ছুটিতে খানিক দূর গিয়া সাম্‌নে দেখেন—এক মন্দির। চন্দ্রধর মন্দিরের দরজায় হাত দিয়া দেখেন কপাট বন্ধ। তখন মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া তিনি ডাকিতে লাগিলেন—"মন্দিরের মধ্যে কে আছো? দরজা খোলো।"

মন্দিরের বাহিরে চন্দ্রধরের গলা শুনিয়া কাজলরেখার চৈতন্য হইল। সে তাড়াতাড়ি দরজারকাছে ছুটিয়া গেল কিন্তু মন্দিরের কপাট খুলিতে গিয়া দেখে তাহাতে যেন কুলুপ আটা,—টানিয়াও খোলারও সাধ্য নাই।

তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কাজলরেখা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

মন্দিরে ভিতরে কান্না শুনিয়া চন্দ্রধর কাজলরেখাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন—'এ কি! কাজল, মন্দিরের ভিতরে তুমি?'

কাদিতে কাঁদিতে কাজলরেখা জবাব দিল 'হাঁ'।

চন্দ্রধর বলিলেন 'আমি তোমার খোঁজেই এসেছি। কপাট খোলো।'

কাজলরেখা বলিল—

'পাষাণের কপাট এ যে, খোলা নাহি যায়।
বন্দিনী হইলাম আমি আসিয়া হেথায়॥'

চট করিয়া সন্ন্যাসীর কথা চন্দ্রধরের মনে হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—মন্দিরের ভিতরে কি তুমি একলা? না, আর কেউ আছে, কাজল?

কাজলরেখা বলিল—

'পালঙ্কে এক কুমার দেখি'
শিয়রে তার ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে।
জীয়ন্ত না মৃত কুমার
কারে সুধাই, কেই বা মোরে বলে॥'

চন্দ্রধর বলিলেন—মা, কপালের লেখা খণ্ডায় কার সাধ্য? চন্দ্রসূর্য্যের অদেখা বনের মধ্যে তোমার স্বামী জুটিবে, তাই তোমার কপালের লিখন। মন্দিরের ভিতরের ঐ কুমারই তোমার স্বামী! মরা হোক, আর জ্যান্ত হোক, ওকে নিয়েই এখানে তোমার থাকতে হবে। বার বছর বিধবার মত থাকো, আর বার বছরের মধ্যে স্বামীর কাছে পরিচয় দিও না। এতেই তোমার মঙ্গল হবে। বেঁচে থাকি তো বার বছর বাদে আবার দেখা হবে। এখন আমাকে বিদায় দাও।' —এই বলিয়া চন্দ্রধর কাজলরেখাকে সেই মন্দিরের মধ্যে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। অজানা পুরীতে বন্দী হইয়া কাজলরেখা মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তিন দিন তিন রাতের মধ্যে কাজলরেখার চোখের জল আর থামে না। তিন দিন পরে চোখের জল হাতে মুছিয়া সে উঠিয়া বসিল। তারপর পালঙ্কের কাছে গিয়া কুমার দেখিতে লাগিল।

কাজলরেখা কুমারের গায়ের দিকে চায় আর তাহার মনে হয়—কুমারের শিরায় শিরায় যেন তর্ তর্ করিয়া রক্তের স্রোত চলে; কুমারের চোখের দিকে চায় আর তাহার মনে হয়—চোখের তারা যেন টল্ মল্ করে। কিন্তু কুমার তবু চোখ মেলিয়া চায়ই না বা কেন, আর কথা কয়ই বা না কেন?

দেখিতে দেখিতে তাহার নজরে পড়িল—কুমারের গায়ে বিঁধানো এক লাখ সুচ। কাজলরেখা একটা সুচ ধরিয়া টান দিতেই তাহা খুলিয়া আসিল। অমনি কুমারের গা দিয়া ঝির্ ঝির করিয়া রক্ত বাহির হইল। কাজলরেখা সুচ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি আঙ্গুল দিয়া কুমারের গা টিপিয়া ধরিল। কিন্তু তাজা শরীরের রক্ত—আঙ্গুলের চাপেই কি তাহা বন্ধ হয়! আর কোনো উপায় না দেখিয়া শেষে কুমারের গায়ে মুখ দিয়া চুষিয়া চুষিয়া রক্ত বন্ধ করিল।

পরদিন কাজলরেখা কুমারের গায়ের আর একটা সুচ খুলিয়া ফেলিল; আর একদিনও আগের মত তাহার গা দিয়া ঝির ঝির করিয়া রক্ত বাহির হইল, কাজলরেখা কুমারের গায়ে মুখ দিয়া চুষিয়া চুষিয়া সে রক্ত বন্ধ করিল।

কাজলরেখা দেখে কুমারের গায়ের যেখান হইতে সুচ খুলিয়া ফেলে, সেখানের রক্তমাংস যেন নড়িয়া উঠে। এই সুচের ফোঁড়েই কুমারের তবে এই দশা—ইহা ভাবিয়া সে ঠিক করিল তাহার গায়ের সমস্ত সুচ খুলিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু সুচ খুলিলেই যে রক্ত পড়ে, তাই এক একদিন দুই একটার বেশী সুচ খুলিতেও সাহস হয় না। কাজলরেখা প্রত্যহ দুই একটা সুচ খোলে, আর কুমারের গায়ে মুখ দিয়া চুষিয়া চুষিয়া রক্ত বন্ধ করে। তখন তাহার নাকের নিঃশ্বাস কুমারের গায়ে লাগে।

এই ভাবে বার বছর প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। এই বার বছরের এগার বছর কুমারকে লইয়া একলা সে সেই মন্দিরের ভিতরেই আছে। মন্দিরের পিছনে প্রকাণ্ড এক ফল-মূলের বাগান, আর বাগানের মধ্যে ফটিক টলমল জলের এক সরোবর। কাজলরেখা সমস্ত দিন কুমারের কাছে বসিয়া থাকে; সন্ধ্যার আগে সরোবরে নাইতে যায়; নাইয়া ধুইয়া তারপর বাগানের ফলমূল খাইয়া কাটায়।

এগার বছরে কুমারের গায়ের এক লাখ সুচের প্রায় সবই তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। কেবল চোখের পাতায় ফোঁড়া দুইটি সুচ তোলা বাকী। সেই দুই-টিতে চোখের পাতা বন্ধ থাকায় কুমারের চোখ মেলার উপায় নাই। কিন্তু গায়ের সুচ না থাকায় শ্বাসপ্রশ্বাস পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। দেখিয়া কাজলরেখার মনে আনন্দ ধরে না—চোখের দুইটি সুচ খুলিলেই তো কুমার জীয়ন্ত হইয়া উঠিবে! আর এই কুমারই তো তাহার স্বামী।...কিন্তু স্বামী হইলেও আর এক বছরের মধ্যে তাঁহাকে তো তাহার পরিচয় দেওয়া মানা—হঠাৎ করিয়া চন্দ্রধরের এই কথা কাজলরেখার মনে পড়িল। চোখের সুচ খুলিলেই কুমার জাগিয়া উঠিয়া যদি তাহার পরিচয় চায় তবে সে কি বলিবে? মুখে যাহা তাহার বলা মানা, মনে মনে তাহা সে বলিয়া রাখিল। চন্দ্রসূর্যের অদেখা বনে চন্দ্রসূর্যের সাক্ষী মিলে না।—কাজলরেখা পালঙ্কের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মনে মনে বলিল—

"চন্দ্রসূর্যের অদেখা বনে সাক্ষী কারে মানি।
আমার স্বামী এই কুমার, জানিও বনের প্রাণী॥

এই বলিয়া সে কুমারের হাতের হীরার আংটীটি খুলিয়া নিজের আঙ্গুলে পরিল, আর নিজের হাতের সোনার আংটীটি কুমারের আঙ্গুলে পরাইয়া রাখিল। তারপর আর আর দিনের মত এদিনও বাগানের মধ্যে ফটিক টলমল জলের সরোবরের নাইতে গেল।

কাজলরেখা রোজই সেই সরোবরে নায়, কাক পক্ষীরও সাড়া পায় না। একদিন সরোবরের ঘাটে সে পা দিয়াছে, শোনে বাগানের বাইরে কে বলে—
'দাসী চাই গো, দাসী চাই?'

বাগানের বাইরে কে ও দাসীর কথা বলে?—কাজলরেখা তাড়াতাড়ি সরোবরের ঘাট হইতে উঠিয়া

দেখিতে গেল। গিয়া দেখে—এক ডোম্‌নী বুড়ি একটি মেয়ের হাত ধরিয়া বাগানের পিছনে দাঁড়াইয়া আছে।

ডোম্‌নী বুড়ী একটি মেয়ে হাত ধরিয়া বাগানের পিছনে দাঁড়াইয়া আছে।

ডোম্‌নী বুড়ী কাজলরেখাকে দেখিতে পাইয়া বলিল—মা, তোমার দাসী চাই? নাও না, আমার এই মেয়েটিকে কিনে। আমার দুঃখের কপাল,—মেয়েকে পেটেই ধরেছি, খেতে দেওয়ার উপায় নেই, তাই বেচ্‌তে এসেছি।'

বনের মধ্যে কাজলরেখার সঙ্গীসাথী নাই। ডোম্‌নী বুড়ীর কথা শুনিয়া সে ভাবিল—মেয়েটিকে কিনিতে পারিলে মন্দ কি!—এই বিজন বনে তবু একজন সঙ্গী হইবে। সে ডোম্‌নী বুড়ীকে জবাব দিল—'মেয়েটিকে পেলে তো আমার ভাল হয়। কিন্তু ওকে কেনার পয়সা যে আমার নাই।'

ডোম্‌নী বুড়ী কাজলরেখার হাতের দিকে চাহিয়া বলিল—'কেন, তোমার পয়সার দুঃখ কি মা! তোমার হাতে দেখ্‌চি সোনার কঙ্কণ,—ঐ কঙ্কণই আমাকে দাও না, আমার মেয়েকে তোমায় দিয়ে যাচ্ছি।

ডোম্‌নী বুড়ীর কথায় কাজলরেখা হাতের কঙ্কণ দিয়া ডোম্‌নী মেয়েকে কিনিয়া রাখিল।

নিজে নাইয়া-ধুইয়া ফলমূল খাইয়া ফিরিতে দেরী হইবে, তাই সে ডোম্‌নী মেয়েকে মন্দির দেখাইয়া দিয়া বলিল 'তুমি ঐ মন্দিরের মধ্যে গিয়া বস।'

ডোম্‌নী মেয়ে মন্দিরের মধ্যে গিয়া দেখে সোনার পালঙ্কের উপর শোওয়া পরম সুন্দর এক কুমার। কুমারের শিয়রে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে। সেই প্রদীপের আলো পড়িয়া তাহার মুখে চাঁদের লহর খেলে। দেখিয়া ডোম্‌নী মেয়ের চোখের পলক পড়ে না—একদৃষ্টে সে কুমারের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে তাহার নজরে পড়িল—কুমারের হাত নড়ে, পা নড়ে, বুকের নিশ্বাস পড়ে, কিন্তু চোখের পাতা কেন বন্ধ?

ডোম্‌নী মেয়ে ঠাওর করিয়া দেখে কুমারের চোখের পাতায় বিঁধানো দুইটা সূচ। সে সূচ দুইটা ধরিয়া টান দিতেই তাহা খুলিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে কুমারও চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিল।

বার বছরের ব্যাপার—রত্নেশ্বর কোথায় আছে, কেন আছে, কিছু তাহার মনে নাই; আর চন্দ্রসূর্য্যের অদেখা গভীর বনের কুমারই যে রত্নেশ্বর তাহাই বা তাহাকে বলিয়া দিবে কে! জাগিয়া উঠিয়া রত্নেশ্বর ডোম্‌নী মেয়েকে সাম্‌নে দেখিয়া তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—কে এ?

রত্নেশ্বরের ভাব দেখিয়া ডোম্‌নী মেয়ের মনে কুবুদ্ধি হইল। সে রত্নেশ্বরকে বলিল—'আমাকে কি চিন্‌তে পারছ না? আমি যে তোমার চোখের সূচ খুল্‌লাম, আর তাতেই যে তুমি জেগে উঠ্‌লে!'

সূচের কথা শুনিয়া রত্নেশ্বরের সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়িল। তাহার দশ বৎসর বয়সের সময় এক সন্ন্যাসী তো বলিয়াছিলেন—আয়ু ফুরাইলে গায়ের সূচ ফুটাইয়া চন্দ্রসূর্য্যের অদেখা এক বনে তাহাকে রাখিয়া দিতে হইবে। রত্নেশ্বর ভাবিতে লাগিল এই মেয়েটি তাহার গায়ের সেই সূচ তুলিয়া ফেলিয়াছে, আর তাহাতেই হয়তো সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে। যে এমন উপকার করিয়াছে তাহাকে কি দেওয়া যায়?

ভাবিতে ভাবিতে সে মনে ঠিক করিল এই মেয়েই তাহার স্ত্রী হওয়ার যোগ্য।

রত্নেশ্বর ডোম্‌নী মেয়েকে বলিল 'আগে তোমাকে চিন্‌তে পারিনি। এখন বুঝ্‌লাম, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। যে প্রাণ তোমার জন্য পেয়েছি তার'

মালিকও তুমি। আজ হতে তুমিই আমার

রত্নেশ্বরের কথা শুনিয়া ডোমনী মেয়ে আহ্লাদে আটখানা। মাথা নাড়িয়া তাহার কথায় সায় দিয়া তাড়াতাড়ি সে পালঙ্কের উপর বসিয়া পড়িল। রত্নেশ্বরও তাহাকে আদর করিয়া টানিয়া লইল।

এই সময়ে কাজলরেখা স্নান করিয়া মন্দিরে ফিরিল।

সেই দাসী কুমারের গা ঘেঁসিয়া পালঙ্কে বসিয়া আছে

মন্দিরে ঢুকিয়াই সে দেখে—কুমার জাগিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, আর হাতের কঙ্কন দিয়া সে যে-দাসী কিনিয়াছে, সেই দাসী কুমারের গা ঘেঁসিয়া পালঙ্কে বসিয়া আছে! এ কি ব্যাপার?—কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কাজলরেখা অবাক হইয়া দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া রহিল।

রত্নেশ্বর কাজলরেখাকে দেখিতে পাইয়া ডোম্‌নী মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিল—'এ আবার কে?'

ডোম্‌নী মেয়ে জবাব দিল—'ও আমার দাসী।'

ডোমনী মেয়ের কথা শুনিয়া কাজলরেখার চক্ষু-স্থির। মনের দুঃখে সে ভাবিতে লাগিল---

'কর্ম্মদোষে বার বছর ছিলাম বনবাসী।
দাসী হইল রাজরাণী, আমি হইলাম দাসী॥'

কিন্তু এখনও তো বার বছর ফুরায় নাই,—মুখ ফুটিয়া নিজের পরিচয় দেওয়ারও জো নাই, আর পরিচয় দিলেও চন্দ্রসূর্য্যের অদেখা এ গভীর বনে তাহা বিশ্বাস করিবে কে! কাজল মনের দুঃখ মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিল।

এদিকে প্রাণ পাইয়া রত্নেশ্বর বাড়ী যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন ডোমনী মেয়ে আর কাজলরেখাকে সঙ্গে লইয়া সে দেশে ফিরিল।

ইহার মধ্যে রত্নেশ্বরের বাপ-মা দুজনেই মারা গিয়াছেন। ডোমনী মেয়ে রত্নেশ্বরের বাড়ী আসিয়া সত্যই রাজরাণী হইয়া বসিল। আর কাজলরেখা ডোমনী মেয়ের, বাঁদী হইয়া রহিল।

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই ডোমনী মেয়ের ভাবচরিত্র দেখিয়া রত্নেশ্বরের মনে খট্‌কা লাগল—এই তাহার স্ত্রী!--দাঁত মাজে না, গা ধোয় না, মাথায় তেল দেয় না, ছোট লোকের মত ন্যাকড়া ছাড়া পরে না, আর কথায় কথায় কোমর বাঁধিয়া সকলের সঙ্গে কোঁদল করে! আর তাহারই দাসী যে, কেমন সে সব্যভব্য লক্ষ্মীটি,—সাতচড়ে মুখে রা নাই ভোরে উঠিয়া স্নান করে, দেবদেবীরে প্রণাম না করিয়া জল ফোটা মুখে দেয় না, সকলের শেষে খায়, সকলের শেষে শোয়,---মুখের দিকে চাইলে মনে হয় যেন শিশিরে-ভেজা যুঁইয়ের কলিটি! রত্নেশ্বর প্রত্যেক দিনই দুই জনকে দেখে আর তাহার মনের খট্‌কা বাড়িয়া যায়। কিন্তু এ খট্‌কা দূর করিবারই বা উপায় কি?

একদিন রত্নেশ্বর বন্ধুবান্ধবদের কাছে মনের কথা বলিল। বন্ধুবান্ধবেরা বলিল, 'বেশ, দুজনকেই তবে পরীক্ষা কর।'

রত্নেশ্বর বলিল 'কি পরীক্ষা?'

বন্ধুবান্ধবেরা বলিল, 'তুমি দুজনকেই গিয়া বলো শীগ্‌গীরই তুমি বাণিজ্যে যাবে, তার জন্যে তোমার লক্ষ্মী পূজা করার দরকার; পূজার জন্যে দুজনেই আল্‌পনা দিক্। হাতের আল্‌পনা দেখ্‌লেই বোঝা যাবে কার কোন্ বংশে জন্ম।'

বন্ধুবান্ধবদের কথায় রত্নেশ্বর অন্দরে গিয়া ডোমনী মেয়েকে বলিল, 'আমি বাণিজ্যে যাব, তার জন্যে লক্ষ্মী পূজা করার দরকার ; ভিতর বাড়ীতে তুমি

আলো চালের পিটুলি দিয়া আলপনা আকিল

আল্পনা দিয়া রাখো।' তারপর চুপে চুপে কাজল-রেখাকেও ডাকিয়া সে বাহির বাড়ীতে লক্ষ্মী পূজার আল্পনা দিতে বলিল।

ডোমনী মেয়ে সারা দিন বিছানায় গড়াইয়া সন্ধ্যার আগে উঠিল। তারপর আধোয়া গায়ে, আধোয়া কাপড়ে একবাটী ময়দার গোলা লইয়া ভিতর-বাড়ীতে আল্পনা দিতে বসিল। আল্পনায় সে আকিয়া রাখিল কাকের ঠ্যাং, 'বকের ঠ্যাং, ডালা, কুলা, ধামা গুগ্‌লী, আর কাছিমের ডিম!

কাজলরেখা সারাদিন উপোষী থাকিয়া সন্ধ্যার আগে স্নান করিয়া আসিল। তারপর আলোচালের পিটুলি দিয়া আল্পনা আকিল স্থলপদ্ম, জলপদ্ম, আর শতদল পদ্মের মধ্যে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি।

সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধবগণকে সঙ্গে লইয়া রত্নেশ্বর আল্পনা দেখিতে আসিল। প্রথমে বাহির বাড়ীতে কাজলরেখার আল্পনা দেখিয়া সকলেই মহা খুসী ; কিন্তু ভিতর বাড়ীতে পা দিয়া তাহারা অবাক! এ কি রকম আল্পনা! বন্ধুবান্ধবেরা বলাবলি করিতে লাগিল 'রত্নেশ্বরের বৌ কি ডোমনী বেটী, না জেলেনী মেয়ে!'

কিন্তু একদিনের পরীক্ষায় বিচার চলে না। বন্ধু-বান্ধবেরা বলিল, 'আর এক পরীক্ষা হোক। তুমি তো বাণিজ্যে যাবে, বলেছ। বলো গিয়ে বাণিজ্যে যাবার আগে বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াতে হবে। তারপর এক একজনকে এক একদিন রাঁধতে বলো। রান্না দেখে বোঝা যাবে কার কোন্ বংশে জন্ম।'

বন্ধুবান্ধবদের কথায় রত্নেশ্বর প্রথমে ডোমনী মেয়ের কাছে বলিল 'বাণিজ্যে যাবার আগে বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াতে হবে। তুমি নিজে আজ একটু ভাল-অভালো রাধো গিয়ে দেখি।'

ডোমনী মেয়ে সারাদিন বিছানায় গড়াইয়া সন্ধ্যার আগে উঠিল। তারপর আধোয়া গায়ে আধোয়া কাপড়ে রান্না ঘরে গিয়া রান্না করিতে বসিল। আর বাছিয়া বাছিয়া রান্না করিল আলুনী কচুর শাক, অসিদ্ধ থোড়ের ঘণ্ট, অকুটন্ত খেসারীর দাল, আর শুট্‌কি মাছের চচ্চড়ি!

রাত্রে বন্ধুবান্ধবেরা খাইতে বসিয়া কাণাকাণি করিতে লাগিল 'রত্নেশ্বর বৌ কি ডোম্‌নীর বেটী, না জেলেনীর মেয়ে!'

পরের দিন রত্নেশ্বর কাজলরেখাকে বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ার কথা বলিয়া রাধিতে বলিল।

কাজলরেখা নাইয়া ধুইয়া আসিয়া খাবার জিনিষ-পত্র জোগাড় করিল। তারপর রান্নাঘরে গিয়া উনুন ধরাইয়া একে একে রাধিয়া রাখিল বত্রিশ ব্যঞ্জন, ছত্রিশ ভাজা, দাল, ডালনা, চাট্‌নি, পোলাও, পায়স আর হরেক রকম পিঠা।

বন্ধুবান্ধবেরা খাইতে বসিয়া খাবার জিনিষ দেখিয়া মহাখুসী।

কিন্তু দুইদিনের পরীক্ষাও যথেষ্ট নহে। বন্ধুবান্ধবেরা বলিল 'কথায় বলে তিন তিনবার। আর একটা পরীক্ষাও হোক্।'

এবারের পরীক্ষা কি হইবে, কেহই ঠিক করিতে পারে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে এক বন্ধু বলিল--- 'তুমি দুজনকেই বলো গিয়ে ভাটিয়াল রাজা এদেশে আস্‌বে শোনা যাচ্ছে। সে আস্‌লে কারুর রক্ষে নেই।

যার প্রাণ বাঁচাবার ইচ্ছে থাকে, সে এখন হতেই সাবধান হও। তুমি এ কথা বল্‌লেই বুঝা যাবে কে কেমন মেয়ে!'

বন্ধুর কথা শুনিয়া রত্নেশ্বর প্রথমে ডোম্‌নী মেয়ের কাছে গেল। তারপর তাহাকে বলিল দেখো, ভাটিয়াল রাজা এ দেশে আস্‌বে শোনা যাচ্ছে। সে আস্‌লে কারুর রক্ষে নেই। তোমার প্রাণ বাঁচাবার ইচ্ছে থাকে তো এখন হইতেই সাবধান হয়ে তার ব্যবস্থা করতে পার।'

রত্নেশ্বরের কথা শুনিয়া ডোম্‌নী মেয়ে চেচাইয়া উঠিল 'ও বাবা গো, এ কি সব্বনেশে কথা! তোমার দেশে এসেছি কি আমি প্রাণ হারাতে! শীগ্‌গীর বলো কোথায় গেলে আমি রক্ষা পাই।

রত্নেশ্বর বলিল 'গোয়াল ঘরের পেছনে মাটির নীচে যে আঁধার কুঠা আছে সেখানে গিয়ে তুমি থাকতে পার। সেখানে থাকলে কারু কিছু টের পাওয়ার কথা নয়, তোমারও প্রাণ হারাবার ভয় নেই।'

ডোমনী মেয়ে বলিল 'এক্ষুণি আমি সেখানে যাচ্ছি। কিন্তু আর একটা কথা তোমার ধনদৌলত সেখানে আমার নিয়ে যাওয়া চাই। কি জানি ভাটিয়াল রাজার হাতে তোমার যদি প্রাণ যায়, তা হ'লে আমার উপায় কি।'

রত্নেশ্বর বলিল 'বেশ' সে ব্যবস্থাও আমি করছি। আগে তুমি তো সেখানে যাও।'

ডোম্‌নী হাতের কাছে যেখানে যাহা পাইল তাহা লইয়া আঁধার-কুঠাতে গিয়া ভয়ে ভয়ে দরজা বন্ধ করিয়া রহিল।

ইহার পর রত্নেশ্বর কাজলরেখাকে ডাকিয়া বলিল 'দেখো, ভাটিয়াল রাজা এ-দেশে আস্‌বে শোনা যাচ্ছে। সে আস্‌লে কারুর রক্ষে নেই। তোমার প্রাণ বাঁচাবার ইচ্ছা থাকে তো এখন হ'তেই সাবধান হও।'

রত্নেশ্বরের কথা শুনিয়া কাজলরেখা বলিল আমি দাসী-বাঁদী, আমার প্রাণের ভয় নেই। কিন্তু যাঁর ঘরে আমি খেয়ে প'রে বেঁচে আছি, তাঁর সুখদুঃখে আমারও সুখদুঃখ। ভাটিয়াল রাজা এলে তাঁর যে বিপদ হবে সে বিপদ থেকে আমি দূরে থাকতে চাইনে। বলুন, আপনার কোনো বিপদের ভয় আছে নাকি, তাহ'লে আমার প্রাণ দিয়েও আপনাকে রক্ষা করতে চেষ্টা কর্‌ব।'

কাজলরেখার কথা শুনিয়া রত্নেশ্বরের মনে আনন্দ ধরে না। বন্ধুবান্ধবেরাও সকল কথা শুনিয়া বলিল তোমার যে বউ, নিশ্চয়ই সে ছোট লোকের মেয়ে। আর যে তার দাসী, নিশ্চয়ই সে দাসী নয়।'

কিন্তু কাজলরেখার পরিচয় জানারই বা উপায় কি? আর কোনো উপায় না পাইয়া শেষে একদিন রত্নেশ্বর কাজলরেখাকে ধরিয়া পড়িল কে সে, পরিচয় তাহার দিতেই হবে।

সে রত্নেশ্বরের পায়ের গোড়ায় লুটাইয়া পড়িয়া বলিল

রত্নেশ্বরের মুখে পরিচয়ের কথা শুনিয়া কাজল-রেখার বার বছরের চোখের জল আর বাঁধ মানে না। চন্দ্রসূর্যের অদেখা বনে বার বছর যাহাকে লইয়া তাহার থাকিতে হইয়াছে, যাহার কাছে সধবা হইয়াও বিধবার মত সে আছে, তাহার কাছে কি তাহার পরিচয় গোপন থাকিবে!

কিন্তু বার বছর এখনও তো ফুরায় নাই কাজল-রেখা নিজের মুখে রত্নেশ্বরকে পরিচয়ই বা দেয় কিরূপে! আঁচলে চোখ ঢাকিয়া চোখের জল মুছিতে

মুছিতে সে রত্নেশ্বরকে বলিল—'আমার আবার পরিচয় কি! যে দাসী হ'য়ে এ বাড়ীতে এসেছি, সেই দাসী হ'য়েই যেন এখানে জন্ম কাটাতে পারি।'

কাজলরেখার এই জবাব শুনিয়া রত্নেশ্বরের মন প্রবোধ মানে না। রোজই সে কাজলরেখাকে ধরিয়া পড়ে 'নিশ্চই তুমি দাসী নও, তোমার আসল পরিচয় কি, বলো।' কাজলরেখা রোজই একটা না একটা কিছু জবাব দিয়া এড়াইয়া যায়।

এই রকম করিয়া কিছুদিন গেল। কিন্তু বার বছর যেদিন শেষ হইল, সেদিন কাজলরেখা রত্নেশ্বরের কাছে পরিচয় আর গোপন রাখিতে পারিল না এদিনও রত্নেশ্বর যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'তোমার আসল পরিচয় কি, বলো তখন সে রত্নেশ্বরের পায়ের গোড়ায় লুটাইয়া পড়িয়া বলিল

'বার বছরের দুঃখ আমার ধোয় না চোখের জলে।
বুকের মাঝে চিতার আগুন জলছে পলে পলে॥
চন্দ্রসূর্য্যের অদেখা বনে সাক্ষী কারে মানি।
আমার স্বামীর সাম্‌নে আমি, জানে বনের প্রাণী॥

'কি? কি বলিলে, তুমি?' রত্নেশ্বরের বুকের মাঝে হাতুড়ির শব্দ হইতে লাগিল। এতদিনের স্বপ্ন আজ সফল হইয়াছে রত্নেশ্বর দুইহাত বাড়াইয়া কাজলরেখাকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

কাজলরেখা বলিল 'এমন যে সীতা-সতী, তারও পরীক্ষা হয়েছিল। আমারও পরীক্ষা হোক্। বার বছর যা মুখ বুঝে স'য়ে রয়েছি, আজ মুখের কথায়ই সে দাবী চলবে কেন? এই বলিয়া সে নিজের হাত উঁচু করিয়া রত্নেশ্বরের চোখের সাম্‌নে ধরিল।

রত্নেশ্বর চাহিয়া দেখে তাহার হাতের হীরার আংটী কাজলরেখার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতের দিকেও নজর করিয়া সে দেখে তাহার হাতে সোনার আংটী, আর তাহাতে লেখা কাজলরেখা।

কাজলরেখা আবার বলিল 'এ তো গেল এক পরীক্ষা। আর এক পরীক্ষা হোক্ আমার বাপ-মায়ের সাম্‌নে, তাঁরা না এলে আমার আসল পরিচয় দিবেই বা কে, আর তা বিশ্বাস হবেই বা কেন।'

রত্নেশ্বর বলিল 'কাজল, আগেই তোমার তিন পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আর পরীক্ষার দরকার নেই। তবে তোমার বাপ-মার কাছেও তোমার খবর দেওয়া উচিত। বলো, তোমার বাপের নাম কি, এখনই তাঁর কাছে লোক পাঠাচ্ছি।'

কাজলরেখা রত্নেশ্বরকে চন্দ্রধরের নাম বলিল। রত্নেশ্বর তখনই চন্দ্রধরের কাছে লোক পাঠাইলেন।

বার বছর পরে চন্দ্রধর মেয়ের খোঁজে চন্দ্রসূর্য্যের অদেখা বনে যাইবেন, ঘাটে সাত ডিঙ্গা সাজানো, এমটি সময় রত্নেশ্বরের লোক গিয়া উপস্থিত। চন্দ্রধর মেয়ের খবর পাইয়া তখনি সকলকে লইয়া ডিঙ্গায় উঠিলেন। দেড়শো মাঝি দেড়শো দাঁড় বাহিয়া সাত ডিঙ্গা ঝড়ের মত চালাইয়া দিল।

.. ..

রত্নেশ্বর চন্দ্রধরের মুখে কাজলরেখা সমস্ত পরিচয় পাইল। আর সন্ন্যাসীর কথায়ই তাহাকে যে চন্দ্রসূর্য্যের অদেখা বনে রাখিয়া আসিতে হইয়াছিল, তাহাও জানিতে পারিল।

কিন্তু ডোমনী মেয়ের পরিচয় তখনও তাহার জানা হয় নাই। তাই রত্নেশ্বর কাজলরেখাকে জিজ্ঞাসা করিল—'এতদিন যাকে নিয়ে ঘর করলাম, সে কে? চন্দ্রসূর্য্যের অদেখা বনে তোমরা দুজনেই তো একসঙ্গে ছিলে, নিশ্চয় তুমি তার পরিচয় জান। বলো, কে সে?

কাজলরেখা ডোমনী মেয়ের পরিচয় দিল নিজের হাতের কঙ্কন দিয়া সে-ই তাহাকে কিনিয়াছিল।

সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া রত্নেশ্বরের মনের ধাঁধা ঘুচিয়া গেল।

ডোম্‌নী মেয়ে মাটির নীচে যে আঁধার-কুঠিতে ঠাঁই লইয়াছিল সেখান হইতে তাহাকে আর বাহির হইতে দেওয়া হইল না। আঁধার-কুঠির দরজায় কুলুপ আঁটিয়া জন্মের মত তাকে সেখানে বন্ধ করিয়া রাখা হইল।

আর কাজলরেখা সন্ন্যাসীর কথামত বার বছর তাহাকে চন্দ্রসূর্য্যের অদেখা বনে স্বামীর সঙ্গে বিধবার মত কাটাইতে হইয়াছে। তাহার ফলে তাহার কপাল ফিরিল। স্বামীর ঘরে স্থান পাইয়া সে জন্ম এয়োস্ত্রী হইয়া মনের সুখে ঘর সংসার করিতে লাগিল।

বায়ুচালিত বাদ্যযন্ত্র, পাখীর গান ও কীট-পতঙ্গের শব্দ

আমরা এইবার বায়ুচালিত বাদ্যযন্ত্রের বিষয়ে আলোচনা করিব। কিরূপে ঐ সমুদয় যন্ত্র বাজে এবং কিরূপেই বা তাহাদের আনুসঙ্গিক সুরের উৎপত্তি হয়, এখানে সে সকল কথাই বলা হইবে। মানুষের গলা হইতে কি ভাবে শব্দ উচ্চারিত হয়, কীট-পতঙ্গই বা কেমন করিয়া বিভিন্ন প্রকারের শব্দ উৎপাদন করে, তাহাও প্রসঙ্গক্রমে বলিব। প্রথমেই দুই একটি কথা বলিয়া রাখিয়াছি। এই কথা কয়টি স্মরণ রাখা উচিত।

শব্দ বিস্তার হইতেছে, বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, বায়ুতে চাপ বাড়িয়াছে এবং কমিতেছে। সুরের মাত্রা হিসাবে আমাদের কানের নিকট এইরূপে এক সেকেণ্ডে যদি ৫১২ বার চাপের ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আমরা উক্ত সুরের গান শুনিতে পাইব। অতএব প্রত্যেক বায়ুচালিত বাদ্যযন্ত্র হইতে সুরের সৃষ্টি করিতে হইলে তাহার মধ্যস্থিত বায়ুর চাপ যাহাতে কমে ও বাড়ে, সেরূপ কৌশলে যন্ত্র তৈয়ারী করিতে হইবে এবং যাহাতে প্রচুর পরিমাণ শব্দ হয় ও তাহা হইতে সুমধুর সুর-লহরী সৃষ্টি হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

বাঁশীর মুখে বাঁশী বাজাইবার জন্য একটি ক্ষুদ্র অংশ সংযুক্ত থাকে; তাহার ইংরাজী নাম মুখ-ভাগ (Mouthpiece)। বাঁশীর আকার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বাঁশীর মুখে ভিন্ন ভিন্ন আকারের মুখ-ভাগ থাকে। বাঁশীর আকার, গঠন ও মুখভাগের উপর সুরের মিষ্টতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

বাঁশীর মুখভাগ (Mouthpiece)

তোমরা সানাই বাঁশীর মিষ্ট সুর নিশ্চই শুনিয়াছ। সানাই বাঁশী কিরূপ ভাবে গঠিত, 'তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি? সানাইয়ের অবয়ব প্রথম দিক্‌টায় সোজা এবং গোল, নীচের দিকে ফুলদানির মত বিস্তৃত। কর্‌নেটের আকার সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের। মুখের নিকট নলের আয়তন অতি অল্প কিন্তু ক্রমশঃ ইহার আয়তন বাড়িতে থাকে। গ্রামোফোনের 'হর্ণ' (চোঙ্) মুখের কাছে সরু কিন্তু শেষের দিক ক্রমে মোটা হইয়া গিয়াছে।

বায়ুচালিত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে 'ফ্লুটে'র ব্যবহার সকল দেশেই আছে। ইহার অবয়ব নলের মত

গোল। বিভিন্ন সুরের সৃষ্টি করিবার জন্য ইহার মধ্যে ছয়টি ছিদ্র থাকে। ফ্লুট বাঁশী সচরাচর পিতলের বা কাঠের খোলের হইয়া থাকে। কাঠের বাঁশীর সুর পিতলের বাঁশীর সুর অপেক্ষা বেশী মিষ্ট হয়। গির্জ্জাঘরে যে সকল বড় বড় 'অর্গান' বাজান হয়, তাহাদের গঠন-রীতি ও বাজাইবার কৌশল অনেকটা ফ্লুট বাঁশীর মত। ফ্লুট বাঁশীর ছয়টি ছিদ্রই অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধ রাখিলে মোটা সুর বাহির হয়। নিম্ন হইতে পর পর ছিদ্র খুলিলে সুর চলিতে থাকে। তারের যন্ত্রে কেমন করিয়া সুর চড়া ও মোটা করিতে হয়, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তার টানিয়া বাঁধিবার পর তাহার দৈর্ঘ্য কমাইলে তাহার সুর চড়িয়া যায় এবং বাড়াইলে মোটা হয়। সকল বাঁশীতেই এই রূপ একটি নিয়ম আছে। বাঁশী বাজিলে বাঁশীর মধ্যস্থিত বায়ু কম্পিত হয় এবং চাপও কমে বাড়ে। বাঁশীর মুখ হইতে কম্পনের সৃষ্টি হইয়া, বাঁশীর শেষ পর্য্যন্ত নলের ভিতরকার সকল বায়ুকণাই কাঁপিতে থাকে।

বাঁশী বাজাইলে, বাঁশীর ভিতরকার বায়ুকণাই কম্পিত হয় এবং চাপও বাড়ে কমে। মুখের নিকট বায়ুর চাপ অধিক মাত্রায় বাড়ে কমে, কিন্তু নলের সীমায়, চাপ অতি অল্প মাত্রায় বাড়ে কমে। মুখ হইতে উক্ত সীমা পর্য্যন্ত যে দৈর্ঘ্য, তাহাকে নলের দৈর্ঘ্য বলা হয়। যখন সকল ছিদ্র বন্ধ থাকে সে সময় বাঁশীর
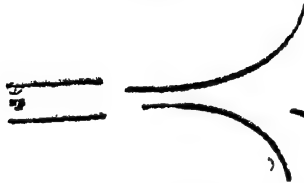
ফুঁ দিলে নলের মধ্যস্থ বায়ুর চাপের বৃদ্ধি ও হ্রাস দৈর্ঘ্য নলের দৈর্ঘ্যের সমান। কিন্তু যখন কোনও ছিদ্র খোলা হয়, তখন সেই স্থানে বাহিরের বায়ুর সহিত বাঁশীর ভিতরকার কম্পনকারী বায়ুর সংযোগ হইয়া যায় এবং এই সময় বাঁশীর মুখ হইতে সেইছিদ্র পর্য্যন্ত তাহার দৈর্ঘ্য হইবে। এই দৈর্ঘ্য কমিলে সুর চলিবে এবং বাড়াইলে সুর মোটা হইবে। অতএব উপরে একটি ছিদ্র খুলিয়া দিলে, সেইস্থানে বাহিরের বায়ুর সহিত সংযোগ হইয়া যায় এবং নলের দৈর্ঘ্য কমিয়া গিয়া চড়া সুরের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মোটামুটি এই নিয়মেই সুর খেলান হয়। তবে বাস্তবপক্ষে ছিদ্রগুলি সরু হওয়ায় একটু ব্যতিক্রম ঘটে এবং বৈজ্ঞানিক নিয়মে দৈর্ঘ্যের হিসাব রাখিয়া ইচ্ছামত সুরের সৃষ্টি করা যায়

সুরের মিষ্টতা

নলের আকারের বাঁশীগুলিতে যদি শেষের দিক খোলা থাকে, তাহা হইলে উপরিউক্ত নিয়মে সুরচড়া ও মোটা হয় এবং আনুসঙ্গিক সুরগুলি প্রাথমিক সুর অপেক্ষা ২, ৩, ৪, ৫ গুণ চড়া হইয়া থাকে (১০৩৬ পৃষ্ঠা 'শিশু-ভারতী') এবং সেই কারণে সুরও বেশ মিষ্ট হয়।

এখন কি প্রকারে বাঁশীর মুখে ফুঁদিয়া বায়ুতে কম্পনের সৃষ্টি করা হয় সেই কথা বলিব। বাঁশীর মুখ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাঁশীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দুই প্রকার 'মুখ' দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট মুখের ছিদ্র (Rectangular) হইতে বায়ু নিঃসৃত হইয়া সম্মুখের (edge) ধারাল জিনিষের পর আঘাত করে। এইজন্যই বায়ুতে ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়। জলের স্রোতের উপর একটি ছড়ি ধরিলে যেমন ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়, সেইরূপে বাঁশীর মুখে ফুঁ দিলে ছিদ্র হইতে বায়ু বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং সেই প্রবাহিত বায়ুর মধ্যে ধারাল জিনিষটি থাকায় ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়। উপরে ঘূর্ণীর চিত্র দেওয়া গেল। তোমাদের বুঝিবার সুবিধারজন্য চিত্রটি একটু বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। ছবিতে লক্ষ্য করিয়া দেখ কেমন রেলগাড়ীর চাকার মত দুই সারি ঘূর্ণীর সৃষ্টি হইয়াছে। তীক্ষ্ণধার অংশটি সরাইয়া লইলেই উহা মিলিয়া গিয়া উপরের ছবির আকার ধারণ করিবে

জলে ঘূর্ণীর চিত্র

বাঁশীর মধ্যে ফুঁ দিলে তাহার মধ্যে ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়

এই ঘূর্ণীগুলিকে স্থির বলিয়া মনে করিও না। ইহারা স্থির নহে। ঘূর্ণীগুলি একই বেগে তীক্ষ্ণ ধারালো অংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। 'ফুঁ'এর চাপ বাড়াইলে ঘূর্ণীর অগ্রগামী বেগ বাড়ে এবং 'ফুঁ'য়ের চাপ কমাইয়া দিলে তাহাদের বেগ হ্রাস পায়। চিত্রে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে, প্রত্যেক সারির দুইটি ঘূর্ণীর মধ্যেকার ব্যবধান এক। এই ব্যবধান আবার ছিদ্র হইতে তীক্ষ্ণধার খণ্ডের দূরত্বের হিসাবে বাড়ে ও কমে।

ঐ দেখ, কেমন এক সারিতেই বায়ুকণাগুলি এক-দিকে ঘুরিতেছে এবং অপর সারিতে উল্টা দিকে ঘুরিতেছে। নীচেকার সারির একটি ঘূর্ণী তীক্ষ্ণধার খণ্ডের নিকট পৌছিলে বাঁশীর অবয়বের ভিতর বায়ু টানিয়া লইয়া চাপ বৃদ্ধির সৃষ্টি করে এবং অল্পক্ষণ পরে ৫১২ সেকেণ্ডে উল্টা ঘূর্ণী সেই স্থানে পৌছিয়া চাপের ক্ষতির সৃষ্টি করে। এইরূপ ফুঁদিতে থাকিলে বাঁশীর মধ্যে চাপের ক্ষতি-বৃদ্ধির সৃষ্টি করিয়া সুরের লহর বিস্তৃত হয়। ফুঁয়ের চাপ কমাইয়া বা বাড়াইয়া ঘূর্ণীর অগ্রগামী বেগ নিয়মিত করিয়া বাঁশীর দৈর্ঘ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিলে তবে প্রচুর পরিমাণে সুরের উৎপত্তি হয়।

তোমরা বলিতে পার, যে ঘূর্ণীর-কথা বলা হইল, তাহা কি কেহ দেখিয়াছ? না দেখিলেও বৈজ্ঞানিকেরা ঐরূপ ঘূর্ণীর আকার সম্বন্ধে যেরূপ

কিরূপে ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়

একটা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং উহার আকার সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা করিয়াছেন তাহা উপরের চিত্র হইতে বুঝিতে পারিবে।

গির্জ্জাঘরে যে অর্গান বাজান হয় তাহার নলের (Pipe) আকার বড় এবং এক একটি সুরের জন্য এক একটি পাইপ থাকে। অর্গানও ঐরূপ কৌশলেই বাজে।

ক্লারিওনেট বাঁশীর অধিকাংশ অবয়বই গোল নলের মত। উহা আব্‌লুস কাঠে তৈয়ারী হয়। ক্লারিওনেটে অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। ঐ সকল ছিদ্র হইতে সকল মাত্রার সুর বাহির করা যায়। কিন্তু সানাইতে মাত্র ছয়টি ছিদ্র থাকে। মুখভাগের গঠন উভয় বাঁশীর বিভিন্নরূপ। ক্লারিওনেট বাঁশীর মুখে পাতলা 'রিড্' (পর্দ্দা) আছে। সেটিতে ফুঁ দিলে কম্পিত হইয়া বাঁশীর মধ্যস্থিত বায়ুতে সুরের সৃষ্টি করিয়া থাকে। পর্দ্দাটি যখন কাঁপিতে থাকে, সেই সময় তাহার মধ্যস্থ বায়ু-পথ কখনও বন্ধ হইয়া যায় এবং কখনও খুলিয়া যায়। হার্ম্মোনিয়মের পর্দ্দার কার্য্যকলাপও ঐ একই প্রকারের। এইরূপে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া চাপের বৃদ্ধি ও হ্রাস অনুযায়ী শব্দ তরঙ্গ বিস্তৃত হয়।

সানাইয়েরও পর্দ্দা আছে। উহা শুধু মুখের আগায়

ঘূর্ণীর ফটো চিত্র
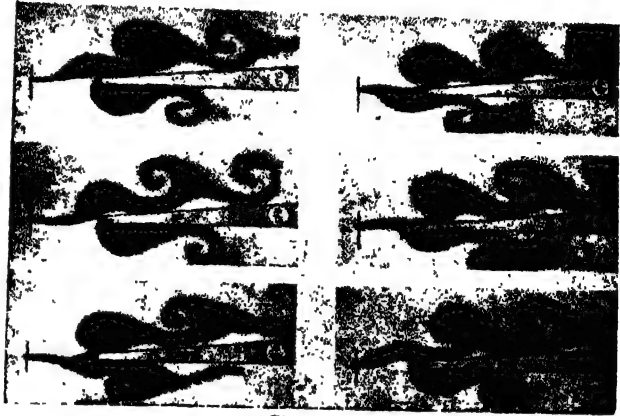
লাগান সামান্য একটু উলু খড় মাত্র। ইহা ক্লারিও-নেটের পর্দ্দার মতন প্রত্যেকটি বায়ুপথ রুদ্ধ করিয়া এবং খুলিয়া নলের মধ্যে শব্দের সৃষ্টি করে। সুরের মাত্রা চড়া ও মোটা করিবার নিয়ম ঐ ফ্ল্যুট বাঁশীর মতনই।

কোন কোন বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ কোন 'মুখ' থাকে না। সেখানে ফুঁ দিবার স্থানে কোন কোনটিতে একটি ধারালো অংশ থাকে। কোনটিতে বা ওষ্ঠই কম্পিত হইয়া সুরের সৃষ্টি করে শঙ্খ বা শাঁখের মুখ ধারালো অংশের কাজ করে এবং ভেরী বাজাইতে ওষ্ঠই তাহার মুখের কাজ করে।

এক পয়সা দামে যে সব খেলার বাঁশী কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার শব্দোৎপাদনকারী মুখ হইতেছে দ্বিতীয় ছিদ্রটি। ইহা তীক্ষ্ণধার মুখের মত কার্য্য করিয়া শব্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। আচার্য্য লর্ড র‍্যালে (Lord

Raleigh) বহু দিনের সাধনায় শব্দ-বিজ্ঞানের এইরূপ নানা তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন।
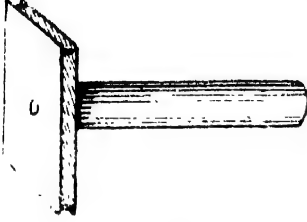
আচার্য্য লর্ড র‍্যালে

খেলার বাঁশীর মুখ

স্বর শব্দের উচ্চারণ

মানুষ ছাড়া অন্য কোনও জীব-জন্তু অ, আ, ই, উ প্রভৃতি স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না। সম্প্রতি স্যার রিচার্ডস্ প্যাজেট বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সূত্র ধরিয়া নানাপ্রকার পুতুল তৈয়ারী করিয়াছেন। ঐ সকল পুতুল এক একটি স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া গান করিতে পারে।
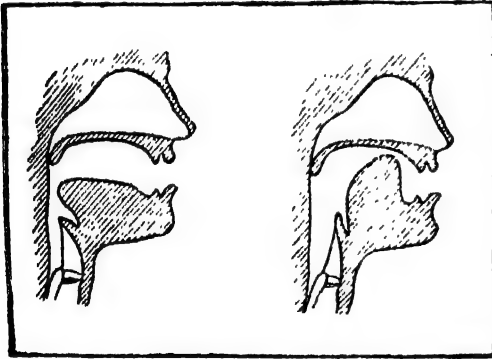
'এ' শব্দ উচ্চারণ করিতেছে

পশু, পক্ষী প্রভৃতি অনেক ইতর প্রাণীও মনুষ্যের ন্যায় ফুস্‌ফুস্ আছে। ফুস্‌ফুস্ দিয়া বায়ু টানিয়া লওয়ার ও বাহির করিবার কাজ হইয়া থাকে। মানুষের গলার গঠন এই প্রকার যে, উহার মধ্যে কম্পনকারী ঝিল্লীর পর্দ্দা আছে। ফুস্‌ফুস হইতে ইচ্ছানুরূপ বায়ু বাহির করিয়া সেই পর্দ্দাকে কম্পিত করা যায়। সুরের মাত্রা ঝিল্লির পেশী (Muscle) দ্বারা মোটা ও চওড়া করা যায়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, সাধারণ বাদ্যযন্ত্রে আনুষঙ্গিক সুরগুলি প্রাথমিক সুর অপেক্ষা মৃদু এবং ক্ষীণ হয়। কিন্তু কোনও একটি স্বর শব্দ উচ্চারণ করিলে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে এবং একটি বিশেষ সুরই প্রচুর পরিমাণে উত্থিত হয়। যে কোনও সুরে 'অ' গান হউক না কেন, যদি উক্ত সুরটি বেশ উচ্চ ভাবে উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে 'আ' স্বরই বাহির হইবে।

এই সূত্র ধরিয়াই অর্থাৎ মুখের হাঁ ও মুখ-গহ্বরের অন্যান্য অনুকরণকারী সুর নির্ণয় করিয়া স্যার রিচার্ডস প্যাজেট 'আ' শব্দের উচ্চারণকারী পুতুল তৈয়ারী করিয়াছেন। পুতুলের মুখের মধ্যে জিহ্বা, তালু, দন্ত প্রভৃতি এমন ভাবে সাজাইয়াছেন, যেন কেবল সেই বিশেষ মাত্রার নিকটবর্ত্তী সুরগুলি অতি উচ্চ-ভাবে অনুকরণ করে। তখনই 'আ' শব্দ বাহির হয়।

স্বর শব্দ হঠাৎ বন্ধ বা আরম্ভ করিয়া বা ওষ্ঠ দুইটি জুড়িয়া রাখিয়া বা দাঁত চাপিয়া অন্যান্য ব্যঞ্জন শব্দ বাহির করা হয়। দন্ত দ্বারা যে সকল শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহাদের শক্তি অতি অল্প। বক্তৃতা-কারীর উচিত, সে সকল শব্দ জোরে উচ্চারণ করা।
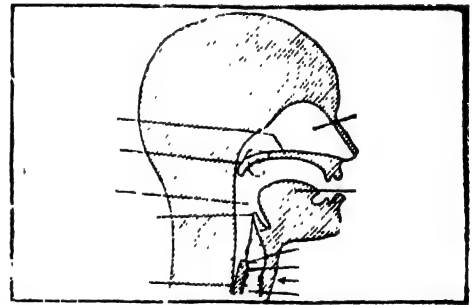
মনুষ্যের গলার মধ্যে শব্দকারী যন্ত্র

পাখীর গান

পাখীর গানের কৌশলও ঠিক্ মানুষের মত। কিন্তু তাহাদের কোনও একটি সুর বিশেষকে অনুকরণ করিবার ক্ষমতা না থাকায় স্বর শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না। যে সকল পাখীর গলা লম্বা, যেমন হাঁস, ইহাদের কম্পমান ঝিল্লী লম্বা হওয়ায় কর্কশ শব্দ বাহির হয়। আবার এমনও আছে

'ছোট গলাওয়ালা পাখী' যেমন কাক, তাহাদের গান বড় কর্কশ। এইরূপ ক্ষেত্রে ঝিল্লীর আনুষঙ্গিক যন্ত্র হইতে শব্দ বাহির হয় এবং সেই কারণে শব্দ কর্কশ হইয়া থাকে।

কীট-পতঙ্গের শব্দ

জীবজন্তুর শব্দের কথা বলিয়াছি। এখন কীটপতঙ্গের শব্দের কথা বলিব। যাহারা গ্রামে বাস করে, তাহার এইবার বলিতেছি। পাখীরা গান করিতে পারে এবং শুনিতেও পায়। মানুষের মত তাহাদের গাহিবার
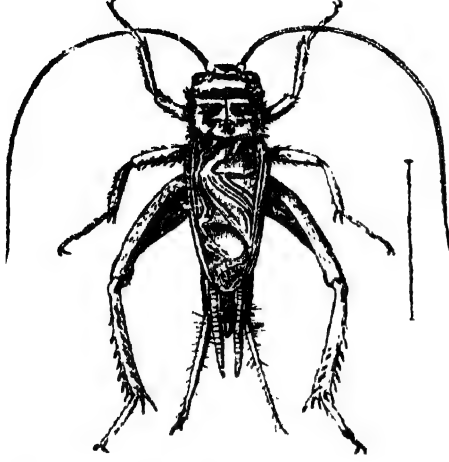
উচ্চিংড়ে পোকা রাত্রে কিট্ কিট্ শব্দ করে

শব্দকারী পতঙ্গ

গঙ্গা ফড়িং পা ঘষিয়া শব্দ করে

কাঠপোকা

কাঠপোকা শুঁড় উঁচু করিয়া শব্দ শুনিতেছে
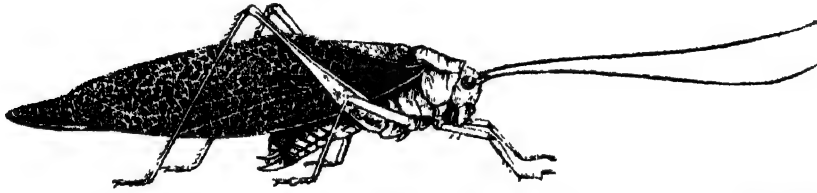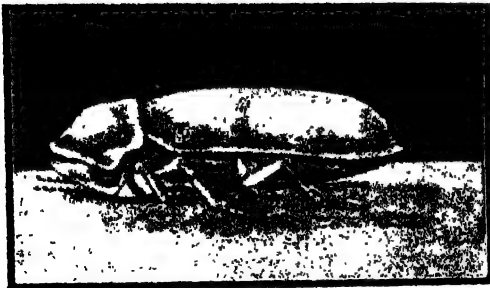
শৃগালের 'হুকাহুয়া' রব, ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁ ঝিঁ শব্দ প্রায়ই শুনিতে পায়। কীট-পতঙ্গের শব্দের কথা এবং শুনিবার অঙ্গও আছে। পাখীর কান পালকে ঢাকা থাকে, সচরাচর তাহা দেখিতে পাওয়া

যায় না। গাহিবার যন্ত্রের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কীট-পতঙ্গের শুনিবার যন্ত্র বা শব্দ করিবার যন্ত্র একেবারে অন্য প্রকারের। শুনিবার যন্ত্র বা কান তাহাদের নাই বলিলেই হয়। আমাদের যেমন কানের ভিতর ঝিল্লীর পর্দ্দা আছে এবং শব্দ-তরঙ্গ উহাতে আঘাত করিলে শুনিতে পাই, সেইরূপ

পতঙ্গ তাহার অন্য সঙ্গীকে ডাকিতেছে

কোনও যন্ত্র তাহাদের নাই এবং কতকগুলি পতঙ্গ এমন আছে যাহারা মোটেই শুনিতে পায় না, যেমন প্রজাপতি। পর পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ, টিনের হর্ণদ্বারা শব্দ করা হইতেছে কিন্তু প্রজাপতির তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই।

পতঙ্গেরা দেখিতে পায় এবং ছুঁইলে বুঝিতে পারে। খাদ্যদ্রব্যও চাখিয়া বাছাই করিতে পারে এবং অতি সূক্ষ্মরূপে গন্ধের বিশ্লেষণ করিতে পারে। কিন্তু গান করিবার ক্ষমতা কীট-পতঙ্গের নাই। তবে নিজের সঙ্গীকে ডাকিবার জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ করিতে পারে। কিন্তু ঐ শব্দ গলা হইতে বাহির হয় না।

তোমরা হয় ত অনেকেই গঙ্গা ফড়িং দেখিয়াছ। এ ফড়িংয়ের পাখায় করাতের মত দাঁত আছে এবং অন্য পাখায় 'আলি'র মতন একটি উচ্চ অংশ আছে। এই 'আলি'র ন্যায় স্থানটি অন্য পাখার দাঁতের উপর ঘষিলে শব্দ হয়। ঝিঁ ঝিঁ পোকাও এই প্রকারেই শব্দ করে। তাহাদের পাখায়ও দাঁত আছে।

পতঙ্গ মাথা ঠুকিয়া অন্য সঙ্গীকে ডাকিতেছে

আর এক প্রকার পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়—যাহারা নিজের শরীরের উপর পা দিয়া ঘষিয়া শব্দ করে। শরীরের উপর একটি বক্র দাঁতাল 'আলি' আছে এবং তাহার লম্বা পায়েও সেইরূপ দাঁত আছে। ঐ দুইটি ঘষিয়া ইহারা কট্ কট্, কটাকট্ এইরূপ তীব্র ও কর্কশ শব্দ বাহির করে।

অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশে এক প্রকার উড়ো পতঙ্গ পাওয়া যায়—ইহাদের নাম সিকাডা (Cicada)। ইহাদের শরীরের মধ্যে একটি কম্পনকারী ঝিল্লী আছে এবং ইহার একধারে একটি পেশীর সহিত সংযুক্ত থাকে। সেই পেশীটি কম্পিত করিলে অতি উচ্চ

শব্দ হয়। পতঙ্গের পাখার কম্পনেও শব্দের সৃষ্টি হয়। ভোম্‌রা, বোল্‌তা, মৌমাছি, মশা প্রভৃতি

হর্ণের শব্দে প্রজাপতির ভ্রূক্ষেপ নাই

ঐরূপে শব্দের সৃষ্টি করে। ইহাদের উড়িবার সময় পাখার কম্পনে বায়ুতে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। আর এক প্রকারের পোকা আছে তাহার মাথা ঠুকিয়া শব্দ করিয়া নিজের সঙ্গীদের ডাকে। ইহাদের ইংরাজী নাম "Detta Watch"। আমাদের দেশে ইহার নাম 'কাঠপোকা'; কেননা ইহারা কাঠের

ঝিঁঝিঁ পোকার পাখায় দাঁতের মত অংশ
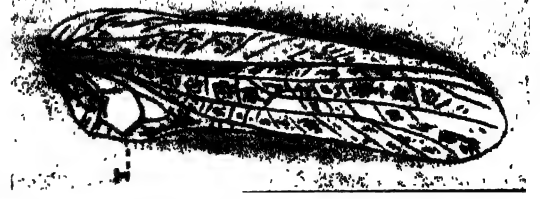
মধ্যেই বাস করে। মাথা ঠুকিয়া কট্ কট্ শব্দ করাই ইহাদের অভ্যাস।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অধিকাংশ কীট-পতঙ্গই কোনরূপ শব্দ শুনিতে পায় না। পরীক্ষা

সিকাডা (Cicada)

দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, পতঙ্গের মুখের উপর যে লম্বা শুঁড় থাকে, তাহার দ্বারা তাহারা শব্দের দিক্ নির্ণয় করিতে পারে। পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ, কেমন করিয়া এক এক জাতি পতঙ্গ শব্দ করিতেছে।

সূচী-শিক্ষা

[সূচী-শিল্প একটি সৌখীন ও কার্য্যকরী শিল্প। এই শিল্প মেয়েদের বিশেষ ভাবে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। দিন দিন ইহার নানারূপ উন্নতি হইতেছে। আমরা এখানে সূচী-শিক্ষা সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আলোচনা করিব। তোমরা অনায়াসেই সহজভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া ইচ্ছানুসারে সেলাই শিক্ষা করিতে পারিবে।]

সেলাই শিক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

সেলাই শিক্ষা করিতে গেলে একখানি ভাল কাঁচি নম্বরী সূচ, নানাপ্রকার সূতা ও একটি অঙ্গুস্তানার বিশেষ আবশ্যক। এই অঙ্গুস্তানা বা অঙ্গুলিত্রাণ, সকলেরই, ডান হাতের মধ্যমা অঙ্গুলির মস্তকে পরাইয়া লইতে হইবে। কারণ ইহার সাহায্যে সূচকে ঠেলিয়া দিতে হইবে, এই কথাটি মনে রাখিয়ো।

আমাদের দেশে এখনও বেশী শক্ত ও মজবুত গুলি-সূতা প্রস্তুত হয় নাই। সেজন্য আলেকজাণ্ডারের গুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেলাই-এর কলেও এই সকল গুলিই প্রচলিত।

সেলাই শিক্ষা করিতে ১২০ নম্বরের গুলি ব্যবহার করাই ভাল। কলে সেলাই করিতে ১৫০ কি ১৬০ নম্বরের গুলি আবশ্যক। বোতাম আঁটিতে ও বোতামের ঘর তৈয়ারী করিতে ৯০ নম্বরের গুলি ব্যবহার করিবে।

এই গেল সাধারণ সেলাই-এর জন্য। কিন্তু যখন বেশী দামী কাপড়ের জামা সেলাই করিতে হয়, তখন N. M. T. মার্কা এক প্রকার নানা রং-বিশিষ্ট কাঠিম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলে ইহার ৫০ কি ৬০ নম্বর কাঠিম প্রচলিত। আবার যখন বেশী সরু সিল্কের কাপড় সেলাই করা হয়, তখন ঐ কাঠিমেরই ৮০ কি ৯০ নম্বরের কাঠিমের ব্যবহার হয়। যখন বোতামের ঘর করা ও বোতাম টাকা হয় তখন ঐ কাঠিমের ২০ নম্বর কাঠিম চলে।

এখন সূচে কি ভাবে সূতা পরাইতে হয়, দেখ। প্রথমে সূচের ছিদ্রটাকে উর্দ্ধদিকে রাখিয়া ডান হাতে সূচটিকে ধর। পরে চিত্র—১) বাম হাতে সূতার মাথা সরু করিয়া ধরিয়া ডান হাতের সূচের ভিতর দিয়া সূতা ঠেলিয়া দাও এবং সূতাকে টানিয়া বাহির
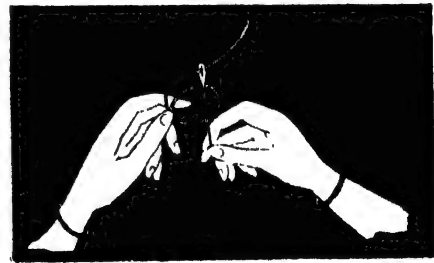
চিত্র —১

করিয়া লও। সকল সময়ে মনে রাখিবে, সূচে বেশী লম্বা সূতা পরাইবে না। তাহাতে একদিকে সূতায় গিরা পড়িতে পারে; অপর দিকে হাত টানিয়া

লইতে অসুবিধা। এই নিমিত্ত সকল সময়েই খাটো সূতা সূচে পরাইবে।

বিভিন্ন প্রকারের সেলাই

প্রথম সেলাই শিক্ষা করিবার সময় একখান কাপড়ের উপর লম্বা লম্বা ফোঁড়ের সেলাই তুলিতে আরম্ভ করিবে। দেখিবে, তোমাদের ঘরে এই প্রকার সেলাই দ্বারা কাঁথা সেলাই করা হইয়াছে। এই প্রকার সেলাইকে রানিং (running) সেলাই বা সাদা সেলাই বলে। ২নং চিত্র দেখ।

সাদা বা রানিং সেলাই শিক্ষা করিবার সময়, হয় সাদা কাপড়ের উপর রঙ্গীন সূতার দ্বারা সেলাই আরম্ভ করিবে, আর না হয় ত রঙ্গীন কাপড়ের উপর সাদা সূতার দ্বারা এই কার্য্য করিতে থাকিবে। কারণ সাদা কাপড়ের উপর রঙ্গীন সূতার অথবা রঙ্গীন
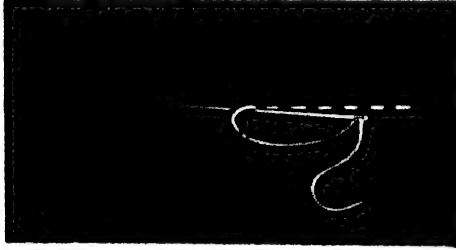
চিত্র - ২। রানিং সেলাই

কাপড়ের উপর সাদা সূতার সেলাই অতি সহজেই লক্ষ্য করা বা পরীক্ষা করা চলে।

প্রথম লম্বা লম্বা সোজা ফোঁড় তুলিবে এবং যে পর্য্যন্ত ঐ সেলাইগুলির সকল ফোঁড় ঠিক সমান সমান না হয়, তাবৎ ঐ প্রকার সাদা বা রানিং সেলাই অভ্যাস করিতে থাকিবে। এই কাজে হাত পাকা হইলে অন্য প্রকার সেলাই আরম্ভ করিবে।

বখেয়া সেলাই—সেলাই-এর কলে যেমন উভয় দিকে ফাঁক না রাখিয়া সেলাই পড়ে, হাতে তদ্রূপ সেলাই করাকে বখেয়া সেলাই (stitching) বলে। ৩নং চিত্রটি দেখ; তবেই খুব সহজ হইবে।

প্রথমে একটি ফোঁড় তোল। পরে যে স্থান হইতে ফোঁড় তোলা হইয়াছে, ঠিক সেই স্থান হইতে, পূর্ব্ব ফোঁড় অপেক্ষা একটু লম্বা আর একটি ফোঁড় তুলিবে তৎপর আবার সর্ব্বপ্রথম ফোঁড়টি যে স্থানে শেষ হইয়াছিল, ঠিক সেই ফোঁড় হইতে সূচ বসাইয়া তৃতীয় ফোঁড়ের চেয়ে, আর একটু লম্বা ফোঁড় তোল। এখন তোমার সেলাই-এর প্রতি নজর করিয়া দেখ, উপরের দিকের সেলাইটি ঠিক্ কলের সেলায়ের ন্যায় দেখা
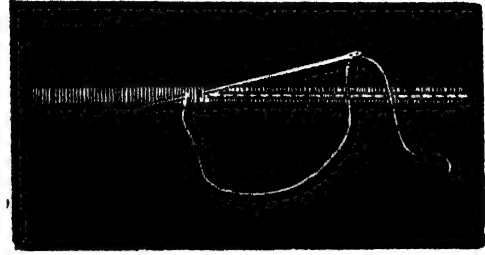
চিত্র ৩। বখেয়া সেলাই

যায় কিনা। যখন কোন জামা হাতে সেলাই করিবে, তখন এই প্রকার বখেয়া সেলাই করিলে কলের সেলাই-এর ন্যায় বোধ হইবে।

মুড়ি সেলাই (Hem Stitch) একখানা কাপড় কিংবা কোন জামার কিনারা বা শেষ প্রান্ত সেলাই করিয়া রাখিতে হইলেই উহাকে মুড়িয়া সেলাই করিতে হয়। নতুবা সেস্থানের সূতাগুলি বাহিরে পড়িয়া খুলিয়া যায়। যখন দুইখানা আলাদা কাপড় জুড়িবে, তখনও এই প্রকার মুড়িয়া সেলাই করা প্রয়োজন হইবে। তোমাদের সকলেরই গায়ে সেমিজ কিংবা ফ্রক আছে। এখন তাহার নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাও কি যে, কাপড় খানার শেষের ভাগকে মুড়ি ভাঙ্গিয়া ভিতরে সেলাই করিয়া রাখা হইয়াছে। সেখানে বোধ হয়, হাতের সেলাই নাই; কলে সেলাই করা হইয়াছে। এই সেলাই বখেয়া সেলাই দ্বারাও হইতে পারে।

মুড়িভাঙ্গা সকল স্থানে সমান চওড় হয় না। যখন দুইখানা ওয়াড়, পরিবার কাপড় প্রভৃতি মুড়িয়া সেলাই করিবার প্রয়োজন হয়, তখন মুড়ির কাপড় খুব সরু করিয়া সেলাই করিতে হয়। আবার যখন কোন জামার বা পর্দ্দার নীচে মুড়ি সেলাই করিবার আবশ্যকতা হয়, তখন মুড়িগুলি বেশ চওড়া করিয়া সেলাই করিয়া দিতে হয়।

মুড়ি সেলাইগুলি আজকাল সকলেই কলে করে, কিন্তু ভাল দামী জামার মুড়িগুলি হাতে সেলাই করিয়া দেয়। ঐ প্রকার সেলাইকে **তুরপাই** সেলাই বলে।

তুরপাই সেলাই করিতে, সকল সময় সূচের ফোঁড় কিরূপ হইবে, ৪নং চিত্র দেখিলেই বুঝিবে। সূচ সকল সময়ই ডানদিকে ফোঁড়দিয়া বামদিকের মুড়ান

কাপড়ের উপর উঠিবে। এই সময় সূচ সর্পের বক্র গতির ন্যায় ডাইনে ও বামে চলিতে থাকে।

চিত্র—৪। মুড়ি তুরপাই

যখন কোন নূতন বা পুরাতন পাড়ওয়ালা দুখানা কাপড় জুড়িয়া দিতে হইবে, তখন জোড় সেলাই (seaming) দ্বারা এই কাজটি শেষ করিতে হয়। ৪নং চিত্র দেখিলেই সহজে বুঝিবে।
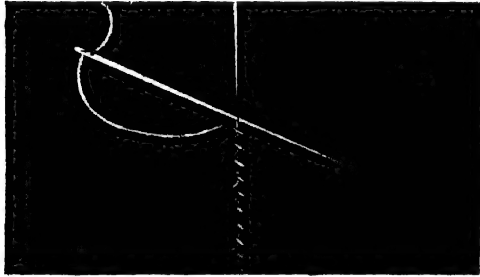
চিত্র ৫। জোড় সেলাই

প্রথমে দুখানা কাপড়ের পাড় দুটির দুই মুখ বাম হাতের দুটি আঙ্গুলের মধ্যে চাপিয়া ধর। এখন ডান হাতের সূচ প্রথম বামদিকের কাপড়ের পাড়ের নীচে দিয়া উপরের দিকে ফোঁড় তোল। এই প্রকার একবার এ-খানার একবার সে-খানার ফোঁড় আস্তে আস্তে তুলিয়া সেলাই কর। সেলাই যেখানে শেষ হইবে, সেখানে একটি শক্ত গিরা দিয়া সূতা কাটিয়া লও। ৫নং চিত্র।

সহজ বোনা—

সেলাই জিনিস বা শিল্পটি অনেক সময় কাহারও নিকট শিক্ষা না করিলেও ঐ কার্য্যে দক্ষতা লাভ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বুনন্ (knitting) কার্য্যটি কাহারও নিকট শিক্ষা না করিলে চলিতে পারে না।

অনেক ঘরের মেয়েরা আপন আপন অবসর মত এই কার্য্যের সাহায্যে, স্বীয় জীবিকার্জ্জনের উপায় করিয়া লইতেছেন। সুতরাং এই শিল্পটি উত্তম জিনিস। যাঁহারা বুননের কার্য্যে পারদর্শী, তাঁহারা নিজ হাতে আপন ছেলেমেয়েদের টুপি, মোজা, গেঞ্জি ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। তন্নিমিত্ত এই কার্য্যটি শিক্ষা করা বড়ই আবশ্যক।

নিটীং বা বুননের কার্য্য আরম্ভ করিতে উল সূতা কুরুশী কাঁটা, আর মাথা-সরু ষ্টিলের কাঁটার (needle) আবশ্যক।

প্রথম যখন বুনিতে শিক্ষা করিবে, তখন লাল কি বেগুনে রংয়ের উল সূতা কিনিয়া লইবে। মোজা ইত্যাদি বুনিতে ষ্টিলের মাথা সরু কাঁটার প্রয়োজন। আর গেঞ্জি, টুপি তৈয়ার করিতে কাঁটার প্রয়োজন। বুননের যন্ত্রের চিত্র দেখ।

চিত্র—৬। বুননেরকাঁটা

বুননের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে উল দ্বারা টিলা বা নরম গোলা তৈয়ার করিয়া লইবে। কারণ, উহা যদি নরম হাতে ব্যবহৃত না হয়, তবে উহার কোমলত্ব চলিয়া যাইবে, মনে রাখিও।

ঘর তোলা: প্রথম সহজ বুনন কার্য্য আরম্ভ কর। এই কাজে দুইটি ষ্টিলের কাঁটা (needle) ও উল্ লও। এখন প্রথম তোমার ঐ উলের গোলাটিকে আপন অংসোপরি স্থাপন কর। তৎপর
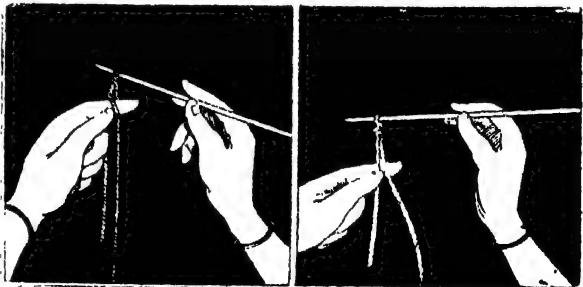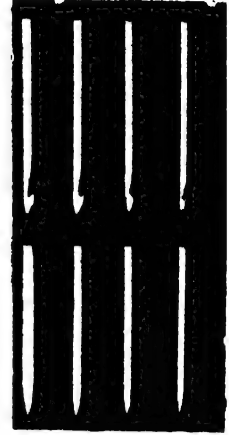
চিত্র ৭

চিত্র

উহার মাথা হইতে প্রায় ৬.কি ৭ইঞ্চি সূতা বাদদিয়া একটি এমন বড় গিরা তৈয়ার কর যেন ঐ ৬।৭

ইঞ্চি সূতা এক পাশে ঝুলিয়া থাকে। ঘর তুলিবার ৭নং চিত্র দেখ, তবেই কাজটি খুব সহজে বুঝিতে পারিবে। এখন এই ঘরটির মধ্যে ডান হাতের কাঠি ভরিয়া দাও। ৮নং চিত্র দেখ। এই প্রকার ১০।১২টি ঘর তোল। এখন ডান হাতের কাঁটা বাম হাতে লইয়া পুনরায় ডান হাতে আর একটি কাঁটা লও। পরে ঐ ডান হাতের কাঁটার মাথা, বাম হাতের কাঁটার মাথায় যে ফাঁস বা গিরা আছে তাহার শেষেরটির মধ্য দিয়া. এমনভাবে ঠেলিয়া ভরিয়া দাও, যেন উহা বাম হাতের কাঁটার নীচু দিয়া যায়, এবং যে ছোট উলের মাথা ঝুলিয়া আছে উহা তোমার বাম হাতের কাঁটার সঙ্গে চাপিয়া ধর।

এখন যে উলের মাথা গোলার সঙ্গে আছে, উহা দেখ ছুটি কাটার মধ্যে ঝুলিয়া রহিয়াছে। অতঃপর কাঁটা ছুটিকে চাপিয়া ধরিয়া. ডান হাতের আঙ্গুলে ঝুলান উলগাছ লইয়া ডান হাতের কাঁটার মাথার নিম্নদিক দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া উপরের দিকে আনিয়া ঝুলাইয়া দাও! ৯ম চিত্রটি দেখ। এখন যে উল-গাছ তোমার ডান হাতের কাঁটার মাথায় জড়ান আছে, তাহাকে আস্তে আস্তে পূর্ব্বেকার বাম হাতের

চিত্র—১০ চিত্র—৯
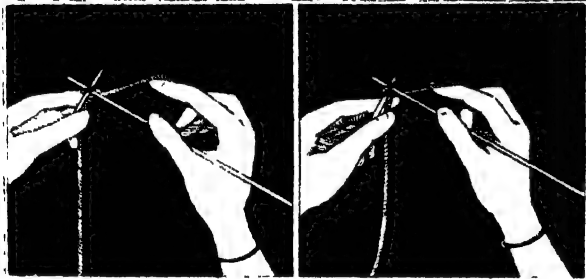
কাঁটার মাথায় যে গিরা বা ফাঁসটি আছে, তাহার মধ্য দিয়া টানিয়া আনিয়া ঐ নূতন ফাঁসটিকে বাম হাতের কাঁটার মাথা গলাইয়া ঝুলাইয়া দাও। তবেই দেখিবে, একটি গিরা পড়িয়াছে। এই প্রকার একটির পর একটি ফাঁস তৈয়ার করিয়া ডান হাতের কাঁটার ঝুলাইয়া লও। এখন এই কাঁটাটি আবার বাম হাতে লও। পরে এই ফাঁসগুলি আবার অন্য কাঁটায় লইবে। চিত্র দেখ, তবেই বুঝিতে পারিবে। এই হ'ল সহজ নিটিং বা বুনন। ১০ম চিত্র দেখ।

ক্যানভাসের উপর ক্রস্

অক্ষর—যখন কার্পেট অথবা ক্যান্-ভাসের উপর নাম কিংবা অন্য কোন কিছু লিখিতে হয়, তখন ঐ সকল শব্দ ক্রস্ ষ্টিচ্ দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। আজকাল অনেক ঘরের মেয়েরাই সুন্দর সুন্দর ইংরাজী ও বাংলা কবিতা কার্পেটের উপর উল সূতা দ্বারা লিখিয়া থাকেন। এই লেখা কি প্রকারে শেষ করিতে হয় তাহাই এই স্থানে বলিব।

যদি কার্পেট কিংবা ক্যান্ভাসের উপর অক্ষর লিখিতে হয় তখন সূচে উল পরাইয়া, উলের লম্বা মাথায় একটি শক্ত গিরা দিবে। এখন যে স্থান হইতে লেখা আরম্ভ হইবে, সূচকে কার্পেট বা ক্যান্ভাসের ঠিক সেই স্থানে নীচের দিক হইতে ফোঁড় তোল। ১১নং চিত্র দেখ। পরে তোমার সূতা যে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে সেই ঘরের কোণাকোণি ভাবে একঘর ফেলিয়া পরের ঘরে সূচকে নীচে বসাইয়া দিয়া ফোঁড়ের ঘরের পরে,

চিত্র—১১। ষ্টিচ অক্ষর
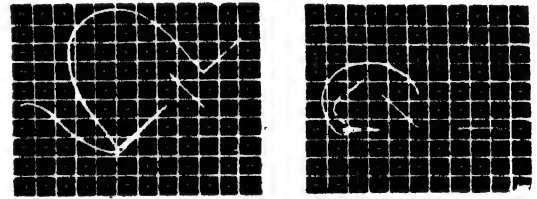
নীচে এক ঘর ছাড়িয়া, পরের ঘরে তোমার সূচ উঠাইয়া লও। এখন আবার তোমার সূচ যে ঘর হইতে উপরে উঠিয়াছে, কোণাকোণি ভাবে একঘর ছাড়িয়া পরের ঘরে ফোঁড় তোল। এখন আবার কোণা ভাবে এক ঘর ছাড়িয়া পরের ঘরে আবার ফোঁড় তুলিয়া দেখ সকল সেলাইগুলি এ কটি ইংরাজী ক্রস্ × চিহ্নের ন্যায় হইয়াছে। চিত্রটি দেখ, তোমার বইতে যে অক্ষরের নমুনা দেওয়া আছে, তাহার প্রতি তাকাইলেই এই সেলাই আরও সহজে ধরিতে পারিবে। ইংরাজী কি বাংলা ১।২ অক্ষরগুলিও এই নিয়মে লেখা যাইতে পারে।

এই হইল কাজ। যদি অক্ষর একটু মোটা করিতে হয় তবে ডবল ফোঁড় দিয়া কাজ করিবে অথবা একটু মোটা সূতায় কাজ আরম্ভ করিবে।

গাছের গুঁড়ি, ডাল ও পাতা

উদ্ভিদ্ শরীরের কোষের কথা বলিয়াছি। এইবার উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশের গঠন ও আকৃতির কথা বলিতেছি। গাছ সাধারণতঃ শিকড়, গুঁড়ি, ডাল ও পাতা এই কয়টি অংশে বিভক্ত। এই সমুদয় বিভিন্ন অংশের বিষয় পূর্ব্বে তোমাদের কাছে মোটামুটি ভাবে বলা হইয়াছে। এইবার বিস্তারিত ভাবে সেকথা বলিব। প্রথমে গুঁড়ি বা কাণ্ডের কথা শোন। গুঁড়ি মাটির বাহিরে খাড়াভাবে থাকে বলিয়া সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গুঁড়ি হইতেই ডাল, পাতা প্রভৃতি বাহির হয়। অবশ্য খেজুর, নারিকেল, পেঁপে প্রভৃতি এমন কতকগুলি গাছ আছে, যেগুলি হইতে ডাল বাহির হয় না।

বীজ হইতেই গাছের উৎপত্তি। বীজের গঠনের বিভিন্নতার সহিত গাছের, বিশেষতঃ গুঁড়ির গঠনেরও এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, গাছের দেহ গঠনের বিষয় জানিবার পূর্ব্বে বীজ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা খুবই দরকার। সেই জন্যই প্রথমে বিভিন্ন বীজের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি।

ছোলা যে বীজ, ইহা বোধ হয় তোমরা জান। একটি ভিজা ছোলা পরীক্ষা কর। প্রথমেই দেখিবে যে, বীজের উপর একটি আবরণ আছে। ঐ আবরণটি সহজেই ছোলা হইতে ছাড়ান যায়। এইরূপ ভাবে আবরণটি ছাড়াইলে যে পদার্থটি বাহির হয়, তাহাই হইতেছে গাছের প্রাণ। দেখিবে যে, উহা বেশীর ভাগই দুইটি প্রায় অর্দ্ধ-গোলাকার জিনিষ দিয়া তৈয়ারী। ইহাদের নাম বীজপত্র (cotyledons)। সুতরাং ছোলায় দুইটি বীজপত্র আছে। ইহাও দেখিবে যে, বীজপত্র দুইটি যে স্থানে জোড়া আছে সেখানে ভবিষ্যৎ গাছের গুঁড়ি ও শিকড় শৈশবাবস্থায় আছে। সুতরাং ছোলাকে দ্বি-বীজপত্রী গাছ (dicotyledonous plant) বলা যাইতে পারে। মটর, রেড়ী, আম, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি দ্বি-বীজপত্রী শ্রেণীর গাছ। কাঁটালের দুইটি বীজপত্রের মধ্যে একটি বড়, অপরটি ছোট। ধানে অবশ্য এইরূপ বীজপত্র একটি আছে সুতরাং ধানকে এক বীজপত্রী গাছ (monocotyledonous) বলা যাইতে পারে। যব, ভুট্টা, কলা, বাঁশ, আক, নারিকেল, তাল, পেঁয়াজ প্রভৃতি এই শ্রেণীর উদ্ভিদ্।
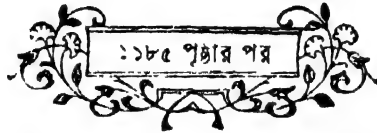
বীজপত্র গাছের অথবা অঙ্কুরের কোন্ কাজে লাগে? এ প্রশ্ন তোমরা করিতে পার। আমরা মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া বড় হই। তেমনি অঙ্কুরেরও বড় হইবার জন্য খাদ্য আবশ্যক। কোন কোন গাছের বীজে বীজপত্র মোটা হয়—যেমন ছোলা, মটর। এই সব গাছের অঙ্কুরের জন্য, বীজপত্রের মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। কোন কোন গাছের বীজপত্র খুব পাৎলা হয়। যেমন রেড়ীর বীজপত্র। ইহাদের বীজপত্রে খাদ্য সঞ্চিত থাকে না, থাকে ইহার অংশবিশেষে। এইরূপে গাছের অঙ্কুর বীজপত্রের সাহায্যে ঐ বিশেষ অংশ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। এই অংশবিশেষের নাম অন্তর্বীজ (endosperm)।
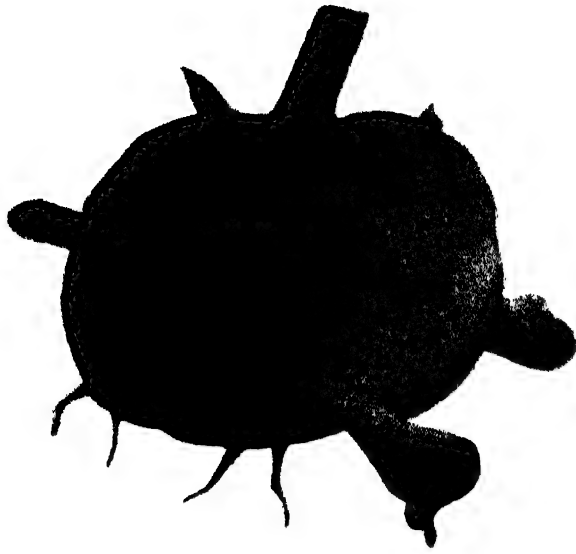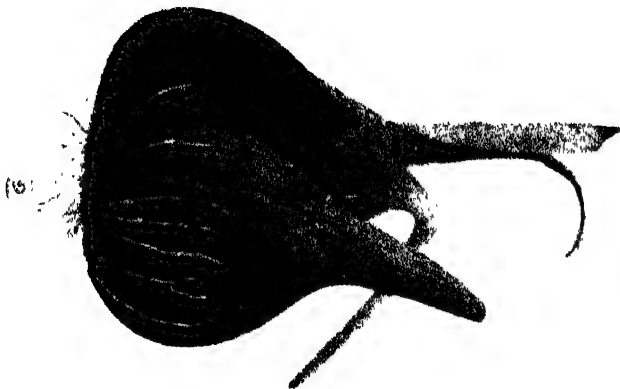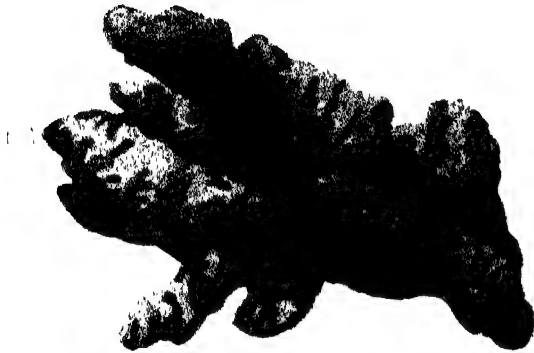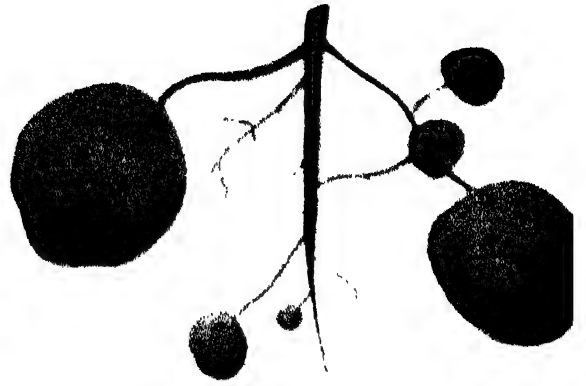
(১) ওল (২) আদা (৩) পেঁয়াজ (৪) আলু (৫) কলা (৬) কাঁঠালের বীজ

অঙ্কুর কিরূপে বৃক্ষে পরিণত হয়, এখন সেকথা বলিব। কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, প্রত্যেক জীবিত বস্তুরই দেহ কোষ দিয়া গঠিত। সুতরাং বৃদ্ধি পাইতে হইলে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং শিশু কোষগুলির আয়তন বাড়াইতে হইবে। কেমন করিয়া কোষ তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করে, সেকথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কোষবৃদ্ধি প্রভাবেই অঙ্কুর বড় হইয়া গুঁড়ি, শিকড় ও ডালপালায় পরিণত হয়। একথা মনে রাখিও যে, গুঁড়ি এবং ডালের গঠনে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ডালকে ছোট বয়সের গুঁড়ি বলা যাইতে পারে। অতএব গুঁড়ির বিষয় যাহা বলা যায়, ডালের বিষয়েও তাহাই বলা যাইতে পারে।

একটি চারার গুঁড়ি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, তাহার গায়ের সর্ব্বত্রই পাতা বাহির হয়
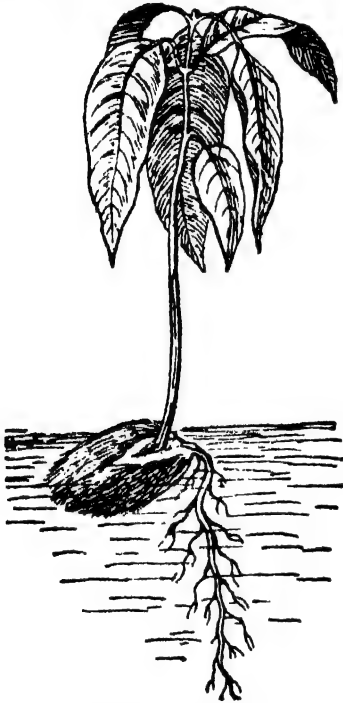
আম গাছের চারা

নাই। যে স্থান হইতে পাতা বাহির হইয়াছে তাহাকে গ্রন্থি বলে। গুঁড়ির যে অংশ দুইটি গ্রন্থির মধ্যে অবস্থিত, তাহাকে পাব বলে। পাতার উপরকার ভাগ এবং গুঁড়ির মধ্যে যে অংশ থাকে তাহার মধ্যে একটি মুকুল (bud) থাকে। গুঁড়ি হইতে যে ডাল বাহির হয় তাহা ঐ মুকুল হইতেই হয়। অবশ্য সব মুকুল হইতেই ডাল বাহির হইবেই, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ সব মুকুলগুলি বিকাশ প্রাপ্ত না হইতেও পারে। ডাল বাহির হইলে তাহার গঠন গুঁড়ির মতন হয়। তাহাকে ক্রমে গ্রন্থি, পাতা, মুকুল ইত্যাদি দেখা দেয়। গাছ যখন বাড়িয়া উঠে, তখন গুঁড়িতে এবং বড় বড় ডালগুলিতে সাধারণতঃ পাতা থাকে না—কেবল ছোট ছোট নরম ডালগুলিতেই পাতা থাকে। গুঁড়ি এবং ডালে অনেকক্ষেত্রে পত্রচিহ্ন (leaf-scars) বিদ্যমান থাকে—পূর্ব্বেকার যে পাতাগুলি ঝরিয়া গিয়াছে এগুলি তাহারই চিহ্ন। তাল, নারিকেল, পেপে ইত্যাদি গাছে তোমরা পত্রচিহ্ন দেখিতে পাইবে।

গুঁড়ির বাহিরের গঠনের কথা বলিলাম। এইবার আভ্যন্তরীণ গঠনের কথা বলিব। সমস্ত গাছটাই যে কোষের দ্বারা গঠিত, তাহা ত তোমরা জান। সুতরাং গুঁড়িটাও যে কোষের দ্বারা গঠিত হইবে, ইহা ত স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্ত গুঁড়ির একই রকমের কোষ থাকে না। বিভিন্ন কার্য্য করিবার
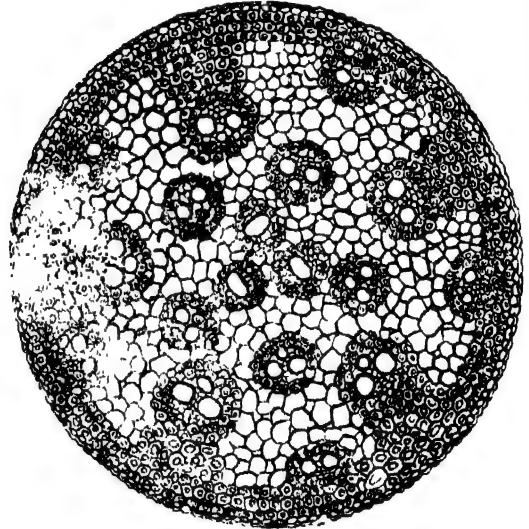
গুঁড়ির মধ্যস্থ কোষ

জন্য গুঁড়ির ভিতরকার কোষ নানা ভাবে রূপান্তরিত হয়।

গুঁড়ির ভিতরকার নানা কোষ সমষ্টির (tissue) বিষয় বলিলেই গুঁড়ির ভিতরকার গঠনের বিষয় বুঝিতে পারিবে। বাহিরের দিকে গুঁড়ি কোষের একটি আবরণ দিয়া ঢাকা—ইহাকে গুঁড়ির আবরণ

(epidermis) বলা হয়। ভিতরের কোষগুলিকে রক্ষা করাই এই আবরণ বা কোষ-স্তরের কাজ। শৈশবাবস্থায় আবরণের কোষে পত্র হরিৎ থাকে কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা অন্তর্হিত হয়। ইহার নীচে বিভিন্ন আকার ও প্রকৃতির কোষের কতকগুলি স্তর আছে। এই কোষ-স্তরের ভিতরের দিকে যে কোষগুলি আছে তাহাই বোধ হয় গুঁড়ি এবং গাছের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু। শিকড় মাটি হইতে যে রস শোষণ করে তাহা গুঁড়ি এবং ডালের সাহায্যে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়। সুতরাং গুঁড়ি এবং ডালের মধ্যে জল সঞ্চালনের নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা থাকা উচিত, এবং তাহা আছে। গুড়ি এবং ডালের মধ্যে অন্যান্য কোষের সহিত নলের মত দুই প্রকার কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ কোষ হইতেই এই নলরূপী কোষগুলির উৎপত্তি। এক প্রকার কোষ-নালিকা জল বহিবার কাজে লাগে—ইহাদিগকে জল-নালিকা (xylem) বলা যাইতে পারে। অন্য প্রকার, খাদ্য স্থানান্তরিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়—ইহাদিকে খাদ্যনালিকা নাম দেওয়া যাইতে পারে, খাদ্য এবং জলনালিকা গুচ্ছাকারে (bundle) থাকে। এইরূপ গুচ্ছের নাম নালিকা গুচ্ছ vascular bundle) দেওয়া হইয়াছে। একটি গুঁড়ির ভিতর অনেকগুলি নালিকাগুচ্ছ থাকে। এগুলি গুঁড়ির মধ্যে একটি বৃত্তাকারে সাজান থাকে—ভিতরের দিকে থাকে জলনালিকা এবং বাহিরের দিকে থাকে খাদ্য নালিকা। জলনালিকা এবং খাদ্যনালিকার মধ্যে সাধারণ কোষের একটি স্তর থাকে। এই কোষগুলিকে উৎপাদক কোষ (cambium) বলে। উৎপাদক কোষের বিষয় পরে বলা যাইবে। নালিকাগুচ্ছের ভিতরের দিকে অর্থাৎ গুঁড়ির মধ্যস্থান বা কেন্দ্রস্থান সাধারণ কোষের তৈয়ারী। ইহাকে গুঁড়ির মজ্জা বা কেন্দ্রস্থল (pith) বলা হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রথমে যে জলনালিকাগুলির protoxylem) উৎপত্তি হয়, সেগুলি নালিকা গুচ্ছের ভিতরের দিকে অর্থাৎ গুঁড়ির কেন্দ্রস্থল অথবা মজ্জার দিকে থাকে এবং প্রথমোৎপন্ন খাদ্যনালিকা, নালিকাগুচ্ছের বাহিরের দিকে থাকে। প্রথম জলনালিকার (protoxylem) এইরূপ অবস্থিতি মনে রাখিবার বিষয়। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য তোমরা বুঝিতে পারিবে—যখন তোমাদের শিকড়ের ভিতরকার গঠনের কথা বলিব। গুঁড়ি এবং শিকড়ের আভ্যন্তরীণ গঠনে যতগুলি বিভিন্নতা আছে, প্রথমজল নালিকার অবস্থিতি তাহাদের মধ্যে প্রধান। ইহারই সাহায্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষার (microscopic examination) দ্বারা গাছের কোন্ অংশ শিকড় অথবা কোন্ অংশ গুঁড়ি, তাহা বলিয়া দেওয়া যায়।

আমরা তোমাদের কাছে প্রথমে বলিয়াছি যে,
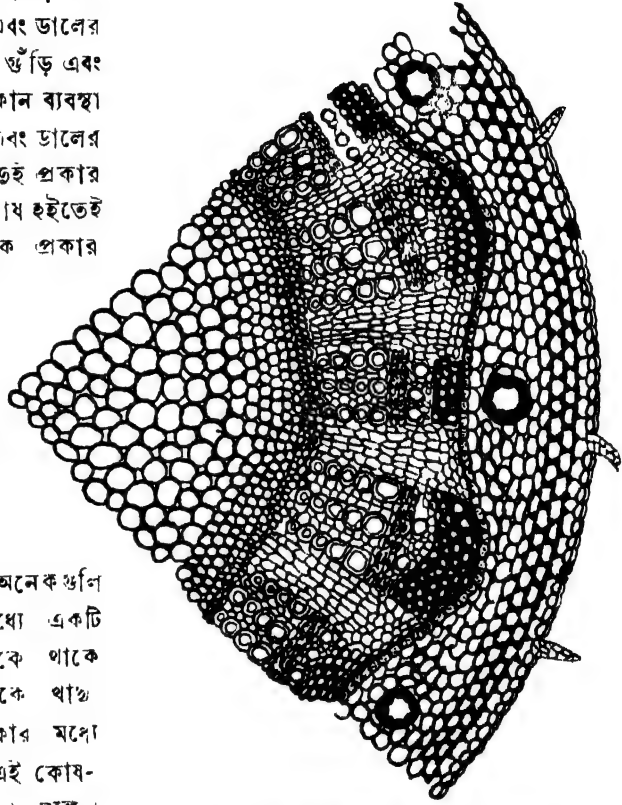
গুঁড়ির মধ্যাস্থ জলনালিকা ও কোষ

কোন কোন বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে এবং কোন কোন বীজে একটি বীজপত্র থাকে। দ্বিবীজপত্রী এবং এক বীজপত্রী গাছের গুঁড়ির ভিতরকার গঠন বিভিন্ন প্রকারের হয়। এই বিভিন্নতার কথা এবার বলিব। এই পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহা কেবল দ্বিবীজপত্রী গাছের গুঁড়ির সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। যেমন আম, জাম কাঁঠাল, বট, অশ্বত্থ ইত্যাদি। একবীজপত্রী গাছের গুঁড়িতে নালিকাগুচ্ছগুলি গুঁড়ির মধ্যে সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ গুঁড়িতে পৃথকভাবে কোন মজ্জা থাকে না। যেমন ধান, গম, আক,

ঘাস, তাল, নারিকেল ইত্যাদি। দ্বিবীজপত্রী গুঁড়ির নালিকাগুচ্ছ জল এবং খাদ্যনালিকার মধ্যে উৎপাদক কোষের একটি স্তর থাকে; একবীজপত্রী গুঁড়ির নালিকাগুচ্ছে এরূপ কোন উৎপাদক কোষ নাই।

জলনালিকার কোষাবরণ মোটা হয় এবং উহার ভিতর জৈবপদার্থ থাকে। খাদ্যনালিকার উপর নীচের দিকের আবরণে চালনির মত বহু ছিদ্র থাকে। এই জন্য ইংরাজীতে উহার নাম চালনিযুক্ত নালি (Seive tube)। এইরূপ ছিদ্র কখন কখন পাশের আবরণে থাকে। খাদ্যনালিকায় অতি সামান্য পরিমাণে জৈবপদার্থ থাকে।

জলনালিকা গুঁড়িকে শক্ত করিবার কাজেও লাগে। গুঁড়িকে শক্ত করিবার জন্য অন্য কোষও আছে। ইহাদের কোষাবরণ অত্যধিক মোটা। ইহাদের কাহারও জৈবপদার্থ আছে, কাহারও বা নাই। একটি কঞ্চি অথবা নরম ডালকে বাঁকাইবার চেষ্টা কর। দেখিবে যে, + চিহ্নিত স্থানে দুই পাশে চাড় পড়িতেছে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং কেন্দ্রস্থলে সর্ব্বাপেক্ষা কম। সুতরাং কঠিনতাবর্দ্ধক কোষগুলি (strengthening tiseue) যতই গুঁড়ির পরিধির (Periphery) কাছে থাকিবে, গুঁড়ি ততই মোচড়ের আঘাত (bending strains) প্রতিরোধ করিতে পারিবে। জোর বাতাসের কিংবা ঝড়ের ঝাপটে গুঁড়ি যাহাতে বাঁকিয়া না যাইতে পারে, তজ্জন্য কঠিনতাবর্দ্ধক কোষসমষ্টি এইরূপ গুঁড়ির পরিধির কাছে ছড়াইয়া আছে জলজউদ্ভিদে অবশ্য এইরূপ হইতে পারে না। কারণ, জলের গাছকে এমন হইতে হইবে, যাহাতে উহা স্রোতের টানে অনায়াসে বাঁকিয়া যাইতে পারে,—অথচ না ভাঙ্গে। সেই জন্য এই সকল গাছে কাঠিন্যবর্দ্ধক কোষসমষ্টি গুঁড়ির মধ্যস্থানে আছে। কাঠিন্যবর্দ্ধক কোষগুলি গুঁড়ির এমন স্থানে থাকে যে, তাহারা আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য গাছকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারে।

গুঁড়ি ছোট হইতে বড় হয়, খাটো হইতে লম্বা এবং সরু হইতে মোটা হয়। গুঁড়ির অগ্রভাগে খুব ছোট ছোট কচিপাতায় ঢাকা তাহার বর্দ্ধনমুখ (growing point) থাকে। এই বর্দ্ধনমুখ যেসব কোষদিয়া তৈয়ারী, তাহারা তাড়াতাড়ি বিভক্ত হইতে পারে। এইরূপে তাহারা অনবরত কোষের সংখ্যা বাড়াইতে থাকে। সেইজন্য গুঁড়িটি লম্বায় বাড়িয়া উঠিতে থাকে। এই কোষগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া গুঁড়ির নানা প্রকার কোষ এবং কোষসমষ্টি রচনা করে। বর্দ্ধনমুখ হইতে যতই নীচের স্তরের কোষ পরীক্ষিত হইবে, ততই উহাদের রূপান্তর দেখা যাইবে।

কেমন করিয়া গুঁড়ি মোটা হয়, এইবার সে কথা বলিতেছি। গুঁড়ির ভিতরে নালিকা-গুচ্ছে জলের এবং খাদ্যনালিকার মধ্যে উৎপাদক কোষের একটি স্তর আছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই কোষগুলি বর্দ্ধনমুখের কোষের মত বিভক্ত হইতে পারে। এই বিভাগের দ্বারা যে কোষগুলি ভিতরের দিকে অর্থাৎ জলনালিকার দিকে উৎপন্ন হয়, তাহারা ক্রমে লম্বা হইয়া জলনালিকায় পরিবর্ত্তিত হয়। সেই প্রকারেই যে কোষগুলি বাহিরের অর্থাৎ খাদ্যনালিকার দিকে উৎপন্ন হয়, তাহারা রূপান্তরিত হইয়া খাদ্যনালিকায় পরিণত হয়। তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিবে যে,
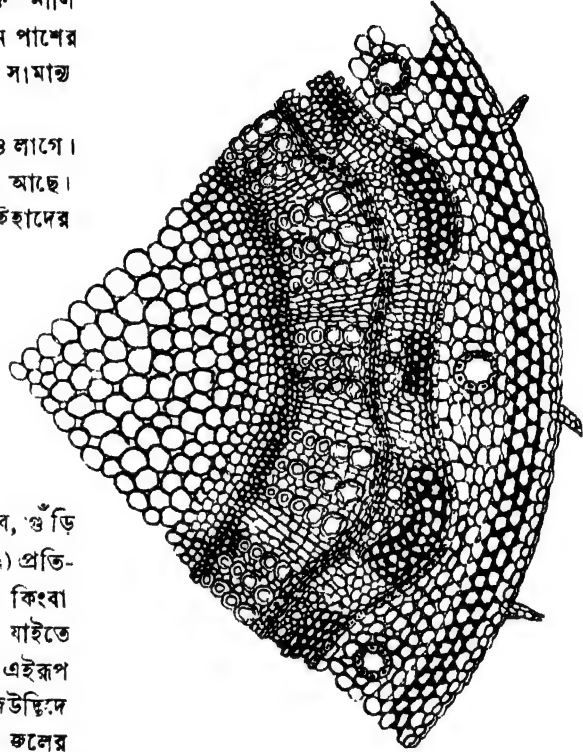
গুঁড়ির মধ্যস্থ খাদ্যনালিকা ও কোষ

এইরূপ হওয়ার দ্বারা প্রথম যে খাদ্যনালিকা এবং জলনালিকাগুলি পরস্পরের সন্নিকটে ছিল, তাহারা ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইবে এবং পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপ নূতন নূতন খাদ্য এবং জলনালিকার সৃষ্টি হওয়ায় গাছের গুঁড়ি এবং ডাল মোটা হইবে। আড়াআড়ি করিয়া কাটা একটি মোটা এবং পুরানো গুঁড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখ। সমস্ত গুঁড়ি ব্যাপিয়া কতকগুলি চক্রাকার চিহ্ন (circle) দেখিতে পাইবে। এই চক্রাকার চিহ্নগুলি প্রতিবর্ষের জলনালিকা বৃদ্ধির চিহ্ন। এই রেখাগুলি গণিয়া গুঁড়ির বয়স অনুমান করা যাইতে পারে।

একবীজপত্রী গুঁড়ির নালিকাগুচ্ছোৎপাদক কোষ নাই। সুতরাং খাদ্যনালিকা এবং জলনালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি ইহাদের পক্ষে অসম্ভব। ইহাদের এইরূপ মোটা হইবার কোন উপায় নাই। শিশু অথবা অল্পবয়স্ক কোষের আয়তন বৃদ্ধি হওয়া যতটা সম্ভব, তাহার বেশী মোটা হওয়া ইহাদের ভাগ্যে লেখা নাই।

তোমরা গাছের ছাল দেখিয়াছ। গাছের ছাল নানা কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুদ্ধ ভাষায় ইহাকে বল্কল কহে। ইহা কিরূপে প্রস্তুত হয়? একটি ছোট চারা পরীক্ষা করিয়া দেখ। ইহার গুঁড়ি নরম এবং সরু। কিন্তু একটি পুরাতন বৃক্ষের গুঁড়ি এইরূপ নহে। উহার আবরণ কঠিন এবং বন্ধুর ও বর্ণ দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। এইরূপ কেমন করিয়া হইল? গুঁড়ি যখন মোটা হইতে আরম্ভ করে, তখন বাহিরের আবরণের উপর ক্রমে ভিতর হইতে চাপ বাড়িতে থাকে। ফলে বাহিরের আবরণ ফাটিয়া যায়। গুঁড়ির আবরণ দ্বারাই কিন্তু ভিতরের কোষগুলি রক্ষা পায়, কিন্তু ইহা ফাটিয়া যাওয়ায় অভ্যন্তরীণ কোষগুলির অনিষ্ট হইতে পারে। যাহাতে ভিতরকার কোষগুলির কোন ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য ভিতরের স্তরের কোষগুলি উৎপাদক কোষে পরিণত হয়। ইহাকে কর্ক-উৎপাদক কোষ (cork cambium) বলে। এই উৎপাদক কোষ বিভক্ত হইয়া বাহিরের অর্থাৎ গুঁড়ির আবরণের দিকে যে কোষের সৃষ্টি করে, সেগুলিতে কর্ক উৎপন্ন হয় এবং সেই কোষগুলিকে কর্ক কোষ বলে। এইরূপে কর্ক-কোষের একটি স্তর প্রস্তুত হয়। এই স্তর ভেদ করিয়া জল এবং খাদ্য ভিতর হইতে গুঁড়ির আবরণের কোষগুলিতে পৌঁছিতে পারে না। অতএব উহারা মরিয়া শুকাইয়া কঠিন হইয়া উঠে এবং গুঁড়িকে বন্ধুর ও অমসৃণ করিয়া তোলে। গুঁড়ি যতই মোটা হইতে থাকে, ততই নূতন নূতন কর্ক উৎপাদক কোষ এবং কর্ক কোষের স্তর উৎপন্ন হয়। কর্ক তোমরা নিশ্চই দেখিয়াছ। কর্কের ছিপি অতি সাধারণ এবং প্রয়োজনীয় বস্তু। ওকজাতীয় এক প্রকার গাছে (Quercus Suber) এই কর্ক কোষের স্তর অত্যধিক মোটা হয় এবং ইহা হইতে কর্ক তৈয়ারী হইয়া থাকে।

এখানে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, গুঁড়ি এবং ডাল দিয়া গাছের কোন কাজ হয়? প্রথমতঃ শিকড় মাটি হইতে যে রস শুষিয়া লয় তাহা গুঁড়ি এবং ডালের মধ্য দিয়াই সর্ব্বত্র সরবরাহ হয়। দ্বিতীয়তঃ গুঁড়ি এবং ডালের সাহায্যে পাতাগুলি আলো এবং বাতাসে উন্মুক্ত এবং প্রসারিত অবস্থায় থাকে। পাতার কোষগুলি আলোর সাহায্যে বাতাস হইতে এবং জল হইতে খাদ্য প্রস্তুত করে। অতএব তাহারা যত বেশী স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে, আলো এবং বাতাস গ্রহণ করিবার সুবিধা তাহাদের সেই পরিমাণে অধিক হইবে। তাহা ছাড়া গুঁড়ি এবং ডাল বংশ বৃদ্ধির (reproduction) কাজেও লাগে। কোন কোন গাছের ডাল পুঁতিলে তাহা হইতে সম্পূর্ণ গাছের উৎপত্তি হয়—যেমন সজনে। ডাল কাটিয়া গাছের কলম প্রস্তুত করিতে তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ।

এখন তোমরা জানিতে পারিলে, অঙ্কুর হইতে গাছ বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে গুঁড়ি এবং ডাল বড় হইয়া নানা প্রকার শাখা-প্রশাখার উৎপত্তি করে। এই সমুদয়ই কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই হইয়া থাকে, বলা যাইতে পারে।

পৃথিবীর ছয়টি আশ্চর্য্য জিনিষ
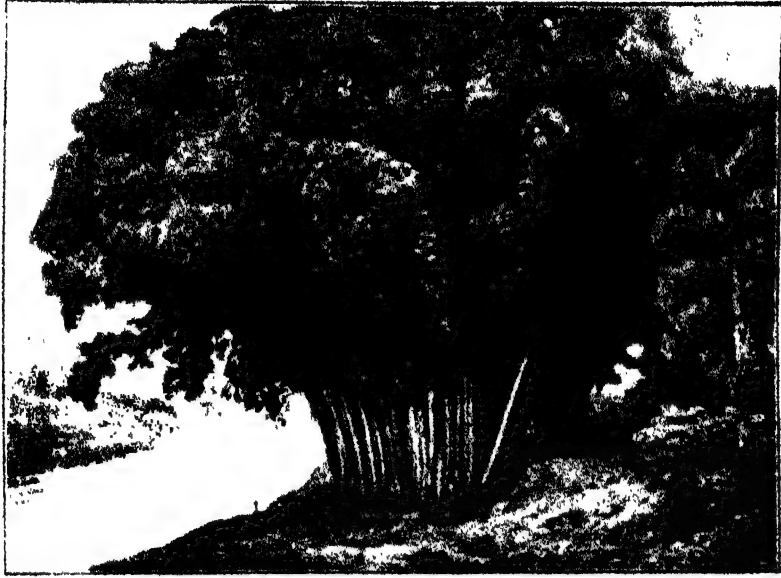
সবচেয়ে বড় বাঁশের ঝাড়—পেরাডেনিয়া সিংহল

এই ঝাড়ের বেড় হইবে ১০০ ফুট, উচ্চতায় ১০০ ফুট

সুচৌব হেলান স্তম্ভ বা 'বাঘ পাহাড়ের স্তম্ভ' (The Tiger Hill Pagoda)এই স্তম্ভটির বয়স ১,৩০০ বৎসর

দোলান পাথর—আর্জেনটিনা

সব চেয়ে বড় গাছ। (মেক্সিকো) বেড় ১৫৪ ফিট

বৃহদাকার তুষার-শিলা
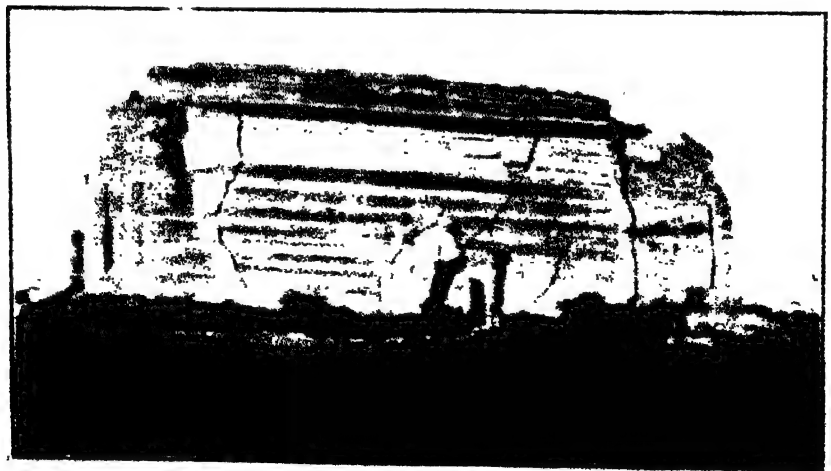
মিন্‌গুন্ প্যাগোডার ধ্বংসাবশেষ—ব্রহ্মদেশ

রাষ্ট্রসর্ব্বস্ব মতবাদ

১০৪০ পৃষ্ঠার পর

ব্যক্তিত্ববাদীদের সমস্ত দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ পৃথক পৃথক লোকের দিকে—তাহাদিগকে সমগ্র এবং সংহত একটা সমষ্টির মূর্ত্তিতে দেখিবার চেষ্টা তাঁহারা মোটেই করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, প্রত্যেক মানুষ নিজের প্রতিভার জোরে অসাধ্য সাধন করিতে পারে এবং তাহার এই অসাধারণ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্নিহিত, ইহার মধ্যে বাহিরের শক্তির কোনই হাত নাই।

ব্যক্তিত্ববাদীদের এই মন্ত্র সারা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ধরিয়া ইংলণ্ডের রাজনীতির ধারাকে গঠিত করিতেছিল, কিন্তু এই শতাব্দীর শেষ ভাগে সেখানেও আদর্শের চিন্তাক্ষেত্রে একটা প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছিল। এই প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় দুইজন মনীষীর লেখায়—তাঁহাদের নাম গ্রীন (T. H. Green) ও বোসাংকোয়েট্ (Bosanquet)। এই দুই দার্শনিক যে মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তাহার প্রধান নীতি ছিল এই যে, রাষ্ট্রই হইতেছে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে একমাত্র অনুষঙ্গ ও একমাত্র রাষ্ট্রকে সর্ব্বস্ব বলিয়া মানিয়া লইলেই মানুষ তাহার চরম পরিণতিতে পৌঁছিতে পারে।

প্লেটো ও অ্যারিষ্টট্ল

রাষ্ট্রসর্ব্বস্ব এই মতবাদের (Idealist theory of the State) একটু ইতিহাস আছে। রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এই নীতি নূতন কিছু একটা নয়। বহুসহস্র বৎসর আগে যখন গ্রীক-সভ্যতা ছিল সারা পৃথিবীর আদর্শ, তখন এই নীতিটি সেখানকার দুইজন বিখ্যাত মনীষীর লেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের নাম প্লেটো (Plato) এবং আরিষ্টট্ল (Aristotle)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক্ রাজ্যগুলি তখন এমনভাবে গঠিত ছিল যে, তাহাদের শাসনকার্য্যে প্রায় সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত এবং উপযুক্ত নাগরিকই অপরোক্ষ একটা অংশ লইতে পারিত।

নাগরিকদের সহিত শাসনযন্ত্রের সম্বন্ধ ছিল অতি গভীর এবং নিকট। তাই গ্রীক দার্শনিকেরা স্বভাবতঃই মনে করিতেন যে, তাঁহাদের দেশের লোকদের সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে প্রধান সাহায্য করিয়াছে তাহাদের রাষ্ট্র, অতএব সেই রাষ্ট্রের মধ্যেই নিজেদের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি খোঁজা সকলের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।… প্লেটো বলিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রের স্বভাবই এই যে, ইহা অন্তঃস্থিত সকল মানুষকে লইয়া একটি মহতী শক্তি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে এবং মানুষেরও প্রকৃতি এই যে, সে রাষ্ট্রের মধ্যেই নিজের স্বভাবজাত পরিপূর্ণতা খুঁজিয়া পায়। আরিষ্টটল ইহার উপর আরও একটু জোর দিয়া বলিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রই হইতেছে মানুষের পূর্ণতার প্রতীক্ এবং

ইমানুয়েল ক্যাণ্ট

মানুষ যদি তাহার সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ পূর্ণবিশ্বাসে ও নির্ব্বিচারে রাষ্ট্রের ঘাড়ে ফেলিয়া দেয় তবেই তাহার যথার্থ কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হইবে।

গ্রীক দার্শনিকদের এই রাষ্ট্রসর্ব্বস্ব নীতির প্রভাব বহুদিন চাপা পড়িয়া ছিল, কিন্তু ফরাসী-বিপ্লবের পর অতি অদ্ভুতভাবে জার্ম্মাণদেশে ইহার পুনঃপ্রচার আরম্ভ হয়। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ফরাসীদেশে বিপ্লবের বহ্নি নিবিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিপ্লবের বাণী (সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা) সকল দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নানাকারণে স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করা হয় ত সর্ব্বত্র সম্ভবপর হয় নাই, কিন্তু সকল দেশেই চিন্তাশীল মনীষী ও আদর্শবাদিগণ বিপ্লবের বাণীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রুশোর মন্ত্রের তীব্র অথচ উচ্ছ্বসিত প্রেরণা জার্ম্মাণদেশের পণ্ডিতদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ক্যাণ্ট (Kant)। রুশোর মতবাদ অনুসরণ করিয়া ক্যাণ্ট দেখাইয়াছিলেন যে, যে রাষ্ট্রে মানুষের স্বাধীন চিন্তা

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

অভিব্যক্ত হইতে পারে না, তাহা রাষ্ট্রনামের যোগ্যই নয়, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন সাধনই সর্ব্বথা কাম্য।

কাণ্টএর শিষ্য ছিলেন ফিক্‌টে (Fichte)। ১৭৬২খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম। ফরাসীবিপ্লবের বহ্নি তাঁহার চোখের সামনেই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার পরিণতির

ছবিও তাঁহার চোখ এড়ায় নাই। প্রথম হইতেই রুশোর বাণী তাঁহার চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল—গুরু কাণ্টএর মত তিনিও রুশোর নীতিকেই আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন।

তারপর হইল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এর অভ্যুদয়। অসামান্য প্রতিভার বলে তিনি ফরাসীদেশের বিপ্লব-চাঞ্চল্য দমন করিয়া সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সমস্ত ফরাসীরাজ্য সানন্দে ও সগৌরবে তাঁহাকে অধিনায়ক পদে বরণ করিয়া লইল। কিন্তু তাঁহার অদম্য যশোলিপ্সা তাঁহাকে প্রণোদিত করিল আশেপাশের সব রাজ্য ফরাসীপতাকার অধীনে লইয়া আসিতে এবং তিনি নজর দিলেন বহুধাবিভক্ত জার্ম্মাণ দেশের দিকে। সংহত এক জাতীয় রাষ্ট্রশক্তি সেখানে না থাকায় ফরাসীবাহিনী সেখানে আসিয়া অনায়াসেই রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া ফেলিল এবং তদ্দ্বারা নিজেদের রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতা ও উৎকর্ষ প্রমাণিত করিল।

এই সব দেখিয়া ফিকটের মতবাদের ধারা অনেকখানি বদলাইয়া গেল। তিনি দেখিলেন যে, জার্ম্মাণ পরাধীনতার প্রধান কারণই হইল তাহাদের একতাবিহীনতা—সংহত একজাতীয় রাষ্ট্রশক্তির অভাব। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চেয়েও বেশী কাম্য হইতেছে জাতীয় সংগঠন, রাষ্ট্রের ক্ষমতা। ধীরে ধীরে নূতন এক পথে তাঁহার চিন্তাধারা চলিতে লাগিল। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, সুগঠিত রাষ্ট্র ব্যতিরেকে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ কিছুতেই সাধিত হইতে পারেনা এবং রাষ্ট্রকে সুগঠিত ও সংহত করিবার জন্য পৃথক পৃথক্ ব্যক্তিকে যদি খানিকটা স্বাধীনতাও বিসর্জন দিতেহয়, তবে তাহাতে তাহাদের ইতস্ততঃ করা উচিত নয় কারণ রাষ্ট্র হইতেছে সকলের সমষ্টি এবং সমষ্টির কল্যাণ শুধু একজনের কল্যাণ নহে, তাহা সকলের কল্যাণ।

ফিকটের এই নূতন চিন্তাধারায় পুরাতন গ্রীক আদর্শবাদীদের অনেকখানি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তিনি তাঁহার নীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরে বিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল (Hegel) অতি বিশদভাবে রাষ্ট্রের মাহাত্ম্য এবং প্রাধান্য বর্ণনা করিতে সুরু করিলেন। এ হইতেছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা।

হেগেল ছিলেন পুরারকমের আদর্শবাদী ও দার্শনিক। তাঁহার মতে পৃথিবীর চরম সত্য হইতেছে আধ্যাত্মিক একটা জিনিষ, যাহার নাম তিনি দিয়াছিলেন "যুক্তিসঙ্গত একটা সঙ্কল্প" (a rational will) এই সঙ্কল্প পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া ওঠে নানা বিরোধী ভাবের সামঞ্জস্যে। মানুষের মনে স্বাধীনতালিপ্সা এবং অনুবর্ত্তিতা, স্থিরতা এবং চাঞ্চল্য ইত্যাকার অনেক বিরোধীভাবের সমাবেশ আছে—এই সমস্ত বিরোধীভাব যখন সুসমঞ্জস একটা সঙ্কল্পে পরিণতি লাভ করে, তখনই মানুষ পূর্ণতা পাইয়াছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে। হেগেলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই পরিণতি আসিতে পারে তখনই, যখন একটি রাষ্ট্রকে নিজেদের যুক্তিসঙ্গত সঙ্কল্পে অভিব্যক্তি বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। মানুষের ব্যক্তিগত বিবর্ত্তনের (evolution) শেষ সোপান হইতেছে অসীম শক্তিশালী রাষ্ট্র। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও সকলের সঙ্ঘবদ্ধ ইচ্ছা উভয়েরই পরিণতি ও পরম বিকাশ হয় রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে। রাষ্ট্রের বাহিরে মানুষের পৃথক্ কোন স্বাধীনতা নাই—রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া সে আত্মপ্রকাশের যে সুযোগ পায়, তাহাই তাহার পক্ষে আদর্শ স্বাধীনতা।

ফিকটে এবং হেগেলের চিন্তাধারা অচিরেই জার্ম্মাণি হইতে বাহিরে ছড়াইয়া পড়িল এবং তাহার ধাক্কা ব্যক্তিত্ববাদী ইংলণ্ডের গায়েও আসিয়া লাগিল। তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ চলিতেছে। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্ণ স্বাধীনতার যে একটা নীতি ইংলণ্ডের সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্র জুড়িয়া বসিয়া ছিল, তাহার একটা প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়া গিয়াছিল। লোকে দেখিতে পাইতে ছিল যে, রাষ্ট্র যদি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে তবে পৃথগাত্মা ব্যক্তিরা আপন ক্ষমতায় অনেক কিছুই করিতে পারে না, রাষ্ট্রকেই অগ্রসর হইয়া অনেক দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে লইতে হয়।

রাষ্ট্রের এই পুনঃপ্রবেশকে উদ্বোধিত করিলেন গ্রীন্ ও বোসাংকোয়েট্। হেগেলের নীতিবাদ অনুসরণ করিয়া গ্রীন্ বলিলেন যে রাষ্ট্র একটা জড় নির্ব্বাক্ বস্তু নহে, তাহার পিছনে আছে চিরন্তন একটা চেতনা—যাহা প্রত্যেক মানুষের অন্তরে একটা সাড়া দিতে সমর্থ এবং যাহাকে সম্পূর্ণভাবে জাগাইয়া তুলিতে হইলে প্রত্যেক মানুষের অম্লান বদনে রাষ্ট্রশক্তির নির্দ্দেশ পালন করা দরকার। রাষ্ট্র আছে বলিয়াই মানুষ কতকগুলি মৌলিক অধিকারের দাবী করিতে পারে—রাষ্ট্র না থাকিলে তাহার সমস্ত দাবী শতধা-

বিভক্ত হইয়া যাইত। রাষ্ট্র যে অনেক সময়ই বল-প্রয়োগের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, তাহা তাহার নিজের কোন বিশেষ স্বার্থের জন্য নহে, প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারগুলি যাহাতে সুসমঞ্জসভাবে বজায় থাকে তাহারই জন্য। রাষ্ট্র যখন এই বলপ্রয়োগ করিতে বাধ্য হয় তখন সে যে অন্তঃস্থিত লোকদের প্রকৃত ইচ্ছার (real will) বিরুদ্ধে করে এমন কথা বলা চলে না। কারণ রাষ্ট্রের চেতনা এবং বুদ্ধি সমস্ত লোকের চেতনা এবং বুদ্ধিরই প্রতীক্। রাষ্ট্র যদি ভুলও করে তবে সকল লোকের ভুলের প্রতিভূ হিসাবে সেই ভুল মার্জ্জনীয়।

বোসাংকোয়েট্ও মোটামুটি হেগেল এবং গ্রীন্‌এর পথই অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে রাষ্ট্র ছিল মহতী একটা শক্তির মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ এবং

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে রাষ্ট্রসর্ব্বস্ব এই মতবাদ অতি উৎকট একটি পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই পরিণতিকে সাম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে সমসাময়িক ইতিহাস একটু পর্য্যালোচনা করা দরকার। গত শতাব্দীর শেষভাগে বিস্‌মার্ক-এর নেতৃত্বে বিশাল এবং একীভূত একটি জার্ম্মাণ সম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সমগ্র জার্ম্মাণ জাতির লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কি করিয়া জগতের সম্মুখে নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন ও প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই উদ্দেশ্যের প্রতি জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল এবং অতি সত্বর এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল যে, রাষ্ট্র যাহা করে তাহা সর্ব্বথা জাতির কল্যাণের জন্য এবং তাহার প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধাচরণ করা জাতির

বিস্‌মার্ক

নিট্‌সে

ট্রাইট্‌স্কে

হেগেল

ফিক্‌টে

গ্রীন্

জীবনের পরিপুষ্টির প্রধান সহায়ক। তিনি বলিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রের প্রচণ্ডতা এবং শ্রেষ্ঠতা এত অসাধারণ যে, তাহার সামনে আর সমস্ত অনুষঙ্গের দাবী ম্লান হইয়া যায়। রাষ্ট্র হইতেছে গতিমান (dynamic), নিজের চেতনার মধ্যে প্রত্যেক পৃথগাত্মা ব্যক্তির চেতনাকে ডুবাইয়া ফেলে তাহার ধর্ম্ম। রাষ্ট্র এবং মানুষের মনের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকাটাই অস্বাভাবিক এবং যদি কোন লোকের মনে বৈষম্যের সূচনা দেখা যায়, তবে রাষ্ট্রের প্রথম কর্ত্তব্যই হইবে তাহা যে প্রকারে হউক দূরীভূত করা, যাহাতে রাষ্ট্র এবং মানুষের অতিনিকট সম্বন্ধের মধ্যে কোন প্রকার গ্লানি বা আবিলতার সৃষ্টি না হয়।

পক্ষে দুর্ব্বলতা ও একত্বহীনতার পরিচায়ক। নীট্‌সে (Nietzsche) ও ট্রাইট্‌স্কে (Treitschke) প্রমুখ কয়েকজন দার্শনিক খুব গম্ভীরভাবে বলিতে সুরু করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রের বাহিরে মানুষের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বই নাই, রাষ্ট্রই হইতেছে তাহার জীবন এবং রাষ্ট্রকে নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়াই হইতেছে তাহার সহজাত ধর্ম্ম। রাষ্ট্র যদি কোন লোককে প্রাণ দিতেও আহ্বান করে, তবে তাহার প্রতিবাদ করা অন্যায়। রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এই নীতি বিগত মহাযুদ্ধের আগে জার্ম্মাণ-চিন্তাধারাকে এতখানি মোহাবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল যে, বিখ্যাত মনীষী বার্ণহার্ডি (Bernhardi) অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রচার করিয়াছিলেন

যে, আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অন্য কোন রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করারও যদি প্রয়োজন হয় তবে তাহাতে যোগ দেওয়া রাষ্ট্রের লোকদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে যুদ্ধের মধ্য দিয়া এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে মানুষের যুক্তিসঙ্গত সংকল্পের বিকাশ এবং পরিপোষণই হয়, তাহার সত্তার কোন ক্ষতি হয় না। জার্ম্মাণ আদর্শবাদীদের এই উৎকট নীতিপ্রচারই পরোক্ষভাবে গত মহাযুদ্ধের জন্য দায়ী।

রাষ্ট্রসর্ব্বস্ব মতবাদের মোটা নীতিগুলি এখন সংক্ষেপে বলা যাক। রাষ্ট্রই হইতেছে মানুষের আত্মার বিকাশের একমাত্র উপায়। রাষ্ট্র আছে বলিয়াই মানুষ তাহার আত্মার চরম স্বাধীনতা লাভ করিবার একটা সুযোগ পায়। রাষ্ট্রের একটা বিশিষ্ট চেতনা আছে এবং এই চেতনাকে অস্বীকার করিয়া কোন মানুষই কোন অধিকারের দাবী করিতে পারে না। রাষ্ট্র যাহা কিছু করে তাহার সবটার মধ্যেই থাকে সকলের সমষ্টিবদ্ধ একটা নৈতিকতা (a collective morality) এবং এই নৈতিকতা মানুষের সৃষ্ট আর কোন অনুষঙ্গের মধ্যে থাকিতে পারে না। রাষ্ট্র হইতেছে পরম, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং মহান্।

এই মতবাদের যুক্তিগুলি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার আপাতঃ সভ্যতার পশ্চাতে অনেকখানি গলদ লুকানো আছে। মানুষের স্বভাবই রাষ্ট্রকে একটু সম্মান এবং শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা, কিন্তু এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার যে কতখানি সুবিধা লওয়া যাইতে পারে, নীট্‌সে, ট্রাইট্‌স্কে ও বার্ণহার্ডির উৎকট নীতিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।... আদর্শবাদীদের নীতি যে, মানুষ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকিতে পারে না এবং থাকা উচিত নয়, এটা মোটেই সত্য নহে। রাষ্ট্রের বিশিষ্ট এবং মহতী একটা চেতনা আছে, এই উক্তি অনেকখানি কল্পনা-প্রসূত, কারণ রাষ্ট্র যদি কিছু চিন্তা করে তবে তাহার শাসকমণ্ডলী মানুষদের মস্তিষ্কের মধ্য দিয়াই চিন্তা করে, এবং এই মানুষদের মস্তিষ্ক নির্ভুল এমন হাস্যকর দাবী কেহই হয় ত করিবে না। আসল কথা হইতেছে এই যে, রাষ্ট্র একটা অনুষঙ্গ মাত্র—অন্যান্য অনুষঙ্গের মত ইহার যেমন কতকগুলি অধিকার আছে তেমন কতকগুলি কর্ত্তব্যও আছে। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্পাদিত হয় প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ দানে, নিজের শ্রেষ্ঠতার দাবী তাহাদের বুকে জগদ্দল পাথরের মত না চাপাইয়া দেওয়ায়। পৃথগাত্মা ব্যক্তিদিগকে উপেক্ষা করিয়া কাল্পনিক একটা রাষ্ট্র-চেতনার দাবীকে বড় করিয়া তোলাটা আড়ম্বরপূর্ণ অনাবশ্যক একটা বাহুল্য মাত্র

ইহাও মনে রাখা উচিত যে, রাষ্ট্র অনেক সময়েই ভুল করিয়া থাকে এবং এই ভুল করাটা কোন মারাত্মক অপরাধ নয়। কিন্তু এই ভুল করার সম্ভাবনাটুকু সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার—তাহা হইলেই রাষ্ট্রের অনেক প্রগল্‌ভ দাবীর পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে।... মানুষের স্বতন্ত্র মনের মত চিন্তাশীল ও স্বচ্ছ চেতনা আর আছে কিনা সন্দেহ, তাই যখনই রাষ্ট্রের সহিত কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন এই স্বতন্ত্র মনের বাণী বেশী শোনা উচিত, রাষ্ট্রের একটা কাল্পনিক বাণীর চেয়ে।

আসল কথা হইতেছে এই যে, মানুষের প্রয়োজন বিশাল, বিচিত্র এবং বহু। একমাত্র রাষ্ট্রই তাহার সমস্ত ক্ষুধা, আশা, আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে এমন দাবী করাটাই বাতুলতা। মানুষ তার নিজেকে বিকাশ করে নানা অনুষঙ্গের মধ্য দিয়া, এবং রাষ্ট্র একটা অনুষঙ্গ মাত্র। ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে অনেকখানি এবং সময়বিশেষে ইহার দাবীর মূল্য কম নয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে পরম বা সর্ব্বশক্তিমান বলা চলে না। ধর্ম্ম বল, অর্থনৈতিক প্রয়োজন বল, সমাজের দাবী বল, এ সমস্তই রাষ্ট্রের অপরোক্ষ ক্ষমতার বাহিরে, অথচ মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনে এসবই ভয়ানকভাবে দরকার। ...মানুষের জীবনে রাষ্ট্র একটা সম্মানজনক আসন পাইবার দাবী অনায়াসেই করিতে পারে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা সর্ব্বস্ব বা পরম্ এমন নীতি আজকালকার যুগে কেহই মানিতে রাজী হইবে না।

ইংরাজী কবিতার প্রথম বিকাশ

জিওফ্রে চশার

২৯৬ পৃষ্ঠার পর

অতি প্রাচীনকালে ইংল্যাণ্ডের কবিগণ ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিতেন না—তাঁহাদের প্রাণের ভাষা ফুটিয়া উঠিত, লাতিন, ফ্রেঞ্চ, এঙ্গলো সাক্সন্ এই তিনটি ভাষায়। নিজের কণ্ঠের বাণী শোভায় সৌন্দর্য্যে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারে, এমন ভাব-সম্পদ ও শক্তি সেদিনকার ইংরাজী ভাষার ছিল না। ইংরাজী ভাষা বলিলে যে ভাষা আমরা বুঝি, চশার সর্ব্ব প্রথমে সেই ভাষায় কবিতা লেখেন। তাঁর ভাষার সহিত এখনকার ইংরাজী ভাষার যথেষ্ট অনৈক্য থাকিলেও চশারই যে বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষার জনক, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই জন্যই তাঁহাকে বলা হইত—"ইংরাজী সঙ্গীতের শুকতারা" (Morning Star of English Songs। এই চশার সম্বন্ধেই আমরা এখানে কিছু আলোচনা করিব।

চশার

জিওফ্রে চশার ১৩৪০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জন্ চশার (John Chaucer) একজন ধনী সুরা-ব্যবসায়ী ছিলেন। রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের দরবারে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং অতি সহজেই তিনি বালক জিওফ্রেকে রাজসভায় বালক-ভৃত্য (Page) রূপে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হন। জিওফ্রে ষোল বৎসর বয়সে রাজ-কুমারী এলিজাবেথের ভৃত্যের পদে নিযুক্ত

হন। বয়স হিসাবে তাঁহাকে ছোট দেখাইত, তাঁহার প্রশান্ত বদনমণ্ডল, শুভ্র গণ্ডদ্বয়, সোণালী রংয়ের চুল এবং প্রশস্ত ললাট —সর্ব্বোপরি তাঁর উজ্জ্বল ভাবব্যঞ্জক চক্ষুর্দ্বয় সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার বয়স যখন উনিশ বৎসর, তখন তিনি Squire (নাইটের সহচর) পদে উন্নীত হন এবং যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ফরাসী দেশে

তৃতীয় এডওয়ার্ডের রাজসভায় চশার

যুদ্ধ করিতে গমন করেন। যুদ্ধে তিনি শত্রুর হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের নবপতি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া লইয়া আসেন।

ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া সম্ভবতঃ রাজার নিজস্ব ভৃত্যের পদে নিযুক্ত হন। সাতাইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি সারাজীবনের জন্য বার্ষিক পঞ্চাশ পাউণ্ড মূল্যের একটি বৃত্তি পান। এই সময় তিনি ইংল্যাণ্ডের রাণীর এক সহচরীকে বিবাহ করেন। অতঃপর তিনি বৈদেশিক রাষ্ট্র বিভাগের একটি পদে নিযুক্ত হন এবং কার্য্যোপলক্ষে ইটালিতে গমন করেন। এই ইটালি হইতেই তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের অনুপ্রেরণা আসে রাজা তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তাঁহার খুল্লতাতদের মধ্যে বিবাদ বাধে। জন্ অব্ গণ্ট (John of Gaunt) ছিলেন চশারের একজন শুভানুধ্যায়ী। রাজ-দরবারে তাঁহার উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে চশারের আর্থিক উন্নতি ও অবনতি এক সূত্রে গ্রথিত ছিল। রিচার্ড রাজা হইয়া চশারের একটি বার্ষিক বৃত্তি (Pension) এর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহার স্থলে রাজা হইলেন হেন্‌রী। বৃত্তি বন্ধ হইবার ভয়ে চশার নিজের আর্থিক দৈন্য সম্বন্ধে কয়েকটি কৌতুকপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া নূতন রাজার কাছে পাঠাইয়া দেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া দিলেন। চশারের দুঃখ ঘুচিল। তিনি সমস্ত জীবন সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া ১৪০০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবি'র (West-minister Abbey) কবিদের সমাধি স্থানে (Poets' Corner) আজও তাঁহার সমাধি রহিয়াছে।

চশার বহু কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় ইতালিয় ও ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। ইতালির লেখক বোকাশিওর (Boccasio) নিকট হইতে তিনি গল্প লিখিবার দক্ষতা আয়ত্ত করেন এবং "The Canterbury Tales" নামক সুবিখ্যাত কবিতায় তিনি তাঁহার কৃতিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই ক্যাণ্টারবেরির গল্প সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা করিব। "The Canterbury Tales" কবিতার ছন্দে লিখিত কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি বিভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি ভাবের সংযোগ রহিয়া গিয়াছে। গল্পটি শোনঃ

ক্যান্টারবেরির গল্প

১৩৮২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের এক দিন, সন্ধ্যার ধূসর ছায়া তখন পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে সময়ে সাউথইয়র্কে (South York) টাবার্ড ইন্ (Tabard Inn) নামক স্থানের একদল যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা সব তীর্থ-যাত্রী, পরদিন সকলে মিলিয়া তাঁহারা ক্যান্টারবেরিতে যাইবেন এবং সেখানে টমাস বেকেটের (Thomas Becket) সমাধির কাছে প্রার্থনা করিবেন। এই দলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়জাতীয় যাত্রীই ছিল। টমাস্ বেকেট ছিলেন ক্যান্টারবেরির প্রধান ধর্ম্মযাজক। ১১৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন তাঁহার নিজের মহাধর্ম্মমন্দিরের (Cathedral) বেদীতে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সময় রাজআজ্ঞায় তিনি নিহত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে সকলে তাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক ঋষিজ্ঞানে পূজা করিতে থাকে। এবং প্রতি বৎসর তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে যাইয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা তাহারা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিত। টাবার্ডইনের (Tabard Inn) এই দর্শকদের মধ্যে চশার নিজেও একজন ছিলেন এবং সম্মিলিত দর্শকদের বর্ণনা দিয়া তিনি ক্যান্টারবেরির গল্প (The Canterbury Tales) আরম্ভ করেন। ক্যান্টারবেরির তীর্থ-যাত্রীদের মধ্যে তদানীন্তন ইংরাজ-সমাজের সমস্ত স্তরের ও সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকই স্থান পাইয়াছে, সুতরাং ক্যান্টারবেরির গল্প পড়িতে পড়িতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের সামাজিক জীবনের এক মনোরম চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে।

টাবার্ড ইন্

চশার প্রথমে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় অশ্বারোহী বীর-পুরুষের (Knight) পরিচয় দিয়াছেন। এক সময়ে এই শ্রেণীর বীর-পুরুষদের শৌর্য্য-বীর্য্য ও আত্মত্যাগের গৌরবময় কাহিনীতে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস সমুজ্জ্বল হইয়াছিল।

ইহার পর চশার বলিয়াছেন, মঠ-এর কথা। বৌদ্ধযুগে আমাদের দেশে বৌদ্ধ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী ও শ্রমণগণ যেমন বিহারে আসিয়া বাস করিতেন এবং ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে সারাজীবন বিহারেই কাটাইয়া দিতেন, সেইরূপ ভিক্ষুণী (prioress), সন্ন্যাসিনী (nun), মঠবাসী সন্ন্যাসী (monk) ও পুরোহিত (priest) গণ ধর্ম্মের জন্য সব ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহারা সকলেই উচ্চবংশসম্ভূত কিন্তু ঐশ্বর্য্যের মায়া, গৃহের নিবিড় সুখবিলাস তাঁহাদের ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, কার অদৃশ্য অঙ্গুলি সঙ্কেতে একদিন তাঁহারা সব ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তারপর তিনি যে ইরিয়ান (Irian) এর কথা বলিয়াছেন, তিনি যেন এক ভিন্ন জগতের মানুষ—আভিজাত্যের ছাপ তাঁহার মধ্যে

নাই—ধনীর সৌধমালায় তাঁহাকে খুজিয়া পাওয়া যায় না—তাঁহাকে দেখা যায়, গরীবের কুটিরে, ঐশ্বর্য্য-দীপ্তিহীন পান্থ-শালায়। অক্সফোর্ডে (Oxford) শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিত, গরীব, নিঃস্বার্থপর চশার তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা ও সমবেদনায় অভিসিঞ্চিত করিয়া এই চরিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন। তদ্বর্ণিত বাথের স্ত্রীর (Wife of Bath) চরিত্রেও একটি মনোজ্ঞ ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান। তারপর একে একে তিনি বণিক্, আইন-ব্যবসায়ী, ছোট জমিদার, গ্রাম্য ভদ্রলোক, পার্লামেণ্টের সভ্য, সূত্রধর, তন্তুবায় প্রভৃতি সহর ও গ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত নাবিক, ডাক্তার, আদর্শচরিত্র পল্লীযাজক (Parson), সাধুতার প্রতিমূর্ত্তি কৃষক, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও এইরূপ আরও কয়েকজনের বর্ণনা দিয়া চশার তাঁহার গল্পের অবতারণা করিয়াছেন।

নৈশ ভোজনকালে সরাইয়ের পরিচালক এই দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করিয়া তাঁহাকে আনন্দময় করিয়া তুলিবার প্রয়াসে এক নূতন পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তিনি বলিলেন, প্রত্যেক যাত্রীকে যাইবার সময় দুইটি ও ফিরিবার সময় দুইটি করিয়া গল্প বলিতে হইবে, এবং সব চেয়ে সুন্দর গল্প যিনি বলিবেন, তাঁহাকে একটি উৎকৃষ্ট ভোজে আপ্যায়িত করা হইবে। এ প্রস্তাবে সকল যাত্রীই সানন্দে সম্মতি দিল। পরদিন সকালবেলা যাত্রীদের যাইবার সময় উপস্থিত হইলে কে প্রথম গল্প আরম্ভ করিবে, তাহা ঠিক করিবার জন্য সুরতি খেলিয়া ঠিক করা হইল। তাহার ফলে বীরপুরুষ (Knight) প্রথম গল্প বলিবার অধিকারী হইলেন। তাঁহার গল্পগুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য চশার যে সুন্দর পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, এখন আশা করি, তোমরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছ।

বীরপুরুষ যে গল্পটি বলিয়াছিলেন সেই গল্পটিই এখানে বলিতেছি।

বহু প্রাচীন কালে এথেন্স (Athens) নগরে থিসুয়াস্ (Theseus) নামে একজন খুব বড় সম্ভ্রান্ত উচ্চপদবীবিশিষ্ট ব্যক্তি (Duke) বাস করিতেন। তিনি বহু দেশ জয় করেন এবং হিপোলিটা (Hyppolyta) নাম্নী এক অতি-সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করেন। নবপরিণীতা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, পথের দুই পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদপরিহিতা বহু রমণী নতজানু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছে। থিসুয়াস্-এর মন করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদের শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বর্ষীয়সী, সে উত্তর করিল—'থিব্স (Thebes)-এর অবরোধে আমাদের স্বামিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে যিনি রাজা, তিনি আমাদের স্বামী-দের মৃতদেহ সমাধিস্থও করিতে দেবেন না, দাহও করিতে দিবেন না।

এই নারীদের উপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হইয়াছে, থিসুয়াস (Theseus) তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। হিপোলিটা ও তাঁহার ভগিনী সুন্দরী এমিলিকে (Emily) এথেন্সে পাঠাইয়া দিয়া তিনি তাঁহার সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে থিব্স্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সেখানে তিনি রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, নগর-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং এই বিধবা রমণীগণ তাহাদের মৃত স্বামীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিল। থিসুয়াস্-এর সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে দুইজন বীরকে আহত অবস্থায় দেখিয়া বন্দী করিয়া লইয়া আসে। তাহারা থিব্স্-এর রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র—একজনের নাম পালামোন্ (Palamon) আর একজনের নাম আর্কিট্

(Arcite) থিসুয়াস্ তাহাদিগকে এথেন্সে লইয়া আসিলেন এবং একটি অন্ধকারময় দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

মে মাস। বসন্তের মায়ামন্ত্রে কি এক অপূর্ব্ব মধুরিমায় সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; দিকে দিকে প্রকৃতির আনন্দোৎসব। এমন এক প্রভাত বেলায় এমিলি রাজোদ্যানে ফুল তুলিতেছিল, আর্কিট তাহার কারাকক্ষের জানালা দিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল। তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে সে মুগ্ধ হইল—সে তাহাকে ভালবাসিল। কিন্তু বন্দী সে—কারাকক্ষের অন্ধকারেই হয়তো তাহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইবে! এই সুন্দরীকে পাইবার কোন আশাই তো তাহার নাই। এক দুর্বিবষহ যাতনায় সে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া পালামোন্ জানালার নিকট গেল এবং আর্কিট তাহাকে তাহার দুঃখের কারণ খুলিয়া বলিল। পালামোন্ এমিলিকে দেখিল; সেও তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। আর্কিট তাহাকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া তিরস্কার করিল, এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধের এক সুউচ্চ প্রাচীর মাথা তুলিয়া উঠিল।

একদিন থিসুয়াস্-এর এক বন্ধু তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। থিব্‌সে বাসকালে আর্কিট-এর সঙ্গে তাহার পরিচয় ছিল। থিসুয়াস্-এর নিকট সে আর্কিট-এর মুক্তি-ভিক্ষা করিল। আর কখনও সে এথেন্সে ফিরিবে না, এই সর্ত্তে থিসুয়াস্ তাহাকে মুক্তি দিলেন। এই অন্ধকারময় কারাগৃহ, এই ঘৃণিত বন্দিজীবন হইতে কোনমতে মুক্তি পাওয়াই ছিল তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু, কিন্তু সেই অপ্রত্যাশিত মুক্তি যেদিন তাহার অন্ধকার জীবনের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিল, স্বাধীন মুক্তজীবন যখন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল, অসহ্য বিপুল আনন্দে তো তাহার সমস্ত দেহ-মন ভরিয়া গেল না—বরং এক সীমাহীন দুঃখের ভারে সে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

এমিলকে আর দেখিতে পাইবে না ভাবিয়া সে শোকাভিভূত হইয়া উঠিল। এদিকে পালামোন্ আর্কিটকে ঈর্ষা করিতে লাগিল। সে মনে করিল, আর্কিট মুক্তি পাইয়া এমিলির পাণি প্রার্থনা করিবে এবং এই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী রমণীর মধুর সাহচর্য্যে তাহার জীবন মধুময় হইয়া উঠিবে।

এমিলির জন্য মনোদুঃখে আর্কিট-এর দিন কাটিতে লাগিল। একদিন সে স্বপ্নে দেখিল যে, তাহার এথেন্সে যাওয়া প্রয়োজন, সে এথেন্স অভিমুখে রওনা হইল। এদিকে এমিলির কার্য্যাধ্যক্ষ একজন চাকর খুঁজিতেছিল। নগরে প্রবেশ করিবার মুখেই আর্কিটে-রএর সঙ্গে তাহার দেখা হইল, এবং আর্কিট এই ভৃত্যপদগ্রহণ করিল। তাহাকে কাঠ কাটা, জল তোলা প্রভৃতি নীচ কাজ করিতে হইত, তবু তার মত সুখী কে? দিনান্তেও সে একবার এমিলিকে দেখিতে পায়। তাহার কাজে খুসী হইয়া থিসুয়াস্ তাহাকে কার্য্যাধক্ষের পদে নিযুক্ত করিলেন; এইভাবে সাতটি বৎসর অতিবাহিত হইল।

বৎসর আসে, বৎসর যায়; এই রকম ভাবে কত বৎসর আসিল আবার কত বৎসর চলিয়া গেল; কিন্তু পালামোন-এর কারা-জীবন শেষ হইল না। ইতিমধ্যে তাহার একজন বন্ধু তাহাকে একটি ঔষধ দিল। পালামোন কারারক্ষীকে এই ঔষধ খাওয়াইল। হতচেতন রক্ষী জানিতেও পারিল না, পালামোন কখন পলায়ন করিল। নিকটবর্ত্তী বনের মধ্যে সে রাত্রি যাপন করিল। পরদিন ১লা মে। অতি প্রত্যূষে ঘুম হইতে উঠিয়া আর্কিট এই বনে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং যেখানে পালামোন লুকাইয়াছিল সেই-খানে আসিয়া তাহার দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করিতে লাগিল। কত বৎসর চলিয়া গেল,

এখনও তো সে তার মনের অভিপ্রায় এমিলিকে জানাইতে পারিল না—এমিলিকে লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিল না। পালামোন্ সব শুনিতে পাইয়া ক্রোধে আত্মহারা হইল। আর্কিট্ এমিলিকে ভাল বাসিতে পারিবেনা—যদি সে তাহার নিষেধে কর্ণপাত না করে, তবে সে (পালামোন্) তাহাকে হত্যা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। দুই জনের মধ্যে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা চলিল। অবশেষে স্থির হইল যুদ্ধে এই বিরোধের মীমাংসা হইবে। পরদিন আর্কিট্ দুই জনের জন্যই অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্ম লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল এবং সুন্দরী এমিলির জন্য দুই ভাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। হঠাৎ একজন অশ্বারোহী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ইহার পর যে অস্ত্রাঘাত করিবে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।" এই অশ্বারোহী স্বয়ং ডিউক ভিন্ন আর কেহই নহেন। তিনি হিপোলিটা ও এমিলিকে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। পালামোন্ ও আর্কিট্ যখন তাহাদের আত্মপরিচয় দিল এবং কেন তাহারা এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে খুলিয়া বলিল, তখন থিসুয়াস্ বলিলেন, তোমাদের মরাই উচিত। হিপোলিটা ও এমিলি এই হতভাগ্য বীরপুরুষদের প্রাণ ভিক্ষা চাহিল ও থিসুয়াস্ তাহাতে সম্মত হইলেন। ডিউকের রাগ পড়িলে তিনি উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ, তোমরা দুইজন তো এমিলিকে বিবাহ করিতে পার না, সুতরাং আমি তোমাদিগকে এক বৎসর সময় দিতেছি। ইহার মধ্যে তোমরা উভয়েই ১০০ জন করিয়া Knight সংগ্রহ করিবে, এবং এক বৎসরের পর এথেন্সে আসিবে। তখন তোমাদের মধ্যে একটি মল্লযুদ্ধ হইবে। তাহাতে যে জিতিবে, সে-ই এমিলিকে বিবাহ করিতে পারিবে।

পালামোন্ ও আর্কিট্ বৎসরান্তে প্রস্তুত হইয়া এথেন্সে উপস্থিত হইল। থিসুয়াস্ আদেশ করিলেন, কেহ তরবারি ব্যবহার করিতে পারিবে না, শুধু বর্শা দ্বারা যুদ্ধ করিতে হইবে। যে পক্ষে অধিকসংখ্যক লোক ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাইবে, সেই পক্ষ পরাজিত হইয়াছে বলিয়া ধার্য্য করা হইবে। আক্রমণের বেগ রোধ করিতে না পারিয়া শীঘ্রই পালামোন্ অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইল, এবং যুদ্ধের নিয়ম ভুলিয়া তাহারা তরবারি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। থিসুয়াস্ যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন, এবং আর্কিট্‌কে জয়ী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কারণ পালামোন্ ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। আর্কিট্ এমিলির নিকট যাইবার জন্য ঘোড়া ছুটাইল, কিন্তু পথিমধ্যে ঘোড়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল, এবং আর্কিট্ গুরুতররূপে আহত হইল।

সকলেই বুঝিতে পারিল আর্কিট্ আর বেশীক্ষণ বাঁচিবে না—মৃত্যুর কালো ছায়া তাহার দৃপ্ত মুখের উপর নামিয়া আসিয়াছে। সে পালামোন্ ও এমিলিকে তার কাছে আসিতে বলিল এবং পালামোন্ কি একাগ্রভাবে এমিলিকে ভালবাসে তাহা বলিয়া তাহার ভাইকে বিবাহ করিবার জন্য এমিলিকে অনুরোধ করিল। তারপরই মৃত্যুর শীতলস্পর্শে তাহারকণ্ঠ চিরতরে নীরব হইয়া গেল। পালামোন্ আর্কিটের জন্য অনেক শোক করিল।

অবশেষে এক শুভ দিনে এমিলির সঙ্গে পালামোনের বিবাহ হইয়া গেল।

চশারের পর যে কবি ইংরাজী সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহার নাম স্পেন্সার। আমরা ক্রমে ক্রমে স্পেন্সার ও তাঁহার পরবর্ত্তী কয়েকজন ছোট ছোট কবির কথা বলিব।

প্যালেষ্টাইন

৪৭৬ পৃষ্ঠার পর

সীমা

প্যালেষ্টাইন্ (Palestine) দেশটির শাসনভার এখন ইংরাজের হাতে। ইহার পূর্ব্ব সীমা সিরিয়ার মরুভূমি, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে মিশর ও হেজাজ রাজ্যের কতকটা এবং পূর্ব্বদিকে জর্দ্দন নদীর উপত্যকা প্রদেশ। লোহিত সাগর ইহাকে মিশরের সহিত পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এদেশের বর্ত্তমান পরিমাণ ৯০০০ বর্গ মাইল। হিব্রু শব্দ প্যালেসকেথ্ (Palescheth) অর্থাৎ ফিলিষ্টাইন্ (Philistine) দের দেশে এই অর্থে এস্থানের নাম হইয়াছে প্যালেষ্টাইন্। ইহার প্রাচীন নাম ক্যানান (Canan)।

জনসংখ্যা

১৯১৪ সালের আদমসুমারীতে এখনকার লোক-সংখ্যা ছিল ৬৮৯,২৮১। ১৯২২ সালের জন গণনায় দাঁড়াইয়াছে ৭৫৭,১৮২। ইহার মধ্যে মুসলমান ৫৯০,৮৯০, ইহুদী ৭৩,০২৪, খৃষ্টান ৭,০২৮, ড্রুস ১৬৩, সামরিট্ ২৬৫, অবশিষ্ট বাহাই, শিখ, হিন্দু প্রভৃতি। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের জনগণায় এখানকার লোক-সংখ্যা বাড়িয়া হইয়াছে ৮১২,২৬৮ জন।

সে সময়ে সারা প্যালেষ্টাইন্‌কে বুঝায় এইরূপ কোন নাম ছিল না। রোমকে অধিকারে আসিবার পর প্যালেষ্টাইন নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এক একটি প্রদেশের নাম যথাক্রমে ফিলিষ্টিয়া (Philistia), ক্যানান (Canan), জুদা (Judah), ইস্রেল, (Israel) বাসন (Bashan) এইরূপ ছিল।

প্রাকৃতিক বর্ণনা

প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত জুডিয়াকে পার্ব্বত্য প্রদেশ বলা যাইতে পারে। এখানকার পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে জেবেল-এল-কুদ (Jebel-el-kud) বিখ্যাত। এই পাহাড়ের উপরিভাগেই জেরুজেলাম (Jerusalem) নগর অবস্থিত। ইহার সকলের চেয়ে উঁচু শিখরটির নাম মিজাপ্ (Mizaph)—উচ্চতা ২,৯৩৫ ফিট। জেরুজেলাম নগরের উত্তরে এই পার্ব্বত্য চূড়াটি অবস্থিত। জেরুজেলাম নগরের উচ্চতা সমুদ্রতট-রেখা হইতে ২,৫৯৩ ফিট। এতদ্ব্যতীত জেবেল এল খালিল বা এল-খালিল (El-khalil), ওয়াদি সেলমান্ (Wadi Selman) প্রভৃতি পর্ব্বত প্রধান। প্রাচীনকালে ওয়াদি সেল্‌ম্যান্ পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশদিয়াই জেরুজেলাম নগরে যাইবার পথ ছিল। সেকালে এই পথেই বণিকেরা পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিত এবং প্রাচীন যিহোবার (Jehovah) মন্দিরে পূজা দিতে ভুলিত না। প্যালেষ্টাইন প্রদেশে ছোট বড় অনেক পাহাড় আছে। দেশটির চারিদিকেই পাহাড়-পর্ব্বত।

জলবায়ু

এই দেশের জলবায়ুকে সাধারণ ভাবে নাতিশীতোষ্ণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু জর্দ্দন উপত্যকায় তাপ ১৩০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে। তবে সচরাচর ৮০ ডিগ্রী পরিমাণ হয়। শীতের সময় একেবারে অতিবেশী নামিয়া যায়। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিও হইয়া থাকে। প্যালেষ্টাইনে

বৃষ্টি হইলেও চূণা পাহাড়ের সংখ্যা বেশী থাকায় পানীয় জলের অভাব হয় খুবই বেশী। নির্ঝরের জল ও প্রস্রবণের জল এখানকার লোকেরা পানীয়রূপে ব্যবহার করে। প্রাচীন কালে কূপের জল লইয়া বিভিন্ন দলের মধ্যে কলহেরও সৃষ্টি হইত। সেকালের লোকেরা কি ভাবে জলপ্রণালীর দ্বারা চাষবাসের জন্য জলের ব্যবহার করিত, তাহার অনেক নিদর্শন স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও কূপ হইতে জল তুলিয়া ক্ষেতে দেওয়া হয়। নভেম্বর

প্যালেষ্টাইন্ নানা দেশের, নানা জাতির শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি-নীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। তোমরা শিশু-ভারতী'তে যে 'হিব্রুজাতি ও ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' পড়িতেছ, তাহা হইতেই এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের কথা জানিতে পারিতেছ। প্যালেষ্টাইনের অনেক জায়গার মাটি খুঁড়িয়া পণ্ডিতেরা নানা প্রকারের প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। কত দেশের কত রাজার কত স্মৃতি যে প্যালেষ্টাইনের মাটির গায়ে লুকাইয়া আছে, সে সমুদয় মাটির ভিতর

জেরুজেলামের দৃশ্য

মাসের শেষাশেষি এখানে বর্ষা ঋতুর প্রাদুর্ভাব হয় এবং এপ্রিল পর্য্যন্ত বর্ষা থাকে। বৃষ্টিপাত বেশী হয় জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে।

যে মরুভূমি এশিয়া ও আফ্রিকাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, প্যালেষ্টাইন তাহার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত

প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন

বলিয়া দুই দেশের ক্ষমতাশালী রাজারা সিরিয়া ও মিশর অধিকার করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন। এই প্যালেষ্টাইনের পথেই এশিয়া ও মিশরের বণিকেরা পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিত। এই পথেই রাজাদের বিজয়-যাত্রা চলিত। সে হিসাবে অতি প্রাচীনকাল হইতেই

হইতে বাহির হইয়া এখন আমাদিগকে বিস্মিত করিতেছে। ঐ সকল কীর্ত্তি-চিহ্ন হইতে এ কথাই পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, প্যালেষ্টাইন কোন দিন কোন কালে একজন নৃপতি বা একটি জাতির অধীনে ছিল না। অতি প্রাচীনকাল হইতেই

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্যালেষ্টাইনের ইতিহাসের সহিত মিশর, হিব্রু, এসিরিয়া, আর্মেনিয়া ও পারস্যের ইতিহাসের যোগ রহিয়াছে। ৩৩২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার প্যালেষ্টাইনের মধ্য দিয়া মিশর জয়ে গিয়াছিলেন। সাত মাস অবরোধের পর টায়ার (Tyre) ও গাজা (Gaza) তিনি

অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডার ইহুদীদের রীতি-নীতি এবং আচরিত ধর্ম্ম ও সমাজ সম্পর্কিত ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই।

প্যালেষ্টাইন

ইহুদীদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সংবাদবাহক সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিল। আলেক্‌জাণ্ডার মিশরে নিজের নামে আলেক্‌জান্দ্রিয়া (Alexandria) নামে যে নগরের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার প্রথম অধিবাসীদের মধ্যে ইহুদীরাই ছিল প্রধান। প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ইহুদীদের রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন ইহুদীদের প্রধান পুরোহিত।
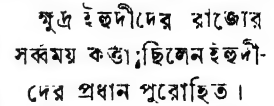
আলেকজাণ্ডার কেবলমাত্র ৩২ বৎসর বয়সে, ১৩ই জুন, ৩২৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তদীয় বিশাল সাম্রাজ্য খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বদেশে তাঁহার নামের স্মৃতিই শুধু বাঁচিয়া রহিল।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর প্যালেষ্টাইনের বিস্তীর্ণ অংশ তাঁহার সেনাপতি লাগাস (Lagus)-এর পুত্র টলেমির হাতে আসিয়া পড়িল। টলেমিদের পরও অনেক রাজবংশ প্যালেষ্টাইনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইন তুর্কীদের হাতে ছিল। জেরুজেলামের অধিকার লইয়া তুর্কীদের সহিত ইউরোপীয় নৃপতিদের বহু ধর্ম্মযুদ্ধ (Crusade) হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের পর প্যালেষ্টাইনের শাসনভার ইংরাজ রাজ সরকারের হাতে আসিয়াছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে সার হার্বার্ট সেমুয়েল (Sir Herbert Samuel) প্যালেষ্টাইনের প্রথম হাইকমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে দশজন

ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারীর, সাতজন আরব (চারজন মুসলমান এবং তিনজন খৃষ্টান), তিনজন ইহুদী লইয়া একটি শাসন পরিষদ গঠিত হয়। পরে একটি ব্যবস্থাপক সভারও সৃষ্টি হইয়াছিল—সেই সভা হাইকমিশনার এবং বাইশজন সভ্য লইয়া গঠিত হয়। ইহার মধ্যে দশজন রাজকর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইবেন এবং বাকী বারজনকে ভোটদ্বারা মনোনীত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মনোনীত সভ্যগণের মধ্যে আটজন মুসলমান, দুইজন ইহুদী এবং দুইজন খৃষ্টান হইবে। আরবেরা এই ব্যবস্থা মানিয়া লইল না; তাহার ফলে এই নবগঠিত শাসন-পরিষদ একেবারেই কার্য্যকরী হয় নাই।

ধর্ম্ম সমাজ

প্যালেষ্টাইনে ধর্ম্মসম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমানেরা তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ে বিচার-ব্যবস্থা, সামাজিক বিধান ও আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত একটি সমিতি দ্বারা সম্পন্ন করেন। যে সব দান বা "ওয়াকফ" সম্পত্তি (Wakf) আছে, তাহার শাসন সংরক্ষণের ভারও এই সমিতির হাতেই আছে। আজকাল ইহুদীরা এখানে বিনা গোলযোগে বেশ শান্তির সহিত বাস করিতেছে। প্যালেষ্টাইনের রাস্তাঘাটেরও দিন দিন উন্নতি হইতেছে। এখন মোট ৮০০ শত মাইল পাকা রাস্তা, ৪৪০ মাইল কাচা রাস্তা, প্রায় ১৭৭টি গ্রামে চলাচলের সুযোগ করিয়া

হাইপা নগরের দৃশ্য

বর্ত্তমান সময়ে প্যালেষ্টাইনের শাসন পরিষদ নিম্নলিখিত ভাবে গঠিত হইয়াছে। ঔপনিবেশিক মন্ত্রীর অনুমোদন ক্রমে হাইকমিশনার দশজন সরকারী কর্ম্মচারী লইয়া একটি কার্য্যকরী শাসন-পরিষদ গঠন করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। কোনও নূতন আইন কানুন প্রচলন করিতে হইলে একমাস পূর্ব্বে সরকারী গেজেটে তাহার খসড়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা জনমত জানিবার সুযোগ ঘটে। তৎপর বিধিব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকে।

পথ-ঘাট

দিয়াছে। শীতঋতুতে আজকাল নানাস্থানে মোটরগাড়ী যাতায়াত করিয়া থাকে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইনে একখানি মাত্র মোটর গাড়ী ছিল। ১৯২৮ সালে তাহার সংখ্যা জেরুজেলেম সহরের ৯০০ খানা গাড়ী লইয়া ২,০০০ হাজারের উপরে গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং দিনদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন নিয়মিত ভাবে মিশর হইতে হাইফা (Haifa), জাফা (Jaffa) হইতে জেরুজেলাম এবং হাইফা হইতে সিরিয়া পর্য্যন্ত রেলগাড়ী

যাতায়াত করে। কনস্তান্তিনোপল্ হইতে ক্যালে পর্য্যন্ত এখন মোটরগাড়ী চলাচলেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন এদেশে ডাকের চিঠিবিলির সুব্যবস্থা হইয়াছে। ৩৪টি টেলিগ্রাফ অফিস হইয়াছে, ৫০টি টেলিফোনের অফিস খোলা হইয়াছে এবং দিন দিনই ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। গাজা (Gaza) নামক স্থানে "হাওয়াই জাহাজের" ঘাঁটি আছে। এখান হইতে নিয়মিতভাবে নানাদেশে 'হাওয়াই জাহাজ' যাতায়াত করে।

ডাক ও তার অফিস

পর্ব্বতভাগের উচ্চতা প্রায় ৩,০০০ ফিট হইবে। হার্মন পর্ব্বত হইতে জন্মলাভ করিয়া একে একে হুলে হ্রদ (Lake Huleh) গ্যালিলি সাগর (Sea of Galile) প্রভৃতির আরও ছোট বড় হ্রদের ভিতর দিয়া অবশেষে সমুদ্র তটরেখা হইতে প্রায় ১,২৯২ ফিট নিম্ন মরুসাগর (Dead sea) বা বাহ্‌র লুটে আসিয়া জর্দ্দন নদী মিলিত হইয়াছে। গ্যালিলি সাগরের দক্ষিণাংশে প্রায়ই ঝড়-তুফান হয়।

জর্দ্দননদী

প্যালেষ্টাইনের মরুসাগর পৃথিবীর মধ্যে একটি আশ্চর্য্য হ্রদ। এশিয়ার আর কোথাও এইরূপ

মরুসাগরের তীরের বালির পাহাড়

প্যালেষ্টাইন্ পার্ব্বত্যদেশ। জর্দ্দন উপত্যকাকে পৃথিবীর মধ্যে একটি আশ্চর্য্য প্রদেশ বলা যাইতে পারে। এই উপত্যকা প্রদেশের নাম এল্‌ঘোর (Elghor)। এই উপত্যকার মধ্য দিয়াই জর্দ্দন নদী প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। জর্দ্দনের জলধারা কয়েকটি হ্রদের ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। ট্রান্স-জর্দ্দানিয়ার (Trans Jardania) সহিত এই ভাবে প্যালেষ্টাইন্ পৃথক হইয়া আছে।

নদ-নদী ও পাহাড়-পর্ব্বত

বিখ্যাত জর্দ্দন নদী হার্মন (Mount Herman) পর্ব্বতের দক্ষিণভাগ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। ঐ

বিচিত্র হ্রদ নাই। বাইবেলে ইহার নাম পাওয়া যায়—লবণ সাগর (Yam) সমতল ভূমির সাগর, বা পূর্ব্ব-সাগর (Yam Hamizvah)। বাইবেলের যুগেরও অনেক পূর্ব্ব হইতেই মরুসাগরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সেকালেও লোকেরা মরুসাগরকে দেখিত নানাপ্রকার কাল্পনিক ভীতির চক্ষে; ইহার চারিদিকের বায়ু বিষাক্ত—ইহার উপর দিয়া পাখী উড়িতে পারিত না—এমন কত কি সব। প্যালেষ্টাইনের দক্ষিণ প্রান্তে মরুসাগর অবস্থিত। ইহার চারিদিকের দৃশ্যাবলী অতি সুন্দর। এই

মরুসাগর

হ্রদের দৈর্ঘ্য হইবে উত্তর-দক্ষিণে ৪৬।৪৭ মাইল এবং প্রস্থে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৯।১০ মাইল, এইরূপ। কোথাও কোথাও ৮২/৪ মাইল মাত্র। জেরুজেলেম হইতে ইহার দূরত্ব ২৫ মাইল মাত্র। জেরিকো (Jericho) হইতে ১০ মাইল, এইরূপ হইবে। ভূমধ্য সাগরের তটরেখা হইতে প্রায় ১৩১২ ফিট নীচে ইহা অবস্থিত। মরুসাগরের তীরে তীরে শিলাকীর্ণ গিরি, করকচ লবনের পাহাড়, বালিয়াড়ি, এই সকল দেখিতে পাওয়া যায়। মরুসাগরের জলের গন্ধ অত্যন্ত বিশ্রী, ইহার জলে মানুষ ডোবে না.— ভাসিতে থাকে। তোমাদের মধ্যে যাহারা সাঁতার জান না— সেখানে আর জলে ডুবিয়া মরিবার ভয় থাকিবে না,

মরুসাগরের জলে সাঁতার দিতেছে

অনায়াসেই সাঁতার দিতে পারিবে। ইহার গভীরতা ১৩০৮ ফিট এইরূপ হইবে। তবে দক্ষিণদিকের গভীরতা একেবারেই কম ; কোথাও ১২ ফিট মাত্র গভীরতা, আবার কিনারার দিকে কোথাও তিন ফিট মাত্র গভীর। জনপ্রবাদ এইরূপ যে, যেখানে এখন মরুসাগর রহিয়াছে, পূর্ব্বে সেখানে সোডম্(Sodom) ও গোমোরা (Gomorrah) নামে দুইটি সমৃদ্ধিশালী জনবহুল নগর ছিল। সেখানে আডমোর, জেবোয়িম ও জোয়ার নামে তিনটি সহরও ঐরূপভাবে ধ্বংস হইয়াছিল। আর সেই সময় এই স্থান ছিল শস্যশ্যামল উর্ব্বর দেশ। সে প্রায় ১৫০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের কথা। জর্দ্দন নদী তখন এ প্রদেশের চারিদিক বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইত। এই কিংবদন্তীর মূলে কোন সত্য নাই। মরুসাগর খনিজ দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা এই হ্রদের জলে ব্রাইন (Brine) সোডিয়াম ক্লোরাইড(Sodium Chloride), পোটাসিয়াম ক্লোরাইড্(Potassium Chloride), ম্যাগনিসিয়াম্ ব্রোমাইড(Magnesium Bromide), পাওয়া গিয়াছে মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে. মরুসাগরের জলে অন্যান্য খনিজদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত লবণের পরিমান হইবে প্রায় ৫০,০০০,০০০,০০০টন। ইহার মধ্যে ১,৫০০,০০০,০০ টন পরিমাণ পোটাসিয়াম ক্লোরাইড্ আছে। খনিজ দ্রব্যের দিক্ দিয়া, বিশেষ পটাসের পরিমাণ হিসাবে প্যালেষ্টাইন্ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। মরুসাগরের জলে লবণের পরিমাণ এত বেশী যে, স্বাভাবিক সূর্য্যের উত্তাপেই ইহার জল হইতে অতি উৎকৃষ্ট দানাদার লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে কষ্টিগান্ (Costigan) নামে একজন আইরিশ্ সাহেব ছোট একখানি ষ্টীমারে করিয়া মরুসাগরের চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আগে অন্য কেহ এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। মরুসাগরের জলে কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব নাই।

মরুসাগরের তীরে কোথাও কোথাও গাছপালা একেবারেই জন্মে না। সেখানে বালির পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঐ বালুকণার মধ্যে পর্ব্বতের উপর হইতে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন মরুসাগরের জলরাশির মধ্যে মণি মাণিক্য জ্বলিতেছে। ঐ পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় ৪,৪০০ ফিট।

মরুসাগরের জলে সঞ্চিত লবণের পরিমাণ হইবে প্রায় ৩০,০০০,০০০,০০০ টন। ইহার মধ্যে প্রতি বৎসর জর্দ্দন নদীর স্রোতোধারাই বাহিয়া আনে প্রায় ৮৫০,০০০ টন।

এখানকার জলে সময় সময় বন্যা আসে। সেইবন্যার জল তীরের গাছপালায় লাগিলে অল্পসময়ের মধ্যেই গাছপালা সব মরিয়া যায়। ইহার জলে কোনপ্রকার জলজন্তু বাস করিতে পারে না। জর্দ্দনের স্রোতোধারার সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য ইত্যাদি যে সকল জলচর প্রাণী

আসে, মরুসাগরের জলে পড়িবা মাত্রই তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে।

আর্ম্মন্ (Armon) বা ওয়াদিমোজিব্ (Wadi-mojib) নামে একটি নদী মরুসাগরের পূর্ব্বাংশে আসিয়া পড়িয়াছে। চূণা পাহাড়ের মধ্য দিয়া নদীটি কেমন করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, তাহা ছবিতে দেখ।

পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের (Great War) সময়

মরুসাগরের তীরদেশ

সর্ব্বত্র পটাসের (Potash) অভাব অনুভূত হয়। সে সময়ে মরুসাগরের জলের রাসয়নিক পরীক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে নানাপ্রকার খনিজদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া

মরুসাগরের লবণ-বন্যা—তীরের গাছ মরিয়া গিয়াছে

গেল। একটি ইংরাজ কোম্পানী গঠিত হইল এবং সেই কোম্পানী মরুসাগরের জল হইতে লবণ, পটাশ: ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া লাভবান হইতেছেন। এখন এই হ্রদের নির্জ্জন তীরে নানা কল-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। একদিন যে হ্রদের নাম শুনিলে লোকে ভীত হইত ও নানারূপ অদ্ভুত কল্পনা করিত—এখন

আর্ম্মন নদীর দৃশ্য

সেই মরুসাগরের তীরস্থ কল-কারখানায় কাজ করিয়া শত শত লোক জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছে।

মরুসাগর হইতে লবণ তোলা হইতেছে

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইনে স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৩৫টি। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা বালক

৪২,৫০০ এবং বালিকা ২৪,৫০০ জন ছিল। এখানে তাহার সংখ্যা দেওয়া হইল। সরকারী স্কুল হইয়াছে ৩১৫, মোট ছাত্র-সংখ্যা ২০,০০০—বালক ১৬,৫০০ বালিকা ৩,৫০০, বেসরকারী মুসলমানদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৩, মোট ছাত্র-সংখ্যা ৪,৫০০; ৩,৬৫০ বালক ও ৮৫০টি বালিকা)। ইহুদীদের পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৭৫ (মোট ছাত্র সংখ্যা, ২৬,৫০০—১৩,৮৫০ বালক এবং ১২,৮৫০ বালিকা)। খৃষ্টানদের প্রতিষ্ঠাপিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৯২টি; (মোট ছাত্র সংখ্যা—১৬,০০০;—বালক ৮,৫০০, বালিকা ৭,৫০০)। বর্ত্তমানে শিক্ষা-বিভাগ গঠিত হইয়া অতি দ্রুত শিক্ষার উন্নতি হইতেছে। এজন্য গভর্ণমেণ্ট অনেক টাকাও ব্যয় করিতেছেন।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

রুশিয়া এবং রুমানিয়া দেশ হইতে এত অধিক সংখ্যক ইহুদী আসিতেছে যে, হয়ত বা একদিন তাহারা মুসলমানদিগকেও সংখ্যায় হারাইয়া দিবে।

এখানে আদালতের ভাষা ইংরাজী, হিব্রু এবং আরবী।

প্যালেষ্টাইন্ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে গম, যব, জলপাই, তরমুজ প্রচুর পরিমাণে ফলে।

প্রাচীনকালে জর্দ্দন নদীর পূর্ব্ব দিকের ভূমি প্যালেষ্টাইনের 'শস্য ভাণ্ডার' বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন কিন্তু অন্যরূপ। এখন জর্দ্দন নদীর পশ্চিমদিকের ভূমিতেই প্রচুর পরিমাণে গম জন্মে। কার্পাসের চাষ অল্প পরিমাণে হয়। আরবদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক ইয়াকুৎ (Yakut) সাহেব আনুমানিক ১২২৫ খৃষ্টাব্দে

কৃষিকার্য্য

ক্ষেতে জল সেচন

প্যালেষ্টাইনের কৃষিকার্য্য
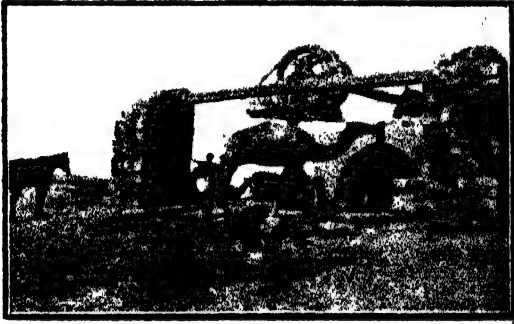
এদেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য একটি স্বাস্থ্যবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ওলাউঠা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে শত শত লোকের মৃত্যু হইত। শিশুদের অকাল মৃত্যু যে কত হইত, তাহার সীমাসংখ্যাই ছিল না। এখন 'কলেরা' ও বসন্তরোগের টীকা, জলের সুব্যবস্থা এবং পথঘাট ইত্যাদি সুগঠিত হওয়ায় মৃত্যু-সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

স্বাস্থ্য

পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের পূর্ব্বে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন প্রসার ছিল না। এখন এখানে তেলের কল ও সাবানের বড় বড় কারখানা হওয়ায় দিন দিনই ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য

এখানে আরবদেশীয় মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী। ইহুদীদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে।

লিখিয়াছিলেন যে, এদেশে প্রচুর পরিমাণে কার্পাসের চাষ হইত। আবুল ই ফিদা (Abul-I-Fida) ১৩২১ খৃষ্টাব্দের লিখিত প্যালেষ্টাইন্ হইতে কিউতা (Ceuta) (মরক্কো)তে কার্পাসের রপ্তানী হইত।

এখানকার সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে চূণা-পাথর, বেলে পাথর, করকচ লবণ, বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে জিপ্‌সামও (Gypsum) মিলে। মরুসাগরে (Dead Sea) গন্ধক পাওয়া যায়।

খনিজ-দ্রব্য

সাবান তৈয়ারী হইতেছে এখানকার প্রধান শিল্প। জেরুজেলেম নগরে অনেক সাবানের কারখানা আছে। নাব্লুস্ (Nablus) এবং হাইফা (Haifa) সহরেও সাবানের কারখানা আছে। নাব্লুস্ এবং অন্যান্য স্থানে জলপাইয়ের তেলের কারখানা রহিয়াছে। মদের ব্যবসাও

শিল্প ও বাণিজ্য

এখানে খুব চলে এবং ইহুদীরা মদ তৈয়ারী করিবার ব্যবসায় একেবারে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে।

প্যালেষ্টাইন হইতে তেল, সাবান, মটর, তরমুজ, মদ এবং কমলা নানা দেশে প্রচুর পরিমানে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানকার কমলার খোসা মোটা হওয়ার দরুণ সহজে নষ্ট হয় না। এজন্য বিদেশে রপ্তানীর পক্ষে এখানকার কমলা খুব ভাল। উৎকৃষ্ট কমলা প্রচুর পরিমাণে লিবারপুল নগরে রপ্তানী হয়। এক হিসাবে এখানকার কমলার ⅔ অংশই ইংলাণ্ডে রপ্তানী হয়। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা মিশর ও তুর্কীদেশে যায়।

আমদানী ও রপ্তানী
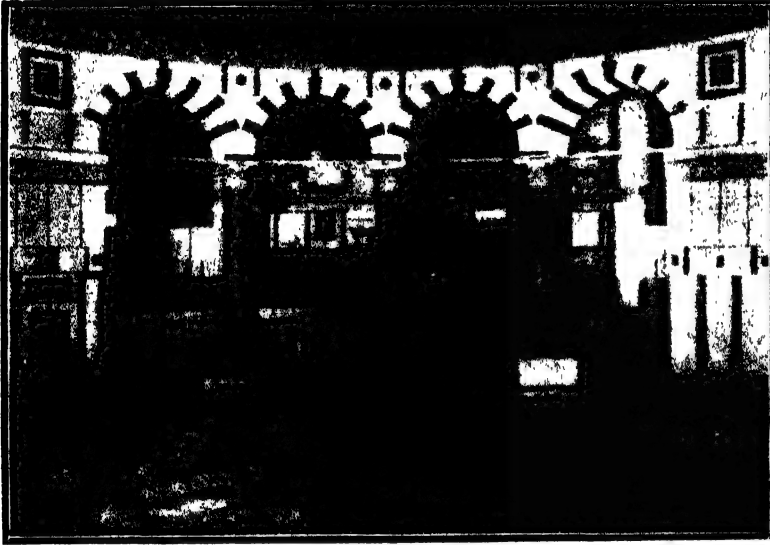
খলিফা ওমরের মস্‌জিদের দৃশ্য

প্রতি বৎসর প্রায় ৩০,০০০,০০০ টাকার (২,০০০,০০০ পাউণ্ড) কমলা প্যালেষ্টাইন হইতে রপ্তানী হয়। বিদেশ হইতে এখানে আমদানী হয় চাউল, চিনি, পেট্রোলিয়ম এবং তুলা।

সহর

প্যালেষ্টাইনের দিন দিন যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি হইতেছে, তেমনি এদেশের সহরগুলিও সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিতেছে। এই সমুদয় সহরের সহিত রেলপথের যোগ হওয়ায় লোক চলাচলের ও ব্যবসা বাণিজ্যের দিক্ দিয়াও দিন দিন উন্নতি হইতেছে। জুডিয়ার উচ্চতম প্রদেশে অবস্থিত নাব্লুস (Nablus), জেরুজেলেম (Jerusalem), বেথেল্ (Bethel) এবং হেব্রন (Hebron) সহর প্রসিদ্ধ। জেরুজেলেম সর্ব্বপ্রসিদ্ধ নগর। অতীত ও বর্ত্তমানের নানা কীর্ত্তিযুক্ত জেরুজেলেম—খৃষ্টানদের কাছে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানরূপেও পরিচিত।

নানাকথা

প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীদের প্রধান হইতেছে—মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টান। এই তিন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদেরই এই দেশের উপর জন্মগত অধিকার আছে। খৃষ্টানদের কাছে প্যালেষ্টাইন পবিত্র ভূমি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কেননা এই দেশেই মহাপুরুষ যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই দেশেই ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন এবং এই পুণ্য ভূমিতেই শত-বেদনা ও নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া তিনি মহা-প্রয়াণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই খৃষ্টানরা তাঁহাদের ধর্ম্মগুরুর জন্মভূমি এই দেশকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন।

ইহুদীরা মনে করেন, এই দেশের উপর তাঁহাদের দাবীটা ইতিহাসের দিক দিয়া সকলের চেয়ে বেশী। তাঁহারা মনে করেন, আব্রাহাম, ইসাক, য়েকব এদেশেই জন্মিয়াছিলেন এবং এদেশের মাটিতেই মিশিয়া গিয়াছেন। হিব্রনের মস্‌জিদের নীচে তাঁহাদের সমাধি আছে। আজকালকার অনেক ঐতিহাসিকের মতে ইহুদীদের একথা সত্য নহে - তাহাদের আদি জন্মভূমি মেসোপটামিয়া বা মিশরে ছিল বলিয়াই মনে করেন—প্যালেষ্টাইনে নহে। আরবেরা এবং ইহুদীরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা উভয়েই বাবা আব্রাহামের (Abraham) বংশধর। ওমরের মস্‌জিদ নামে যে মস্‌জিদটি অবস্থিত আছে, সেটি মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদী তিন জাতির কাছেই পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

প্যালেষ্টাইনে অনেক কিছু দেখিবার আছে। মহাত্মা যীশুখৃষ্টের জন্মস্থান—বেথলহেম্ নগরী

(BethelHem) এখনও বিদ্যমান আছে। বেথেল-হেমের অন্য নাম বেইৎ-লাম অর্থাৎ রুটির জায়গা। বহুবার বেথেলহেম্ নগরী ধ্বংস হইয়াছে—কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে পুনরায় উহার সংস্কার ও পুনর্গঠন হইয়াছে। এখানকার লোকদের বেশীর ভাগ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবনধারণ

দ্রষ্টব্য স্থান

বেথেলহেমের গির্জ্জা

করে। অনেকে তীর্থযাত্রীদের জন্য ক্রূশ, মালা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে।
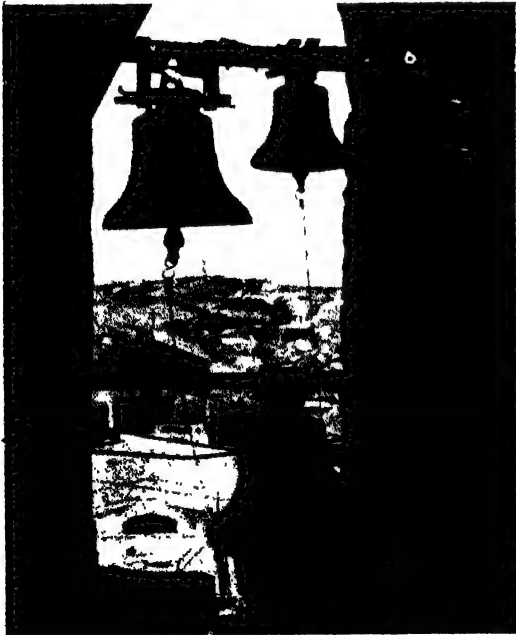
যীশুখৃষ্টের সমাধি

বেথেলহেমের যে গির্জ্জা ঘরের ছবি এখানে দেওয়া হইল,—কথিত আছে, মহাত্মা যীশু এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। এ স্থানে যাযাবর বেদুইনরাই অধিক সংখ্যায় বাস করিয়া থাকে। রাজা ডেভিড এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। ২,৫৫০ ফিট উচ্চ একটি পার্ব্বত্য উপত্যকার উপর এই নগরী প্রতিষ্ঠিত।

জাফ্ফা (Jaffa) এখানকার সামুদ্রিক বন্দর। জেরুজেলেম হইতে ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ভূমধ্য-

জাফ্ফার বাজার

সাগরের তীরে এই নগরটি অবস্থিত। জাফ্ফার প্রাচীন নাম জোপ্পা (Joffa)।

জাফ্ফা

জাফ্ফা প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ স্থান। তীর্থযাত্রীরা এই পথে জেরুজেলেমে গমন করেন বলিয়াই এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে।

বেথেলহেমের বর্ত্তমান দৃশ্য

এখানকার আশে পাশে অনেক কমলার বাগান আছে। জাফ্ফার কমলা খুব উৎকৃষ্ট।

গ্যালিলি সাগরের তীরে তেল্‌হামের (Tel-Hum) ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, প্রাচীনকালের কেপারনৌম (Capernaum) নগর এখানেই ছিল। সাদা চূণা পাথরের তৈয়ারী দুইটি বৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

তেলহাম

গ্যালিলি সাগরের দৃশ্য

এই ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া মনে হয়, এখানে ইহুদীদের কোনও ধর্ম্ম-মন্দির (Synagogue) ছিল।

মারসাবা (Marsaba)-র নির্জ্জন বিহারটি দেখিবার মত বটে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কয়েকজন ধর্ম্মযাজক মরুসাগরের কাছাকাছি এই মঠটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানে অনেক ধন-সম্পত্তি আছে বলিয়া বহুবার এই মঠ নানা জনে লুণ্ঠন করিয়াছে।

রাম্‌লে (Ramleh) নামক স্থানে এক স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে সকল খৃষ্টান এক সময়ে ধর্ম্মযুদ্ধ (Crusade) করিয়াছিলেন, হয়ত তাঁহাদের কেহ এইটিকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

একার উপসাগরের তীরবর্ত্তী বন্দরের শোভাও অতি চমৎকার।

কার্ম্মেল পাহাড়ের নীচে মহাপুরুষ এলিজার বাসস্থান ছিল। এখন সেখানে কৃষিকার্য্য চলিতেছে। অদূরে একার উপসাগরের তীরে হাইদান নগরীর শোভা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। সূর্য্য-কিরণে প্রতিফলিত সমুদ্রের নীল জলে সাদা সাদা বাড়ীগুলির ছায়া অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়।

সেবাস্‌তিয়ে (Sebastiyeh) নামক স্থানের পাহাড়ের উপর রোমকযুগের প্যালেষ্টাইনের শাসন-কর্ত্তা হিরোডের তৈয়ারী রাজপথ, অট্টালিকা, স্তম্ভ এবং প্রস্তর-প্রাচীরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্যালিলি সাগর ও ভূমধ্য সাগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এস শিখ্ (EsSikh) নামক পাহাড়ের উপর পুরাকালের নাজারেথ্ (Nazareth) নগরী অবস্থিত। আরবেরা এই সহরের নাম দিয়াছেন, — এন-নাশিরা (En-Nasira)। মহাপুরুষ যীশু এই নাজেরেথ্ নগরেই তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখানেই তিনি ইহুদীদের ধর্ম্মমন্দিরে যাইয়া সেখানকার যাজকদের সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। সেই প্রাচীন নাজারেথ্ সহরের সামান্য অস্তিত্বও এখন আর নাই। পুরানো সহর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার বুকে নূতন সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। চারিদিকের পাহাড়ের উপর হইতে নাজারেথের
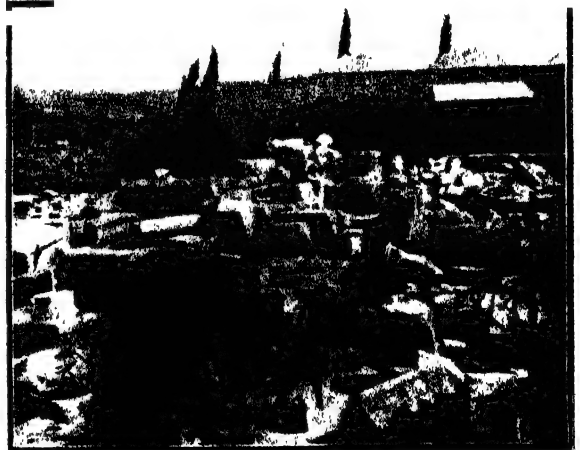
তেল্‌হামের ইহুদীদের প্রাচীন ধর্ম্ম-মন্দির

সৌন্দর্য্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এথানে প্রায় ১০,০০০ খৃষ্টান বাস করেন। তাঁহাদের অধিকাংশই

রাজা হিরোডের প্রাচীন কীর্ত্তি

নাজারেথ্‌ সহর

এখন কৃষিকার্য্য ও ফলের বাগান করিয়া আপনাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

জেরুজেলেম খৃষ্টানদের পবিত্রতম তীর্থ। জেরুজালেমের সহিত খৃষ্টান জগতের অনেক প্রাচীন স্মৃতি জড়াইয়া আছে। একটি পাহাড়ের উপর সহরটী অবস্থিত। বর্ত্তমানে সেকালের পুরাতন সহর নূতন

প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীরা যুগে যুগে নানা রাজার শাসনকালে নানারূপ অত্যাচার ও নির্যাতন সহিয়া আসিয়াছে। ইংরাজ-শাসনে আসিয়া নানাদিক্ দিয়াই প্যালেষ্টাইনের উন্নতি হইতেছে। মরুভূমির বুকে শ্রীশালী নগর নির্ম্মিত হইতেছে—ফুলে ফলে-ভরা

র‍্যামলের প্রাচীন স্তম্ভ

তরুশ্রেণী শোভা পাইতেছে। জর্দ্দন নদীর জল-স্রোতের দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। মরুসাগরের জলের খনিজ দ্রব্যে দেশ সম্পদশালী হইয়াছে। শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে একতা বৃদ্ধি পাইয়া এদেশ দিন দিন উন্নত হইতেছে।

ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে খৃষ্টানেরা তীর্থযাত্রা করিতে আসেন। এখানে খৃষ্টের সমাধি-মন্দির দেখিতে নানাদেশের খৃষ্টানেরা আসিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সমাধি-মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার একজন মুসলমানের হাতে। সকালবেলা সমাধি-ভবনের দ্বার খুলিয়া দেওয়া এবং সন্ধ্যার সময় দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে এই রক্ষকের কাজ। এখানে তিনটি বড় বড় ঘণ্টা আছে। ঘণ্টা তিনটি বেশ পুরানো। এই মন্দির হইতে জেরুজেলেমের বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থান, খলিফা ওমরের নির্ম্মিত মস্‌জিদ ও অলিভ পাহাড় (Mount of Olives) দেখা যায়। মোরিয়া (Mount Moriah) পাহাড়ের গায়ে খলিফা ওমরের নির্ম্মিত মস্‌জিদটি অবস্থিত। প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ

জেরুজেলেম

ওমরের মস্‌জিদ

মরুসাগরের তীরের মঠ

কেহ বলেন যে, ইহা সপ্তম শতাব্দীতে তৈয়ারী হইয়াছিল। কারুকার্য্যখচিত মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত এই মস্‌জিদটি জেরুজেলেমের একটি দ্রষ্টব্য স্থান।

জেরুজেলেমে ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান—এই তিন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদেরই নানারূপ কীর্ত্তি ও তীর্থস্থান আছে।

দেহের পুষ্টি—খাদ্য ও পরিপাক

মানুষের জীবনে শুধু নয় — প্রাণীজগতেও দেখিতে পাইবে, সর্ব্বদাই একটা পরিবর্ত্তন চলিতেছে। বড় বড় সহরের কথাই বল, আর ছোট ছোট গ্রামের কথাই বল, যেখানে মানুষ বাস করিতেছে, সেখানেই জীবন ও মৃত্যুর লীলা-খেলা চলিতেছে। প্রতিদিনই কাহারও মৃত্যু হইতেছে, আবার কাহারও বা জন্ম হইতেছে। বড় বড় সহরের জন্ম মৃত্যু তালিকা সংবাদ-পত্রে বাহির হয়। ঐ তালিকা হইতে তোমরা জানিতে পারিবে, এক একটি বড় সহরে প্রতিদিন কত লোকের জন্ম হয় এবং কত লোকের মৃত্যু হয়। এই জীবন-মরণের লীলাখেলা লইয়াই পৃথিবী চলিতেছে। যখন কোনও জাতির লোকসংখ্যা মৃত্যু-হারের সহিত তুলনায় বাড়িতে থাকে, তখন সে জাতি জনবলে বলীয়ান্ হইয়াছে, এমন কথা বলা চলে। জাতি বা সমাজের পক্ষে যেমন একথা খাটে, তেমনি আমাদের শরীরের পক্ষেও একথা খাটে। তোমরা জান যে, আমাদের শরীর-চালনার জন্য আমাদের শরীরের মাংস ক্রমাগত ক্ষয় পাইতেছে। প্রতিদিন হাজার হাজার কোষ (Cells) ধ্বংস হয়, আবার জীবিত দেহের মধ্যে হাজার হাজার কোষ জন্ম লাভ করে। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইও না, কিন্তু অতি সত্য কথা যে, প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের শরীরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ রক্তকোষ (Blood Cells) মরিয়া যায়। যদি পুনরায় শরীরের মধ্যে নুতন রক্ত কোষের সৃষ্টি না হইত তাহা হইলে শরীরের অবস্থা কি হইত, বল ত? যে সব কোষ মরিয়া যায়, সেখানে যদি নূতন কোষের উদ্ভব না হইত, তাহা হইলে 'জীবন' বলিয়া কিছুই থাকিত না। শিশু এবং জীবজন্তুর ক্ষুদ্র শাবকের পক্ষে এই রক্ত-কোষের বৃদ্ধি হওয়াই যে চাই, নতুবা তাহাদের বৃদ্ধি হইত কিরূপে?
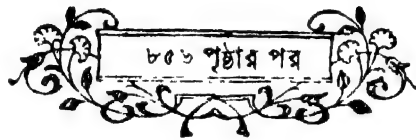
প্রাণীমাত্রেরই দেহ বাড়িয়া থাকে। নির্জীব পদার্থ —যেমন পাহাড়, সে কি কখনও প্রাণীর ন্যায় দিন দিন একটু একটু করিয়া বাড়িতে পারে? পারে না। তবে নানারূপ জড়বস্তুর সম্মেলনে তাহার আকার বাড়ে। জীবজগতে—তরুলতা বল অথবা প্রাণীই বল, দেহের পুষ্টিজনক খাদ্য-সামগ্রী দ্বারা দেহ বৃদ্ধি পায়। সেই অতি ছোট মায়ের কোলের শিশুটি জন্মের সময় হইতে মাতৃস্তন্য পান করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ নানারূপ খাদ্যের পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে।

আমাদের দেহের মধ্যে যে সকল সজীব কোষ আছে, তাহারা বাঁচিবার জন্য খাদ্য চায়। ক্ষুধা দ্বারা তাহাদের সেই ইচ্ছা প্রকাশ পায়। যখন আমাদের ক্ষুধা পায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, আমাদের শরীরের মধ্যে যে কোষ আছে তাহার খাদ্যের প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদের এই শরীরটাকে একটা ঘর বা কলের (Machine) সহিত তুলনা করিতে পার। কল চলিতে চলিতে ক্ষয় পায়, বিকল হয়। একটি বাড়ীও চিরদিন একভাবে থাকে না। তাহাকে খাড়া রাখিতে হইলে আমাদের কি করিতে হয়?

আজ একটু ছাউনি দেই, কাল একটা ফাটা দেয়ালের খসা ইটখানির জায়গায় অন্য একখানি ইট বসাইয়া দেই, চূণকাম করি ; তবে ত উহার সুঠামটি বজায় থাকে। তেমনি আমাদের শরীর রক্ষার জন্য, শরীরের বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন ঐরূপ মেরামতি কাজটা চালাইতে হয়। আমাদের শরীরের এই যে গঠন ক্রিয়া, তাহা প্রতিদিন চলিতেছে এবং আমরা যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন এই গঠন-ক্রিয়া চলিতেই থাকিবে।

জীবিত মানুষের শরীরে তাপ থাকে। শীতকালই হউক বা গ্রীষ্মকালই হউক, সাধারণতঃ মানুষের দেহের তাপের পরিমাণ প্রায় ১০০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত থাকে। কয়লা, কাঠ বা তেলের সাহায্য ব্যতীত যেমন আগুন জ্বলে না বা তাপ জন্মে না, তেমনি আমাদের দেহের ভিতরকার আগুনকে জ্বালাইয়া না রাখিতে পারিলে আমাদের শরীরই বা উত্তপ্ত থাকিবে কিরূপে ? শরীরের এই তাপ বজায় রাখিতে হইলে দেহের ভিতরকার আগুনকে প্রজ্বলিত রাখিতে হইবে। কাঠ ও কয়লার মত সেখানেও এমন কিছু জিনিষের জোগান দেওয়ার দরকার, যাহাতে দেহের আগুন প্রতিনিয়ত জ্বলিতে পারে। আমাদের দেহের এই যে আগুন, তাহার তাপের পরিমাণ জান ? আমাদের শরীরের তাপ অনায়াসে চব্বিশ ঘণ্টায় সাত গ্যালন বরফ-জলকে ফুটাইতে পারে। বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সাহায্যে এই দহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

আমাদের শরীর ক্ষয় পাইবার অন্য কারণ হইতেছে শ্রম করা। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমেও আমাদের শরীর ক্ষয় পায়। একটা রেলগাড়ীর এঞ্জিনের সঙ্গে এ বিষয়টার তুলনা করা যাইতে পারে। এঞ্জিনের ভিতর কয়লা জ্বালাইয়া জল ফুটাইয়া বাষ্প তৈয়ারী করিতে হয়, অবশেষে সেই বাষ্পের জোরে এঞ্জিন চলিয়া থাকে। বাষ্প হইতেছে এঞ্জিনের শক্তি। সেইরূপ আমাদের শরীরের ভিতরকার কোষগুলি (cells) খাদ্য হইতে তাহাদের শক্তি পায়। আমরা এই যে চলাফেরা করি, কাজ-কর্ম্ম করি, এই শক্তি কোথা হইতে পাই ? পাই পুষ্টিকর খাদ্যের সাহায্যে। কাজেই, আমাদের দৈহিক শক্তির মূল সূত্র হইতেছে, খাদ্য। এই জন্যই চিকিৎসকেরা বলেন—The body has only one source of energy. That is food. যে যত শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহার তত বেশী খাদ্যের আবশ্যক হয়। ভাবিয়া দেখ, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের দেহকোষ কত কাজ করিতেছে।

আমাদের হৃদ্‌পিণ্ড (Heart) দিনরাত্রি অনবরত চাপ দিয়া শরীরের প্রত্যেক অংশে রক্ত চালনা করিতেছে। ফুস্‌ফুস্ (Lungs) এবং মাংসপেশীও (Muscle) তাহার কাজ করিয়া যাইতেছে। এই যে কার্য্য, ইহার মূলে অর্থাৎ দেহের বিবিধ যন্ত্রকে পরিচালিত করিয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার মূলে একমাত্র খাদ্যই হইতেছে মূল উপাদান।

এখন আমরা দেখিতে পাইলাম, খাদ্যের সাহায্যে আমাদের দেহের পুষ্টি হয়। খাদ্যের দ্বারাই আমাদের দেহের প্রত্যেকটি শিরা, উপশিরা, হাড়, মাংসপেশী, রক্ত, মস্তিষ্ক—এক কথায়, দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে।

আমাদের শরীর কি কি উপাদানে গঠিত, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম। একজন মানুষের দৈহিক ওজন ১৫০ পাউণ্ড হইলে তাহার শরীরে কোন্ কোন্ উপাদান কি কি পরিমাণে থাকে, তাহা দেখ।

উপাদান	পরিমাণ
অক্সিজেন (Oxygen)	৯৭.৫ পাউণ্ড
কার্ব্বন (Carbon)	২৭.০ ”
হাইড্রোজেন (Hydrogen)	১৫.০ ”
নাইট্রোজেন (Nitrogen)	৪.৫ ”
কেলসিয়ম (Calcium)	৩.০ ”
ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus)	১.৫ ”
পটাশিয়াম (Potassium)	.৫ ”
সালফার (Sulphur)	৪ ”
ক্লোরিন্ (Chlorine)	.২ ”
সোডিয়ম (Sodium)	.২ ”
মেগ্‌নিসিয়াম (Magnesium)	১.২ আউন্স
আয়রণ (Iron)	.১ ”
ফ্লোরিন্ (Fluorine)	সামান্য পরিমাণ
সিলিকন্ (Silicon)	”

তোমরা একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার, এই সব উপাদান আমরা কোথা হইতে পাই ? এই পৃথিবীর মাটি, বাতাস ও জল হইতেই আমাদের দেহ গড়িয়া তুলিবার এই সব উপাদান আমরা পাইয়া থাকি।

এখন আমরা কি খাইয়া বাঁচি এবং কিরূপ খাদ্য আমাদের শরীরের কিরূপ পুষ্টিসাধন করে, সে বিষয়ে তোমরা 'খাদ্য শস্য' পড়িয়া (শিশু-ভারতী) জানিতে

পারিতেছ। কিন্তু এখন আমরা কি ভাবে খাই, কি ভাবে খাদ্যদ্রব্য শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের দেহের পুষ্টিসাধন করে, তাহাই বলিব।

আমরা যে সব খাদ্য গ্রহণ করি, তাহার অধিকাংশই কঠিন (Solid) পদার্থ। কঠিন খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীর রক্তনালীর আবরণ দিয়া রক্তের সহিত মিশিতে পারে না; খুব তরল হইলে তবে মিশিতে পারে। আমরা যে সকল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি, সে সমুদয় পাকস্থলীতে যাইয়া প্রথম খাদ্য হইতে শরীর গঠনোপযোগী বা পুষ্টিকর সামগ্রী, অপুষ্টিকর সামগ্রী হইতে পৃথক হয়, তাহার পর উহা তরল আকার ধারণ করে। তরলাকার ধারণ করিবার পর উহা পাকস্থলীতে সেই চুলের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তনালীর রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহাকেই সহজ কথায় আমরা পরিপাক ক্রিয়া (Digestion) বলি।

এই পরিপাক কার্য্য মুখ হইতে আরম্ভ হয়। দাঁত যাঁতার কাজ করে। দাঁত জিহ্বার সাহায্যে খাদ্যদ্রব্যকে চূর্ণ করে। সেই চূর্ণের সহিত মুখের লালা (Saliva) মিশিয়া খাদ্য নরম ও তরল হইয়া থাকে। মুখেরভিতর ছয়টি লালার থোলে আছে। উহার ভিতর হইতে
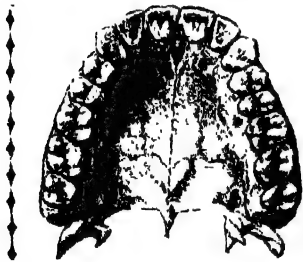
দাঁত—উপরের পাটি কুকুর দাঁত—খণ্ডিত

সর্ব্বদা লালা বাহির হইয়া আমাদের মুখের ভিতরকে সিক্ত রাখে। যেমন তুমি খাদ্যদ্রব্য মুখে দিলে, অমনি অনেকটা লালা বাহির হইয়া আসে।

জিহ্বা কি কাজ করে, বল ত? জিহ্বা খাদ্যদ্রব্যকে দাঁতের নীচে লইয়া যায় এবং তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ হইলে মুখের পশ্চাতের ছিদ্র দিয়া পাকস্থলীর দিকে ঠেলিয়া দেয়। দাঁত এবং জিহ্বার সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ হইলে তাহার সহিত লালা মিশ্রিত হইয়া খাদ্যের কতক অংশ তরল হয়। লালা, ভাত, রুটি, আলু প্রভৃতির অধিকাংশকেই তরল করিতে পারে, কিন্তু মাছ, মাংস, ডাল, ঘৃত, মাখন প্রভৃতি পদার্থকে প্রায় তরল করিতে পারে না। তোমরা ভাত, রুটি, আলু খাইলে তাহা বেশীর ভাগ মুখের মধ্যেই তরল হইয়া যায়। এইঅবস্থায় মুখের মধ্যে যে সূক্ষ্মসূক্ষ্ম রক্ত নালী আছে, তাহারা তাহার যতটা পারে চুষিয়া লয়।

মুখ-গহ্বরের পশ্চাতে নয় ইঞ্চি লম্বা একটি নল দিয়া খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। এই নলীর
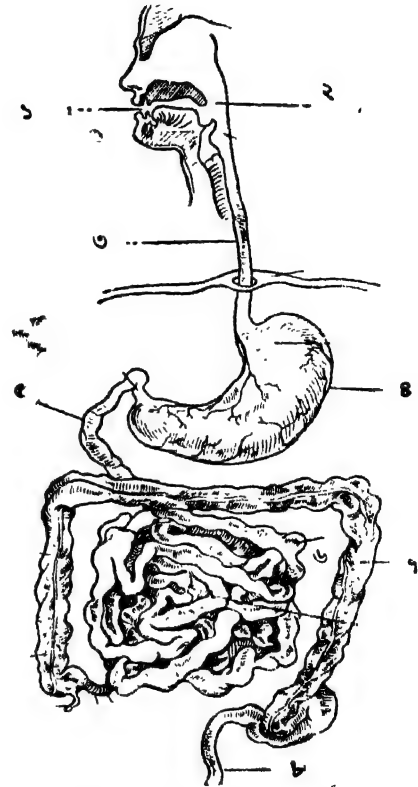
মুখগহ্বর হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত

(১) মুখগহ্বর (২) আলজিব (৩) গলনালী (৪) পাকস্থলী (৫) ক্লোম যন্ত্র (৬) ক্ষুদ্র অন্ত্র বা পক্বাশয় (৭) বৃহৎ অন্ত্র (৮) মলনালী।

নাম খাদ্য-নালী। তোমরা একখানি দর্পণের কাছে হাঁ কর। হাঁ করিলে দেখিতে পাইবে, মুখের সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটি ছিদ্র আছে। সম্মুখের ছিদ্রটি ছোট এবং পশ্চাতের ছিদ্রটি বড়। ছোট ছিদ্রটি হইতেছে শ্বাসনালীর দ্বার, আর বড় ছিদ্রটি হইতেছে

খাদ্যনালীর দ্বার। এই ছুইটি ছিদ্র কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও খাদ্য, খাদ্যনালীর দ্বার দিয়াই যায় এবং কখনও শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে না। কেন করে না? এখানেই বুঝিতে পারিবে, কি আশ্চর্য্য কৌশলে ঈশ্বর আমাদের এই দেহযন্ত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্বাসনালীর দ্বারে মাংসপেশীর একটি ছোট ঢাকনী আছে। তাহার নাম আল্‌জিব। খাদ্য যখন শ্বাসনালীর উপরদিয়া পশ্চাতে খাদ্যনালীর দিকে যায়, তখন ঐ আল্‌জিব শ্বাসনালীর ছিদ্র বন্ধ করিয়া রাখে। এই জন্যই খাদ্য শ্বাসনালীতে বা ফুসফুসে যাইতে পারে না। খাদ্য আল্‌জিবের উপর দিয়া ভিতরে চলিয়া যাইবার পর আল্‌জিব সরিয়া গিয়া আবার শ্বাসনালীর দ্বার খুলিয়া দেয়। আল্‌জিব যদি শ্বাসনালীর দ্বার বন্ধ করিয়া থাকিত, তাহা হইলে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশই করিতে পারিত না।

এখন কি ভাবে খাদ্য, খাদ্যনালীর ভিতর দিয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, তাহা বলিতেছি। খাদ্যনালী (oesophagus) কতকগুলি গোলাকার মাংসপেশী দ্বারা বেষ্টিত। যেমন খাদ্যনালীর মধ্যে খাদ্য আসে, অমনি খাদ্যনালীর প্রথম মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইয়া চাপ দিয়া খাদ্যকে নীচের দিকে ঠেলিয়া দেয়, তাহার পরে ঐরূপ দ্বিতীয় মাংসপেশীও সঙ্কুচিত

পাকস্থলী

হইয়া আবার চাপ দিয়া খাদ্যকে আর একটু নীচে ঠেলিয়া দেয়। এই ভাবে অবশেষে খাদ্য পাকস্থলীতে গিয়া পৌছে।

পাকস্থলীর (Stomach) বেশীর ভাগ ফুসফুসের নীচে বামদিকে অবস্থিত। ইহা দেখিতে একটা বড় গোলের মত। ইহাতে প্রায় দুই সের পরিমাণ জল ধরে। পাকস্থলী মাংসপেশী দিয়া নির্ম্মিত। এই মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর ন্যায় আপনা হইতেই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে।

পাকস্থলীর ভিতর দিকে সর্ব্বদা অনেকগুলি রসপূর্ণ থলি (Gland) থাকে। আমরা মুখের ভিতর কোন খাদ্য গ্রহণ করিলে যেমন লালা বাহির হইয়া মুখের মধ্যস্থিত খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়, সেইরূপ পাকস্থলীতে যখন কোন খাদ্য আসে তখন পাকস্থলীর ভিতরকার থলিগুলি হইতে রস বাহির হইয়া খাদ্য-দ্রব্যের সহিত মিশে।

খাদ্য, পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে উহার একদিকের মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইয়া চাপদিয়া খাদ্যকে অন্যদিকে পাঠাইয়া দেয়। তখন আবার অপরদিকের মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইয়া চাপ দিয়া খাদ্যকে আবার সেই প্রথম দিকে ঠেলিয়া দেয়। এই ভাবে ক্রমাগত সঞ্চালন ক্রিয়া চলিতে থাকে। এইরূপে ক্রমাগত সঞ্চালন ক্রিয়া দ্বারা খাদ্যদ্রব্য চূর্ণ হইয়া মণ্ডের মত তরল হয়। তখন দেখিতে উহার রং হয় হলুদের মত। ঘৃত, তেল, মাখন প্রভৃতি ব্যতীত ইহাদের অধিকাংশ খাদ্য
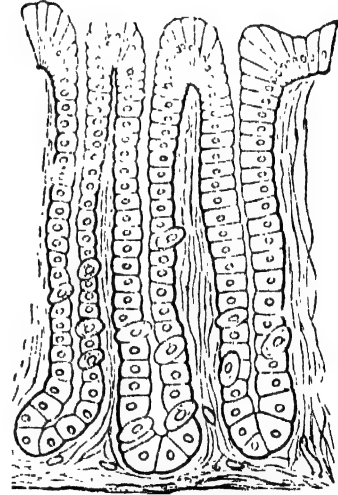
পাকস্থলীর মধ্যস্থ রসপূর্ণ থলে (Gland)

পদার্থই পাকস্থলীর রসে তরল হইয়া যায়। তরল হইবার পর পাকস্থলীর ভিতর চুলের মত যে পাতলা রক্ত-প্রণালী আছে, তাহা, উহার ভিতরকার তরল খাদ্যকে চুষিয়া লয় এবং উহা দেহের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দেয় এবং ক্ষয় প্রাপ্ত মাংসপেশীর অভাব পূর্ণ করে। পাকস্থলীর ভিতর মণ্ডের ন্যায় যে সমস্ত খাদ্যাবশিষ্ট পড়িয়া রহিল, তাহার অধিকাংশই হইতেছে

স্নেহ দ্রব্য (তৈলময় পদার্থ) এবং ভাত, রুটি, তরকারী, মাছ, মাংস ডালের কঠিন অংশ। রক্ত-নালী ইহা চুষিয়া লইতে পারে না। এজন্য ইহা পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে প্রবেশ করে। সেখানে ইহা আরও চূর্ণ হইয়া তরল হইতে থাকে।

পাকস্থলীর দক্ষিণ দিক্ হইতে অন্ত্রের (Intestine) আরম্ভ। অন্ত্র একটি প্রকাণ্ড নালী। ইহা লম্বায় প্রায় ছাব্বিশ ফুট। ইহার দুইটি ভাগ। উপরের ভাগ দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০ ফুট এবং ইহার ছিদ্রের

অন্ত্র (Intestine)

ব্যাস প্রায় ১৷৷০ ইঞ্চি পরিমাণ হইবে। আর নীচের ভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ ফুট এবং ব্যাস প্রায় তিন ইঞ্চি পরিমাণ হইয়া থাকে। অন্ত্রের উপরিভাগকে ক্ষুদ্র অন্ত্র (Small Intestine) এবং নীচের ভাগকে বৃহৎ অন্ত্র (Large Intestine) বলা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র অন্ত্রটি পাকস্থলীর নীচের দিকে কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া গিয়াছে। বৃহৎ অন্ত্রটি প্রথম উপরে পাকস্থলীর দিকে উঠিয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে; তাহার পর পাকস্থলীর নীচে দিয়া বাম দিকে যাইয়া পরে মল-দ্বারে (Rectum) আসিয়াছে। খাদ্যনালীর যেমন মাংসপেশী আছে, অন্ত্রের ভিতরেও তেমনি মাংস-পেশী আছে। ইহারা আপনা হইতেই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। অন্ত্রের মধ্যেও আবার অনেকগুলি ছোট ছোট রসপূর্ণ থলি (Gland) আছে।

যকৃৎ (Liver) পাকস্থলীর উপরে দক্ষিণদিকে অবস্থিত। ইহা দেখিতে মেটে রঙ্গের। যকৃৎ অন্ত্রের মধ্যে এক প্রকার রস ঢালিয়া দেয় এই রসের নাম পিত্তরস (Bile)। পিত্ত দ্বারা তৈল-জাতীয় খাদ্যদ্রব্যাদি আরও তরল হয়। যকৃতের এই রসের যখন প্রয়োজন হয় না, তখন উহা এক থলির মধ্যে সঞ্চিত থাকে। এই থলির নাম পিত্ত-কোষ।

পাকস্থলীর রস ও অন্ত্রের রস খাদ্যদ্রব্যাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্যের যে অংশ এই দুইটি রস দ্বারা তরল হয় না, এই অন্ত্রের রস তাহা তরল করিয়া ফেলে, অবশিষ্ট তরল অংশ ক্রমশঃ অন্ত্রের শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিতে পৌছিতে রক্তনালী সকল তাহা হইতে পুষ্টিকর সমস্ত তরল-পদার্থ চুষিয়া লয়। তখন খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ তরল থাকে না, শক্ত বা কঠিন হইয়া পড়ে। এই সকল পদার্থের মধ্যে শরীরের পুষ্টিকর কিছুই থাকে না। দুষ্পাচ্য দ্রব্য যাহা থাকে, তাহা মল দ্বার দিয়া মলের আকারে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।

খাদ্য ও পরিপাক সম্বন্ধে তোমাদের কাছে সব কথাই বলিলাম। খাদ্যের জিনিষ যদি ভাল করিয়া চিবাইয়া না খাও, তাহা হইলে উহা মুখের মধ্যে চূর্ণ না হওয়াতে উহার সহিত লালা মিশ্রিত হইতে পারে না, সুতরাং উহা ভাল করিয়া তরল হইতে পারে না। চূর্ণ ও তরল না হইয়াই খাদ্য পাকস্থলীতে যাইয়া পড়ে। পাকস্থলীকে দাঁতের কাজও করিতে হয়। পাক-স্থলী যাহা পারে না, অন্ত্রও তাহা পারে না। ফলে খাদ্যদ্রব্য খুব ভাল ভাবে চূর্ণ না হওয়ার দরুণ রক্ত-নালী তাহা হইতে পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী চুষিয়া লইতে পারে না। এইজন্য খাদ্যদ্রব্যের অধিকাংশ শরীরের কোন কার্য্যে না আসিয়া তরল অবস্থায় বাহির হইয়া যায়—এই অবস্থারই নাম "পেটের অসুখ।" কাজেই, খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চিবাইয়া না খাইলে এবং অত্যধিক আহার করিলে পেটের পীড়া জন্মে।

জল

৮৮০ পৃষ্ঠার পর

জলের চাপ

জলের উপর চাপ দিলে, তাহা তরল পদার্থের নিয়মানুবর্তিতায় চতুর্দ্দিকে সমানভাবে প্রসারিত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পিপায় জল ভরিয়া তাহার উপর একটি নল লাগাইয়া তাহাতে জল ভরিয়া দিলে, কিরূপে পিপার ভিতরের জলের চাপ বাড়িয়া উঠে, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আরও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইবে। ইহা চাপ দিবার কল। এই কলটি জলের চাপে চালান হয়। ছবিতে দেখিতে পাইবে, এই বিরাট্ কলটি, মূলে পরস্পর সংলগ্ন দুইটি পিচকারীর মত। তবে একটি, অন্যটি হইতে একশত বা দুইশত গুণ প্রস্থে অধিক। এই পিচকারী দুইটির মুখ নীচের দিকে ও পরস্পর যুক্ত থাকে ইহাদের ভিতর এমনভাবে জল রাখা হয় যে, সরু পিচকারীর ডাঁটিটি ভিতরদিকে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে, উৎপন্ন চাপের গুণে অন্যটির ডাঁটি ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

ব্রামার চাপযন্ত্র

চওড়া পিচকারীর ডাঁটিটির উপর একটি পাটাতন যুক্ত থাকে। খড়, লোম বা তুলার গাঁইট প্রভৃতি যে সব আলগা বস্তু কষিয়া ছোট করা প্রয়োজন হয়, তাহা এই যন্ত্রে পাটাতনের উপর, যন্ত্রের ছাদ পর্য্যন্ত ভরিয়া দেওয়া হয়। ছোট পিচকারীর ডাঁটিটি ভিতরে প্রবিষ্ট করাইলে, বড় পিচকারীর পাটাতন, তাহার উপর রক্ষিত তুলার বোঝাটাকে ছাদের নীচে ক্রমান্বয়ে কষিয়া ধরিতে থাকিবে। পিচকারীর ডাঁটিগুলির আপেক্ষিক প্রস্থের উপর এই চাপের পরিমাণ নির্ভর করে। এইরূপে, পাট, তুলা, কাগজ প্রভৃতির বৃহৎ বৃহৎ বোঝা এই জলযন্ত্রে ক্ষুদ্র আকারে পরিণত করা হয়। ছবিতে প্রদর্শিত জলযন্ত্রটিকে ব্রামার চাপযন্ত্র (Brahma's press) কহে।

জলে চাপ প্রয়োগে আজকাল নানাবিধ যন্ত্র চালিত হয়। বন্দরে বোঝা উঠাইবার ও নামাইবার কপিকল, কারখানার অতিকায় হাতুড়ি, আকাশচুম্বী সৌধের বিভিন্ন তলায়

ওঠানামা করিবার মাচা, বন্দরে পোতাদির প্রবেশ-নিয়ামক জল-কবাট প্রভৃতি অসংখ্য যন্ত্র, চাপতত্ত্বের কৌশলে, আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেয়।

জলের নিম্নভূমির দিকে গড়াইয়া যাওয়া তরল বস্তুর সমতলত্ব-প্রাপ্তি-প্রয়াসের নিদর্শন। ইহার বিষয়েও পূর্ব্ব প্রবন্ধে কিছু বলা হইয়াছে, ও সেই সূত্রে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উৎসেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। আরও দুই একটি উদাহরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া হইল।

জলের সমতলত্ব

একটি ছোট কাঁচের নলে জল পুরিয়া, তাহাতে মাত্র একটি বুদ্‌বুদ রাখিয়া, মুখদুইটি বন্ধকরিয়া দেওয়া হয়। এই নলটি তোমার টেবিলের উপর শোয়াইয়া রাখ। দেখিবে, যতক্ষণ না তাহা সম্পূর্ণ সমতল স্থানে রাখা হয়, বুদ্‌বুদটি কিছুতেই মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে না। যে দিকে উচ্চ, বুদ্‌বুদটি সেই দিকে ঠেলিয়া উঠে। যন্ত্রকুশলীগণ এইরূপে কোন স্থান ঠিক সমতল কি না, বা করা হইল কিনা অনায়াসে এই যন্ত্র সাহায্যে বলিয়া দেন। যেকোনও তরল পদার্থ এইরূপ যন্ত্রে ব্যবহৃত হইতে পারে, তবে সাধারণতঃ সুরাসার ব্যবহৃত হয়। ইহাকে সেইজন্য (Spirit level) বা সমতল মাপিবার যন্ত্র কহে।

সমতল যন্ত্র

স্পিরিট লেভেল বা সমতল মাপিবার যন্ত্র

জরীপের কাজে, বিভিন্নস্থানের ভূপৃষ্ঠদেশ কতউচ্চে অবস্থিত, তাহা বাহির করা হয়। এলাহাবাদ সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৪০০ ফুট, কলিকাতা ২০ ফুট, গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ ২৯,০০২। স্থানীয় জমীর কোথায় নিম্নভূমি বা কোথায় উচ্চভূমি, তাহা বাহির করাও জরীপের একটি কাজ। তোমরা জরিপের কাজ দেখিয়াছ কি? একজন লোক পরিমাপক যন্ত্র দূরে ভূমির উপর ঋজু-ভাবে ধরিয়া থাকে। অন্য একটি লোক তাহার টেবিলের উপর স্থাপিত যন্ত্রের ভিতর দিয়া তাহা পরিবীক্ষণ করে ও এইরূপে যে ভূমির উপর পরিমাপক দণ্ডটি স্থাপিত, তাহা কত উচ্চ, তাহা বাহির করিয়া ফেলে। টেবিলের উপরকার যন্ত্রটি, দুইদিকে শুঁড় তোলা কাঁচের নল। ইহাতে এমন-ভাবে জলভরা হয় যে, শুঁড় দুইটির ভিতর জল ওঠে তরল পদার্থের ধর্ম্মানুযায়ী, জল দুইটি শুঁড়ের ঠিক একই সমতলে আসিতে হয়। শুঁড়ে অবস্থিত জলের মাথা দুইটি, এক রেখায় রাখিয়া যদি পরিবীক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে দৃষ্টি রেখা সমতলভাবে চালিত হইয়া পরিমাপক দণ্ডের কোনও একটি অঙ্কের উপর পড়িবে। ধর, ইহা 'তিন ফুট' এই অঙ্কের উপর পড়িল। শুঁড়ে অবস্থিত জলের মাথা, স্থানীয় ভূমি হইতে, ধর পাঁচ ফুট উচ্চে আছে। তাহা হইলে দণ্ডটি দুই ফুট উচ্চ ভূমিতে নিশ্চয় স্থাপিত হইয়াছে।

জরীপের কাজ

জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়াছ কি? নর্ম্মদার জলে মর্ম্মর পর্ব্বতের ও যমুনার জলে তাজমহলের প্রতিবিম্ব হয়, তাহা জলের উপরিতলের নিখুঁত সমতলত্বের জন্য, এরূপ পরিষ্কার ও নিখুঁত হয়।
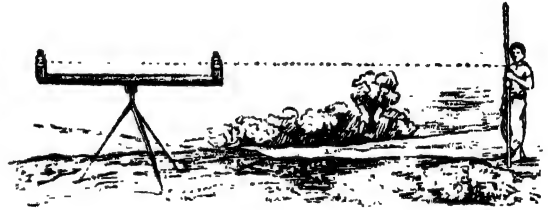
জরীপের লেভেল

তরল পদার্থের আরও কয়েকটি গুণ, এস, আমরা জলে দর্শন করি। একখণ্ড কাষ্ঠ ইহাতে ডুবাইবার চেষ্টা কর। দেখিবে, কি যেন ইহাকে উপরে ঠেলিয়া দিতেছে। ইহাও উপরিউক্ত চাপতত্ত্বের নিয়মে হয়। কাষ্ঠখণ্ডটির গাত্রের প্রত্যেক কণাটির উপর সেই স্তরের জলের যাহা চাপ, সেই চাপের ক্রিয়া চলিতে থাকে।
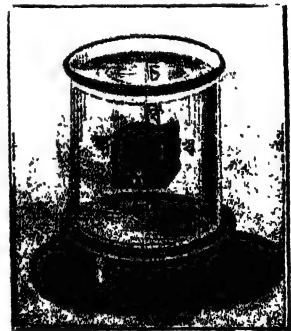
কোন জিনিষ জলে ডুবাইলে তাহার সম আয়তন জল স্থানচ্যুত হয়

কাষ্ঠখণ্ডটি যেখানে ধরা হইয়াছে, সেই স্থানে পূর্ব্বে জল ছিল, আর সেই জল তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ

জলকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। তাহা হইলে পার্শ্বস্থ জলের চাপ এই জলখণ্ডটির ওজনের সমান প্রমাণিত হইল। অর্থাৎ যে চাপ কাষ্ঠখণ্ডটিকে উপরদিকে ঠেলিয়া দিতেছে, তাহা কাষ্ঠের নিমজ্জিত আয়তনে যে জল পূর্ব্বে ছিল, তাহার ওজনের সমান।

কাষ্ঠটিকে সম্পূর্ণভাবে ডুবাইয়া ছাড়িয়া দিলেও তাহা পুনরায় ভাসিয়া উঠিবে। কারণ, তাহার নিজস্ব ওজন সেই আয়তন জলের ওজন অপেক্ষা অনেক কম। জলে যে পরিমাণ ডুবিয়া থাকিলে, তাহার নিজস্ব ওজন সেই পরিমাণ জলখণ্ডের ওজনের সমান হয়, কাষ্ঠটি মাত্র সেইপরিমাণ জলে ডুবিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে।

এখন বুঝিতে পারিতেছ কি, সোলা, কাঠ প্রভৃতি বহুবিধ বস্তু জলে কেন ভাসে, আমরা কেন জলে সাঁতার দিতে পারি বা কাষ্ঠের ভেলায় নদী পার হওয়া কিরূপে সম্ভব হয়?

জলে কাঠ ভাসিতেছে

জলে কাঠ ডুবিয়া গিয়াছে

লৌহ জল হইতে বহুগুণ ভারী; জলে ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যায়। তথাপি দবাসম্ভারপূর্ণ লৌহ-পোত জলের উপর কিরূপ অবলীল গতিতে ভাসিয়া চলে। কেন, বলিতে পার? নৌকার বা জাহাজের তলদেশ খোলের মত হওয়ায়, ইহা যতখানি জল সরাইয়া ফেলে তাহার ওজন জাহাজ ও তৎস্থিত

লাইফ বেল্ট ও অলাবুর সাহায্যে সাঁতার দিতেছে

দ্রব্যাদি হইতে যতক্ষণ বেশী থাকে, পোতখানি ততক্ষণ ভাসিয়া থাকিতে সমর্থ হয়। তবে বহু ভার চাপাইলে, বা ভিতরে জল প্রবেশ করিলে, অপসারিত জলখণ্ডের ওজন হইতে পোত এবং তৎস্থিত জল বা দ্রব্যাদির ওজন বেশী হইলেই ইহা ডুবিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। প্রত্যেক পোতে মাত্র এমন ভার লওয়া হয়, যাহাতে তাহার নিরাপদ অবস্থা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়। পোত ব্যবহারের পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া তাহার গাত্রে একটি রেখা অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়। পরে যাহাতে এই রেখাটি জলের উপর জাগিয়া থাকে, মাত্র এইরূপ ভারই পোতে লওয়া হয়।

জল অপেক্ষা হাল্কা বা ফাঁপা বস্তু কিরূপে, তাহার সাহায্যে, অন্যান্য বস্তুকে ভাসাইয়া রাখিতে পারে, তাহার উদাহরণে কাঠের ভেলা, অলাবুর খোল, বয়া, জীবনরক্ষক কটিবন্ধ (life belt) প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যের নাম করা যাইতে পারে। অলাবুর খোলের

জলে সাঁতার দিতেছে

সাহায্যে নূতন সন্তরণকারী সন্তরণ অভ্যাস করে। জাহাজ-ডুবিতে জীবনরক্ষক মেথলাধারী জলের উপর ভাসিয়া থাকিতে সমর্থ হয়।

নিমজ্জিত জাহাজ একটি সুন্দর কৌশলে উদ্ধার করা হয়। বড় বড় অনেকগুলি বয়াতে জল ভরিয়া ডুবাইয়া নিমজ্জিত জাহাজটির সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। পরে নিষ্কাশন যন্ত্রে তাহাদিগকে ভিতরকার জল বাহির করিয়া দিতে থাকিলে, তাহা যেমন যেমন উপরে ভাসিয়া উঠিতে থাকে, নিমজ্জিত জাহাজখানিকেও টানিয়া উপরে তুলিতে থাকে।

মাছেরাও তাহাদের ফুসফুস ফুলাইয়া জলে ভাসিয়া উঠে। মানুষের শরীর তাহার ভিতরকার খোল ইত্যাদি লইয়া মোটের উপর জল হইতে কিছু হাল্কা। পেট হাল্কা মাথা ভারি বলিয়া আমরা সন্তরণ চেষ্টায় ওলোট পালট খাই ও সেই ওলোট পালটে পেটে জল প্রবিষ্ট হইয়া ডুবিয়া যাই এবং দম বন্ধ হইয়া মারা যাই। সেইজন্য দেহ ভাসাইয়া রাখিতে হইলে ঠিকমত প্রক্রিয়াটি আমাদের শিখিয়া অভ্যাস করিতে হয়।

ডুবো জাহাজ তোলা হইতেছে

লবণাক্ত জলে আমরা অপেক্ষাকৃত সহজে সাঁতার দিতে পারি; কারণ, ঐরূপ জলের তুলনায় আমাদের শরীর অপেক্ষাকৃত লঘুভার।

একখণ্ড নিরেট স্বর্ণ সেই আয়তনের জল হইতে ১৯·৩৬ গুণ ভারী। একখণ্ড নিরেট রৌপ্য ১৩·৪৭ গুণ, লৌহ ৭·৭৮ গুণ ও প্রস্তর প্রায় ২·৮ গুণ ভারী।

আপেক্ষিক গুরুত্ব

উপরিউক্ত অঙ্কগুলিকে ঘনত্বমাপক অঙ্ক বা আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) বলি। বস্তুর ঘনত্ব বুঝাইতে আমরা সাধারণতঃ উপরিউক্তভাবে, সেই আয়তনের জল হইতে, তাহা কয় গুণ ভারী, তাহাই নির্দ্দেশ করি। ইহা বাহির করিবার বহু প্রণালী আছে, কয়েকটি এখানে বিবৃত হইবে।

আমরা এইমাত্র শিখিয়াছি যে, নিমজ্জিত বস্তুকে, তাহার নিজের আয়তনের জলের ওজন, উপরদিকে ঠেলিয়া দেয়। তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হইল যে, কোনও বস্তুকে জলে নিমজ্জিত অবস্থায় ওজন করিলে, তাহার তৎকালীন ওজন, বাস্তব ওজন হইতে কম পাওয়া যাইবে। এই ন্যূনতা সেই আয়তনের জলের ওজনের সমান, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। এখন বস্তুটির বাস্তব ওজন এই ন্যূনতার কয় গুণ ইহা বাহির করিলেই, আমরা বস্তুটির আপেক্ষিক গুরুত্ব পাইলাম।

স্বর্ণের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯.৩৬। ধর তোমাকে একখণ্ড স্বর্ণবৎ পদার্থ দেওয়া হইল।
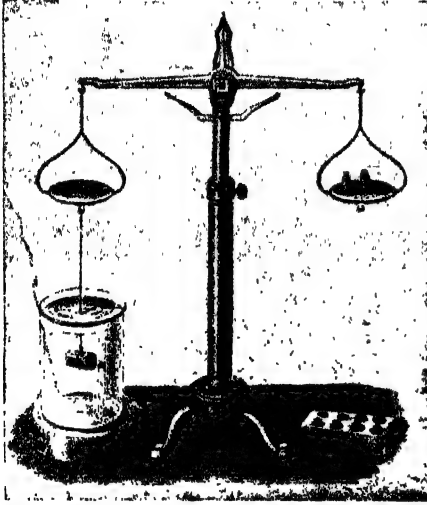
আপেক্ষিক গুরুত্ব বাহির করিবার প্রক্রিয়া

বস্তুটি নিরেট হইলে, তুমি ইহা স্বর্ণ কি না, এখন অনায়াসেই বলিয়া দিতে পারিবে। তাহার বাস্তব ওজন ও তাহার জলে নিমজ্জিত ওজন বাহির কর ও তাহা হইতে বাস্তব ওজন ন্যূনতার কয় গুণ বেশী, তাহা দেখ। যদি উহা উপরিউক্ত ১৯.৩৬ গুণ না হয়, তাহা হইলে, ঐ পদার্থটি কখনই খাঁটি স্বর্ণ হইতে পারে না। দেখ কেমন সহজে বস্তুটি নষ্ট না করিয়া, তুমি ইহা স্বর্ণ কি না বলিয়া দিতে পারিলে। এই প্রক্রিয়াটি মনীষী আর্কিমিডিসের (Archimedes) আবিষ্কৃত। ইনি খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে গ্রীসদেশে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। সেই দেশের সম্রাটের একটি সুন্দর মুকুট ছিল। তাহা সত্যই খাঁটি স্বর্ণের কি না, তাহা মুকুটটিকে না ভাঙ্গিয়া, মাত্র বুদ্ধি বা কৌশলে বাহির করিতে আর্কিমিডিস সম্রাট্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন। মহাসমস্যার বিষয়। কিছুদিন আর্কিমিডিস কোনও উপায় বাহির করিতে পারিলেন না। একদিন তিনি স্নানের নিমিত্ত গৃহস্থিত চৌবাচ্চায় অবগাহন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল জলের

আর্কিমিডিস্ চৌবাচ্চায় নামিতেছেন

ভিতর তাঁহার শরীর লঘুভার হইয়া গিয়াছে। এই আবিষ্কারে তাঁহার সমস্যা সমাধানের উপায় হইয়া গেল। কথিত আছে, আনন্দে আত্মহারা হইয়া, বিবস্ত্রাবস্থায়, পথে পথে "পাইয়াছি পাইয়াছি" বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাহা বাহির করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। তাঁহার নামের গৌরবে ইহা আর্কিমিডিসের তত্ত্ব বলিয়া খ্যাত হয়।

আরও অনেক প্রকারে আপেক্ষিক গুরুত্ব বাহির করা যায়। এখানে আর একটি উপায়ের বিবরণ দেওয়া গেল। একটি কাচের মাপিবার পাত্রে কোনও একটি দাগ পর্য্যন্ত জল ভরিয়া তাহাতে ঘন

বস্তুটি ডুবাইয়া দাও। বস্তুটি যেন বেশ ডুবিতে পারে এবং আধারটি হইতে জল যেন বাহির হইয়া না আসে। জল এখন উচ্চাঙ্কের কোনও দাগে আসিয়া দাঁড়াইবে। এই দুইটি দাগের অঙ্ক হইতে পদার্থের আয়তন বাহির হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এক ঘন সেণ্টিমিটার জলের ওজন এক গ্র্যাম। তাহা বাহির হইল। এখন, পদার্থের নিজস্ব ওজনকে সেই আয়তনের জলের ওজন দিয়া ভাগ দিলেই তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বাহির হইবে।

তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব।

ঘন পদার্থের ন্যায় তরল পদার্থগুলিরও, আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণে, জলের সহিত তুলনা করা হয়। অর্থাৎ জলের গুরুত্ব "এক" ধরিয়া ঘন ও তরল পদার্থ সমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাহির করা হয়। ইহারও বহুবিধ উপায় প্রচলিত আছে; দুই একটি প্রক্রিয়া এখানে বিবৃত হইল।

একটি কাচের মাপিবার পাত্রে কোনও একটি দাগ পর্য্যন্ত জল ভরিয়া সেই জলের ওজন বাহির কর। পরে, তাহাতে, সেই দাগ পর্য্যন্ত অন্য তরল পদার্থটি ভরিয়া তাহার ওজন বাহির কর। একই আয়তনের জল ও তরলপদার্থের ওজন এইরূপে জানা যাইবে। এইবার, তরল পদার্থের ওজনকে, জলের ওজন দিয়া ভাগ দিলে, তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাহির হইবে। এইরূপ মাপিবার পাত্রের একটা ছবি পার্শ্বে দেওয়া হইল। ইহাকে Specific Gravity bottle বলে।

আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপক বোতল

তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাহির করিতে, চিত্রে যে যন্ত্রটি দেওয়া গেল, তাহা প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। ইহার নিম্নাঙ্গ ফাঁপা, চোঙ্গের মত ও তলা প্রয়োজনানুযায়ী ভারী বলিয়া, ইহা তরল পদার্থে দণ্ডায়মান অবস্থায় ভাসিতে সমর্থ হয়। এই অবস্থায় ইহার নিম্নাঙ্গ ও ডাঁটিটির কতক অংশ, অর্থাৎ ডাঁটির গাত্রে লিখিত বিভিন্ন অঙ্ক পর্য্যন্ত, বিভিন্ন তরল পদার্থে ডুবিয়া থাকে। যাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব জানা আছে এইরূপ কয়েকটি তরল পদার্থে এই যন্ত্রটি ভাসাইয়া, ডাঁটিটির নিমজ্জিত বিভিন্নাংশ চিহ্নিত করা হয় ও এইগুলি হইতে সমস্ত ডাঁটিটির উপর বিভিন্ন আপেক্ষিক গুরুত্বের অঙ্ক লিখিয়া দেওয়া হয়। কোনও তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাহির করিতে হইলে, সেই পদার্থে এইরূপ একটি যন্ত্র ছাড়িয়া দিলে ডাঁটিটি যে দাগ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত হইবে, দাগের সেই অঙ্কটি, আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিমাণ। এই যন্ত্রের নাম হাইড্রোমিটার।

হাইড্রোমিটার

দুগ্ধ একটি একক পদার্থ না হইলেও তাহার একটি মোটামুটি আপেক্ষিক গুরুত্ব আছে। এইরূপ যন্ত্রযোগে যদি কোনও দুধের নমুনার আপেক্ষিক গুরুত্ব কম পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই দুধটি যে জলমিশ্রিত, তাহা বলা হয়। তবে দুধ নিজে জল প্রভৃতি বস্তুনিচয়ের মিশ্রণ বলিয়া, বিভিন্ন গাভীর বা বিভিন্ন সময়ের দুধের আপেক্ষিক গুরুত্বের সুনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ঠিক নাই। তাহা হইলেও, সেই মোটামুটি পরিমাণ হইতে অত্যধিক তফাৎ হইলে, তাহাতে জল মিশান হইয়াছে, বলিতেই হইবে। দুগ্ধ পরীক্ষার যন্ত্রকে ল্যাক্টোমিটার (Lactometer) বলে। দুধের মোটামুটি আপেক্ষিক গুরুত্ব ১'০৩।

এস, জলের বিভিন্ন অবস্থার আলোচনা করা যাউক।
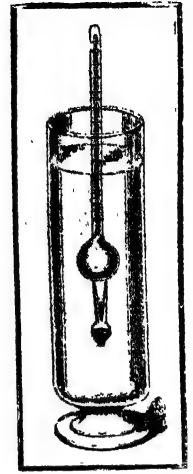
জল পদার্থটির তিনটি অবস্থার সহিত আমরা পরিচিত। প্রথম, বাষ্পীয় অবস্থা, দ্বিতীয় তরল অবস্থা যাহাকে আমরা সাধারণতঃ জল বলি ও তৃতীয় কঠিন অবস্থা, যাহাকে আমরা বরফ বলি। ক্রমেক্রমে আমরা জলের এই তিনটি অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করিব।

ধোপা কাপড় শুকাইতেছে

সকল সময়েই জলের উপরিতল হইতে বাষ্প নির্গত হইতে থাকে। উন্মুক্ত পাত্র হইতে জলের উবিয়া যাওয়া সিক্ত বস্ত্রের শুষ্ক হইয়া যাওয়া প্রভৃতি জলের এই গুণের উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই বাষ্পের চাপে জলের সেই সময়কার উত্তাপের উপর নিভর্ করে।

বাষ্প

জল তাপমানের ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ফুটিতে থাকে। এই উত্তাপে জলীয় বাষ্পের চাপ বায়ুর চাপের সমান হওয়ায় ইহা যেন বায়ুর ভিতর নিজেকে ছড়াইয়াদিতে চাহে। এখন মাত্র উপরিতল নহে, ইহার সমস্ত শরীরের ভিতরদিয়া সজোরে বাষ্পবাহির হইতে থাকে। ইহাকেই আমরা জল ফুটিতেছে বলি।

বায়ুরচাপের ন্যূনাধিক্যে তাহার ফুটিবার তাপাঙ্কের ন্যূনাধিক্য ঘটে, ইহা তোমরা ইতিপূর্ব্বে বায়ু প্রবন্ধে পড়িয়াছ। উর্দ্ধে পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহা অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপাঙ্কে ফোটে।

জল যতক্ষণ ফুটিতেথাকে, তাহার তাপাঙ্কের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, অথচ সেই অবস্থা বজায় রাখিতে তাহাতে অনবরত উত্তাপ প্রযুক্ত হইতে থাকে। তাপাঙ্কের বিনাপরিবর্ত্তনে, বাষ্পে পরিণত হইতে যে তাপ ইহাতে লুপ্ত হইয়া যায়, সেই তাপকে বাষ্প-জননের লুপ্ততাপ কহে।

সহজ অবস্থায় জল যখন উবিতে থাকে, তাহার বক্রী অংশ শীতলতর হইয়া পড়ে। উবিয়া যাওয়া অনুগুলি দ্রুততর গতিসম্পন্ন। কাজেই উবিবার পূর্ব্বে অনুসমষ্টির যে মোটগতি ছিল, দ্রুতগতিসম্পন্ন অনুগুলি চলিয়া গেলে, বক্রী অনুগুলির মোট গতি কম হইয়া পড়ে

চায়ের কেটলি হইতে "ভাপ" বাহির হইতেছে

এই কারণে ঘর্ম্মের উপর বাতাস করিলে শরীর শীতল বোধ হয়, গরম জলে ফুৎকার দিলে তাহার উত্তাপ কমিয়া যায়। সোরাই বা তদ্রূপ সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত পাত্রে জল রাখিলে, বিশেষতঃ তাহাকে বায়ুপ্রবাহে বসাইয়া দিলে, তাহার জল চমৎকার শীতল হইয়া যায় বায়ুতে জলের ন্যূনাধিক্যে, জলের উবিয়া যাওয়ার গতি নির্ভর করে। গ্রীষ্মকালে জল শীঘ্র শুকাইয়া যায়, কিন্তু বর্ষায় তত শীঘ্র শুকায় না।

চায়ের কেটলির নল হইতে যে "ভাপ" নির্গত হয়, তাহা ঠিক বাষ্পনহে। বাহিরের ন্যূনতাপে বাষ্প জলকণায় পরিবর্ত্তিত হয়। ইহা সেইরূপ সৃষ্ট জল-কণার সমষ্টি। মেঘের সৃষ্টিরও ইহাই ইতিহাস। আকাশে সকল সময়েই বাষ্প আছে, আমরা তাহা দেখিতে পাইনা। যখন তাহা প্রাচুর্য্য বশতঃ বা শীতল হইয়া জলকণায় পরিণত হয়, তখনই আমরা তাহাকে মেঘ ও কুয়াশা রূপে দেখিতে পাই। সূর্য্যকিরণে
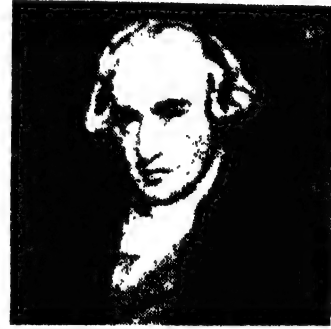
জেম্‌স ওয়াট্

বাতাস গরম হইলে কুয়াসা কাটিয়া যায়। পণ্ডিতেরা বৈদ্যুতিক আকর্ষণেও কুয়াসা দূর করিতে সমর্থ

রেলের এঞ্জিন

জল যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখন অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া বসে। তখন তাহাকে বল প্রয়োগে কমস্থানে ভরিয়া দিলে, সেও বলের সহিত বাহির হইতে চাহিবে। এই স্থিতিস্থাপকতা গুণের সুবিধা লইয়া মানুষে এঞ্জিন তৈয়ারী করিয়াছে। এক

ঘন ইঞ্চ জল ১২৪৪ ঘন ইঞ্চ বাষ্পের সৃষ্টি করে। চায়ের কেটলির ঢাকনার ওঠা-পড়া দেখিয়া বালক (Watt) ওয়াটের মনে ইহা দ্বারা যন্ত্রাদি চালিত করাইবার বাসনা জাগিয়া ওঠে। বাষ্পীয় এঞ্জিনের জনক বলিয়া তাঁহাকে গণ্য করা হয়।

এঞ্জিন কিরূপে চলে, তাহা প্রধানতঃ এইরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। এঞ্জিনের বহিভাগে, উপরে মাঝামাঝি স্থানে একটি ককুদের মত গম্বুজ আছে এঞ্জিনের সম্মুখভাগে ধূমকক্ষ, পিছনে চুল্লী ও বৃহৎ মধ্য প্রদেশটি জলপূর্ণ বাষ্পস্থালী। চুল্লী হইতে অনেকগুলি নল বাষ্পস্থালীর ভিতর দিয়া এঞ্জিনের সম্মুখভাগ বা ধূম-কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছে। চুল্লীর লোল শিখাগুলি নলগুলির ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া বাষ্পস্থালীর জলকে ফুটাইতে আরম্ভ করে এবং এইরূপে চুল্লীর সমস্ত গ্যাস ও ধূম, ধূমকক্ষ হইয়া তৎসংযুক্ত ধূমনালীব বা চিম্নির ভিতর দিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। ফুটন্ত জলের বাষ্প ঐ গম্বুজটিতে জমা হইতে থাকে। গম্বুজ হইতে একটি নল, ভিতরে ভিতরে নামিয়া, এঞ্জিনের তল-দেশে অবস্থিত Piston বা পিচকারী বাক্সের সহিত সংযুক্ত আছে। বাষ্প নিজের চাপে, এই নল দিয়া সেই পিচকারী বাক্সে প্রবল বেগে প্রবেশ করে ও সেই চাপে পিচকারীর ডাঁটিটি বাহিরে ঠেলিয়া আসে এবং এইরূপে তাহার সহিত সংযুক্ত এঞ্জিনের চলিবার চাকাটাকে অর্দ্ধেকটা ঘুরাইয়া দেয়। চলনরহিত এঞ্জিনে যে বৃহৎকায় চাকা এইরূপে বিঘূর্ণিত হয়, সেই চাকাটিকে ফ্লাই হুইল (fly wheel) কহে।

পিচকারীতে বাষ্প প্রবেশ করিবামাত্র তদ্‌গাত্রসংলগ্ন তাহার আগমন দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। ডাঁটিটি বাহিরে নিষ্কাশিত হইবামাত্র অন্য একটি দ্বার খুলিয়া যায় এবং সেই পথে বাষ্প বাহির হইয়া ধূমকক্ষ ও ধূমনালীর ভিতর দিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে উপরের আর একটি দ্বার দিয়া নূতন বাষ্প পিচকারীর ভিতর ডাঁটিটির উপরের দিকের কক্ষাংশে প্রবেশ করে ও তাহার চাপে পিচকারীর ডাঁটিটি পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। সেই গতিবেগে চলৎচক্রটি বক্রী অর্দ্ধেক ঘুরিয়া লয়। অর্থাৎ পিচকারীর যাওয়া আসায় চাকাটি পূর্ণ মাত্রায় বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। এই চাকাটি, এখন নিজের গতিতে অন্যান্য যন্ত্রাদি চালাইতে থাকে। বাষ্পের চাপ অত্যধিক হইলে এঞ্জিন ফাটিয়া ভয়ানক কাণ্ড হইতে পারে। তাহার গতিরোধার্থ (safety valve) বা আপদ্-রক্ষক যন্ত্র থাকে। ইহা বাষ্পের গুরু চাপে আপনা হইতেই খুলিয়া যায় ও তাহার ভিতর দিয়া খানিকটা বাষ্প বাহির হইয়া যায়।

তোমরা বড় হইয়া এঞ্জিনের গঠন প্রণালী একবার যাইয়া দেখিয়া আসিও; অনেক কথা শিখিতে পারিবে।

তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহখণ্ড জলে ডুবাইলে, স্ফুটনের শব্দ হয় ও প্রচুর বাষ্প ত্বরিত গতিতে বাহির হয়। প্রচুর বাষ্পের সহসা নির্গমন হেতু বাতাসের কণাগুলিতে ঠেলাঠেলি পাড়য়া যায়; তাহারই ফলে ঐরূপ শব্দোৎপত্তি হয়।

কঠিন অবস্থার জলকে আমরা বরফ বলি। জল শীতল করিতে থাকিলে, চার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত ইহার আয়তন সঙ্কুচিত হইতে থাকে; পরে আরও শীতল করিলে ইহার আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ইহা জমিয়া যায়। এক ঘন ইঞ্চ জল ১'১ ঘন ইঞ্চ বরফে পরিণত হয়। সেইজন্য বরফ জলের উপর ভাসে। শীতপ্রধান দেশে হ্রদাদির জলে বরফ উপরেই ভাসিতে থাকে বলিয়া, মৎস্যাদির জলচর জন্তুগুলির মারা পড়িবার আশঙ্কা থাকে না।

বরফ

হিমশিলা ও বরফের উপর ছেলেরা খেলা করিতেছে

শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে জল হইতে যে উত্তাপ বাহির করিয়া দিলে, তাহা জমিয়া যায়, তাহাকে জমাইবার গুপ্ত তাপ কহে।

জলের এইরূপ আয়তন বিস্তারে, শীতপ্রধান দেশে পাইপের জল জমিয়া, প্রায়ই পাইপ কাটিয়া যায়।

এই সব দেশে, মোটর গাড়ীর জল কক্ষও (radiator) সময়ে সময়ে ফাটিয়া যায়। শুধু পাইপ কেন, স্থূল লৌহ গোলকের ভিতর জল জমাইয়া দেখা গিয়াছে গোলকটি ফাটিয়া গিয়াছে যে, জল জমিবামাত্র গোলাকটি বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি ?

বরফের ঝড়

শীতপ্রধান দেশে হ্রদ ও পুষ্করণীর জল শীতকালে প্রায়ই জমিয়া যায়। এরূপ শক্ত বরফের স্তর পড়ে যে, তাহার উপর লোকেরা নির্ভয়ে চলাফেরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়। আর্কটিক ও এন্টার্কটিক প্রদেশগুলি বরফের দেশ। বরফের নদী (glacier) বরফের ঝড় (blizard) ও ভাসমান বরফের স্তূপের কথা তোমরা পড়িয়া থাকিবে। এইরূপ ভাসমান বরফস্তূপের সংঘর্ষণে লুসিটানিয়া নামক সুবিখ্যাত বিরাটকায় অর্ণবপোতটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।

দুই খণ্ড বরফ প্রচুর বলের সহিত চাপিয়া ধরিলে জোড়া লাগিয়া যায়। তার দিয়া বরফ কাটিবার চেষ্টা করিলে, অনেক সময় দেখা যায় যে, তারটি বাহির হইয়া আসিবে বটে, কিন্তু বরফটি কাটা পড়ে নাই। চাপে বরফ জলে পরিণত হইয়া তারটির পথ করিয়া দেয় কিন্তু তারটি সরিয়া যাইবার পরই, চাপ অপসৃত হওয়ায়, সেই জল পুনরায় বরফে পরিণত হইয়া যায়। চাপাধিক্যে বরফ জমাইতে হইলে, জলকে শূন্য ডিগ্রীর আরও নিম্নাংশে লইয়া যাইতে হইবে।
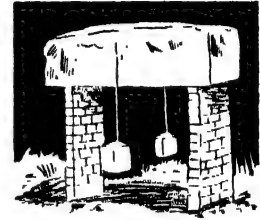
বরফ কাটা পড়ে নাই

নীচের চিত্রখানি দেখ। মনে হইবে যেন স্ফটিকের টুকরা, কিন্তু তাহা নহে। ইহা বরফের অতি ছোট ছোট টুকরা মাত্র।
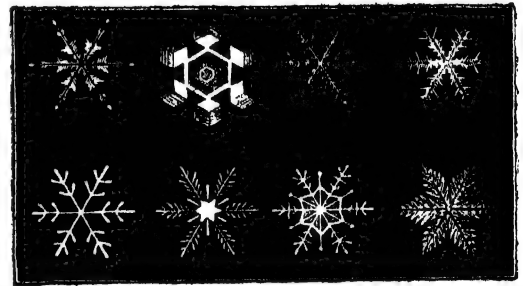
অনুবীক্ষণে বরফের টুকরাকে যেমন দেখায়

অনুবীক্ষণে এই বরফকণাগুলি যে কি সুন্দর দেখায়, তাহা লিখিয়া জানানো যায় না। উপরের ছবিতে মাত্র তাহার কয়েকটি চিত্র দেওয়া গেল।

কবিতা-চয়ন

ছেলে ভুলানো ছড়া

*　*　*　*　*

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ী কাজিতলা দিয়ে॥
কাজি-ফুল কুড়তে গিয়ে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত ঝুম্ ঝুম পা ঝুম্ ঝুম্ সীতারামের খেলা॥

নাচত সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলোচাল দেব টোপাল ভরিয়ে॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথায় ত জল নেই ত্রিপুণির ঘাট॥
ত্রিপূণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কে।

তার বোনকে বিয়ে করি ওড় ফুল দিয়ে।
ওড় ফল কুড়তে হয়ে গেল বেলা।
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক্ দুকুর বেলা।

*　*　*　*　*

ও পারে জন্তি গাছটি জন্তি বড় ফলে।
গো জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে॥
প্রাণ করে হাই চাই গলা হল কাঠ।
কতক্ষণে যাব রে ভাই হরগৌরীর মাঠ॥

হরগৌরীর মাঠে রে ভাই পাকাপাকা ধান
পান কিন্‌লাম, চূণ কিন্‌লাম
ননদ ভাজে খেলাম ॥
একটি পান হারালে
দাদাকে বলে দেলাম ॥

গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ছুটেছে।
পরণে তার ডুবে শাড়ি ঘুরে পড়েছে ॥
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে ॥
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন টিয়ে।
টিয়ের মায়ের বিয়ে ॥

দাদা দাদা ডাক ছাড়ি দাদা নাইক বাড়ি
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ি

অশথের পাতা ধনে, গৌরী বেটি কনে, নকা বেটা বর।
ট্যাম্ কুড়্ কুড়্ বাদ্দি বাজে চড়কডাঙ্গায় ঘর ॥

আজ সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে
সুবলকে নিয়ে যাব আমি দিগ্‌নগর দিয়ে ॥
দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে বসেচে।
মোটা মোটা চুলগুলি গো পেতে বসেচে ॥
চিকন্ চিকন্ চুলগুলি ঝাড়্‌তে লেগেচে।
হাতে তাদের দেবশাঁখা মেঘ নেমেছে ॥

দাদা গো দাদা সহরে যাও।
তিন টাকা করে মাইনে পাও।
দাদার গলায় তুলসী মালা।
বউ বরণে চন্দ্রকলা ॥
হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি
বউ এনে দাও খেলা করি ॥

পৃথিবীর ইতিহাস

হিব্রুজাতি ও ওল্ড টেষ্টামেণ্ট

১১৮৩ পৃষ্ঠার পর

মোসেসের মৃত্যুর পর ভগবান একদিন জোশুয়াকে বলিলেন, মোসেসের ত মৃত্যু হইয়াছে। এইবার তুমি হিব্রুদের লইয়া জর্দ্দন নদী পার হইয়া প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ কর। আমি তোমার সহায় হইব। কোন ভয় নাই।"

জোশুয়া প্রথমে জেরিকো (Jericho) অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন ও চর পাঠাইয়া এই দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হইলেন। এইবার জর্দ্দন পার হইবার আয়োজন চলিল। লেভির বংশধরেরা ভগবানের আর্ক বহন করিয়া আগে আগে চলিল। তাহাদের পিছনে হিব্রুরা দলে দলে অগ্রসর হইল। সম্মুখে জর্দ্দনের খরস্রোত বিপুল গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছিল। কার সাধ্য পার হয়! কিন্তু আর্ক-বাহকেরা ধীরে ধীরে জলে নামিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তখন এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিল। দূরে আদম সহরের নিকটে সহসা জর্দ্দনের স্রোত রুদ্ধ হইল—একটু জলও আর নামিল না। এদিকে আর্ক-বাহকদের পদতলের জল সরিয়া গিয়া শুষ্ক বেলাভূমি বাহির হইল। ধীরে ধীরে ইস্রেল সন্তানেরা সেই শুষ্ক পথ দিয়া পার হইল। সবাই নদীর অন্য পারে উঠিলে আর্ক-বাহকেরা নদী পার হইয়া তাহাদের সম্মুখ ভাগে চলিয়া গেল। অমনি রুদ্ধ নদীস্রোত পুনরায় বিপুল বেগে ভীম গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া চলিল।

হিব্রুরা গিল্‌গলে (Gilgal) গিয়া শিবির স্থাপনা করিল। জোশুয়া যখন একদিন জেরিকো সহরের চারিদিকে পরিক্রমণ করিয়া সহরের বলাবল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে একজন যোদ্ধার আবির্ভাব হইল। জোশুয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি? আপনি কোন্ পক্ষে? আমাদের, না, আমাদের শত্রুদের?" যোদ্ধা উত্তর করিলেন, "আমি ভগবানের সেনাধ্যক্ষ।" তৎক্ষণাৎ জোশুয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিলেন, "দাসের প্রতি ভগবানের কি আদেশ?" যোদ্ধা বলিলেন, "এ স্থান পবিত্র। শীঘ্র তোমার জুতা খুলিয়া ফেল।" জোশুয়া তাঁহার কথামত কাজ করিলে সেনাধ্যক্ষ বলিলেন, "দেখ, জেরিকো সহর আমি তোমার হস্তে অর্পণ

করিলাম। আমার উপদেশ মত কাজ কর।” সহরের দিকে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া জোশুয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। কথা শেষ হইলে জোশুয়া ফিরিয়া দেখেন, কই কেহ ত কোথাও নাই। তিনি সম্পূর্ণ একা! শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আদেশ

আর্ক-বাহকেরা আর্ক বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে

দিলেন, “কাল সকালে সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে। লেভির সন্তানেরা আর্ক-বহন করিবে।”

পরদিন প্রাতঃকালে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল। আর্ক-বাহকেরা আর্ক উঠাইল। জোশুয়ার আদেশ মত যোদ্ধারা একে একে ইহার সম্মুখ দিয়া গিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিল নগরবাসীরা ভীত সন্ত্রস্তভাবে তাহাদিগের কার্যাকলাপ দেখিতে লাগিল। পর পর ছয় দিন হিব্রু যোদ্ধারা এইভাবে নগর প্রদক্ষিণ করিল সপ্তম দিন অতি প্রত্যূষে তাহারা সাতবার সহরটির চারিধার ঘুরিল। সন্ধ্যাবেলায়ও তাহারা সাতবার প্রদক্ষিণ করিল। তারপর জোশুয়ার কথামত তাহারা সকলে একসঙ্গে হর্ষধ্বনি করিল। সহসা নগরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইস্রেল সৈন্যেরা ভীমবেগে নগরে প্রবেশ করিল এবং সম্মুখে যাহাকে পাইল, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে সবাইকে হত্যা করিল ; এমন কি, গরু-ভেড়াও রক্ষা পাইল না। তারপর আগুন লাগাইয়া সহরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হইল।

এইবার জোশুয়া আই (Ai) নগর বিজয়ে মন দিলেন। প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হইল। এই পরাজয়ে হিব্রুরা বিশেষ ভীত হইল। তখন ভগবান্ জোশুয়াকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে একজন আমার আদেশ অবহেলা করিয়া জেরিকো নগরের কিছু লুঠের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছে। সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ তোমাদের পরাজয় হইয়াছে।” তখন হিব্রুদের একস্থানে সমবেত করিয়া দোষীকে বাহির করা হইল। সন্তপ্ত অ্যাকান তাহার দোষ স্বীকার করিল। তাহাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলা হইল।

তখন ভগবান্ জোশুয়াকে বলিলেন, “যাও, আমি আই নগর তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। সবাইকে হত্যা করিবে। তবে ধন-রত্ন তোমরা লইতে পার।”

এইবার জোশুয়া একটি কৌশল করিলেন। রাত্রিকালে আই ও বেথেল্ (Bethel)-এর মধ্যবর্ত্তী শৈলগহ্বরে পাঁচ হাজার বাছা সৈন্য লুকায়িত রাখিলেন। পরদিন ভোর-বেলা অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া আই আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহা দেখিয়া আই নগরের রাজা তাঁহার সৈন্য-সামন্ত লইয়া হিব্রুদের আক্রমণ করিলেন। প্রথম আক্রমণেই হিব্রুরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল এবং পলায়নের ভাণ করিল। তখন আই ও

বেথেল্ নগরের সমস্ত অধিবাসী পরাজিত হিব্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। এইবার জোশুয়া তাঁহার লুক্কাইত সৈন্যদের সঙ্কেত করিলে তাহারা বাহির হইয়া শূন্য নগর অধিকার করিয়া ভস্মীভূত করিল। নগর হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখিয়া সন্ত্রস্ত অধিবাসীরা চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন দুইদিক হইতে হিব্রুরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং নিষ্ঠুরভাবে সবাইকে হত্যা করিল। কেহই তাহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইল না।

এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে অন্যসমস্ত রাজারা হিব্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইলেন। শুধু গিবিয়ন্ (Gibeon) নগরের অধিবাসীরা চাতুরী করিয়া হিব্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া রেহাই পাইল। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া জেরুজেলেম-রাজ আদনি-জেদেক (Adoni-Zedec), হেব্রনরাজ হোহাম্ (Hoham), জার্মুথরাজ পিরম্ (Piram), ল্যাকিস্‌রাজ জাফিয়া (Japhia) এবং এগ্‌লনরাজ দেবির(Debir), একযোগে গিবিয়ন অবরোধ করিলেন। অসহায় গিবিয়নবাসীরা দূত পাঠাইয়া জোশুয়ার সাহায্য ভিক্ষা করিল। ভগবানের প্রত্যাদেশ পাইয়া জোশুয়া সসৈন্যে গিবিয়ন অভিমুখে রওনা হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তিনি অবরোধকারীদের বিশেষভাবে পরাজিত করিয়া ছত্রভঙ্গ করিলেন। কত লোক যে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তাহার সংখ্যা নাই। পরাজিত রাজারা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পর্ব্বত-গহ্বরে আশ্রয় লইলেন। সেখান হইতে তাঁহাদের ধরিয়া আনা হইল ও পদতলে নিপীড়িত করিয়া হত্যা করা হইল। সেইদিনই জোশুয়া মাক্কেদা (Makkedah) সহর অধিকার করিয়া সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করিলেন। তারপর তিনি মূর্ত্তিমান্ যমের মত সমস্ত দেশের উপর হত্যার তাণ্ডব লীলা আরম্ভ করিলেন। এমন কি, হেব্রনের পার্ব্বত্যভূমির দৈত্যবংশোদ্ভূত অ্যানাকিম-দের (Anakim) পর্য্যন্ত ধ্বংস করিলেন। ইহার পর হাজোররাজ জাবিন্ ও উত্তর দিকের রাজারা তাঁহাকে একযোগে আক্রমণ করিলেন। জোশুয়া তাঁহাদিগকেও ভীষণভাবে পরাস্ত করিয়া একেবারে বিধ্বস্ত করিলেন। এইরূপে অনেকদিন যুদ্ধের পর সমগ্র দেশ ইস্রেল সন্তানদের হস্তগত হইল।

সাত বৎসর পরে একদিন ভগবান্ জোশুয়াকে বলিলেন যে, এই দেশ হিব্রু-সন্তানদের ভাগ করিয়া দিতে হইবে। জোশুয়া তাহার আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। ক্যালেব্‌কে তাঁহার বীরত্বের জন্য হেব্রন প্রদেশ দেওয়া হইল। জুদার সন্তানেরা পাইল মরুসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থিত সমগ্র প্রদেশ। ইফ্রেম ও মানাস্সের সন্তানদের ভাগে বেথহোরোনের উত্তরস্থিত প্রদেশটি পড়িল।

এইবার ইস্রেল সন্তানেরা ভগবানের আর্ক বহন করিয়া শিলো (Shiloh) উপত্যকায় উপস্থিত হইল। এইখানে তাহাদের জাতীয় মিলন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। একটি বস্ত্রা-বাসের মধ্যে যিহোবার আর্ক স্থাপিত হইল। ইহাই হইল সমগ্র হিব্রু জাতির ধর্ম্মকেন্দ্র।

ইহার পর জোশুয়া অন্যান্য হিব্রুসন্তানদের সাতটি ভাগ করিয়া অবশিষ্ট দেশ প্রদান করিলেন। জর্দ্দনের উভয় পারে তিনটি তিনটি করিয়া ছয়টি সহর—আশ্রয়নগর (City of Refuge) নির্দিষ্ট হইল। যদি কেহ অনিচ্ছায় নরহত্যা করিত, তবে সে ইহাদের কোন একটিতে বিচারনা হওয়া পর্য্যন্ত আশ্রয় পাইত। জোশুয়া নিজের জন্য টিমনাথসেরার পার্ব্বত্যপ্রদেশ পছন্দ করিয়া লইলেন।

অনেক দিন পরে বৃদ্ধ জোশুয়া তাঁহার মৃত্যু সন্নিকটে বুঝিতে পারিয়া ইস্রেল

সন্তানদের সেকেমে (Shechem) আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা ত জান, যিহোবা কিভাবে তোমাদিগকে মিশর হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়া বিপদে আপদে সহায় হইয়া এই দেশ তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের কর্ত্তব্য, সমস্ত দেবদেবীর পূজা ছাড়িয়া দিয়া শুধু কায়-মন-প্রাণে যিহোবার আরাধনা করা। তবে তোমাদের যদি ইহা মনঃপূত না হয়, তবে আজ ঠিক কর, কাহার পূজা তোমরা করিবে। আমি ও আমার বংশধরেরা কিন্তু যিহোবার শরণাগত হইব।"

তখন সমবেত জনতা একবাক্যে বলিল, "যিহোবা ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা আমরা মনেও স্থান দিব না। তিনিই আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা।" জোশুয়া বলিলেন, "যিহোবার শরণাপন্ন হইবার মত মনের জোর তোমাদের নাই। মনে রাখিও, তিনি পবিত্র ও ঈর্ষাপরায়ণ। তিনি কখন তোমাদের অপরাধ ও ত্রুটি ক্ষমা করিবেন না। তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তিনি তোমাদের বিনাশ করিবেন।" সমবেত জনতা আবার বলিল, "আমরা তাঁহারই পূজা করিব।"

জোশুয়া বলিলেন, "তোমাদের অঙ্গীকারের সাক্ষী কিন্তু তোমরা নিজেরাই হইলে।"

উত্তর হইল, "আমরাই সাক্ষী।"

"তবে অন্য দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেল। একমাত্র যিহোবার ভজনা করিবে। তিনিই ইস্রেলের দেবতা।"

আবার তাহারা বলিল, "যিহোবার পূজাই আমরা করিব। তাঁহার আদেশ সর্ব্বথা পালন করিব।"

সেইদিনই জোশুয়া তাহাদের সঙ্গে চুক্তি করিলে (Covenant)। একটি টেরিবিন্থ বৃক্ষের তলে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "দেখ, এই পাথরটিই সাক্ষী রহিল। ভগবান আমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সে শুনিয়াছে।"

এই সেকেমে ইস্রেল সন্তানেরা জোসেফের মৃতদেহ সমাহিত করিল। কিছুদিন পরে জোশুয়ার মৃত্যু হইল।

জোশুয়ার মৃত্যুর পর যাঁহারা হিব্রুদের শাসন করিতেন, তাঁহাদের বিচারক (Judge) বলা হইত। হিব্রুরা যিহোবার পূজা ভুলিয়া বার বার বাল (Baal) ও আস্টার্টের (Astarte) পূজা আরম্ভ করিত। সুতরাং ভগবান তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য নানারূপ বিপদের মধ্যে ফেলিতেন। চারিদিক হইতে দুর্দ্দান্ত শত্রুরা তাহাদিগকে নির্য্যাতিত করিত। বিপদে পড়িয়া হিব্রুরা পুনরায় যিহোবার শরণাপন্ন হইত। তখন তাহাদের মুক্তির জন্য ভগবান ত্রাণকর্ত্তা পাঠাইতেন। এই যোদ্ধাদেরই বিচারক বলা হইত।

ক্যালেবের ভাই ওথনিয়েল্ (Othniel) ছিলেন প্রথম বিচারক। তিনি কুশান রিশথায়েমের অধীনতা-পাশ হইতে জাতিকে মুক্ত করেন। তারপর এহুদ (Ehud) মোয়াবের রাজা এগ্লনকে পরাজিত ও নিহত করেন। ফিলিষ্টাইন্‌দের (Philistines) হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন, বিচারক শামগর (Shamgar)।

অনেকদিন পর আবার ভগবান্ তাহাদের প্রতি বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। এবার হাজাররাজ জাবিন (Jabin, the king of Hazar) তাহাদিগকে নির্য্যাতন করেন। তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি সিসেরা (Sisera) তাঁহার যুদ্ধরথ লইয়া সমগ্র দেশ চষিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার ভয়ে পথে কেহ বাহির হইতে সাহস করিত না। হিব্রুদের তিনি নানারূপ শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করিতেন। বিশ বৎসর নির্য্যাতন সহ্য করিবার পর

তাহারা যিহোবার শরণাপন্ন হইল। এই সময় দেবোরা (Deborah) নামে একজন স্ত্রীলোক হিব্রুদের বিচারক ছিলেন। তিনি বারাক (Barak) নামে একজন যোদ্ধাকে দশ সহস্র সৈন্য লইয়া সিসেরার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইবার জন্য উৎসাহিত করেন।

এই বিদ্রোহের খবর সিসেরার কাণে পৌঁছিলে তিনি সসৈন্যে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু এইবার ভগবান্ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইলেন। তুষার-ঝটিকায় ক্যানানীয়দের অশেষ অসুবিধা হইল। হঠাৎ বিশন নদীতে বন্যা হওয়াতে তাহাদের যুদ্ধরথের চাকাগুলি মাটিতে বসিয়া গেল। তখন বারাক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। নিরুপায় হইয়া সিসেরা তাঁহার রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি মোসেসের স্বশুর জেথ্রোর বংশধর হিবারের বাটীতে আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। হিবারের স্ত্রী জেইল্ (Jael) তাঁহাকে সাদরে বস্ত্রাবাসে লইয়া গেলেন। শ্রান্ত সিসেরা একগ্লাস জল খাইতে চাহিলে তাঁহাকে দুধ দেওয়া হইল। তারপর তিনি জেইলকে বলিলেন, "দয়া করিয়া তুমি দরজা পাহারা দাও। কেহ আমাকে খুঁজিতে আসিলে বলিও যে, এখানে কেহ নাই।" এই বলিয়া সিসেরা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

এদিকে জেইল দরজা পাহারা দিতে দিতে ইস্রেল সন্তানদের নির্যাতনের কথা ভাবিতেছিলেন। তাহাদের দুঃখে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তখন একটি খুঁটি ও একটি হাতুড়ী লইয়া তিনি নিঃশব্দে সিসেরার দিকে অগ্রসর হইলেন ও খুঁটিটি তাঁহার বুকে আমূল বসাইয়া দিলেন। সিসেরার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল।

বারাক যখন সিসেরার খোঁজে হিবারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তখন জেইল সানন্দে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "আসুন, আসুন। আপনাদের পরম শত্রুর অবস্থা দেখিবেন ত ভিতরে প্রবেশ করুন।" এই বলিয়া জেইল সেই মৃত সিসেরাকে দেখাইলেন।

তখন দেবোরা, বারাক ও অন্যান্য হিব্রু সন্তানেরা ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার চল্লিশ বৎসর পর হিব্রুরা পথভ্রষ্ট হইলে ভগবান আবার তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। এইবার মিদিয়েরা, আমালেকেরা ও পূর্ব্বদেশীয় অন্যান্য লোকেরা তাহাদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করে। প্রত্যেক বৎসর শস্য কাটার সময় উপস্থিত হইলে তাহারা হঠাৎ জর্দ্দন নদী পার হইয়া আসিয়া পঙ্গপালের মত সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিত ও গরু, ভেড়া ও শস্য লুঠপাট করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিত। প্রাণভয়ে হিব্রুরা বনজঙ্গলে ও পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় লইত। এইরূপে কতকাল আর তাহারা ইহাদের অত্যাচার সহ্য করিতে পারে? কাজেই, পুনরায় তাহারা যিহোবার শরণাপন্ন হইল।

সপ্তম বৎসর যখন বিদেশী দস্যুরা তাহাদের দেশ আক্রমণ করিল, তখন এক দিন আবিজের বংশীয় জোয়াসের (Joash) পুত্র গিদিয়ন (Gideon) তাহাদের টেরিবিন্থ বৃক্ষের তলে দেবদূতকে দেখিতে পাইলেন। এই গিদিয়নকে লোকে কাঠুরে গিদিয়ন্ (Gideon, the Tree-feller) বলিয়া ডাকিত; কিন্তু তাহাকে দেখিলে রাজপুত্র বলিয়া মনে হইত।

দেবদূত তাহাকে বলিলেন, "শোন বীর, ভগবান্ তোমার সহায়।" তাহা শুনিয়া গিদিয়ন বলিলেন, "না মহাশয়, আপনার কথা ঠিক নহে। ভগবান্ আমাদের পক্ষে থাকিলে আমাদের দুর্দ্দশা হইত না। কই,

তিনি ও আমাদের জন্য কিছুই করিতেছেন না? নিশ্চয়ই তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিয়াছেন।" তখন দেবদূত বলিলেন, "যাও বীর, নিজ বাহুবলে তুমি ইস্রেল সন্তানদের পরিত্রাণ কর।"

গিদিয়ন অবশ্য জানিত না যে, সে দেবদূতের সঙ্গে কথা বলিতেছে। কাজেই, সে অবাক্ হইয়া বলিল, "কি বলিতেছেন আপনি? কিরূপে আমি হিব্রুদের পরিত্রাণ করিব? ম্যানেসায় আমাদের মত গরীব কেহ নাই। আর আমি ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র।"

এইবার দেবদূত বলিলেন, "ভয় নাই। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। তুমি মিদিয়দের পরাস্ত করিবে।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিদিয়ন ভাবিতে লাগিল, "ইনি কে, যে এইরূপ অসম্ভব কথা বলিতেছেন!" তারপর সে আগন্তুককে বলিল, "আপনি যখন আমার প্রতি এত সদয় আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া ঐ গাছতলায় অপেক্ষা করিবেন কি?"

দেবদূত বলিলেন, "বেশ, যাও।"

গিদিয়ন্ ছাগমাংস ও রুটি লইয়া অতিথির কাছে ফিরিয়া আসিল। দেবদূত বলিলেন, "এই পাথরটার উপর রাখ।" গিদিয়ন্ তাঁর কথামত কাজ করিলে তিনি তাঁহার যষ্টি দিয়া উহা স্পর্শ করিলেন। অমনি পাথরটার উপর হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া খাদ্যগুলি নিঃশেষ করিল। গিদিয়নের আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ফিরিয়া দেখে, কই, কেহই ত কোথাও নাই। এইবার তাহার বিশেষ ভয় হইল। "দুর্ভাগা আমি আমি দেবদূতকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমার আর নিস্তার নাই।" এই বলিয়া সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভগবান তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, তুমি মরিবে না।" তখন গিদিয়ন সেই পাথরটার কাছে ভগবানের একটি বেদী রচনা করিল।

এদিকে দস্যুরা সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদিগের হাত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য গিদিয়ন বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার আমন্ত্রণে চারিদিক হইতে হিব্রুসন্তানেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ৩২০০০ সৈন্য লইয়া গিদিয়ন গিল্‌বোয়ার (Gilboa) পর্ব্বতশৃঙ্গের কম্পন-কূপের (Well of Trembling) নিকটে ঘাঁটি স্থাপন করিলেন। নীচে বহুদূর ব্যাপিয়া লক্ষাধিক মিদিয়সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

ভগবান্ তখন গিদিয়নকে বলিলেন যে, "এত সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিলে তোমার আর বাহাদুরী কোথায়! তাহা হইলে হিব্রুরা যুদ্ধজয়ের সমস্ত গৌরব দাবী করিবে। বরং ইহাদের মধ্যে যাহারা ভীরু, তাহারা দেশে ফিরিয়া যাউক।" তাঁহার কথামত বাইশ হাজার লোক শত্রু-সৈন্য দেখিয়া ভীত হইয়া চলিয়া গেল। মোট রহিল ১০ হাজার হিব্রুসন্তান। তাহাও ভগবানের মনঃপূত হইল না। আবার তিনি গিদিয়নকে বলিলেন, "ইহারা কম্পন-কূপের জল পান করুক। শুধু যাহারা আঁজলা করিয়া জল খাইবে, তাহারাই থাকিবে, আর বাকি লোক চলিয়া যাইবে।" মোটে ৩০০ লোক এই পরীক্ষা অতিক্রম করিল। তখন ভগবান বলিলেন, "এই ৩০০ লোকই যথেষ্ট। আমার অনুগ্রহে এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়াই তুমি মিদিয়দের পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং আর সবাই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুক।" তাঁহার আদেশ অনুসারে গিদিয়ন তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

রাত্রিকালে ভগবান্ গিদিয়নকে ছদ্মবেশে শত্রুশিবির ঘুরিয়া আসিতে বলিলেন। গিদিয়ন দুইজন শত্রুসৈন্যের কথোপকথন শুনিতে পাইল। একজন বলিতেছিল,

"দেখ, আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, হঠাৎ একটা বালির পিষ্টক আসিয়া সেনাপতির শিবিরে পড়িল। অমনি শিবির ভাঙ্গিয়া পড়িল।" তখন তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "উহা আর কিছুই নহে, গিদিয়নের তরবারি। ভগবান্ মিদিয়দিগকে গিদিয়নের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া গিদিয়নের খুব স্ফূর্ত্তি হইল। সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে নিজের শিবিরে ফিরিয়া আসিয়াই সৈন্যদের জাগাইয়া বলিল, "ওঠ, তৈরী হও। আজই আমাদের মুক্তির দিন।" এই বলিয়া সে তাহার ৩০০ সহচরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া শত্রু-সৈন্যের তিন দিকে অবস্থান করিতে আদেশ দিল। "দেখ, আমার শৃঙ্গধ্বনি শুনিতে পাইলে ও আমার হস্তস্থিত মশাল দেখিতে পাইলে তোমরাও একযোগে শৃঙ্গধ্বনি করিবে এবং মশাল আন্দোলিত করিবে; আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিবে, জয় ভগবানের জয়! জয় গিদিয়নের জয়।"

এইবার তাহারা ঘুমন্ত শত্রু-শিবিরের তিন দিকে চলিয়া গেল। গিদিয়নের সঙ্কেত শুনিলে একসঙ্গে তাহারা শৃঙ্গ নিনাদ করিল ও মশাল নাড়িতে নাড়িতে "ভগবানের জয়! গিদিয়নের জয়!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অতর্কিতে এই ভাবে চীৎকার শুনিয়া শত্রু-সৈন্যেরা জাগিয়া উঠিয়া সন্ত্রস্তভাবে এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তারপর আরম্ভ হইল এক বীভৎস ব্যাপার। অন্ধকারে শত্রু-মিত্র চিনিতে না পারিয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। হিব্রু-সৈন্যেরা কিন্তু দাঁড়াইয়া খালি চীৎকার করিতে লাগিল ও মশাল ঘুরাইতে লাগিল। অবশেষে শত্রু-সৈন্যেরা প্রাণভয়ে জর্দ্দন নদীর দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। এইবার অন্যান্য হিব্রুরা পশ্চাদ্ধাবন করিল।

গিদিয়নও তাহার ৩০০ অনুচর লইয়া জর্দ্দন নদী পার হইয়া মিদিয়রাজ জেবা (Zebah) ও জালমুন্নার (Zahmunna) অনুসরণ করিল। পথে সে সাক্কতের (Succoth) অধিপতিদের কাছে তাহার সৈন্যদের জন্য আহার প্রার্থনা করিল। তাঁহারা কিন্তু তাহার প্রতি বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আচ্ছা, ফিরিয়া আসিয়া তোমাদিগকে কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিব।" পেনুয়েলের নেতারাও আহার দিতে অস্বীকার করিল। তাহাদিগকে সে বলিল যে, তাহাদেরও বিশেষ শিক্ষা দিবে।

তারপর রাত্রিকালে সে ক র্কোরে রাজাদের আক্রমণ করিল। তাঁহাদের সঙ্গে ১৫০০০ লোক ছিল। কাজেই, তাঁহারা নিশ্চিন্ত ছিলেন। গিদিয়ন তাঁহাদের সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করিয়া তাঁহাদিগকে বন্দী করিল। পথে সাক্কতের ও পেনুয়েলের নেতাদের বিশেষ শিক্ষা দিল। তারপর সে জেবা ও জালমুন্নাকে নিহত করিল। হিব্রুরা এইবার গিদিয়নকে রাজা করিতে চাহিল। সে কিন্তু অস্বীকৃত হইয়া বলিল, "ভগবানই তোমাদের রাজা।" যতদিন গিদিয়ন বাঁচিয়াছিল দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল।

তাঁহার পর টোলা তেইশ বৎসর বিচারকের কাজ করিয়াছিলেন। টোলার পর বিচারক হইয়াছিলেন জেয়ার।

আবার ভগবান ইস্রেল সন্তানদের ব্যবহারে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। কারণ, তাহারা ইতিমধ্যে তাঁহার পূজা পরিত্যাগ করিয়া নানা দেবদেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ফলে, ফিলিষ্টিয়েরা (Philistines) ও আম্মোনেরা তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। এই বিপদে গিলিয়াদের (Gilead) রাজারা

জেফ্‌থা (Zephtha) নামে একজন দস্যু-সর্দ্দারের শরণাপন্ন হইতে মনস্থ করিলেন। জেফ্‌থা ছিল গিলিয়াদের একজন একঘরে নির্ব্বাসিত সন্তান। রাজপুত্রেরা আম্মোনের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে সে বলিল, "উত্তম, বিপদে পড়িয়া তোমরা আমার শরণাপন্ন হইয়াছ। কিন্তু তোমরা কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, আমার প্রতি শত্রুতা করিয়া তোমরা আমার ভাইদের সাহায্য করিয়া আমাকে গৃহহারা করিয়াছ? তবে কোন্ আশায় আমার কাছে আসিয়াছ?" তখন রাজারা তাহাকে তাহাদের অধিপতি করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এইবার সে তাঁহাদের সঙ্গে দেশে ফিরিয়া আসিল। দেশের লোকেরা তাহাকে রাজা করিয়া নিজেদের সেনাপতি-পদে বরণ করিল।

জেফ্‌থা তখন আম্মোনের রাজার কাছে দূত প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, কেন তিনি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আম্মোনের রাজার ত কোন শত্রুতা নাই, তবে তাঁহার এই আচরণের কারণ কি? যদিও এক সময়ে এই দেশ তাঁহাদের ছিল, তবু স্বয়ং ভগবান্ ইহা হিব্রুদের দিয়াছেন—আর তাহারা ৩০০ বৎসর ধরিয়া এই দেশ ভোগ করিয়া আসিতেছে। তাহাদের এই বিপদে যিহোবাই বিচার করিবেন!

আম্মোনের রাজা ঘৃণাভরে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন জেফ্‌থা ইস্রেল উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এতদিন তিনি নানা দেবদেবীর পূজা করিতেন। এইবার তিনি যিহোবার কাছে এক ভীষণ অঙ্গীকার করিলেন, যদি ভগবান্ তাঁহাকে আম্মোন বিজয়ে সহায়তা করেন, তবে তিনি তাঁহার গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনকালে যে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে তাঁহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া অভিনন্দিত করিবে, তাহাকেই তাঁহার কাছে অগ্নিতে উৎসর্গ করিবেন।

জেফ্‌থা আম্মোনকে বিশেষ ভাবে পরাজিত করিয়া তাহাদের দেশ ছারখার করিয়া আম্মোন রাজের দর্পচূর্ণ করিলেন। তার পর তিনি সগৌরবে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। নিজের বাটীর নিকট উপস্থিত হইলে গৃহ হইতে তাঁহার প্রিয়কন্যা নর্ত্তকী ও বাদ্যকর সঙ্গে লইয়া অভিনন্দিত করিতে অগ্রসর হইল। একমাত্র প্রিয় সন্তানকে দেখিয়া জেফ্‌থার খুবই আনন্দ হইল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়াতে তিনি দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ওরে তুই আমার এ কি সর্ব্বনাশ করিলি। আমি যে ভগবানের কাছে ভীষণ শপথ করিয়াছি, আর সে শপথ প্রত্যাহার করিবার যে কোন উপায়ই নাই।" তখন জেফ্‌থার কন্যা বলিল, বাবা! আপনি যদি ভগবানের কাছে প্রতিশ্রুতি থাকেন, বেশ আমাকে লইয়া যাহা করিতে চান, করুন। তবে শুধু এক ভিক্ষা আমাকে দিন—আমায় দুইমাসের সময় দিন। আমি আমার সহচরীদের লইয়া পাহাড়ে গিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের বেদনা লাঘব করিব।" জেফ্‌থা বলিলেন, "বেশ, তাহাই হউক।"

দুইমাস পরে জেফ্‌থার কন্যা ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহার শপথ পালন করিলেন।

জেফ্‌থার মৃত্যুর অনেক দিন পরে ফিলিষ্টিয়েরা ইস্রেলের উপর বিশেষ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। হতভাগ্য হিব্রুরা অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সময়ে জোরা (Zorah) নগরে মানোয়া (Manoah) নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। এক দিন মানোয়ার স্ত্রীর নিকট দেবদূত আবির্ভূত

হইয়া বলিলেন, "তুমি ত নিঃসন্তান। তোমার একটি পুত্র সন্তান জন্মিবে—তাহাকে কিন্তু ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করিবে। সে কখন মদ্য স্পর্শ করিবে না। তাহার চুল কখনও কাটা হইবে না। সে-ই ফিলিষ্টিয়ের বিরুদ্ধে ইস্রেলের মুক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ করিবে।"

তাহার জন্মের পর নাম রাখা হইল স্যাম্‌সন্ (Samson)। ভগবানের অনুগ্রহে দিন দিন সে ষোলকলায় বাড়িতে লাগিল।

বড় হইয়া একদিন টিম্‌নাথ সহরে একটি ফিলিষ্টিয় রমণীকে বিবাহ করিতে তাহার ভারি ইচ্ছা হইল। বাপ-মা কত বারণ করিলেন। কিন্তু সে কোন নিষেধ মানিল না। অগত্যা তাঁহারা রাজী হইয়া পাত্রীর বাপ-মায়ের সম্মতি পাইবার জন্য টিম্‌নাথ সহরের দিকে রওনা হইলেন। সহরের নিকট উপস্থিত হইলে হঠাৎ একটি সিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। স্যাম্‌সন্ অক্লেশে সিংহটিকে হত্যা করে। অনেক দিন পরে স্যাম্‌সন্ সেই পথে বিবাহ করিতে যাইবার সময় দেখিতে পাইল যে, সিংহের কঙ্কাল সেখানে পড়িয়া আছে। আর ইহার বক্ষ-পঞ্জরের মধ্যে একটি মৌচাক রহিয়াছে। মৌচাক হইতে কিছু মধু সে নিজেও লইল ও বাপ-মাকে দিল। তাঁহারা মধু খাইতে খাইতে পথ চলিতে লাগিলেন।

তাহার বিবাহ-উৎসবে টিম্‌নাথের ত্রিশজন যুবাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তাহারা পরস্পর ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। তখন স্যাম্‌সন্ তাহাদের বলিল, "যদি তোমরা সাত দিনের মধ্যে আমার ধাঁধার উত্তর দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদের ত্রিশটি গায়ের জামা ও অন্যান্য পোষাক দিব; না পারিলে তোমরা আমাকে দিবে।" তাহারা রাজী হইলে সে বলিল, "ভক্ষকের ভিতর হইতে মাংস বাহির হইল; আর রক্তের ভিতর হইতে মধু। বল দেখি কি?"

সপ্তম দিবসও তাহারা এই ধাঁধার উত্তর বাহির করিতে না পারিয়া স্যাম্‌সনের স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "তুমিই ত সব নষ্টের গোড়া। আমাদের ঠকানর জন্যই তোমরা আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে। ভাল চাও এই ধাঁধার উত্তর বল, না হইলে বাড়ী শুদ্ধ তোমাকে পোড়াইয়া মারিব।" তখন সে স্যাম্‌সনের নিকটে গিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া ধাঁধার উত্তর জানিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বলিল। সন্ধ্যার সময় তাহারা স্যাম্‌সনের নিকট উপস্থিত হইয়া সোল্লাসে বলিল, "ওহে, ভারী ত ধাঁধা। এই শোন উত্তর—"মধুর চেয়ে মিষ্টি কি? সিংহের চেয়ে বলিষ্ঠ কে?"। স্যাম্‌সন্ বলিল, "বুঝিতে পারিয়াছি—ঘরে বিশ্বাসঘাতক আছে।" এই বলিয়া সে আস্ফালন সহকারে গিয়া ত্রিশ জন ফিলিষ্টিয়কে বধ করিয়া তাহাদের পোষাক আনিয়া বাজির পণ শোধ করিল। কিন্তু স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় সে এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিল যে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া গেল।

কিছুদিন পরে রাগ পড়িয়া গেলে সে আবার টিম্‌নাথে ফিরিয়া গিয়া দেখে যে, তাহার স্ত্রী বিবাহ-উৎসবের একজন অতিথিকে বিবাহ বরিয়াছে। তাহার শ্বশুর বলিল, "তুমি ঘৃণাভরে আমার কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে, কাজেই তাহার আবার বিবাহ দিয়াছি। তাহার ভগিনী তাহার অপেক্ষা সুন্দরী। তুমি তাহাকে গ্রহণ কর।" স্যাম্‌সন্ আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। এই সময়ে মাঠে শস্য পাকিয়াছিল। স্যাম্‌সন্ তিনশত শিয়াল ধরিয়া জোড়ায় জোড়ায় তাহাদের লেজ বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে একটি প্রজ্বলিত

মশাল বাঁধিয়া শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিল। মাঠের সমস্ত ফসল ও বৃক্ষাদি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। তখন ফিলিষ্টিয়েরা ক্রোধান্ধ হইয়া স্যাম্‌সনের স্ত্রী ও তাহার পিতাকে পোড়াইয়া মারিল। ইহাতে স্যাম্‌সনের ক্রোধ তাহাদের উপর আরও বৃদ্ধি পাইল। সে তখন তাহাদের অনেককে হত্যা করিয়া প্রস্থান করিল। ইহাতে ফিলিষ্টিয়দের আর ক্রোধের সীমা রহিল না। তাহারা জুদা আক্রমণ করিল। জুদার অধিবাসীরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে, তাহারা স্যাম্‌সন্‌কে বন্দী করিতে আসিয়াছে—কারণ, সে তাহাদের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে। তখন জুদার লোকেরা স্যাম্‌সনের খোঁজে বাহির হইল।

একদিন এটামের শৈলশিখরে স্যাম্‌সন্‌কে দেখিতে পাইয়া জুদার (Judah) লোকেরা খুব তিরস্কার করিল। "কেন তুমি ফিলিষ্টিয়দের সঙ্গে বিবাদ করিয়া তাঁহাদের ক্ষতি করিয়াছ? তুমি কি জান না যে, তাঁহারা আমাদের প্রভু? আমরা তোমাকে বাঁধিয়া তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিব।" স্যাম্‌সন্‌ তাহাদিগকে কিছুমাত্র বাধা দিল না। তাহারা তাহাকে বাঁধিয়া ফিলিষ্টিয়দের কাছে আনিল। তখন তাঁহাদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? এদিকে স্যাম্‌সন্‌ কিন্তু দৈববলে বলীয়ান্‌ হইয়া অক্লেশে তাহার বাঁধন ছিন্ন করিয়া নিজেকে মুক্ত করিল ও পথপার্শ্ব হইতে একটি মৃত গাধার চোয়াল তুলিয়া লইয়া এক সহস্র ফিলিষ্টিয়কে হত্যা করিল।

অতঃপর স্যাম্‌সন্‌ বাইশ বৎসর ইস্রেলের বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত রহিল।

একদিন স্যাম্‌সন্‌ গাজানগরে (Gaza) গিয়া একটি গৃহে অবস্থান করিল। তাহার আগমনের কথা জানিতে পারিয়া গাজাবাসীরা তাহাকে হত্যা করিবার জন্য নগরের দ্বারে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মধ্য রাত্রে স্যাম্‌সন্‌ বাহির হইয়া নগর-তোরণে উপস্থিত হইয়া তোরণদ্বার উত্তোলন করিয়া কাঁধে লইয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। নগর-বাসীরা বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া চাহিয়া রহিল।

ইহার কিছুদিন পরে স্যাম্‌সন্‌ সোরেক উপত্যকায় দেলিলা (Delilah) নামে একটি রমণীকে ভালবাসিল। ফিলিষ্টিয় নেতারা দেলিলাকে অনেক ধনরত্ন দিবে বলিয়া প্রলুব্ধ করিয়া তাহাকে বলিল, "স্যাম্‌সনের শক্তির উৎস কোথায় জানিয়া আমাদিগকে বলিলে তোমাকে আমরা প্রত্যেকে ১১০০ রৌপ্যখণ্ড দিব।"

তখন দেলিলা স্যাম্‌সনকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল, "আচ্ছা বল দেখি তোমার শক্তির উৎস কোথায়? আচ্ছা তোমাকে কি দিয়া বাঁধা যায়?" স্যাম্‌সন্‌ উত্তর করিল, "আমাকে যদি কেহ সাতটি চিরসবুজ লতা দিয়া বাঁধে তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে অসহায় হইব।"

তখন ফিলিষ্টিয় নেতারা দেলিলাকে এইরূপ সাতটি লতা আনিয়া দিল। সে তাহা দিয়া স্যাম্‌সন্‌কে বাঁধিয়া ফেলিল এবং "ফিলিষ্টিয়েরা তোমাকে আক্রমণ করিতেছে" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ স্যাম্‌সন্‌ বিনা আয়াসে তাহার বন্ধন ছিন্ন করিল। তখন অভিমান করিয়া দেলিলা বলিল, "তুমি খালি আমাকে ধাপ্পা দিয়াছ। সত্য বল না, তোমাকে কি দিয়া বাঁধা যায়।" স্যাম্‌সন্‌ বলিল, "যদি কেহ আমাকে একেবারে আন্‌কোরা নূতন দড়ি দিয়া বাঁধে, তবে আমার আর কোন ক্ষমতা থাকে না।" আবার দেলিলা তাহাকে বাঁধিল। কিন্তু এবারও সে পূর্ব্বের ন্যায় বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেলিল। আবার কাকুতি মিনতি করিলে স্যাম্‌সন্‌ বলিল যে, তাহার সাত গোছা চুল যদি কেহ বাঁধে তাহা হইলে সে আর মুক্তি লাভ করিতে

প্রভু! একটিবার – শুধু একটিবার আমার দেহে বল দাও – শ্যামসন্

পারিবে না। এবারও দেলিলা তাহার কথামত কাজ করিয়া বোকা বনিয়া গেল। সে কিন্তু তবু দমিল না। স্যামসন্‌কে সম্বোধন করিয়া সে বলিল, "তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস কর না, তখন নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ভালবাস না। তিন তিন বার তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছ।" এইরূপে প্রত্যহই দেলিলা স্যাম্‌সন্‌কে অনুযোগ করিতে লাগিল। একদিন ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া স্যাম্‌সন্‌ সবই বলিয়া ফেলিল—"আমার মস্তক কখনও মুণ্ডন করা হয় নাই। কারণ, আমাকে যিহোবার চরণে উৎসর্গ করা হইয়াছে। আমার কেশ কাটিয়া ফেলিলে আমি একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িব।"

এইবার দেলিলা ফিলিষ্টিয় নেতাদের খবর পাঠাইল। তারপর স্যাম্‌সন্‌ তাহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে সে তাহার সাত গোছা চুল কাটিয়া ফেলিল। তখন সে 'ফিলিষ্টিয়েরা আসিয়াছে' বলিয়া চীৎকার করিবামাত্র স্যাম্‌সনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল নিঃশঙ্কচিত্তে সে তখন ঘরের বাহির হইলে ফিলিষ্টিয়েরা তাহাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিল। তাহারা তাহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিল এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গাজায় লইয়া গিয়া তাহাকে কারাগৃহে গম পিষিতে দিল।

কিছুদিন যায়; আবার একটু একটু করিয়া স্যাম্‌সনের চুল বাড়িতে লাগিল। একদিন ফিলিষ্টিয়েরা শত্রুর পরাভবের জন্য তাহাদের দেবতা ড্যাগনের মন্দিরে বলি উৎসর্গ করিল ও উৎসব করিতে মাতিয়া গেল। তখন হঠাৎ তাহাদের খেয়াল হইল যে, স্যাম্‌সন্‌কে লইয়া একটু মজা করা যাউক। নেতাদের আদেশমত স্যাম্‌সন্‌কে আনা হইল। সবাই তাহাকে নানারূপে উত্যক্ত করিতে লাগিল। শেষে তাহাকে বিশ্রামের জন্য একটু অবকাশ দিলে সে তাহার পথপ্রদর্শক বালককে বলিল, "আমায় একটি থামের নিকট দাঁড় করাইয়া দাও, আমি একটু বিশ্রাম করিব।" তখন সে ভগবানকে কাতরভাবে ডাকিয়া বলিল, "প্রভু, আমার প্রতি সদয় হও। একটিবার—শুধু একটিবার আমার শরীরে বল দাও, আমি ফিলিষ্টিয়দের উপর প্রতিশোধ লইব।" তারপর সে দুই হাতে দুইটি থাম ধরিয়া শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া ঝুকিয়া পড়িয়া বলিল, "এই ফিলিষ্টিয়দের সঙ্গে করিয়াই আমি মরিব।" তাহার আকর্ষণে সমস্ত গৃহ শুদ্ধ থাম দুইটি ভাঙ্গিয়া পড়িল। যত লোক ছিল সবাই চাপা পড়িয়া মারা গেল; কেহই নিস্তার পাইল না। মৃত্যুকালে স্যাম্‌সন্‌ যত শত্রু বধ করিয়াছিল, সারা জীবনেও সে তাহা করিতে পারে নাই।

১০৭৪ পৃষ্ঠার পর

বেদ কতকাল আগে রচিত হইয়াছিল, ঠিক করিয়া বলা কঠিন; তবে সে বহু সহস্র বৎসর আগেকার কথা। তখন মানুষ লিখিতে শিখে নাই, সুতরাং পড়িবারও দরকার হইত না। কিন্তু কথা কহিতে মানুষ তখনও পারিত এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানা বিষয়ে চিন্তাও করিত। বেদের সময় মানুষ পৃথিবীটাকে যেমন দেখিত, এখন হয়ত আমরা ঠিক তেমনই দেখি না। তখনকার মানুষের জীবনধারাও অনেকটা অন্য রকমের ছিল; খাওয়া-পরা, চাল-চলন সবই অন্য ধরণের ছিল। বেদ পড়িলেই আমরা জানিতে পারি, সে সময়কার লোকের রীতি-নীতি কিরূপ ছিল; সব বিষয়ে হয়-ত স্পষ্ট ধারণা আমরা করিতে পারি না; কিন্তু তথাপি মোটামুটি সে সময়কার লোকের জীবন-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা ধারণা আমরা করিতে পারি। আর সে সময়কার লোকে এই বিশ্ব-সম্বন্ধে কি ভাবিত, তাহাও আমরা বেদ হইতেই জানিতে পারি।

বেদ কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি। এইসব মন্ত্র বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত স্তব। এই সকল স্তব এক সময়ে একইস্থানে একই ব্যক্তিবৃন্দদ্বারা রচিত হয় নাই। অনেক দিন ধরিয়া বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ব্যক্তিকর্তৃক এই সকল রচিত হইয়াছিল। তখন লোকে লিখিতে জানিত না; সুতরাং এই সকল মন্ত্র লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইত এবং ক্রমশঃ এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হয়—যাঁহারা এই সব মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। পরবর্তী কালে ইহারাই ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে সম্মান লাভ করেন।

যখন এই সকল মানুষের সংখ্যা বহু হইয়া যায়, তখন একজন মনীষী এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া চারি ভাগে বিভক্ত করেন বলিয়া শোনা যায়। এই ভাবেই চারি বেদের উৎপত্তি হয়। যে মহাপুরুষ বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন, তাঁহার নাম বেদব্যাস। অনেক সময় তাঁহাকে ব্যাসদেবও বলা হয়। 'বেদব্যাস' ঠিক তাঁর নাম নয়; বেদকে 'ব্যস্ত' বা বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ঐ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। পরাশরের ছেলে বলিয়া তাঁহাকে 'পারাশরি' বলা হইত। এছাড়া, মাতার নাম অনুসারে এবং পিতামহের নাম অনুসারে তাঁহার আরও নাম আছে। কিন্তু তিনি বেদব্যাস নামেই পরিচিত বেশী।

চারি ভাগে বিভক্ত হওয়ার পরও বোধ হয় বেদ মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল। তার পর যখন লিখন-পদ্ধতির আবিষ্কার হইল, তখন উহা ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইল। আরও পরে যখন মানুষ বই ছাপিতে শিখিল, তখন বেদও ছাপা হইতে লাগিল। এখন আমরা হাতের লেখা বেদ আর বড় পড়ি না, ছাপারই পড়িয়া থাকি।

বেদের মন্ত্র যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন,তাঁহাদিগকে ঋষি কহিত। এই ঋষিদের জীবন-ধারা বড়ই সরল ছিল বলিয়া মনে হয়। তখনকার দিনে এখনকার মত বড় বড় শহর নিশ্চয়ই ছিল না; ট্রাম গাড়ী মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন প্রভৃতিও ছিল না; রেলগাড়ী, জাহাজ, টেলিফোন প্রভৃতির ব্যবহারও লোকে জানিত না। পরিবার কাপড় চোপড়ও সাদাসিধে ছিল। একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে পদস্থ ধনী ব্যক্তিরা অনেক সময় রথ ব্যবহার করিতেন। এই রথ ঠিক কি রকম দেখিতে ছিল, বলা কঠিন; তবে বর্ত্তমানে পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত টাঙ্গা এবং এক্কা প্রভৃতি যে ধরণের, অনেকটা সেই ধরণের ছিল বলিয়া মনে হয়।

ঋষিরা সাধারণতঃ জনপদে অর্থাৎ গ্রামে আসিতেন বলিয়াই মনে হয়। দুই-একটা ছোটখাটো শহরও তখন হইয়া থাকিবে; তাহাতে অন্য লোক বাস করিত। এই সকল লোক এবং মন্ত্র-রচয়িতা ঋষিরা সকলেই এক সমাজের অন্তর্ভূত ছিলেন। ইঁহাদের জাতিগত নাম আর্য্য। আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী ছিলেন না; মধ্যএশিয়ার কোন্ এক স্থানে তাঁহারা থাকিতেন; সেখান হইতে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হইয়া তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন।

ভারতবর্ষ তখন একেবারে জনমানবহীন ছিল না। ভারতের আদিম অধিবাসীদিগকে সাধারণভাবে 'অনার্য' বলা হইয়া থাকে। ইহারাও একেবারে অসভ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না; এমন কি, ইহাদের নির্ম্মিত দুই একটা নগরের ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বহিরাগত আর্য্যদের সঙ্গে ইহাদের তুমুল কলহ হয়; দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বিবাদ চলে, অনেক মারামারি কাটাকাটি হয়; পরিণামে আর্য্যরাই জয়ী হন।

দেশে অনেক বন-জঙ্গল ছিল। সেই সকল আবাদ করিয়া আর্য্যেরা বসতি করেন এবং ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে ও দক্ষিণদিকে বসতি বিস্তার করিয়া সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া ফেলেন। আর্য্যদের এই বসতি-বিস্তার গঙ্গানদীর কূলে কূলে পূর্ব্বদিকেই সহজে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গঙ্গাকে যে হিন্দুরা এত পবিত্র মনে করেন, ইহাও তাহার একটা কারণ হইয়া থাকিবে। এই ভাবে আর্য্যেরা ক্রমশঃ বর্ত্তমান বিহার প্রদেশ পর্য্যন্ত বসতি-স্থাপন করিয়া ফেলেন; তার পর অবশ্যই আরও চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষই তাঁহারা অধিকার করেন।

বেদের কোন কোন অংশ হয়ত আর্য্যদের ভারতে সৃষ্টির আগে কিছু ছিল কি না, ইত্যাদি প্রশ্নের উন্মেষ বেদের মন্ত্রভাগেও দেখিতে পাওয়া যায়। দুই একটা নমুনা এখানে দেওয়া যাইতে পারে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এই প্রকার দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনা আমরা যথেষ্ট পাই। এক জায়গায় ঋষি কহিতেছেন—"আদিতে হিরণ্যগর্ভ ছিলেন: তিনি সমস্ত ভূত-গ্রামের ঈশ্বর ছিলেন। পৃথিবী এবং আকাশ তিনি ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন"—ইত্যাদি। (১০।১০।১২১)। এখানে আমরা দেখিতে পাই বৈদিক ঋষি জগতের স্রষ্টাকে জানিতে চাহিতেছেন।

জগৎ-সৃষ্টির আগে কি অবস্থা ছিল, তাহার দুই একটি চমৎকার বর্ণনাও আমরা এই দশম মণ্ডলে পাই। "তখন, অর্থাৎ যখন এই জগতের উৎপত্তি হয় নাই, সেই সময়ে, সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, এই পরিদৃশ্যমান লোকও ছিল না, এই আকাশও ছিল না এবং কোন কিছুই ছিল না"—ইত্যাদি। আবার "তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না, রাত্রিও ছিল, না এবং দিবাও ছিল না" —ইত্যাদি। (১০।১১।১২৯)

বেদের মন্ত্রভাগে দার্শনিক চিন্তা এর বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। দর্শন শাস্ত্র যাহা জানিতে চায়, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা ঋষিদের মনে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা আমরা উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে দেখিতে নাই। কিন্তু জগৎ-সৃষ্টির আদিতে কিছুই ছিল না, এ কথা বলিলেই জগৎ-সম্বন্ধে দার্শনিকদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। পরবর্ত্তী দর্শনের মাপ-কাঠিতে দেখিতে গেলে বেদের মন্ত্রভাগে দর্শন খুব বেশী পাওয়া যায় না।

বেদের মন্ত্রভাগ ক্রিয়া-বিধির অধীন ছিল। নানা প্রকার যাগাদি ক্রিয়ায় এই সকল মন্ত্রের প্রয়োগ হইত। ক্রমশঃ এই ক্রিয়ার উপরই আর্য্যদের ঝোঁক পড়িয়া গেল বেশী; নূতন মন্ত্র রচনার চেয়ে প্রাচীন মন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগ কি ভাবে করিতে হইবে, তাহা লইয়া ঋষিরা মাতিয়া গেলেন। সুতরাং দার্শনিক গবেষণা আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। এই ভাবে কিছুদিন কাটিল।

এদিকে আর্য্যেরা এই সব ক্রিয়া-কর্ম্মের বিচার করিতে করিতে গঙ্গার তীরে তীরে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময় ধরিয়াই হয় ত বেদের উত্তর ভাগ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ রচিত হইয়াছিল। উপনিষদে কাশী এবং বিদেহ-মগধের এত: উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মনে হয়, বেদের এই সব অংশ বিদেহ মগধেই (বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের উত্তরাংশেই) রচিত হইয়াছিল। যেখানেই রচিত হইয়া থাকুক, এই উপনিষদ্‌গুলিতে আমরা গভীর দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পাই। আর এই যুগের দার্শনিকদের জীবন-ধারার সহিত আমাদের পরিচয় সম্ভব হয়। প্রাচীন বৈদিক যুগের ঋষিদের জীবন পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ; কিন্তু উপনিষদের ঋষিদের জীবনের অনেক কথা আমরা জানিতে পাই।

বেদ মূলতঃ চারিটি, এবং ইহাদের মন্ত্র-সংখ্যাও সাধারণভাবে সর্ব্ব-সম্মত। কিন্তু ক্রিয়া-কর্ম্মের খুঁটিনাটি লইয়া অনেক মতভেদ হয় এবং তার ফলে প্রত্যেক বেদেরই অনেকগুলি 'শাখা' হইয়া যায়। যাঁহারা ঋগ্বেদ অনুসরণ করিতেন, তাঁহাদিগকে ঋগ্বেদী বলা হইত; আর যাঁরা সামবেদ অনুসরণ করিতেন, তাঁহাদিগকে সামবেদী বলা হইত; এই প্রকার চারি-বেদ অনুসারে আর্য্যেরা চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। এই বিভাগ বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদেরই হইয়াছিল, কারণ, তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিতেন এবং বৈদিক যাগাদিতেও তাঁহারাই নেতৃত্ব করিতেন। তথাপি সাধারণ-ভাবে এই বিভাগ ব্রাহ্মণদের যজমান অন্যান্য জাতিতেও সংক্রান্ত হইয়াছিল।

বেদের চারিটি ভাগ অনুসারে যেমন আর্য্য সমাজ চারিটি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল তেমনি প্রত্যেক বেদের শাখা-বিভাগ অনুসারেও ঐ চতুর্ধা বিভক্ত সমাজ আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। এই বিভাগ মূলতঃ এবং প্রধানতঃ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং আচার লইয়া হইলেও ক্রমশঃ মন্ত্রাদির পাঠে এবং ব্যাখ্যা প্রভৃতিতেও ইহার বিস্তার ঘটে। সেইজন্য শাখা-ভেদ অনুসারে ঠিক বেদ ভেদ না ঘটিলেও ব্রাহ্মণ-ভেদ এবং উপনিষদ্-ভেদ হইয়াছিল; আর অনেক স্থলে একই মন্ত্রের পাঠান্তরও এই অনুসারে ঘটিয়া যায়।

চারি বেদের শাখার সংখ্যা সমান নয়; এবং সেই জন্য ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের সংখ্যাও সব বেদের এক নয়। মোটের উপর এই চারি বেদের কতটি শাখা ছিল এবং উহাদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ই বা কতগুলি ছিল, ঠিক জানা যায় না। "মুক্তিকা-উপনিষদ্"—নামক একখানা বইয়ে বেদের শাখাগুলির একটা সংখ্যা দেওয়া আছে; আরও দুই এক জায়গায় এই শাখা-সমূহের গণনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই সব গণনা অনুসারে চারিবেদের শাখা সর্ব্বসমেত এক হাজারেরও উপর ছিল। কিন্তু যে সংখ্যা আমরা পাই, সেগুলির নাম কোথাও মিলে না, এবং তাহাদের অস্তিত্বের কোন নির্ভুল ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায় না।

'মুক্তিকা উপনিষদ্' আরও বলেন যে, প্রত্যেক শাখারই একখানা করিয়া উপনিষদ্ ছিল। তাহা হইলে উপনিষদের সংখ্যাও হয় এক হাজারের উপর। ইহার অর্দ্ধেকেরও নাম 'মুক্তিকা' উপনিষদ্ দিতে পারেন নাই; আমরাও এত সংখ্যক উপনিষদের কোন উদ্দেশ এখন পর্য্যন্ত পাই নাই। আধুনিক পণ্ডিতদের অনুসন্ধানের ফলে প্রায় আড়াই শত উপনিষদের নাম পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে বেশীর ভাগই ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র; সাহিত্যিক কিংবা দার্শনিক মূল্য ইহাদের কিছুই নাই। পরবর্ত্তী দার্শনিক আলো-চলনায় যে সব উপনিষদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা অতি সামান্য। যে সব উপনিষদ্ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটির নাম করা যাইতে পারে:—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর, কৌষীতকি ও কৈবল্য।

এই সব উপনিষদের ভিতর ভারতীয় দর্শন ও দার্শনিক দের যে সব পরিচয় মিলে, তাহা এক অমূল্য সম্পদ। ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়; তোমাদের কাছে এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকজন দার্শনিক ও তাঁহাদের দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা দিব।

'বৃহদারণ্যক নামক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য নামক একজন দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি অতি প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন; ইঁহার জীবন এবং দর্শন দুই-ই সম্মানের যোগ্য। তখন মিথিলার রাজা ছিলেন জনক। ভবভূতি নামক নাট্যকার বলিয়াছেন, ইনিই রামের শ্বশুর এবং সীতার পিতা রাজর্ষি জনক। জনক রাজা দর্শন শাস্ত্রের বড় পক্ষপাতী ছিলেন; তাঁহার সভায় প্রায়ই বড় বড় দার্শনিকদের সমাগম হইত এবং নানা প্রকার বিচার গবেষণা হইত। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ইঁহার সভায় প্রায়ই যাতায়াত করিতেন।

একবার জনক রাজা একটা খুব বড় যজ্ঞ করেন। তাহাতে কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি বহু দূর দেশ হইতে

পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। যজ্ঞে বহু টাকা খরচ হয় এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর দক্ষিণা দেওয়া হয়। যজ্ঞের শেষে রাজর্ষি জনক এক হাজার গরু একত্র করিয়া বাঁধিলেন এবং ইহাদের প্রত্যেকটির শিংয়ে দশ পাদ করিয়া সোনা বাঁধিয়া দিলেন। তারপর সমবেত পণ্ডিতদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি কহিলেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত, তিনি এই গরুগুলি লইতে পারেন।" ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহই সাহস করিয়া গরু লইতে অগ্রসর হইতে পারিলেন না; তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্যদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই গরুগুলি বাড়ী লইয়া যাও।"

এই সব ব্রাহ্মণদের ভিতরে যাজ্ঞবল্ক্য নিজেকে সকলের চেয়ে বড় বিদ্বান মনে করেন, এই দেখিয়া উপস্থিত সকলেই তাঁহার উপর অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে বিচারে আহ্বান করিলেন। এক জনের পর আর একজন তাঁহাকে প্রশ্নজালে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন! অনেক দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনা সেখানে হইল।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত্যুর দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন হইয়া আছে; যজমান এই মৃত্যু হইতে মুক্তি পাইতে পারে কি প্রকারে?" আর একজন প্রশ্ন করিলেন, "যজ্ঞ করিয়া যজমান যে স্বর্গে যায়, তাহার প্রণালীটি কি? তৃতীয় ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন, "যজ্ঞ-বিশেষে কতটি মন্ত্র কে কে উচ্চারণ করিবেন, সেই সম্বন্ধে।" আর একজন প্রশ্ন করিলেন, "মানুষ যখন মরে, তখন তাহার প্রাণ কি উপর দিকে উঠিয়া যায়?" আবার একজন জিজ্ঞাসা করিলেন। "মানুষ মরিয়া গেলেও তাহাকে ত্যাগ করে না, এমন কি কিছু আছে?" অপর এক প্রশ্ন হইল, "অশ্বমেধ যজ্ঞ যাহারা করে তাহাদের কি ফললাভ হয়?"

এইরূপ বহু প্রশ্নের উত্তর যাজ্ঞবল্ক্য দিলেন। কিন্তু ইহাতেও সমবেত জনতা তৃপ্ত হইল না। জনতার ভিতরে অনেক বিদুষী মহিলাও ছিলেন; অতঃপর তাঁহারাও যাজ্ঞবল্ক্যের উপর প্রশ্নবাণ করিতে লাগিলেন। গার্গী বাচক্নবী বলিয়া একজন মহিলা ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, এই জগৎ জলেতে ওতপ্রোত-ভাবে আছে বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু এই জল আছে কোথায়? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "বায়ুতে" "বায়ুর আশ্রয় কি?" "অন্তরীক্ষ"। আবার প্রশ্ন হইল, "অন্তরীক্ষের আশ্রয় কি?" যাজ্ঞবল্ক্য তাহারও উত্তর দিলেন এবং সমস্তের আশ্রয় ব্রহ্মলোক, ইহাই কহিলেন। ইহার পরেও গার্গী প্রশ্ন করিলেন, "ব্রহ্মলোকের আশ্রয় কি?" এইবার যাজ্ঞবল্ক্য চটিয়া গিয়া উত্তর করিলেন, "বেশী জানিতে চাহিবেন না, গার্গী; তাহাতে বিপদ আছে।" অতঃপর গার্গী চুপ করিলেন।

গার্গী থামিলেন বটে, কিন্তু প্রশ্ন থামিল না। ইহার পরেও এক জনের পর আর এক জন নানাপ্রকার প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এক জন প্রশ্ন তুলিলেন, "জগতের অন্তর্যামী কে?" ইহার অতি সুন্দর উত্তর যাজ্ঞবল্ক্য দিলেন।

"যিনি পৃথিবীতে আছেন অথচ পৃথিবী হইতে ভিন্ন যাঁহাকে পৃথিবী জানিতে পারে না, অথচ পৃথিবী যাহার দেহ, এবং ভিন্ন হইয়াও যিনি ভিতর হইতে পৃথিবীকে পরিচালনা করেন, সেই যে তোমার আত্মা, তিনিই অমর অন্তর্যামী। এইরূপে যিনি অগ্নিতে, অন্তরীক্ষে, বায়ুতে, আকাশে, সূর্য্যে, চারিদিকে, চন্দ্রতারকায়, অন্ধকারে, আলোতে,—এক কথায় সর্ব্বত্র সব জিনিষে থাকিয়াও সব জিনিষ হইতে পৃথক্ এবং সব জিনিষ যাঁহার দেহ-স্বরূপ এবং সব জিনিষকে যিনি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই অন্তর্য্যামী আত্মা। যিনি বাক্যে আছেন, শ্রবণে আছেন, চক্ষুতে আছেন, মনে আছেন, —যাঁহাকে দেখা যায় না, অথচ যিনি দেখেন, যাঁহাকে শোনা যায় না, অথচ যিনি শোনেন, যাঁহাকে জানা যায় না, অথচ যিনি সব জানেন, যাঁহার উপরে দ্রষ্টা, শ্রোতা বিজ্ঞাতা নাই,—তিনিই অন্তর্যামী আত্মা।"

এইরূপ প্রশ্নোত্তর আরও কিছুক্ষণ চলে। কিন্তু ইহার পরে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। শাকল্য নামক একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ব্বের শত্রুতা ছিল বলিয়া মনে হয়। এই শাকল্য এইবার প্রশ্ন করিতে অগ্রসর হন। অনেকক্ষণ বাদানুবাদ চলে। তার পর শাকল্য এক প্রশ্ন করিয়াই বলেন, "যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন, তবে আপনার মাথা খসিয়া পড়ে যেন!" যাজ্ঞবল্ক্য তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং প্রশ্নের উত্তর দিলেন। কিন্তু সে উত্তর শাকল্যের মাথায় ঢুকিল না, সুতরাং তাঁহার মাথা খসিয়া পড়িল এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার হাড় কয়খানা লইয়া পলাইয়া গেল। এই ব্যাপারটা কি, ভাল বোঝা যায় না; কৃষ্ণ যেমন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ঝগড়া করিয়া শিশুপালকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেইরূপ একটা কিছু হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, এর পর আর কেহ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে সাহস পাইলেন না। যাজ্ঞবল্ক্যের জয় স্বীকৃত হইল।

সিরিয়া

১২৬৪পৃষ্ঠার পর

সিরিয়া এসিয়ার একটি ছোট দেশ। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব তীরে ইহার অবস্থান। ইহার সীমা এসিয়া মাইনর,(Asia Minor) পূর্ব্ব সীমা ইরাক্ (Iraq), দক্ষিণে ট্রান্স জর্দ্দান (Trans Jordan) ও প্যালেষ্টাইন

পূর্ব্বে সিরিয়া তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন সিরিয়া ফরাসীদের কর্ত্তৃত্বাধীনে শাসিত হইয়া থাকে বর্ত্তমানে সিরিয়া ও লেবানন্, লতাকিয়া (Latakia) আলাওইয়া (Alwayia) এবং জেবেল-এদ্ দ্রুজ্ Jebel-ed-Druz) প্রভৃতি এক রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক অবস্থা

সিরিয়াকে পার্ব্বত্য দেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেবানন্ ও আন্টিলেবানন্ পর্ব্বতশ্রেণী ভূমধ্যসাগরের তীরে তীরে পাশাপাশি ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে। লেবানন্ পর্ব্বতের উচ্চতা ১০,৫৪০ ফিট হইবে, তিমারুমের (Timarum) কাছাকাছি। আরদাহ্ র-এল্-খাদেবের কাছাকাছি হইবে প্রায় ১০,৫০৫ ফিট্। এই পর্ব্বত-শ্রেণীর পূর্ব্বদিকের অধিতক্যাপ্রদেশ ক্রমশঃ ঢালু হইয়া ইরাকের মরুভূমির সহিত যাইয়া মিশিয়াছে। দক্ষিণদিকের উর্ব্বর প্রদেশের নাম হোরান্ (Hauran) এদেশের প্রধান নদীর নাম ওরোন্তেস্ (Orontes)। ইহা প্রায় দুই শত মাইল দীর্ঘ। ইউফ্রেতিস্ নদী

নদী

ইরাকের উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

সিরিয়ার সহিত অনেক পুরাণো কথা জড়ান রহিয়াছে। বাইবেলে সিরিয়ার কথা অনেক আছে। এই দেশের উপর দিয়া অনেক রণ-দুন্দুভি বাজিয়া গিয়াছে। সেই খুব প্রাচীন ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিলে ঐতিহাসিক যুগে দিগ্বিজয়ী বীর আলেক্জাণ্ডার হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক রোমক বীর এই দেশের উপর দিয়া বিজয়-যাত্রা করিয়াছেন।

লোক-জন

সিরিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। খৃষ্টান, দ্রুজ্ প্রভৃতি নানাজাতীয় লোকও এদেশে বাস করে। ধর্ম্ম লইয়া কলহ এখানে অনবরতই চলিয়া আসিতেছে। এজন্য নানা অশান্তি ঘটিতেছে। তাহার ফলে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও খুব ক্ষতি হইতেছে।

কৃষিকার্য্য

কৃষিকার্য্যই এদেশের লোকের প্রধান জীবিকা। তামাক এখানকার প্রধান কৃষি। রেশম-কীট পালনও একটা প্রধান ব্যবসায়। এদেশের জমি তেমন উর্ব্বর নয়। লেবানন্ পাহাড় সাগর-তীরে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া সামুদ্রিক বায়ু দেশের ভিতরে আসিতে পারে না, কাজেই বৃষ্টি তেমন হয় না। এজন্য জলের অভাব খুব বেশী। সিরিয়ার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে জলের অভাব এত বেশী যে, কৃষকদের সহিত গৃহস্থদের জল লইয়া প্রায় বিবাদ হয়। যে সব ছোট ছোট খাল বা জল-নালী আছে, কৃষকেরা তাহাদের ক্ষেতের ভিতর দিয়া উহার প্রবাহ লইয়া যাইতে চাহে, আর গৃহস্থেরা চাহে তাহাদের গ্রামের কাছাকাছি দিয়া লইতে। ফলে, ঝগড়া বাধে এবং আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়।

সময় সময় ঝড়ো হাওয়ার মত তীব্র বায়ু দেশের উপর দিয়া বহিয়া যায়। তাহার ফলে ধূলিপূর্ণ বাতাস চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তখন চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া যায়, সে সময় সিরিয়ার পথে চলা দুষ্কর হইয়া উঠে।

প্রবল বায়ু

এদেশে যেমন গ্রীষ্ম, তেমনি শীত। তবু এদেশের স্বাস্থ্য ভাল। এখানকার সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের শোভা পরম রমণীয়। আকাশ তখন নানাবর্ণে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে।

সিরিয়ার গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে উষ্ট্রই প্রধান। বোঝা বহিতে, মরুভূমির পথে চলাফেরা করিতে উষ্ট্রই হইতেছে একমাত্র প্রাণী। এদেশের লোকেরা উটের দুধ খায়, উটের মাংস খায়, উটের চামড়াদিয়া জিনিষপত্র সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করে। উটের লোমদিয়া তাঁবু তৈয়ারী করে আর উটের পুরীষ শুকাইয়া ঘুঁটে প্রস্তুত করিয়া জ্বালানীর কাজ করে। সিরিয়ার মত মরুভূমির দেশে ঘোড়া বাঁচে না, কাজেই, ঈশ্বর এদেশের লোকের উপকারের জন্য উটের সৃষ্টি করিয়াছেন।

গৃহপালিত জীবজন্তু

প্রতি বৎসর হাজার হাজার মক্কাতীর্থযাত্রী সিরিয়া দেশের মধ্য দিয়া মক্কা, মদিনা প্রভৃতি তীর্থস্থানে গমনাগমন করে। এই যাত্রীদের মধ্যে কেহ বা পায়ে হাটিয়া যায়, কেহ বা উটের পিঠে চড়িয়া যায়। অনেক যাত্রী এখন রেলের গাড়ীতে যাতায়াত করে। রেলগাড়ী চলাচলের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের লোকের জীবনযাত্রার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু অধিবাসীরা এমনই রক্ষণশীল যে, এখনও পর্য্যন্ত প্রাচীন রীতিনীতির বড় একটা পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

সিরিয়াকে আমরা দূর হইতে যেমন মস্ত বড় মরু-দেশ বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। সমতল ভূমি দিয়া যাইতে যাইতে পথের মধ্যে প্রায়ই গ্রামের পর গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে যাইবার পথে চাষ করা মাঠও যেমন দেখা যায়, তেমনি মরুভূমির উষর প্রান্তরও চোখে পড়ে। প্রত্যেক গ্রামেই এক একটি মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়। মস্‌জিদের গায়ে গায়ে লোকের ঘর-বাড়ী। কোথাও কোথাও পাহাড়ের গায়ে দুই একটি ক্ষুদ্র পল্লী বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত।

এদেশের ঘর-বাড়ী কি ধনী, কি দরিদ্র প্রায় সকলেরই এক ধরণের। ধনীর বাড়ীর ঘরে নানারূপ কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখেই একটি দরদালান, তারপর বসিবার ঘর বা বৈঠকখানা ঘর। বড়লোকের বাড়ীর বৈঠক-খানা ঘরের তিন দিক্ বেড়িয়া কক্ষ-প্রাচীরের ঠেস্ দেওয়া বসিবার আসন আছে। অতিথিরা ঐ সব আসনের উপর বসে;—গৃহস্বামী মধ্যস্থলে একখানি নীচু আসনে বসিয়া থাকেন। চাষীদের বাড়ীতে কোন বসিবার ঘর থাকে না। তাহারা ঘরের মেজের উপর মাদুর বিছাইয়া বসিবার বন্দোবস্ত করে। ঘরের কোণে কম্বল, মাদুর, বালিস এইসব জড় করা থাকে, রাত্রিতে ঐসব পাতিয়া শয়ন করে। কাফি খাইবার বাসন কোসন ও সাজসরঞ্জাম, কি চাষা, কি ধনী সকলের বাড়ীতেই দেখা যায়।

সিরিয়াবাসী আরব

এদেশের লোকেরা যেমন অদৃষ্টবাদী, তেমনি নানা-প্রকার তাবিজ-কবচ, মন্ত্রতন্ত্র কবচ ও ঔষধের প্রতিও ইহাদের খুব বিশ্বাস। আপদ-বিপদের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য দেওয়ালের গায়ে কোরাণ-শরীফের আয়াৎ খোদিত করিয়া রাখে। ধনীদের বাড়ীতে বাড়ী ঘরে শিল্পচাতুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। কোনও মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীতে পশু পক্ষী বা অন্য কোন রূপ জীবজন্তুর চিত্র থাকে না।

এই মরুভূমির দেশের লোকেরা ভোজন-বিলাসী। তাহারা নিজেরা যেমন খাইতে ভালবাসে, তেমনি অতিথি ও অভ্যাগতকে খাওয়াইতেও ভালবাসে। ঘরের মধ্যে আসন পাতিয়া নানারূপ সুখাদ্য সাজাইয়া ইহারা খাইতে বসে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সুরুয়া, মাংস, ভাত, রুটী, পিষ্টক এ সব থাকে। সকলের শেষে উটের দুধ খায়। খাওয়া হইয়া গেলে একজন ভৃত্য জলভরা একটি পাত্র প্রত্যেক অভ্যাগতের নিকট হাত ও মুখ ধুইবার জন্য লইয়া যায়।

সিরিয়ার লোকেরা কাফি খুব ভালবাসে। কাফি ভোজের একটি প্রধান অঙ্গ। ছোট ছোট বাটিতে করিয়া ভোজের আগে প্রত্যেক নিমন্ত্রিতকে কাফি পান করিতে দেওয়া হয়।

পোষাক পরিচ্ছদ

এদেশের পুরুষ ও মেয়েদের পোষাক প্রায় একই রকমের—ঢিলা জামা ও কাপড়। মাথায় রুমাল বাঁধে ও টুপি বা পাগ্‌ড়ী পরে। মুসলমান স্ত্রীলোকেরা বোরখা পরিয়া চলাফেরা করেন। এখানকার আমোদপ্রদ ক্রীড়া-

আমোদ প্রমোদ

কৌতুকের মধ্যে একটি অতিপ্রিয় হইতেছে গেজেল (Gazelle)—এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণসার হরিণ, শিকার। পাহাড়ের উপরে ও নীচে গেজেল বাস করে;—শিকারীরা ইহাদের পিছনে পিছনে ছুটিয়া ইহাদের শিকার করে।

সিরিয়ার লোকেরা সাধারণতঃ দীর্ঘজীবন লাভ করে। গ্রামের লোকদের বয়স সম্বন্ধে ধারণা অদ্ভুত রকমের। বয়সের হিসাব কেহই বড় একটা রাখে না। চল্লিশ বৎসর বয়সের কাহাকেও যদি তাহার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে সে বলিবে মাত্র উনিশ বৎসর! এই রকম অদ্ভুত কথা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। বয়সের সম্বন্ধে যেমন অদ্ভুত জ্ঞান, তেমনি রোগ ও ঔষধ সম্বন্ধে ধারণাও বিচিত্র রকমের। লাল টক্‌টকে লোহা পোড়াইয়া দাগ দিলে কিংবা কোরাণ-শরীফের কোনও বয়াৎ লিখিয়া গিলিয়া খাইলেই রোগ মুক্তি হয়, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস।

সিরিয়ার বেদুইনরা আজ এখানে তাঁবু ফেলিল, কাল আবার অন্যত্র লইয়া গেল, এইরূপ যাযাবর রূপে বাস করিয়া আসিতেছে। ঝগড়া-কলহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইহাদের নিত্যকার ব্যবহার। বেদুইনরা নানা শাখা বা জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে খুব একতা আছে। বিপদে পড়িলে প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করে। একজন যদি একান্ত দরিদ্র ও নিঃসম্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে তাহার জ্ঞাতিরা তাঁবু, টাকা কড়ি এবং উট, ভেড়া এ সকল দিয়া তাহার অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়া থাকে।

উত্তর সিরিয়ায় ঘরে ঘরে তাঁত আছে। স্ত্রী-লোকেরা সুন্দর সুন্দর রেশমী কাপড় বয়ন করে।

তাঁতের প্রচলন

গ্রামের পথ-ঘাট জুড়িয়া রেশমী কাপড় ছড়ান দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত কষ্ট করিয়া যাহারা বয়ন করে, তাহারা পারিশ্রমিক হিসাবে অতি অল্প

টাকাই পায়। কিন্তু যাহারা এখানকার রেশমী কাপড় নানাদেশে চালান দেয়,তাহাদের হয় প্রচুর অর্থ লাভ।

সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস্ (Damascus) একটি সমতল উর্ব্বর ভূমিতে অবস্থিত। সিরিয়ার মধ্যে এই সহরটি যেমন সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তেমনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রাচীনকালে দামাস্কাস্ নগরী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। অনেকের মতে দামাস্কাস্ পৃথিবীর সব চেয়ে পুরাণো সহর। বাবিলনের চেয়েও দামাস্কাস্

দামাস্কাস্

দামাস্কাসের বাজার

প্রাচীন। আজ বাবিলনের ধ্বংসাবশেষ মেসোপটামিয়ার মরুভূমির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া আছে, কিন্তু দামাস্কাস্ এখনও তাহার প্রাচীন গৌরব লইয়া বিদ্যমান। এক সময়ে দামাস্কাস্ রোমের অধীন ছিল। রোমকদের হাত হইতে ইহা আরবদের হাতে আসে। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রাচীন নগরী তুর্কীদের অধিকারভুক্ত হয়। প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত দামাস্কাস্ খালিফদের রাজধানী ছিল। এখানকার আশ্চর্য্য ও সুন্দর বাড়ী-ঘর, মসজিদ, মুসলমান-পল্লী, ইহুদী-পল্লী ও খৃষ্টান-পল্লীর বাড়ী-ঘর বস্তুতঃই অতিশয় মনোহর দামাস্কাসে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানকার তরোয়াল এবং ধাতব শিল্প প্রসিদ্ধ। এখানকার ঝিনুকের কাজও মুক্তার কাজ অতি সুন্দর। দামাস্কাস্ হইতে বেরুট্ ও আলিপোর দূরত্ব ১৮০ মাইল। রেলপথ দ্বারা দামাস্কাসের সহিত ইহাদের যোগ রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ যখন ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল, সেখানকার অসভ্য অধিবাসীরা যখন প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বন্য পশুদের

দামাস্কাসের একটি রাজপথ

সহিত কলহ করিত, সে সময়ে দামাস্কাস্ পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান নগরী রূপে পরিচিত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শত শত বৎসর ইহার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু এখানকার রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে তেমন কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

বাজারের কথা।

দামাস্কাসের বাজারে গেলে এই সত্যটি বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারা যায়। আগে সেই সত্যিকার যুগে যেমন করিয়া রেশম তৈয়ারী হইত, এখন এই সভ্যতার

যুগেও তেমনি করিয়া তৈয়ারী হইতেছে। বাজারের

খান বা সরাই
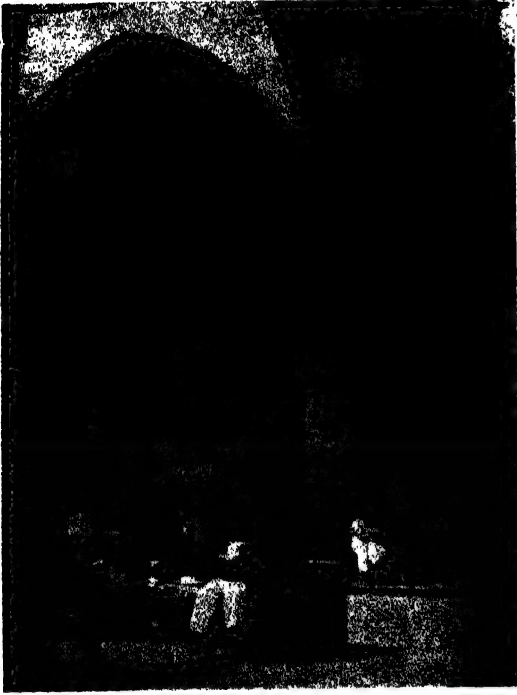
অপ্রশস্ত গলির দুইধারে দোকানের সারি। বুলগেরিয়ার ন্যায় দামাস্কাসও গোলাপী আতরের জন্য প্রসিদ্ধ কোথাও চামড়ার, ঘোড়া ও গাড়ীর সাজোয়া তৈয়ারী হইতেছে, লোহার কামারেরা হাতুড়ী পিটিতেছে, তামার বাসন ইত্যাদি বিক্রী হইতেছে, ফল-বিক্রেতারা ফলের দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। দামাস্কাস সহরে অনেক ভোজনশালা (Restaurant) আছে। অনেকেই আরামে বসিয়া রুটি, মাংস, সুরুয়া, কাফি খাইয়া থাকে। এদেশের রুটি কতকটা চাপাটির মত।

আলিপোর প্রাচীন দুর্গ

সিরিয়ার লোকদের মধ্যে এখনও শিক্ষার তেমন প্রচলন হয় নাই। খুব অল্প লোকেই লেখা-পড়া জানে। এজন্য কাফিখানায়, ভোজনশালায় পেশাদারী লেখক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা নিরক্ষর লোকদের চিঠি পত্র লিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। বাজারের মধ্যে এইরূপ নানা বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ ও নারীরা ব্যস্তভাবে চলাফেরা করিতেছে, উট, গাধা ও কুকুর পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছে। এখানের পথে-ঘাটে অসংখ্য কুকুর দেখা যায়। মুসলমানেরা কুকুরকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করেন। লালরঙের কুকুরগুলি পথে-ঘাটের নোংরা ঘাঁটিয়া বেড়ায়।

খান্ বা সরাই

দামাস্কাসের সর্ব্বত্র অনেক খান্ (Khan) বা সরাই দেখা যায়। এই সব সরাইয়ে সাধারণতঃ বিদেশী বণিকেরা ও তীর্থযাত্রীরা আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এসব সরাইয়ে দেখিতে পাইবে,—কোথাও বস্তা বস্তা পণ্য-দ্রব্য পড়িয়া আছে, কোথাও উট শুইয়া আছে,—প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড জলপাত্র, সেখানে উট, গাধা পশুরাও যেমন জলপান করিতেছে, তেমনি পথিকেরাও সেখান হইতে পানীয় জল সংগ্রহ

করিতেছে—স্বাস্থ্যের দিকে কাহারও কোন লক্ষ্য নাই।

আলিপো

আলিপোও সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ নগরী। বাইবেলে ইহার নাম হেল্‌বোন্ (Helbon)। তুর্কীরা ইহার নাম দিয়াছে হালেব্ (Haleb)। কুওয়েক্ (Kuweik) নদীর তীরে একটি সমতল ভূমির উপর আলিপো

পালমিরার বিজয়-তোরণ

অবস্থিত। আলিপো সহরটি খুব প্রাচীন, কিন্তু বারবার ভূমিকম্প ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য ইহার প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্ন কিছুই নাই বলিলেই চলে। এখানকার জামসাকরিয়া একটি প্রসিদ্ধ মস্‌জিদ্। কিংবদন্তী
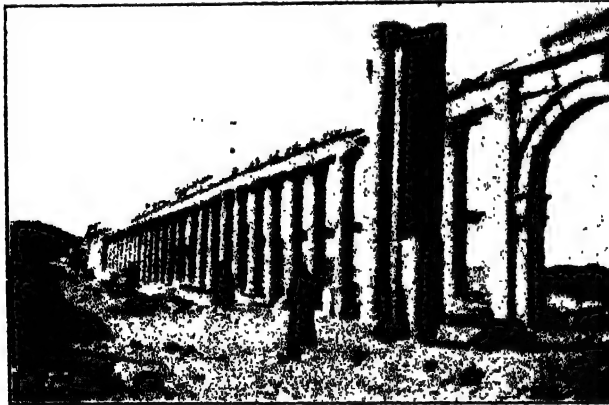
রাজবাড়ীর একটি দিকের দৃশ্য

এইরূপ যে, এখানে জন্ দি ব্যাপটিষ্টের (John the Baptist) দেহাবশেষ আছে।

রেশম, পশম, তুলা, তামাক প্রভৃতি বাণিজ্য-দ্রব্যাদি আলিপো হইতে আলেক্‌জান্দ্রাটা
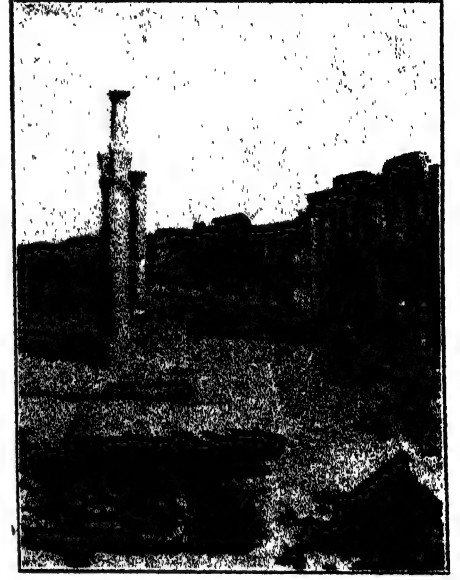
রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ
দূরে ১৫০০টি স্তম্ভ দেখা যাইতেছে

সূর্য্য-মন্দির

(Alexandretta)র বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানি হয়। ৬৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আলিপো সারাসেন্‌দের হাতে

ছিল। ১৪০২ খৃষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ এই নগরী অধিকার করেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে ইহা তুর্কীদের হাতে আসে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এই নগরী অধিকার করেন।

আলিপো সহরের মধ্যে একটি দুর্গ আছে। দুর্গটি একটি কৃত্রিম পাহাড়ের উপর অবস্থিত।
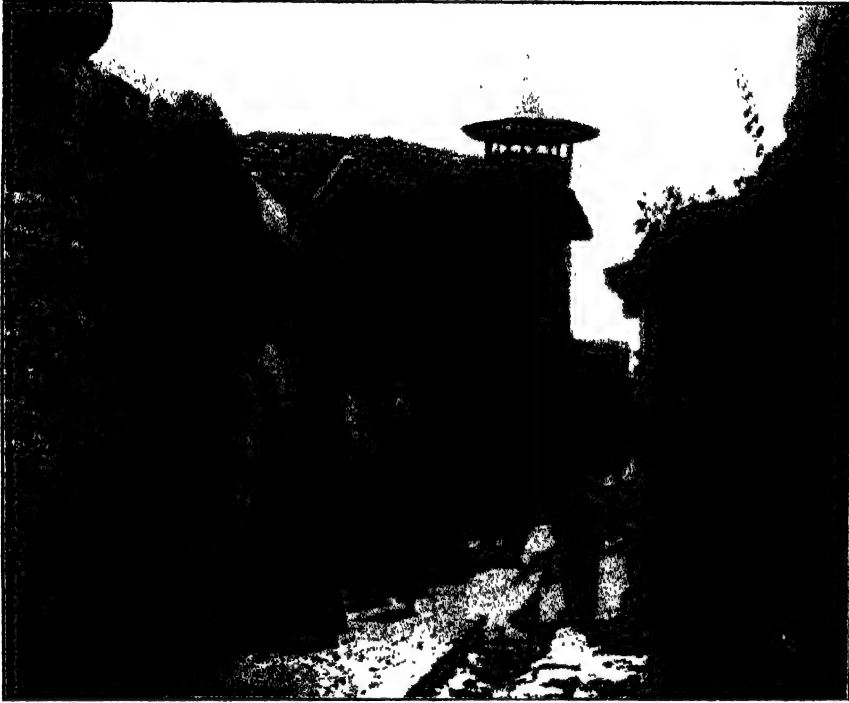
এন্টিয়োকের পথ

আরবেরা বলেন,—প্রায় ৮০০০ আট হাজার থামের উপর একটি কৃত্রিম পাহাড় তৈয়ারী করিয়া এই দুর্গটি নির্ম্মিত হইয়াছে।

ওরোন্তেস্ নদীর তীরে এন্টিয়োক (Antioch) সহর। পূর্ব্ব সিরিয়ার মধ্যে এই নগরটি প্রধান। ঐতিহাসিকেরা এই সহরের নাম দিয়াছিলেন সুন্দর এন্টিয়োক্ (Antioch the Beautiful)। রোমকদের প্রভাব কালে এন্টিয়োকের নাম দেশ-বিদেশে প্রচারিত ছিল। প্রাচীন রোমের সহিত ইহার তুলনা হইত। বর্ত্তমান এন্টিয়োকের প্রাচীন সমৃদ্ধি নাই, সেই গৌরবও নাই।

তাদমোর (Tadmor) নামক একটি ছোট আরব গ্রামের কাছে, প্রাচীন পালমিরার (Palmyra) সহরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে পালমিরা, পারস্য ও রোমের বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ধনৈশ্বর্য্যে খ্যাতিমান্ ছিল। সে সময়ে নানারূপে এই নগর সৌন্দর্য্যে ও শোভায় অতুলনীয় হইয়াছিল। রাজ্ঞী জেনোরিয়ার রাজত্বকালে পালমিরা তাঁহার রাজধানী ছিল। তখন এই সহরে নানা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও মন্দির ছিল। ২৭৩ খৃষ্টাব্দে পালামিয়ার পতন হয় এবং পালমিরার বিজয় তোরণটি সম্রাট্ অরলিয়ান (Aurelian) রাজ্ঞী জেনোরিয়াকে পরাজয় করিবার পর নির্ম্মাণ করেন। এখানকার সূর্য্যমন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ যাহা আছে তাহা বাস্তবিকই মনোহর। প্রায় একমাইল জায়গা জুড়িয়া পালমিরার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে দেখা যায়।

ডিভোনিয়ান্ স্তর

২৬১ পৃষ্ঠার পর

আদি যুগের তৃতীয় স্তরকে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নাম দিয়াছেন, 'ডিভোনিয়ান্ স্তর' (Devonian Division)। ইংল্যাণ্ডের ডিভোন্ সায়ারের অন্তর্গত পাহাড়ের গায়ে অতি প্রাচীন লাল বেলে পাথর (old red-sand-stone) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্যই ঐ স্থানের নামানুযায়ী উহা ডিভোনিয়ান স্তর নামে পরিচিত।

মাছের জন্ম

ব্রিটেনের বিভিন্ন ভূভাগে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে—যেমন উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, উত্তর ইউরোপ প্রভৃতি স্থানেও লালপাথরের চিহ্ন দেখা যায়।

আমরা 'সিলুরিয়ান' বা সিলুরিয় যুগের কথা বলিতে গিয়া সে-যুগের সামুদ্রিক জীবের কথা বলিয়াছি। ক্রম-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের প্রাণীরা শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দ্রুত গমনাগমনের অভ্যাস লাভ করিল। ঐ সময়ে নানা বৃহদাকার মৎস্যের সৃষ্টি হইল। কাঁকড়া ও গল্দা চিংড়ি জাতীয় প্রাণীরা আকারে যেমন বড় হইল, তেমনি তাহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল অসাধারণরূপে। এক-জাতীয় প্রাণীর আকার ছিল একটু অদ্ভুত ধরণের। কোন কোনটি প্রায় ত্রিশ ফিট পর্য্যন্তও বড় হইত। ইহাদিগকে বলিত 'ইউরিপ্তেরিদ' (Eurypterids)। ইহাদের মধ্যে আবার টেরিগোটাস্' (Terygotus) নামক এক ভয়ানক প্রাণীর জন্ম হইয়াছিল। ইহারা সাগরের জলেও বড় বড় হ্রদের জলে বিচরণ করিত। এ সময়ের মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণীর নাম পণ্ডিতেরা তাহাদের আকার অনুযায়ী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কোনটির নাম কোকেস্টিয়াস্ (Coccosteus)। কোনটির নাম
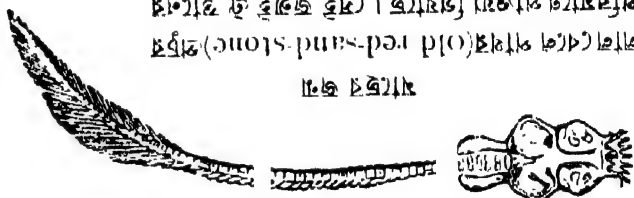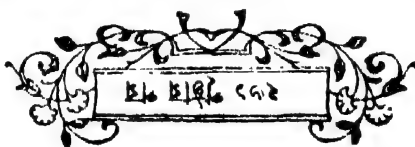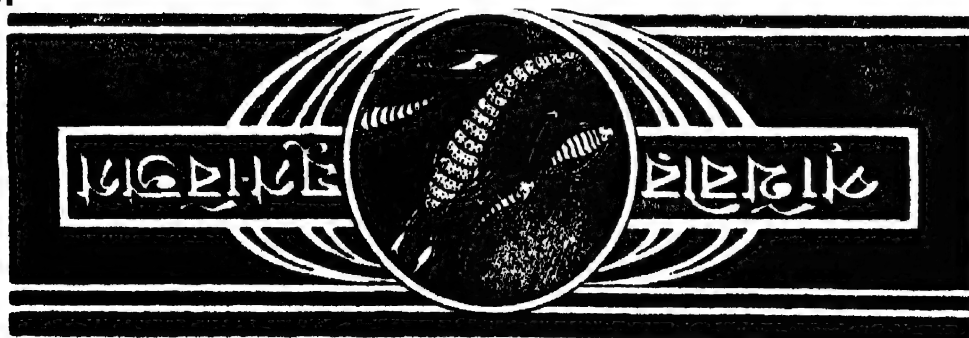
সেকালের মাছ

ট্রিলোবিট্ (Trilobite)। ট্রিলোবিট সিলুরিয়ান স্তরেও বিদ্যমান ছিল। কোনটির নাম একানথোদ
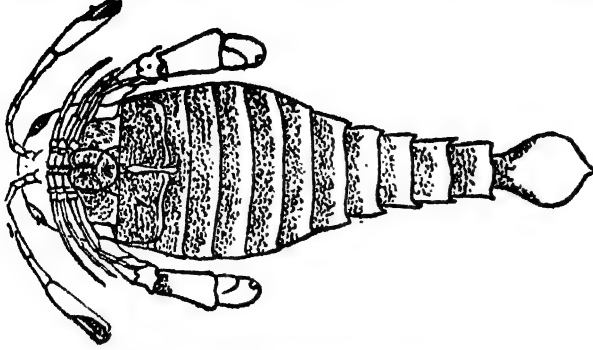
গলদা চিংড়িজাতীয়পুরাকালের মাছ

(Acanthodes), এইরূপ কত কি? কোকোস-টিয়াস জাতীয় একটি মাছ ২৫ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইত। এতদ্ব্যতীত ডিপ্‌টেরাস্ (Dipterus) টেরাস্‌পিস, টেরিকথিস্, প্রভৃতি অনেক রকমের মাছ ছিল

ফুস্‌ফুস্ মাছ (Lung fish) এখনও অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতেছে ডিপটেরাস (Dipterus) জাতীয় মৎস্য। এখন পর্য্যন্তও ইহাদের দেহ পূর্ব্ব-পুরুষদের দেহ হইতে বড় বেশী বিভিন্নরূপ হয় নাই। 'কোকেস্‌টিয়াস্ জাতীয় বৃহদাকার মৎস্য-জাতীয় প্রাণীর ধারা বজায় রাখিয়াছে—হাঙ্গর, কুমীর প্রভৃতি জাতীয় প্রাণী। এসময়ে ক্রমবিকাশের ফলে টিকটিকি, গিরগিটি, কুমীর, হাঙ্গর প্রভৃতি জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। আর এদিকে গাছপালার দিক্ দিয়াও আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তন দেখা দিল। বর্ত্তমান সময়ে যে পর্ণীতরু (Fern) প্রভৃতিকে অতি ক্ষুদ্রাকারে দেখিতে পাই, সে যুগে সেগুলি অতি বৃহদাকারের ছিল। এখন আমরা 'লাইকে-পোড' জাতীয় যে লতাটিকে দুই হাতের বেশী দীর্ঘ দেখিতে পাই না, সে সময়ে উহার এক একটি লতা অতি উচ্চ গাছের ন্যায় দেখাইত। কোনটিই পঞ্চাশ, ষাট হাতের কম উঁচু হইত না। সেকালের গাছগুলি সাধারণতঃ জলা-জমির আশে পাশে জন্মিত এবং তাহাদের শাখা

ডিভোনিয়ান যুগের হাঙ্গর

প্রশাখা মাটিতে পড়িয়া তাহা হইতে আবার নূতন গাছ জন্মিত।

ডিভোনিয়ান স্তরে প্রাপ্ত জীব-পঞ্জর

পৃথিবীর সেই অতি আদিম যুগের এই ইতিহাস আমরা পৃথিবীর স্তর বিভাগের মধ্য হইতে যে সকল মৃত জীবের দেহাব-শেষ পাইয়াছি, তাহা হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছি। এই স্তর ৪০০০ হইতে ১০,০০০ ফিট মাটির নীচে হইতে পাওয়া গিয়াছে। ডিভো-নিয়ান স্তরের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া পাওয়া গিয়াছিল যে, এই যুগের বয়সও ছিল আনুমানিক ৪৫,০০০,০০০ বৎসর।

আকাশ ও সমুদ্রের রঙ্

৮৮০ পৃষ্ঠার পর

কি দিন, কি রাত্রি, সকল সময়েই আমাদের মাথার উপর একটা বিরাট্ আবরণ চারিদিক ঘিরিয়া ঢাকিয়া রহিয়াছে। কোথায় যে ইহার আরম্ভ, তাহাও কেহ জানে না এবং কোথায় যে ইহার শেষ, তাহাও কাহারও জানা নাই। তুমি ইহাকে ছুঁইবার জন্য কোনও উপায় করিয়া উপরের দিকে যাইতে থাক, ইহার শেষ পাইবে না, এবং তখন যদি নীচের দিকে পৃথিবীর দিকে চাহ, দেখিবে, ইহার খানিকটা যেন নীচেতেই ফেলিয়া আসিয়াছ। দেখিবে সমস্ত পৃথিবীটার উপরে যেন একটা স্বচ্ছ আবরণ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা নানারূপ অনুমান করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যদিও এই আবরণটিকে মনে হয় ঊর্দ্ধে কতদূর গিয়া উঠিলে ইহার নাগাল পাওয়া সম্ভব, তথাপি ইহা কোনও বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নাই। চাঁদোয়ার মত দেখাইলেও ইহা মোটেই সেরূপ নহে। অপর পক্ষে তাঁহারা বলেন যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তাহার বায়বীয় পরিমণ্ডল যতদূর উঠিয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি বিন্দুই এই আবরণটিকে গঠন করিতে অল্পবিস্তর সাহায্য করে। তাঁহারা আরও বলেন যে, যদি তুমি বহুদূর উঠিয়া গিয়া কোনও ক্রমে এই বায়ুমণ্ডল ছাড়াইয়া যাইতে পার, তবে ইহাকে আর উপরের দিকে দেখিতে পাইবে না। ইহার পরিবর্ত্তে পাইবে একটা ঘোর অন্ধকারময় আবরণ, অমাবস্যার রাত্রিও সেই অন্ধকারের নিকট হার মানে। সূর্য্য উদিত হইয়া থাকিলেও তাহার প্রখরতা ও উজ্জলতা পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে যে পরিমাণ পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় বহু গুণ বর্দ্ধিত হইলেও এই ঘোর অন্ধকারের কণা মাত্রও হ্রাস পায় না।
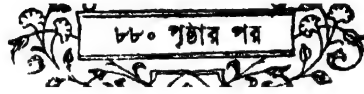
অথচ সেই প্রখর ও দীপ্তিমান্ সূর্য্য থাকা সত্ত্বেও সে অন্ধকারকে ভেদ করিয়া অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতে থাকে; মিট্-মিট্ করিয়া নহে—এত তীব্রভাবে যে, তাহার নিকট তোমাদের দৃষ্টি যে কোনও উজ্জলতম নক্ষত্র অনুজ্জ্বল বোধ হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি উজ্জল হইতে উজ্জলতর হইয়া আলো দিতে থাকিলেও এই বিরাট্ 'কৃষ্ণতার' কণামাত্রও হ্রাস পায় না। পৃথিবী নিজের চতুর্দ্দিকে যে আবরণটি টানিয়া লইয়া এই নিদারুণ অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছে, তাহার সহিত তোমাদের প্রত্যেকেরই পরিচয় আছে। এই পরম কল্যাণকর আবরণটির নাম আকাশ। আমরা এই আকাশের রঙের কথাই এখানে বলিতেছি।

আকাশের যে রঙ্ প্রধানতঃ আমাদের চোখে পড়ে তাহাকে আমরা নীল বলি। সৃষ্টির সেই আদি যুগ হইতে আকাশের এই নীলিমাকে অবলম্বন করিয়া

মানুষের কল্পনা কাব্যের ভিতর দিয়া, দর্শনের ভিতর দিয়া, কথা ও কাহিনীর ভিতর দিয়া, চিত্রের ভিতর দিয়া, কত ভাবে যে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। যে রঙ্ মানুষকে সকল দিক্ দিয়া এমন বিচিত্র ভাবে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে তাহার সম্বন্ধে জানিবার জন্য তোমাদের যে একটা কৌতূহল হইবে, সে ত স্বাভাবিক। নীল ছাড়াও আকাশের গায়ে বহু রঙ্ দেখিতে পাওয়া যায়। সকাল ও সন্ধ্যায় পূর্ব্বে ও পশ্চিমে যত রঙ্ ফুটিয়া উঠে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিত্রকরেরও সাধ্য নাই যে, তাহা সে প্রতিফলিত করিতে পারে। কোথায় পাইবে সে অত বড় বিচিত্র রঙের ভাণ্ডার!

ক্ষীণভাবে লাল রঙ্ শোষণ করিয়া লয় এবং কাজে কাজেই সূর্য্যের যে রঙ্ আমরা দেখিতে পাই, তাহা প্রধানতঃ নীল হইয়া পড়ার দরুণ আকাশ নীলাভ দেখায়। আকাশের রঙের এইরূপ ব্যাখ্যা হঠাৎ আমাদের মনে যথার্থ বলিয়া প্রতীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু ব্যাপারটা সেরূপ নহে। বায়ুমণ্ডলে এমন কোনও রঙীন পদার্থ নাই, যাহা, সৌর বর্ণ-কিরণের লাল অংশ সামান্য ভাবেও নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে। এরূপ যে হয় না এখানে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিয়া পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

জন টিণ্ডাল—যৌবনে

জন টিণ্ডাল—বার্দ্ধক্যে

তোমাদের আরম্ভেই বলিয়া রাখি যে, এই সমস্ত রঙ্ বায়ুর কণা এবং বায়ুর সহিত ভাসমান ধূলিকণা ও অন্যান্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কণা সকলের সহিত আলোক-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে তৈয়ার হইতে পারিয়াছে। পূর্ব্বে একথা বলা হইয়াছে যে, কোনও রঙীন পদার্থের ভিতর দিয়া শাদা আলো চলিয়া গেলে তাহা রঙীন হইয়া পড়ে। অতএব তোমরা এরূপ বলিতে পার যে, রঙীন পদার্থ যে উপায়ে শাদা আলো-কে তাহার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে দিয়া রঙীন করিয়া ফেলে, বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো ভেদ করিবার সময়ে সেই উপায়েই তাহা রঙীন হইয়া উঠে। একথাও বলিতে পার যে, বায়ুমণ্ডল অতিশয়
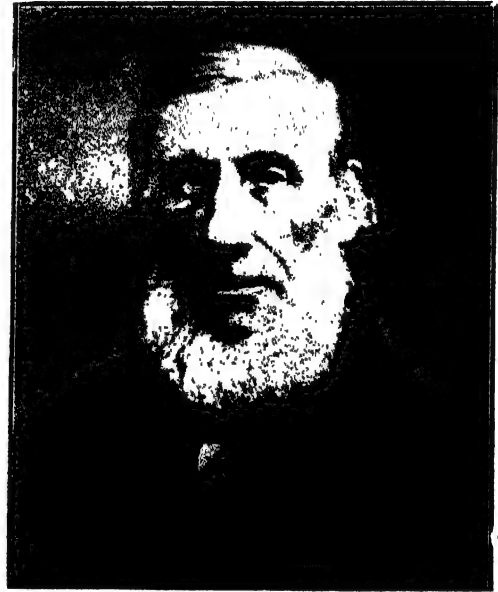
সূর্য্যরশ্মিকে সকাল ও সন্ধ্যার সময়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে বেশী করিয়া অতিক্রম করিতে হয়। আকাশ নীল হইবার কারণ যদি বায়ুমণ্ডলের সূর্য্য-রশ্মি হইতে তাহার লাল অংশ শোষণ করিয়া লইবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করিত, তবে সকাল ও সন্ধ্যায় যখন রশ্মিকে বায়ুমণ্ডলের অধিকতর অংশ ভেদ করিয়া যাইতে হয় তখনই তাহাতে নীলের পরিমাণ অধিক হইয়া উঠিবার কথা। কিন্তু আমরা তাহার ঠিক্ বিপরীত ক্রিয়া দেখিতে পাই। তখনই বরং আকাশের রঙ্ অধিকতর রক্তিম হইয়া উঠে—নীল রঙ্ তখন বড় একটা চোখেই পড়ে না।

আলোক তরঙ্গধর্ম্মী, এ-কথা তোমাদের নিকট

নূতন নহে। একাধিকবার সে-কথা বলিয়াছি। বৈজ্ঞানিকেরা এই তরঙ্গের পরিমাপ করিতে পারেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, লাল আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য, নীল আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হইতে প্রায় দুই গুণ বড়। সৌর বর্ণ-কিরণের (Spectrum) মাঝের রঙ্গুলির তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও নিজ নিজ স্থান অনুযায়ী বড় হইতে ছোট হইয়া গিয়াছে। তোমরা জান যে, শাদা আলো এই সমস্ত তরঙ্গগুলির সংমিশ্রণে তৈয়ারী হয়। এইরূপ সর্ব্বরঙ্যুক্ত যে শাদা আলো, তাহা আমাদের বায়ুমণ্ডলের ভিতর প্রবেশ করিলে, তাহার রঙ্গুলির পরস্পরের মধ্যে কে বায়ুকণাগুলিকে অক্লেশে অতিক্রম করিতে পারে, এই লইয়া প্রতিযোগিতা লাগিয়া যায়।

মনে কর, তোমরা সাতজন বালক ভিড়ের মধ্য দিয়া যাইতেছ। তোমাদের মধ্যে যে কৃশকায়, তাহারই সেই ভিড় কাটাইয়া উঠিতে কম ক্লেশ পাইতে হইবে। কিন্তু যে আয়তনে বেশ বড়, তাহার ভিড়ের ধাক্কায় ছিট্‌কাইয়া পড়িবার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু তোমরা যদি মানুষ না হইয়া তরঙ্গ হইতে, তাহা হইলে ব্যাপার দাঁড়াইত ইহার ঠিক বিপরীত। তোমাদের মধ্যে যেটি স্থূলকায় সে স্বচ্ছন্দে ভিড়ভেদ করিয়া চলিয়া যাইত এবং যে কৃশকায়, সেই ছিট্‌কাইয়া পড়িত। তোমরা সাত রঙের সাতটি বালক শাদা আলো হইয়া চলিতে সুরু করিলে। পথে ভিড় পড়িল। তাহাকে যখন কাটাইয়া উঠিলে, দেখিতে পাইলে, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কৃশকায়টি ভিড়ের মধ্যেই ছিট্‌কাইয়া গিয়া অন্যত্র সরিয়া গিয়াছে। এই কৃশকায় বালকটিকে নীল বলিতে পার। সে ছিট্‌কাইয়া গিয়া যেখানে যেখানে যাইবে, সেখানে সেখানে নীল দেখাইবে।

টিণ্ডাল সাহেব এই যন্ত্রটি দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা যে আলোক ছড়াইয়া দিয়া থাকে, তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন

সূর্য্যের শাদা আলো বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিতে গেলেই তাহাকেও বায়ুকণার ভিড় ঠেলিয়া পৃথিবীতে আসিতে হয়। তরঙ্গের নিয়ম অনুযায়ী যে রঙের তরঙ্গ যত বড়, সে রঙ্ তত অল্পায়াসে এই বায়ুকণা ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে। যে আলো আমাদের চোখকে উত্তেজিত করে, তাহার মধ্যে লালের তরঙ্গ বৃহত্তম। তাই লাল রঙ্ যত বেশী করিয়া, পথে কম ছিট্‌কাইয়া গিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিবে, অন্য রঙ্ সেরূপ পারিবে না। নীল রঙের তরঙ্গ ক্ষুদ্রতম বলিয়া ইহাকে খুব বেশী করিয়া পথে এদিক ওদিক ছড়াইয়া যাইতে হইবে। অতএব যে আলো সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে সোজা চলিয়া আসে, তাহাতে লাল অংশের প্রাধান্য থাকিবে এবং যে আলো বায়ুকণার দ্বারা আকাশে ছড়াইয়া পড়িবে, তাহাতে নীলের প্রাধান্য হইবে বেশী। আকাশ হইতে আমরা যে আলো পাই, তাহা প্রত্যক্ষভাবে সূর্য্যের আলো নহে—বায়ুকণাগুলি যে আলো-কে ছড়াইয়া দিতেছে সেই আলো। ইহা ছড়াইয়া পড়া আলো বলিয়া ইহাতে নীলের প্রাধান্য হইবে বেশী—অতএব আকাশ হইতে যে আলো আমাদের চোখে আসে, তাহা হইবে নীলাভ।

প্রত্যক্ষভাবে সূর্য্যের যে আলো আমাদের নিকট আসে তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিবে যে, তাহা নীল নহে—ঈষৎ পীতাভ। সূর্য্যের আলো-কে যখন বায়ুমণ্ডলকে অধিকার করিয়া অতিক্রম করিতে হয়, তখন তাহা আর পীতও থাকে না—যথেষ্ট লাল হইয়া ওঠে। প্রভাত ও সন্ধ্যায় তাই রৌদ্রের রঙ্ লাল। তখন যদি সূর্য্যের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিবে, সূর্য্যও তখন ঘোর রক্ত বর্ণের। অবশ্য সকাল ও সন্ধ্যায় ঐরূপ ঘোর রক্তবর্ণের আকাশ পাইতে হইলে বায়ুকণাগুলির অতিরিক্ত আরও কিছু আবশ্যক হয়। এবিষয়ে পরে বলা হইবে।

যে বৈজ্ঞানিক প্রথমে এই তত্ত্বটি প্রচার করিয়াছিলেন, যে আকাশের রঙ্ বায়ুমণ্ডলের কণাগুলির নীল রঙকে বেশী করিয়া ছড়াইয়া দিবার ক্ষমতার জন্য সৃষ্ট হইতে পারিয়াছে, তাঁহার নাম জন্ টিণ্ডাল

(John Tyndal)। তিনি জাতিতে আইরিশ। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু হইয়াছিল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁহাকে সুইট্‌জারল্যাণ্ড দেশের বরফের নদীর উপর গবেষণা করিতে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে গিয়া বায়ুমণ্ডলের উপর সূর্য্য-রশ্মির ক্রিয়া কিরূপ হইতে পারে, তাহা লইয়া তাঁহাকে অনেক চিন্তা করিতে হয়। সে-চিন্তার ফলেই পৃথিবীর লোক এই চিরন্তন রহস্যের মূল সূত্রের সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছে। টিণ্ডাল সমস্ত ব্যাপারটির ঠিক মত ব্যাখ্যা করিলেও আলোক ছড়াইয়া দিবার মূল কারণ বাতাসের কণাগুলিকে বলেন নাই। বায়ুমণ্ডলে যে জলের কণা বর্ত্তমান, তিনি সেইগুলিকেই আকাশকে নীল দেখাইবার মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাতাসের কণাগুলিই যে আলোক-তরঙ্গকে ছড়াইয়া দিতেছে, ইহা পরবর্ত্তী কালে প্রমাণিত হয়।

এই ছবিটি তুলিতে পীত ও পীত হইতে হ্রস্ব তরঙ্গের আলো দিয়া যে ফটোগ্রাফিক প্লেটে ছবি উঠিতে পারে সেইরূপ প্লেট ব্যবহার হইয়াছিল। কুয়াসার কণাগুলি এই আলোগুলিকে অল্প বিস্তর ছড়াইয়া থাকে। তাই ছবিটিও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই।
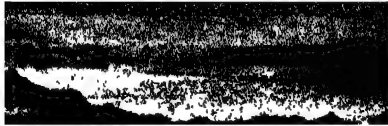
এই ছবিটি তুলিতে যে প্লেট ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহাতে লাল আলোর তরঙ্গ হইতেও দীর্ঘতর তরঙ্গ দ্বারা ছবি উঠিয়া থাকে। কুয়াসার কণাগুলি এই তরঙ্গগুলিকে তেমন ছড়াইয়া দিতে পারে নাই বলিয়া ছবিটি কেমন পরিষ্কার উঠিয়াছে।

পৃথিবীর সন্নিকটে বায়ুমণ্ডলের যে অংশ রহিয়াছে, তাহা নানারকম অজস্র গ্যাস ও অসংখ্য ধূলিকণায় পরিপূর্ণ। ইহারাও আলোক-তরঙ্গকে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেয়। বায়ুমণ্ডলে ভাসমান এই সব বাহিরের কণাসমূহ আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। তাহারা সেই জন্য অন্য রঙ্‌ গুলাকে যথেষ্টরূপেই ছড়াইয়া দিয়া থাকে। এই কারণে সমতল ভূমির লোকেরা আকাশকে যথার্থ নীলভাবে কখনো দেখিতে পায় না—তাহাদের কাছে আকাশের রঙ্‌ অপরিষ্কার। এই বৃহৎ আয়তনের কণাগুলি সাধারণতঃ এক হাজার গজের অধিক উপর দিকে উঠিতে পারে না। হাজার গজ উচ্চে গিয়া এই স্তরকে ছাড়াইয়া উঠিলে সত্যিকারের নীলের সন্ধান মিলে। সমুদ্র-পথের যাত্রীরা যে আকাশ দেখিতে পায় বা অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উপর উঠিলে যে আকাশ আমাদের চোখে উদ্ভাসিত হয়, তাহার নীল রঙের তুলনা নাই। অনেকক্ষণ ধরিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইবার পর যখন সমস্ত ধূলি ধুইয়া গিয়া আকাশ পরিষ্কার হয়, তখন সমতলের লোকেরা আকাশের যে রঙ দেখিতে পায়, তাহা ঐ নীলের কতকটা অনুরূপ

পাহাড়ের উপর খুব হাল্‌কা কুয়াসার ভিতর দিয়া দূরের পাহাড়ের দিকে দেখিলে তাহাকে নীলাভ দেখায়। দূরের পাহাড়টা অবশ্য নীল রঙের আলো তোমাদের

নিকট কখনই প্রেরণ করে না। তোমরা এখন বোধ করি, নিজেরাই ইহার কারণ ধরিতে পারিবে। দূরের পাহাড় ও তোমার মধ্যে যে বায়ুর স্তর আছে, তাহার প্রত্যেক কণাটি তোমার নিকট ঐ আলো পাঠাইতেছে। তোমার এবং পাহাড়ের মধ্যস্থিত ব্যবধানটাকে আকাশের একটা অংশ বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছে।

তোমরা জান, চলিবার পথে বাধা পাইলে অন্য রঙের আলোর তুলনায় লাল আলো ছড়াইয়া যায় অল্প। তাই কুয়াসার মধ্যে অন্য আলোর তুলনায় লাল আলোর উপযোগিতা বেশী। যেখানে কুয়াসার প্রকোপ বেশী, সেখানে মোটরে যাইতে হইলে হেডলাইট হইতে লাল আলো ফেলিবার ব্যবস্থা করা হয়। শাদা আলো যেখানে কুয়াসার উপর পড়িয়া ছড়াইয়া গিয়া চালকের অবস্থা দূরের জিনিষ দেখিবার পক্ষে কঠিন করিয়া তুলে, সেখানে লাল রঙের আলো ঢের বেশী কাজ দেয়। কুয়াসার মধ্যে যখন দূরের জিনিষ একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন ক্যামেরার
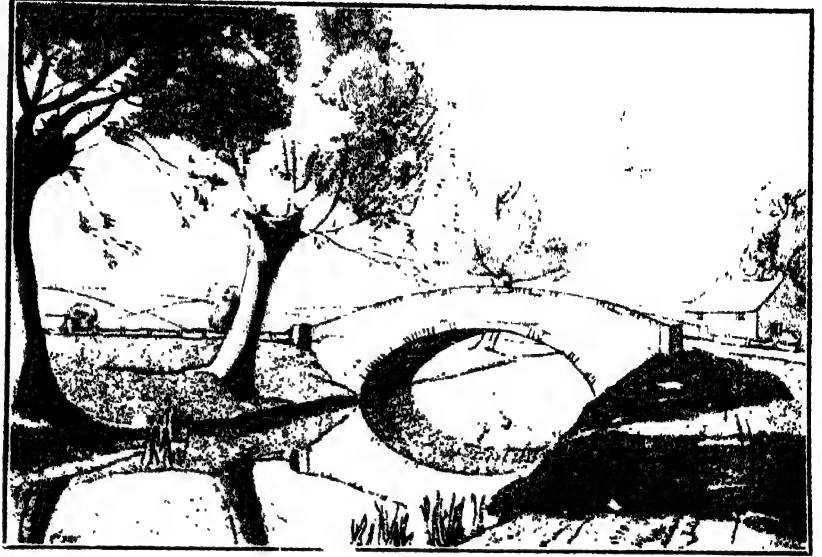
এই ছবিটিতে নদীর জলটা খুব পরিষ্কার। তাই গাছের ছায়াটি নদীর জলের উপর পড়িয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। অপর পক্ষে পরিষ্কার জলে গাছের প্রতিবিম্বটি কেমন সুন্দর হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

নদীটিতে জল এখন খুবই ঘোলা। ঘোলা জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণাগুলি গাছের যে ছায়াটি তাহার উপর আসিয়া পড়িতেছে তাহাকে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়া ছায়াটিকে স্পষ্ট করিয়া দিতেছে। অথচ ঘোলা বলিয়া জলে গাছের প্রতিবিম্ব তেমন ভাল হইতে পারে নাই।

লেন্সের সামনে একটা লাল কাচ দিয়া ছবি তুলিবার ব্যবস্থা আছে। লাল কাচে নীল, সবুজ ইত্যাদি অন্য রঙ্ আট্‌কাইয়া যায়—শুধু লাল রঙ্ই তাহাকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে। আবার লাল রঙ্‌টাই কুয়াসাকে ভেদ করিয়া যাইতে সব চেয়ে সমর্থ। তাই এই উপায়ে ছবি লইলে, যেখানে চোখে কিছুমাত্রও দেখা যায়না, সেখানেও যথেষ্ট স্পষ্ট ছবি উঠিয়া থাকে। আজকাল আবার লাল আলোর চেয়েও বৃহত্তর আলোর তরঙ্গ দিয়া ছবি তুলিবার কৌশল বাহির হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, কুয়াসার কণাগুলি এত বড় যে, লাল আলোও তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে ভেদ করিয়া আসিতে পারে না—কিছু কিছু তাহাও ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু নূতন উপায়ে লাল আলোর চেয়ে বৃহত্তর তরঙ্গের আলো লইয়া ছবি উঠাইলে তাহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ঘন কুয়াসাও তাহার বিশেষ কিছু করিতে পারে না। এই যে আলোর কথা তোমাদের বলিলাম, ইহা অবশ্য চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের রঙ্

এইবার তোমাদিগকে সমুদ্রের রঙের কথা বলিব। আকাশ যে কারণে নীল মনে হয়, সমুদ্রের নীল হওয়ার কারণ প্রায় তাহাই। অনেক সময়ে আকাশের নীল ছায়া পড়িয়া সমুদ্র নীল দেখায় এবং সমুদ্রের নীল হইবার ইহাও একটা কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু আকাশকে প্রতিবিম্বিত করিয়া আমাদের দিকে পাঠাইতে হইলে সমুদ্রের উপর খুব সামান্য রকম তরঙ্গ থাকা দরকার। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র আকাশকে সব দিকে প্রতিবিম্বিত করিতে পারে না, অথচ তখনও সমুদ্র নীল। অতএব আকাশের নীলকে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করা ছাড়াও সমুদ্র নিজেও আকাশের মত নীল রঙ্ ছড়াইতে থাকে।

ইহা অবশ্য গভীর সমুদ্রের কথা—যেখানকার জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, ধূলিকণা-বিহীন। তটের নিকটস্থ সমুদ্রের কথা স্বতন্ত্র। এখানে তটের সহিত অনবরত সঙ্ঘর্ষের ফলে জলে নানারকমের বস্তুকণা মিশিয়া যায়। এই কণাগুলি নিজেরাই তখন আলো-কে ছড়াইয়া দেয়। সাধারণতঃ তটের নিকটস্থ জলে অতিশয় সূক্ষ্ম অবস্থায় বালুকারকণা ভাসিয়া বেড়ায়। এই বালুকণাগুলির আয়তন এইরূপ যে, তাহারা সবুজ ও তাহা হইতে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গের আলো-কে খুব বেশী করিয়া ছড়াইয়া দেয়। সেই জন্য তটের সমুদ্রের রঙ্ সবুজ। যদি সমুদ্রের জলে সামুদ্রিক উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হইয়া মিশিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারাও নিজের প্রভাব বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। এইগুলি সাধারণতঃ মেটে রঙের আলোকেই আমাদের দিকে ছড়ায়। তখন এই মেটেরঙ্, বালুকণার সবুজ রঙ্ ও নীল রঙ্ এইসব মিলিয়া মিশিয়া সমস্ত দৃশ্যটাকে অদ্ভুতরকম ঘোলাটে করিয়া তোলে।

প্রয়াগে (এলাহাবাদে) যেখানে গঙ্গা-যমুনা একসঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে, সেই সঙ্গম স্থলে একটা সুন্দর ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটি নদীর জল যে ধীরে ধীরে মিশিয়া যাইতেছে, তাহা অতিশয় সুন্দর ভাবে বুঝিতে পারা যায়। এ ক্ষেত্রেও দুইটি নদীর বিভিন্নভাবে আলোক ছড়াইয়া দিবার ক্ষমতার জন্যই ঐরূপ ঘটনা সম্ভব হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন যে, যমুনা গঙ্গা হইতে প্রাচীনতরনদী। সেজন্য তাহার গভীরতা সাধারণভাবে গঙ্গার গভীরতা হইতে বেশী। গভীর নদীর স্রোত অগভীরের তুলনায় অল্প হয়। তাহার পর যমুনা প্রয়াগের নিকট আসিয়া প্রথমে একটা হ্রদের মধ্যে পড়িয়াছে এবং এই হ্রদেরই এক অংশে গঙ্গা আসিয়া তাহার সহিত খরস্রোতে মিশিয়াছে। কাজে কাজেই, যমুনার জলে গঙ্গার তুলনায় একেবারেই স্রোত নাই। জলে স্রোত বেশী হইলেই তাহাতে বৃহদায়তনের কণা সকল ভাসিয়া থাকিতে পারে। তাই স্রোতপূর্ণ গঙ্গার জল তাহার সহিত অজস্র বড় বড় বালুকণা বহিয়া আনে। এই বালুকণা সকল সূর্য্যের আলোর প্রায় সবরঙ্‌গুলিকেই ছড়াইয়া দেয়। এই জন্যই গঙ্গার জলকে ঘোলাটে দেখায়। অপরপক্ষে যমুনারজল স্রোতোহীন বলিয়া ইহাতে যে সব কণা ভাসিয়া থাকে, তাহাদের আয়তন অতিশয় ক্ষুদ্র—এত ক্ষুদ্র যে তাহাদিগকে চোখে দেখা যায় কিনা সন্দেহ। এই সূক্ষ্ম কণাগুলি সমুদ্রতটের জলে ভাসমান বালুকণার কাজের মত সবুজ ও নীল রঙেই অধিক পরিমাণে ছড়াইয়া থাকে। তাই যমুনারদিকে চাহিলেই তাহাকে সবুজ দেখায়। দুইটা নদী যখন পাশাপাশি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার নিজস্ব রঙ্ পরস্পরের সহিত তুলনার সুযোগ হওয়ায় আরও স্পষ্ট হইয়া ওঠে। যমুনার জল গাঢ় রঙের হইয়া ওঠে ও গঙ্গা দেখায় শুভ্র বর্ণের।

ব্যায়াম-পদ্ধতি

ব্যায়াম পদ্ধতি অগণিত। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব কিছু না কিছু ব্যায়ামের ধারা আছে; তার উপর অন্য দেশ থেকে নানা নূতন ধারা আমদানী করবার অন্ত নেই। এ ছাড়া অগণিত ব্যায়াম ব্যবসায়ীর পদ্ধতি ত' আছেই। এত বিভিন্ন পদ্ধতির মাঝ থেকে কোন একটা বেছে নেওয়া নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে কষ্টকর। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা না থাকিলে শিক্ষার্থীর দিশেহারা হয়ে পড়বার কথা। আমরা এই প্রবন্ধে চলতি পদ্ধতিগুলির বিষয়ে কিছু আলোচনা করে' তাদের দোষ গুণ বিচার করব।

ব্যায়াম ভাল কি মন্দ, বিচার করবার একটা অত্যন্ত সহজ উপায় আছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোন পদ্ধতি বিচার করা শিক্ষার্থী কেন, অনেক বিশেষজ্ঞের ক্ষমতার বহির্ভূত। সহজ উপায়টা এই।

ব্যায়াম বিচার করা যায় তার ফল দিয়ে। শরীরের উপর তার প্রভাব যদি আংশিক হয়, সে পদ্ধতি ত্যাগ করা উচিত, প্রভাব একান্ত ভাবে সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। বাঙ্গলাদেশে কেন, প্রায় সব দেশেই যুবকদের একটা ধারণা আছে যে, বাহু আর বুক মজবুৎ হলেই ব্যায়াম-পদ্ধতি ভাল হল, তাদের দেহের অনেক প্রধান অংশ— যেমন পেট, কোমর ও পা বাদ পড়ে, এইটাকে আংশিক ফল বলা যায়। সাধারণ-ভাবে ব্যায়াম-পদ্ধতিগুলি এই একমাত্র উপায়ে বিচার্য্য।

দেহের শক্তি ও পেশী বাড়ে বর্দ্ধনশীল বাধার কারণে। এই বাধা দুই উপায়ে সৃষ্টি করা যায়। প্রথম, শিক্ষার্থীর নিজের দেহের ভার দিয়ে; দ্বিতীয়, বর্দ্ধনশীল বাধা পাওয়া যেতে পারে এমন কোন যন্ত্র বা অন্য কোন ব্যক্তির দেহের ভার দিয়ে। সুতরাং গোড়াতেই ব্যায়াম-পদ্ধতির একটা বিভাগ হয়ে গেল। কিন্তু এমন অনেক যন্ত্র আছে যা প্রথম পর্য্যায়ভুক্ত, সেগুলি যান্ত্রিক ব্যায়ামের অন্তর্গত নয়, কারণ, শিক্ষার্থীর দেহের ভারই তার মধ্যে প্রধান জিনিষ।

আমাদের দেহে পেশীর ক্ষয় পূরণের কাজ দিনরাত চলছে। যেখানে কোন দৈহিক পরিশ্রম নেই সেখানে এই ক্ষয়পূরণ শ্লথ গতিতে চলে। পরিশ্রম যত বাড়ে, পেশীর ক্ষয় পূরণও তত বেশী হয়ে থাকে, কারণ, সেই পরিশ্রমের অনুরূপ পেশীগুলি মজবুত হতে প্রকৃতিগত কারণে বাধ্য। পেশী বৃদ্ধি পাওয়ার মোটা নিয়ম এই— পরিশ্রমের জন্য দুর্ব্বল পেশীর বিনাশ হয়ে নূতন পেশী দেহের রক্তস্রোত থেকে খাদ্য আহরণ করে পরিশ্রমের উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করে। তোমরা বলবে, তাহলে পরিশ্রম বাড়িয়ে গেলে পেশীও এমন ভাবে বাড়িতে পারে যার কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা হয় না। যে যে জাতির লোক, সাধারণতঃ সেই জাতীয় শারীরিক উৎকর্ষের নিরিখ ব্যক্তিগত উন্নতির শেষ সীমা। একটু আধটু ব্যতিক্রম

ঘটে না যে এমন নয় কিন্তু তাও অত্যন্ত অল্প। এসব কথা আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করবার সুযোগ পাব।

এখন বোঝা যায় যে, পরিশ্রম ও পৈশিক বাধা প্রায় এক। 'প্রায়' কথাটা ব্যবহার করা হল এই জন্য যে, অনেক পরিশ্রম পৈশিক বাধার পর্য্যায়ে না এসে সহিষ্ণুতার পর্য্যায়ে পড়ে। ব্যায়াম একটা ছন্দোবদ্ধ পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। দেহের ভারের অনুপাতে যতদিন পেশীগুলি দুর্ব্বল থাকে, দেহের উৎকর্ষ লাভের জন্য সেই ভার যথেষ্ট। পেশীগুলি এই ভারের অনুপাতে সমশক্তির হয়ে উঠলে অন্য প্রকারে পৈশিক বাধা সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়ে ওঠে। এইটাই যান্ত্রিক ও সাধারণ ব্যায়ামের মূল কথা।

চল্‌তি ব্যায়ামগুলি বিচার করবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের পুরাতন দুটি বিশেষ পদ্ধতির সামান্য পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অন্য কোন দেশে এ ধরণের কোন ব্যায়াম-পদ্ধতি আজ পর্য্যন্ত হয় নি।

হিন্দুদের পুরানো ব্যায়ামপদ্ধতি—হঠযোগ—সর্ব্বজন বিদিত। আর একটি পদ্ধতির নাম 'পায়াৎ'। হঠযোগের মত পায়াৎ পুরানো হলেও এটির বিষয়ে অত্যন্ত কম লোকেরই কিছু জানা আছে।

একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে, মূল ব্যায়াম-পদ্ধতিগুলির উৎপত্তির উপর জাতীয় বা জনসমষ্টির মনোবৃত্তির ছাপ আছে। হঠযোগ ও পায়াতে এই মনোবৃত্তি পরিস্ফুট। হিন্দু ঋষিরা দেহের বাহিরটার চেয়ে দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলি শাসন করতে চেয়েছিলেন।

হঠযোগের আসন বা ভঙ্গিগুলি গতিবিহীন, পায়াতেও কোন গতি নেই, কিন্তু অনেক মন্ত্রোচ্চারণের পদ্ধতি আছে। বিশেষ কোন ভঙ্গিতে শরীরকে রেখে মন্ত্রোচ্চারণ করলে আভ্যন্তরিক বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণ হয়ে থাকে; সম্প্রসারণটি আকুঞ্চনের অনুপাতে কম। এই পায়াতই আজ 'সূর্য্য নমস্কার' নামে জনসাধারণের মাঝে নব পরিচয় লাভ করেছে।

আধুনিক ব্যায়ামগুলি গতিবহুল। প্রাণশক্তি এই গতিবিহীন হঠযোগে যে অধিকতর বৃদ্ধি পায়, একথা আমরা পূর্ব্বপ্রমাণের উপর নির্ভর করে মেনে নিতে বাধ্য; কারণ হঠযোগকে বিচার করা আমাদের ব্যক্তিগত বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়।

আধুনিক ব্যায়াম-পদ্ধতি

এখন আধুনিক ব্যায়াম-পদ্ধতিগুলির বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

খালি হাতে ব্যায়াম—অনেক উৎসাহী ব্যক্তিদের ভিতর এই জাতীয় ব্যায়ামের প্রচলন আছে। আমাদের দেশের ডাও্ ও বৈঠক ছাড়া অন্যপ্রকার খালি হাতের ব্যায়ামগুলি

ডাও্

বিদেশী। তাহলেও এগুলির আমাদের দেশে বহু প্রচলন হয়েছে, মলারের পুস্তকগুলির কৃপায় ও বিদ্যালয়ের ড্রিলের জন্য। ছাত্রদের মধ্যে ড্রিলের কোন ফল না পাওয়া গেলেও অন্য ব্যক্তিরা যথেষ্ট উপকার পেয়েছেন। ডাও্ ও বৈঠকের কথা বিভিন্ন, এই দুটির উপর নির্ভর করে' অনেকে অত্যন্ত বলশালী হয়ে উঠেছেন।

দুর্ব্বল শিক্ষার্থীর পক্ষে কিছুকাল খালি হাতে ব্যায়াম অভ্যাস করা প্রশস্ত; কারণ তার দেহের ভার ও পৈশিক শক্তির অসমতার জন্য এই ব্যায়াম বিশেষ ফলদর্শী হয়। কিন্তু ক্রমাগত অভ্যাসে যে এ দুটির আর কোন বিভেদ থাকে না, একথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। পেশীগুলি এই সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করলে দেহের ভার সেগুলিকে কোন প্রকার বাধা দিতে সক্ষম হয় না, কাজেই তখন এমন কোন অন্য প্রকারের ব্যায়ামের প্রয়োজন হয়, যাতে বাধাটা ক্রমবর্দ্ধনশীল হতে পারে। খালি হাতে ব্যায়ামের অভ্যাস বজায় রাখলে ফল ভিন্ন হয়ে যায়। একদিন যা পেশী ও শক্তি বর্দ্ধন করত, সেটা পরে কেবল দেহের সহ্যশক্তি বাড়াতে পারে, সুতরাং খালি হাতে ব্যায়ামের ফল একান্ত সীমাবদ্ধ।

কোষ্ঠবদ্ধতা, অনিদ্রা প্রভৃতি অনেকগুলি রোগ ব্যায়ামের দ্বারা সারানো যায়, এই ব্যায়ামগুলিও এই জাতীয়।

ডাণ্ড ও বৈঠক—এ গুলিকে খালি হাতে ব্যায়ামের পর্য্যায়ে ফেলা যেতেপারে বটে, কিন্তু এই জাতীয় ব্যায়াম সাধারণ ব্যায়ামের চেয়ে অত্যন্ত জোরালো। কতকটা সীমা পর্যন্ত এ গুলির দ্বারা পৈশিক শক্তি বৃদ্ধিকরা যায়, ও পরে দেহের সহশক্তি বৃদ্ধি করিতে এ ব্যায়াম দুইটি অতুলনীয় হয়ে ওঠে। বৈঠকের একটা বিশেষ গুণ ফুস্‌ফুসের শক্তি ও আয়তন বৃদ্ধি করা। এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিতে আমরা ভবিষ্যতে বাধ্য হব।

প্যারালাল্ বার—এই যান্ত্রিক ব্যায়াম-পদ্ধতিটি অত্যন্ত সুপরিচিত। কিন্তু ফল বিচার
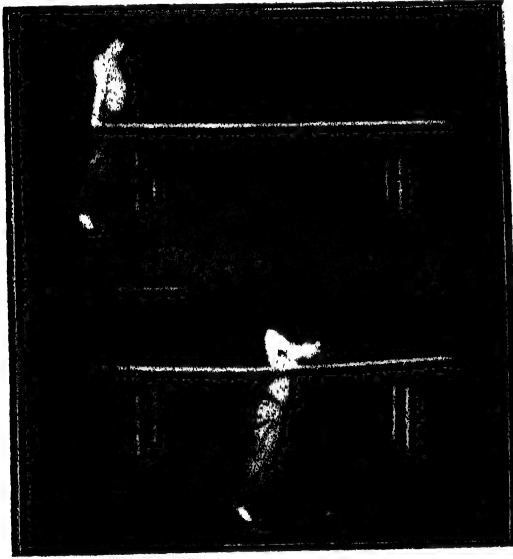
প্যারালাল বার

করলে এটিকে যান্ত্রিক ব্যায়ামের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। কারণ খালি হাতে ব্যায়ামের মত দেহের ভারই এই ব্যায়ামেও বাধা দেয়। যান্ত্রিক ব্যায়ামের উদ্দেশ্য বাধা ক্রমবর্দ্ধনশীল করা, প্যারালাল্ বারে সেটা অসম্ভব। তাছাড়া এই ব্যায়ামের ফল আংশিক। শক্তি সঞ্চয় করার প্রধান অংশ কোমর ও পা—এই ব্যায়ামে কাজ করে না, সুতরাং ব্যায়াম হিসাবে এটি নিকৃষ্ট, তবে অন্য কোন ব্যায়ামের সঙ্গে এই ব্যায়াম অভ্যাস করিলে কিছু কাজ হতে পারে।

হরাইজেণ্টাল বার—খেলা দেখানো ছাড়া এ যন্ত্রের ব্যায়াম হিসাবে কোন উপকারিতা নেই।

হরাইজেণ্টাল বার
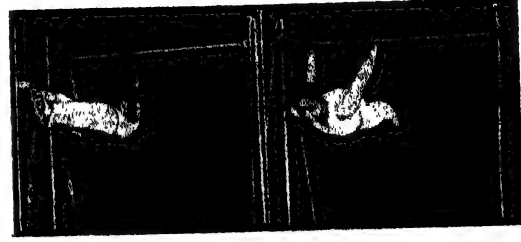
রোম্যান রিঙ্‌স্—এই ব্যায়ামে দেহের উপরার্দ্ধের চমৎকার উৎকর্ষ ও অপরিসীম শক্তি বাড়ে। কিন্তু আংশিক, পা ও কোমরের কোন উপকার হয়না, কাজেই ব্যায়াম হিসাবে রিঙ্‌স্
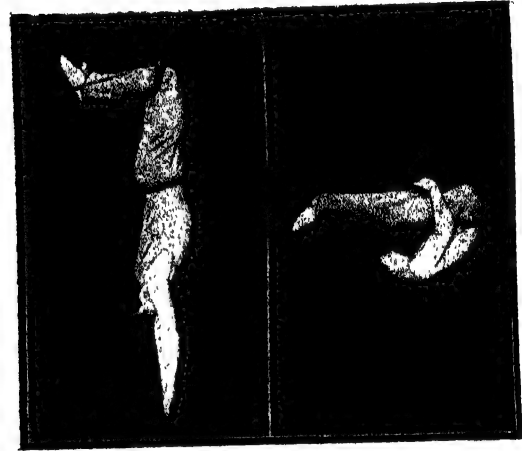
রিং-এর খেলা

ক্ষতিকর। তবে এর সঙ্গে পায়ের ব্যায়াম যোগ করলে আশাতীত ফল পাওয়া যেতে পারে।

কুস্তি—ব্যায়াম হিসাবে কুস্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পৈশিক বাধা অত্যন্ত বর্দ্ধনশীল,তাছাড়া কুস্তির মধ্যে যা প্রধান কথা, অপর এক ব্যক্তির সহিত প্রতি-যোগিতা করা, সেইটাই অত্যন্ত উপকারী। পৈশিক বাধা ছাড়া বিপক্ষের মানসিক গুণগুলি,—যথা চাতুর্য্য, বুদ্ধি, দাঁও প্যাঁচ প্রভৃতি এক ভিন্ন রকম বাধার সৃষ্টি করে। দেহে এমন কোন পেশী নেই যা কুস্তি

লড়বার সময়ে কাজ না করে ও মজবুৎ না হয়। কিন্তু নবশিক্ষার্থীর পক্ষে কুস্তি ততটা সুবিধার নয়, কারণ প্রথম থেকেই কতকটা প্যাঁচ ইত্যাদি জানার ও বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

ব্যায়াম করতে সক্ষম, এবং একটা যন্ত্র পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করা যেতে পারে

বক্সিং—(মুষ্টিযুদ্ধ) বাঙ্গলাদেশে বক্সিংএর কিছু চর্চ্চা হতে আরম্ভ হয়েছে। ব্যায়াম হিসাবে বক্সিং
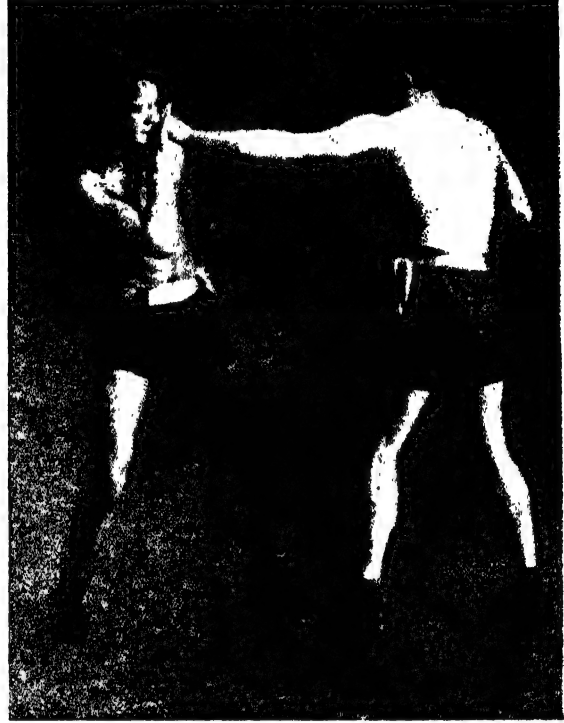
ভারোত্তোলন

ভারোত্তোলন—কুস্তির মত মনের ওপর প্রভাব থাকলে ভারোত্তোলন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম হতে পারত। কোন ব্যায়ামেই দেহ এত নিশ্চিতভাবে উৎকর্ষলাভ করতে পারে না, কারণ ভারোত্তোলনের পৈশিক বাধা শুধু ক্রমবর্দ্ধনশীল নয়, সেটাকে ক্রমবর্দ্ধনশীল করা একান্ত আয়ত্তাধীন। একই যন্ত্রে দুর্ব্বলতম ব্যক্তি অথবা অতিশয় বলশালী পালোয়ান

অত্যুৎকৃষ্ট। দেহের চমৎকার উৎকর্ষ ছাড়া বক্সিংএ মানসিক অনেক গুণ প্রসার লাভ করে। বিপক্ষের বুদ্ধি, চাতুর্য্য, ক্ষিপ্রতা প্রভৃতি শিক্ষার্থীকে যে অভিজ্ঞতা দিতে পারে, তার তুলনা নেই। বক্সিং মানুষকে অত্যন্ত সাহসী করে, আত্মরক্ষা ও আক্রমণ করার বুদ্ধি দেয় এবং সবগুলি মনোবৃত্তি সজাগ রাখে। এদেশে এই ব্যায়ামের বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়।

মহাভারত

[এই গ্রন্থে কৌরব ও পাণ্ডব রাজগণের পরস্পরের দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধের বিবরণ বর্ণিত আছে। এই রণ-বিবরণ-সংবলিত মহাভারত এক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহা অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ দুই শতাব্দীতে মহাভারত বর্ত্তমান (শত-সহস্রী-সংহিতা) আকারে গ্রথিত হইয়াছিল। মহাভারত অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে সে সময়কার সামাজিক আচার-ব্যবহার, দেশের ভৌগোলিক বিবরণ এবং মানব জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে বিবিধ শিক্ষাপ্রদ সুন্দর সুন্দর আখ্যানমালা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস এই বিপুল গ্রন্থের রচয়িতা। হিন্দুর আদর্শ দেবতারূপে যিনি সমগ্র ভারতে পূজিত ও অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ও ইহাতে বর্ণিত আছে। মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বে গীতা কথিত হইয়াছে। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রোতা অর্জ্জুন। মহাভারতে প্রায় সর্ব্বত্র বৈষ্ণব-প্রভাব বিদ্যমান দেখিয়া মনে হয় যে, পরবর্ত্তিকালে ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরাই ইহার সঙ্কলন ও সম্পাদন করেন। এই জন্যই মহাভারতের অপর নাম কার্ষ্ণবেদ।]

১১৬৩ পৃষ্ঠার পর

ভারতবর্ষের উত্তরাংশে প্রাচীন হস্তিনাপুরে (বর্ত্তমান মীরাটের নিকট) চন্দ্রবংশের রাজারা রাজত্ব করিতেন। এই বংশের শান্তনু এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেন। গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করিবার সময় রাজা শান্তনু এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি গঙ্গাদেবীর কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করিবেন না। কিছুদিনের পর গঙ্গাদেবীর একটি পুত্র জন্মিল। গঙ্গাদেবী সেই পুত্রকে গঙ্গা জলে ফেলিয়া দিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি সাতটি পুত্রকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিলেন। তথাপি শান্তনু গঙ্গাদেবীর এই কার্য্যের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। বৎসরের পর আবার একটি পুত্র জন্মিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত গঙ্গাদেবী এইপুত্রটিকেও গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছেন দেখিয়া মহারাজ শান্তনু গঙ্গাদেবীকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। শান্তনুর এই নিষেধ শুনিয়া গঙ্গাদেবী বলিলেন,—মহারাজ! আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন। আপনি আজ আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। অতএব আজ আমি আপনার গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। গঙ্গাদেবী এই কথা বলিয়া শান্তনুকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, মহারাজ! মহামতি বশিষ্ঠের শাপে অষ্টবসু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহারা মুনির শাপে কাতর হইয়া আমার নিকট বর প্রার্থনা করেন, যেন আমি তাঁহাদিগকে গর্ভে ধারণ করি। সেই কারণেই আমি আপনাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। আপনার এই পুত্রও উক্ত বসুসন্তানদের মধ্যে অষ্টমস্থানীয়। এখন আমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি। আমি ইহাকে প্রতিপালন করিব এবং ধনুর্ব্বেদ, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া যথাসময়ে আপনার নিকট রাখিয়া যাইব।

গঙ্গাদেবী চলিয়া গেলেন। তারপর অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন রাজা শান্তনু গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, হাঁটু পরিমাণ জলে একটি পরমসুন্দর বালক হাতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া গঙ্গার জল-প্রবাহ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বালকটিকে দেখিয়াই শান্তনুর পুত্রদের কথা মনে জাগিয়া উঠিল। এমন সময়ে গঙ্গাদেবী ঐ পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া শান্তনুর সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনার এই পুত্রকে গ্রহণ করুন। আপনার এই পুত্রের নাম দেবব্রত। মহামতি বশিষ্ঠ, বৃহস্পতি, শুক্র ও পরশুরাম ইহার গুরু। বশিষ্ঠের নিকট বেদ এবং বৃহস্পতির ও শুক্রের নিকট সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। মহামতি পরশুরাম ইহাকে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন। আপনার পুত্র সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছে। এইবলিয়া গঙ্গাদেবী সহসা অন্তর্হিতা হইলেন।

পরম সুন্দর বালক জলপ্রবাহ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে

কিছুদিন পরে মহারাজ শান্তনু দাশরাজের কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। এই সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য। অতএব তোমরা মনে করিয়া রাখ, মহারাজ শান্তনুর তিনপুত্র ছিলেন,—দেবব্রত, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য। এই দেবব্রতের পরে নাম হইয়াছিল ভীষ্ম। কেন, জান? যখন রাজা শান্তনু সত্যবতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন, তখন দাশরাজা, শান্তনুর সহিত তাহার মেয়ের বিবাহ দিতে এইবলিয়া অস্বীকার করেন যে, দেবব্রত যখন রাজার পুত্র রহিয়াছেন, তখন সত্যবতীর ছেলেরা ত আর সিংহাসন পাইবে না। ইহা শুনিয়া দেবব্রত সত্যবতীর পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 'আমি কখনও বিবাহ করিব না'। এইরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞা করায়, তাঁহার নাম হইয়াছিল, ভীষ্ম। মহারাজ শান্তনুও এই জন্য তাঁহাকে "ইচ্ছামৃত্যু" বর দিয়াছিলেন।

ভীষ্ম নিজে বিবাহ করিলেন না। তিনি তাঁহার ছোট ভাই বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময়ে খবর পাইলেন, কাশীরাজের তিন কন্যার

স্বয়ংবর হইতেছে। ভীষ্ম এই স্বয়ংবরে গমন করিয়া কাশীরাজের তিনকন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণ করিয়া আনিলেন। হস্তিনাপুরে পৌছিয়া জানিতে পারিলেন, অম্বা শাল্বরাজকে মনে মনে ভালবাসেন। এজন্য তিনি বহু সম্মানের সহিত অম্বাকে শাল্বরাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু অম্বা ভীষ্মকর্তৃক অপহৃতা জানিয়া শাল্বরাজ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অম্বা ভীষ্মের গুরু পরশুরামকে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মের নিকট আসিয়া ভীষ্মকেই বিবাহ করিতে চাহিলেন। কিন্তু ভীষ্ম অম্বার কথা, এমন কি,গুরু পরশুরামের কথাও রক্ষা করিলেননা। অম্বা ভীষ্মকর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া ভীষ্মবধের জন্য মহাদেবের আরাধনা করিতে হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। কাশীরাজের অপর দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ হইল। ইতিপূর্ব্বে চিত্রাঙ্গদ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া একদিন মৃগয়ায় গিয়া সরস্বতী নদীর তীরে এক গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

ইহার পর বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইলেন। কিন্তু তিনিও অল্পদিনের মধ্যে ক্ষয়রোগে মারা গেলেন। বিচিত্রবীর্য্যের ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ। হিন্দু শাস্ত্রে জন্মান্ধ রাজ্যাধিকারী হয় না। এজন্য ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পারিলেন না; কনিষ্ঠ হইয়াও পাণ্ডু রাজা হইলেন। যথাসময়ে গান্ধাররাজার কন্যা গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের ও কুন্তীভোজ রাজার কন্যা কুন্তীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ হইল। ইহা ছাড়া মদ্ররাজের কন্যা মাদ্রীকেও পাণ্ডু বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যলাভ করিলেন। পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব নামে পাঁচপুত্র ছিল। ধর্ম্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার এইসব দেবতাদের বরে এই পাঁচ পুত্রের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ইঁহারা ঐসকল দেবতার পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডুরাজার মৃত্যুসময়ে মাদ্রী তাঁহার কাছে ছিলেন, এইজন্য তিনি সেকালের রীতি অনুসারে পাণ্ডুর সহিত সহমরণে গিয়াছিলেন। কাজেই,কুন্তীদেবী তাঁহার তিনপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম,অর্জ্জুন,ও মাদ্রীর দুইপুত্র নকুল ও সহদেবকে একসঙ্গে পালন করিতে লাগিলেন।

গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের নাম দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ইত্যাদি। চন্দ্রবংশে কুরু নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ঐ বংশে জন্ম বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নাম হইয়াছিল, কৌরব। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর পুত্রদিগকে এবং নিজের পুত্রদিগকে সমানভাবে স্নেহ করিতে লাগিলেন।

কৌরব ও পাণ্ডবগণ এক সঙ্গে খেলা করেন, এক সঙ্গে থাকেন, এক সঙ্গে বেড়ান। কিন্তু

বালকগণ···গাছ হইতে···মাটিতে পড়িয়া যাইত

কৌরবগণ পাণ্ডবগণকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না ইঁহাদের সকলেরঅপেক্ষা বলবান্ হইয়াছিলেন ভীম। যখন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা গাছে উঠিয়া ফল পাড়িত, তখন ভীম সেই সব গাছে লাথি মারিত, গাছগুলি দুলিয়া উঠিত—আর বালকগণ তৎক্ষণাৎ গাছ হইতে ফলের সহিত মাটিতে পড়িয়া যাইত! ভীমের এইরূপ বিক্রম দেখিয়া কৌরবগণ ভয় পাইতেন। এইজন্য দুর্যোধন ভীমকে মারিবার জন্য নানা রকম চেষ্টা করিতেছিলেন। একবার তিনি ভীমকে বিষের লাড়ু খাওয়াইয়া দিয়া পাণ্ডবদের

অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ভীম নাগলোকে গেছেন। নাগরাজ বাসুকির অনুগ্রহে তিনি অমৃতকুণ্ডের অমৃত পাইয়া অসাধারণরূপে বলশালী হইয়া ফিরিয়াছিলেন। এইসব কারণে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে বেশ মনের মিল ছিল না। তথাপি ধৃতরাষ্ট্রের শাসনে তাহাদের অস্ত্রশিক্ষাদি একত্রেই চলিত।

প্রথমতঃ কৃপাচার্য নামক এক মহাবীর যোদ্ধা ব্রাহ্মণ রাজকুমারগণকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। একদিন রাজকুমারগণ নগরের বাহিরে কন্দুক (লোহার গোলা বা ভাঁটা) লইয়া খেলা করিতেছেন, হঠাৎ তাহাদের খেলার কন্দুকটি এক অন্ধকূপে পড়িয়া গেল। রাজকুমারগণ কন্দুক উঠাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই তাহা উঠাইতে পারিলেন না। এক শ্যামবর্ণ রুক্ষ ব্রাহ্মণ রাজকুমারদের এইরূপ নাকাল দেখিয়া হাসিতেছিলেন। তিনি সেখানে আসিয়া বাণ প্রয়োগ করিয়া কন্দুকটি কূপ হইতে তুলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের এইরূপ বাণপ্রয়োগের কৌশল দেখিয়া রাজকুমারগণ অবাক হইলেন এবং ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, তোমরা ভীষ্মদেবের নিকট গিয়া আমার কথা বল, তাহা হইলেই তিনি আমায় চিনিতে পারিবেন। রাজকুমারগণ আর কিছু না বলিয়া ভীষ্মদেবের কাছে সব কথা বলিলেন। ভীষ্ম শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, এ ব্রাহ্মণ আর কেহ নহেন, তিনি মহাবীর দ্রোণ। ভীষ্ম মহাসম্মানে দ্রোণাচার্যকে রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার গুরুপদে বরণ করিলেন।

মহাবীর দ্রোণ পাণ্ডব ও কৌরবদিগকে অস্ত্র শিক্ষা দিতে আসিলেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন—ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। দ্রোণ ও পাঞ্চাল দেশের রাজকুমার দ্রুপদ মহাবীর অগ্নিবেশের নিকট অস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যা শিখিবার জন্য এক সঙ্গে বাস করিতেন। এই সময়ে উভয়ের মধ্যে খুব ভাব হইয়াছিল। এমন কি সে সময়ে দ্রুপদ বলিয়াছিলেন, "হে দ্রোণ! আমি যখন রাজা হইব, সে সময়ে সে রাজ্য তুমিও আমার সঙ্গে ভোগ করিবে। আমি তোমার নিকট শপথ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলাম।" দ্রোণ সর্বদা এই কথা কয়টি গৌরবের সহিত স্মরণ করিতেন। শিক্ষা শেষ হইলে রাজকুমার দ্রুপদ চলিয়া গেলেন। কিছুদিনের পর দ্রোণের অর্থাভাব হইলে দ্রোণ সখা দ্রুপদের কাছে কিছু প্রার্থনা করিবার জন্য গেলেন। এখন দ্রুপদ রাজা হইয়াছেন। বাল্যকালের বন্ধু গরীব ব্রাহ্মণ দ্রোণকে তিনি চিনিতে পারিবেনকেন? দ্রুপদ অপমান করিয়া দ্রোণকে তাড়াইয়া দিলেন। রাজসভা হইতে আসিবার সময় দ্রোণ দ্রুপদকে বলিয়া আসিলেন, দ্রুপদ! একদিন আমি তোমাকে ইহার পুরস্কার দিব এবং সেদিন তুমি আমাকে তোমার বন্ধু বলিয়া মনে করিবে। এই বলিয়া তিনি হস্তিনাপুরে চলিয়া আসিয়া রাজকুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষার আচার্য পদ গ্রহণ করিলেন। এইজন্য তিনি ক্রমে দ্রোণাচার্য নামেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

দ্রোণাচার্যের শিক্ষার গুণে রাজকুমারগণ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। একদিন দ্রোণাচার্য রাজকুমারগণের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই পরীক্ষায় অর্জুনের বিশেষ গৌরব বাড়িল। সহসা কর্ণ নামক এক মহাবীর রঙ্গস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া মহাবীর অর্জুনকে অস্ত্র পরীক্ষা দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু এই বীর কে, কেহই জানিতেন না, কৃপাচার্য কর্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; কর্ণ কোন উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জায় নতমস্তক হইলেন। এই সময়ে দুর্যোধন মহাবীর কর্ণকে অঙ্গ দেশের রাজা করিলেন। সকলে কর্ণকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

এদিকে কর্ণের পালক পিতা অধিরথ সূত, পুত্রের এইরূপ রাজ্যলাভের কথা শুনিয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। কর্ণ সিংহাসনহইতে নামিয়া অধিরথকে প্রণাম করিলেন। ইহা দেখিয়া সকলেই কর্ণকে সূতপুত্র বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দুর্যোধন কর্ণকে সখা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এইরূপ নানা গোলযোগে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অর্জুনের সহিত কর্ণের অস্ত্র পরীক্ষা আর হইল না।

কর্ণকে জান? কর্ণ কুন্তীর পুত্র; অধিরথের নহেন। কুন্তী কর্ণের মা হইয়াও তাঁহার প্রতি মায়ের মত স্নেহ করেন নাই—বরং জন্মিবার পরই তাঁহাকে এক মঞ্জুষার মধ্যে রাখিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেন। নদীতে অধিরথ নামে এক সূত স্নান করিতেছিল। মঞ্জুষার মধ্যে একটি ছেলে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া অধিরথ ঐমঞ্জুষা হইতে ছেলেটিকে লইয়া স্ত্রী রাধাকে প্রদান করেন। তাঁহাদের কোন সন্তান ছিল না। অধিরথ ও রাধা এই শিশুটিকে সন্তানের মত করিয়া লালনপালন করিতে থাকেন। এজন্য কর্ণ অধিরথ নামক সূতের পুত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

রাজকুমারগণ সকলেই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী

হইয়াছেন জানিয়া একদিন আচার্য্য দ্রোণ দ্রুপদ রাজ-কর্ত্তৃক তাঁহার অপমানের কথা বলিয়া আদেশ করিলেন, তোমারা গুরুদক্ষিণারূপে রাজা দ্রুপদকে আমার কাছে বাঁধিয়া আন। গুরুর কথায় অর্জ্জুন প্রভৃতি পাঞ্চালদেশে গিয়া রাজা দ্রুপদের সহিত যুদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া বন্দীরূপে দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত করেন। দ্রোণাচার্য্য অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, কেমন সখা দ্রুপদ রাজ। এখন কি তুমি আমায় চিনিতে পারিলে? তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তোমাকে আমি বধ করিব না; তবে সেই অপমানের জন্য আমি তোমার অর্দ্ধ রাজ্য গ্রহণ করিলাম। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

দ্রুপদ রাজার অন্য নাম ছিল যজ্ঞসেন। তিনি দ্রোণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া দ্রোণ বধের জন্য এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের অনল হইতে এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। পুত্রের নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন; কন্যার নাম যাজ্ঞসেনী। কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম হয় কৃষ্ণা। দ্রুপদ রাজার কন্যা বলিয়া ইঁহার অন্য নাম দ্রৌপদী।

বক রাক্ষস বধ

এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পিতৃ রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। দুর্য্যোধনাদির তাহা ভাল লাগে নাই। তাঁহারা পাণ্ডবগণকে নানাপ্রকার কষ্ট দিতে লাগিলেন। এই সময়ে বারণাবতে এক উৎসব হইতেছিল। নানা কৌশল করিয়া কৌরবেরা পাণ্ডবগণকে বারণাবতে পাঠাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য বারণাবতে গালা, ধুনা, সর্জ্জ, তেল, শণ, কাঠ ইত্যাদি দিয়া এক বাড়ী তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীর সহিত এ লাক্ষাগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা দুই এক দিনের মধ্যেই দুর্য্যোধনের এই ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলেন।

দৈবযোগে একদিন এক চণ্ডালী পাঁচটি পুত্রকে লইয়া পাণ্ডবদের গৃহে অতিথি হইয়াছিল। রাত্রে আহারাদির পর তাহাদের স্থানান্তরে যাইবার কথা, কিন্তু তাহারা

ঐ গৃহের একাংশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পাণ্ডবগণ এ সংবাদ জানিতেন না। ভীম খবর পাইলেন, দুর্য্যোধনাদির মন্ত্রী পুরোচন ঐ দিন ঐ গৃহে অগ্নি প্রদান করিবে। খবর পাইয়াই মধ্যরাত্রে ভীম নিজে ঐ গৃহে আগুন লাগাইয়া দিয়া মা ও অন্য ভাইদের লইয়া ঘরের মধ্যস্থ সুড়ঙ্গ পথ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পাণ্ডবদের এক খুড়া ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল বিদুর। ইনি বিচিত্রবীর্য্যের এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদুর পাণ্ডবদিগকে ঐরূপ বিপদের কথা ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা এই খবর পাইয়া এক খনকের দ্বারা সুড়ঙ্গ কাটিয়া রাখেন। যেখানে এই জতু (লাক্ষা) গৃহ ছিল এখনও তার নাম লচছাগির) প্রয়াগের নিকটে গঙ্গার তীরে এখনও তাহা দেখা যায়। পুরোচনও এই অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়া মরিয়াছিল। পরদিন সেই ছাইয়ের গাদা হইতে ছয়টি অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ বাহির হইলে দুর্য্যোধন প্রভৃতি মনে করিলেন, কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব পুড়িয়া মরিয়াছে।

পাণ্ডবেরা অনেক দিন বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। অতঃপর তাঁহারা হিড়িম্ব বনে প্রবেশ করিলেন। এই বনে হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ও তাহার ভগিনী হিড়িম্বা বাস করিত। ভীম হিড়িম্ব রাক্ষসকে বধ করিয়া হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। এই হিড়িম্বার গর্ভে ভীমের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম হয় ঘটোৎকচ।

অবশেষে তাঁহারা একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতে থাকেন। এই একচক্রার নিকটে বক নামে এক রাক্ষস বাস করিত। ঐ নগরবাসীরা এইরূপ নিয়ম করিয়াছিল যে, প্রতিদিন এক এক ব্যক্তির বাড়ী হইতে তাহাকে খাদ্য দেওয়া হইবে। একদিন ঐ ব্রাহ্মণের পালা। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া উঠিলেন। করুণহৃদয়া কুন্তী সব কথা জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আমি আপনাদের জন্য আমার পঞ্চপুত্রের মধ্যে এক পুত্রকে রাক্ষসের কাছে পাঠাইয়া দিব। আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না। রাক্ষস আমার পুত্রের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আমার ঐ পুত্র অনেক রাক্ষস বধ করিয়াছে। কুন্তী ভীমের নিকটে আসিয়া সব কথা বলিলেন। ভীম মাতার আদেশে বক রাক্ষসের কাছে খাবার লইয়া গেলেন এবং বককে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন বনের মধ্যে ব্যাসদেবের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। ব্যাসের কথায় তাঁহারা দ্রুপদের কন্যার স্বয়ংবর দেখিবার জন্য পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন।
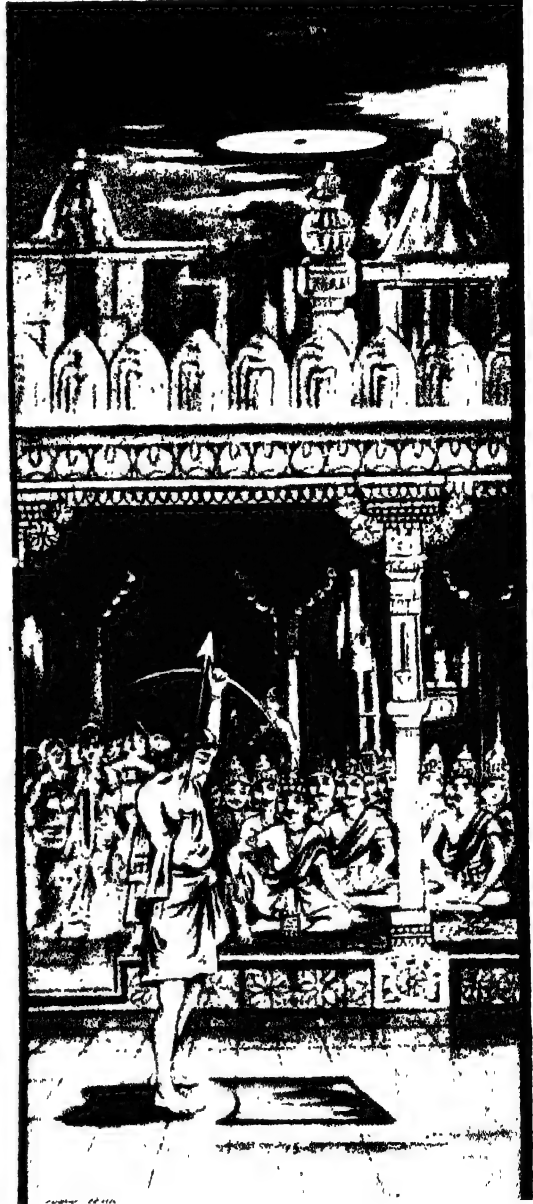
অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ

রাজা যজ্ঞসেনের মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে, অর্জ্জুনকেই কন্যা দান করেন, কিন্তু তিনি একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। এইজন্য অর্জ্জুন

ছাড়া অন্য কেহ যাহাতে দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে না পারে, সেজন্য তিনি এক আশ্চর্য্য কৌশল করিলেন এমন একটা ভয়ানক দৃঢ় শরাসন (ধনুক) প্রস্তুত করিলেন, যেন তাহাকে কেহ বাঁকাইতে না পারে; সেই ধনুকটিকে বাঁকাইয়া তাহাতে গুণ পরাইতে হইবে এবং পরে সেই ধনুকে তীর লাগাইয়া আকাশের খুব উপরে ঝুলানো একটা লক্ষ্য বিঁধিতে হইবে। লক্ষ্যের মাঝখানে আবার একটি যন্ত্রের মত রহিয়াছে, উহার ভিতর দিয়া তীর চালাইয়া যিনি লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন।

কত দেশ হইতে কত বড় বড় ক্ষত্রিয় রাজারা আসিলেন, কত ঋষি মুনিরা আসিলেন। তারপর স্বয়ংবরের দিনে দ্রৌপদী স্নান করিয়া নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া কাঞ্চনময় বরণপাত্রে সোনার বরণ-ডালায় সোণার মালা সাজাইয়া আনিয়া সভাস্থলে দাঁড়াইলেন।

দ্রুপদ রাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শুনুন আপনারা, এই ধনুক ও এইপাঁচটি তীর আপনারা দেখিতেছেন এবং ঐ আকাশের উপর লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। এইপাঁচটি শর দ্বারা ঐ যন্ত্রের ছিদ্র দিয়া লক্ষ্য বিঁধিতে হইবে। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, যিনি একাজ করিতে পারিবেন, তিনিই আমার ভগিনীকে লাভ করিবেন।

কত দেশ হইতে কত বড় বড় ক্ষত্রিয় রাজা আসিয়াছেন; কিন্তু কেহই এই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিলেন না। এমন সময় মহাবীর কর্ণ আসিয়া ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন। কর্ণ ধনুকে বাণ যোজনা করিয়াছেন দেখিয়া দ্রৌপদী বলিলেন, আমি সূত-পুত্রকে বিবাহ করিব না। দ্রৌপদীর এই কথায় কর্ণ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। এই সময়ে অর্জ্জুন ব্রাহ্মণদের মধ্য হইতে উঠিয়া মৎস-চক্ষু বিদ্ধ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ জয়-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ক্ষত্রিয় রাজারা রাগিয়া গিয়া দ্রুপদরাজাকে মারিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু ভীম ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ কৌশলে সকলেই হারিয়া গেল। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লইয়া ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ফিরিলেন। এই সময়ে কুন্তী ঘরের ভিতর ছিলেন। পাণ্ডবেরা মাকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ মা, আজ আমরা কি ভিক্ষা পাইয়াছি। কুন্তী ভিতর হইতেই বলিলেন, যাহা আনিয়াছ তাহা তোমরা পাঁচ ভাইয়ে লও। কুন্তী বাহিরে আসিয়া বধূকে দেখিয়া অবাক্। পাণ্ডবগণের নিকট মাতৃ-আজ্ঞা অন্যথা হইবার নয়। পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

কোথাকার কে এক ব্রাহ্মণকুমার এত বড় বড় রাজাদিগকে যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাকে লইয়া গেল, এইরূপ চিন্তা করিয়া মহারাজ দ্রুপদ প্রিয়পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, বৎস! তুমি ঐ বীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার পরিচয় জানিয়া আইস।

ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া অন্যের অগোচরে ভীমার্জ্জুনের পশ্চাতে পশ্চাতে ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় জানিতে পারিলেন, এবং পরিচয় পাইলেন তাঁহারা ছদ্মবেশী পঞ্চ পাণ্ডব। ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে সকল সংবাদ জানাইলেন। মহারাজ দ্রুপদ পুত্রের মুখে এই সংবাদ পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। অবিলম্বে রাজ্যের সকলেই জানিতে পারিল যে, লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ আর কেহই নহেন তৃতীয় পাণ্ডব মহাবীর অর্জ্জুন। মহারাজ দ্রুপদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কুন্তীদেবীর আদেশ অনুসারে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দিলেন। রাজ্য জুড়িয়া আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল।

অবিলম্বে এই খবর দুর্যোধনাদির কর্ণগোচর হইল। যে পঞ্চপাণ্ডব যতুগৃহে পুড়িয়া মরিয়াছে মনে করিয়া কৌরবগণ পুলকিত হইয়াছিলেন, আজ পাণ্ডবগণের জীবিত থাকার কথা এবং ভীমার্জ্জুনের বিবিধ অসম্ভব ব্যাপার সাধন স্মরণ করিয়া তাঁহারা অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। ভীষ্ম পাণ্ডবগণের সংবাদ পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং যথাযোগ্য সমাদর করিয়া তাহাদিগকে হস্তিনাপুরে লইয়া আসিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে আদেশ করিলেন। এইব্যাপারে কর্ণ অতিশয় রাগিয়া গেলেন। কর্ণের ক্রোধ দেখিয়া দ্রোণ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তোমাদের বীরত্বের পরীক্ষা লক্ষ্যভেদের স্থানেই হইয়া গিয়াছে। যে অর্জ্জুন শত শত নৃপতিকে একাকী রণে পরাস্ত করিয়াছে, যাহার হুঙ্কারে তোমরা ভীরু, কাপুরুষের মত পলায়ন করিয়া কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছ, তুমি এত বড় ধৃষ্ট যে, সেই অর্জ্জুনের বিপক্ষতা করিতে চাহ! ধৃতরাষ্ট্র এই বিতর্ক-সভায় কোন পক্ষের কথা না শুনিয়া সসম্মানে পাণ্ডবগণকে হস্তিনাপুরে লইয়া আসিবার জন্য বিদুরকে আদেশ করিলেন

যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ দিয়া বিদুর পাণ্ডব গণকে সসম্মানে হস্তিনানগরে লইয়া আসিলেন।

কৌরবগণের সহিত পাণ্ডবগণের একত্রবাস নিরাপদ নহে ভাবিয়া একদিন ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সস্নেহে বলিলেন, বৎস! আমার ইচ্ছা, তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থে যাইয়া নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া বাস কর। যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের কথায় সম্মত হইয়া ভ্রাতৃগণ ও সখা কৃষ্ণের সহিত খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া নগর নির্ম্মাণে মনোযোগী হইলেন। পরে এই নগরের নাম হইয়াছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে দ্রৌপদীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত অস্ত্রগৃহে আছেন। এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, আমার গরুগুলিকে চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। আপনি দয়া করিয়া আমার গরুগুলি রক্ষা করুন। এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অস্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলেন ও অস্ত্রগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের সহিত চলিয়া গেলন।

অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা মত বারো বছরের জন্য তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। এই তীর্থ পর্য্যটন কালে তিনি নাগকন্যা উলূপী এবং মণিপুরের রাজা চিত্রভানুর পরমা সুন্দরী কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের একপুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম হইল বভ্রুবাহন। অর্জ্জুন কিছুদিন মণিপুরে থাকিয়া রৈবতক পর্ব্বতে গেলেন। এই রৈবতক পর্ব্বতের উপরে দ্বারকানগরী—শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম বলরাম। দুর্য্যোধনের সহিত বলরামের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। এইজন্য বলরাম তাঁহার অপূর্ব্বসুন্দরী ভগিনীর সহিত দুর্য্যোধনের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের খুব প্রণয় ছিল। কৃষ্ণ-বলরামের ভগিনী সুভদ্রার সহিত একদিন অর্জ্জুনের দেখা হইল। সুভদ্রা অর্জ্জুনের প্রতি অনুরক্তা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া জ্যেষ্ঠ বলরামকে বলিলেন, অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দেওয়া হউক। কিন্তু বলরাম সম্মত হইলেন না। পরিশেষে সুভদ্রার স্বয়ংবর স্থির হইল। অর্জ্জুন পূর্ব্বের ব্যবস্থামত সুভদ্রাকে স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। বলরাম ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নানা কৌশলে বলরামের ক্রোধ শান্ত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দিলেন। এই সুভদ্রার গর্ভে অর্জ্জুনের এক মহাবীর পুত্র জন্মগ্রহন করেন। তাঁহার নাম অভিমন্যু।

ক্রমে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞার বারো বছর পূর্ণ হইল। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতেছেন। এই সময়ে দ্রৌপদীর পাঁচটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যমুনার তীরে ভ্রমণ করিতেছেন। এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাদের নিকট খাদ্য ভিক্ষা করিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন, ব্রাহ্মণ, আপনি যাহা খাইতে চাহিবেন, তাহাই আপনাকে খাওয়াইব। এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণবেশী অগ্নিদেব বলিলেন, আমি ব্যাধিযুক্ত হইয়াছি। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, খাণ্ডব বনের সমস্ত জীব-জন্তু ভোজন করিলে আমি ব্যাধিমুক্ত হইব। ব্রহ্মার এই কথায় আমি একবার খাণ্ডববন ভোজন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ঐ বন ইন্দ্রের রক্ষিত। সেখানকার জন্তুরা জলবর্ষণ করিয়া আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছে। আমি বহুদিন হইতে ব্যাধিযুক্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছি। তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আমার ব্যাধি দূর কর। অগ্নিদেবের এই ব্যাধি হইবার কারণ কি জান? বহু পূর্ব্বে শ্বেতকি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দুর্ব্বাসামুনির দ্বারা এক যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা মুনি মুষলধারায় ঘৃতদান করিয়া বারো বছরে ঐ যজ্ঞ পূর্ণ করেন। এই যজ্ঞে অপরিমিত ঘৃত ভোজন করিয়া অগ্নিদেব ব্যাধিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অগ্নিদেবের এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বনের দুইদিকে দাঁড়াইয়া আগুন লাগাইয়া দিলেন। ইন্দ্ররাজা স্বর্গে এই সংবাদ পাইলেন। তাঁহার রক্ষিত এই খাণ্ডব বন। তিনি রাগিয়া গিয়া ঐরাবতে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কি ভয়ানক যে যুদ্ধ হইল, তাহা কি বলিব। এই যুদ্ধে ইন্দ্রদেব, অর্জ্জুনের পরাক্রম ও শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। খাণ্ডব দাহন হইয়া গেল। তাহাতে মাত্র ছয়টি প্রাণী বাঁচিয়াছিল; ময় দানব তাহাদের অন্যতম।

পৃথিবীর ছয়টী আশ্চর্য্য জিনিষ
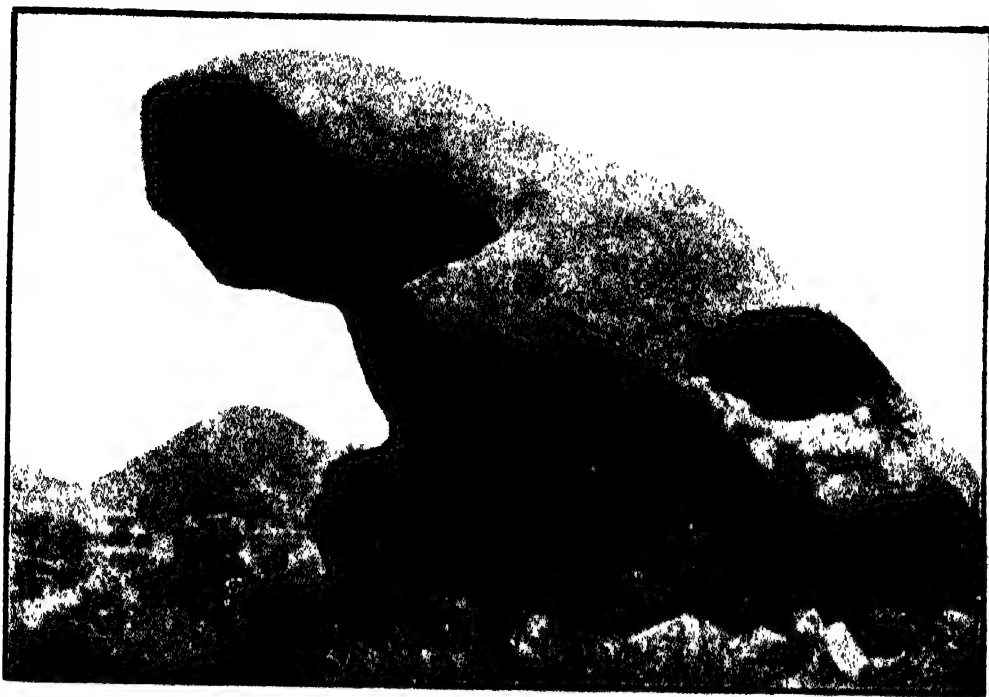
আবুপর্ব্বতের—বেঙ পাহাড়, ভারতবর্ষ

বরফ জমা জলপ্রপাত—চুম্বি উপত্যকা, তিব্বত
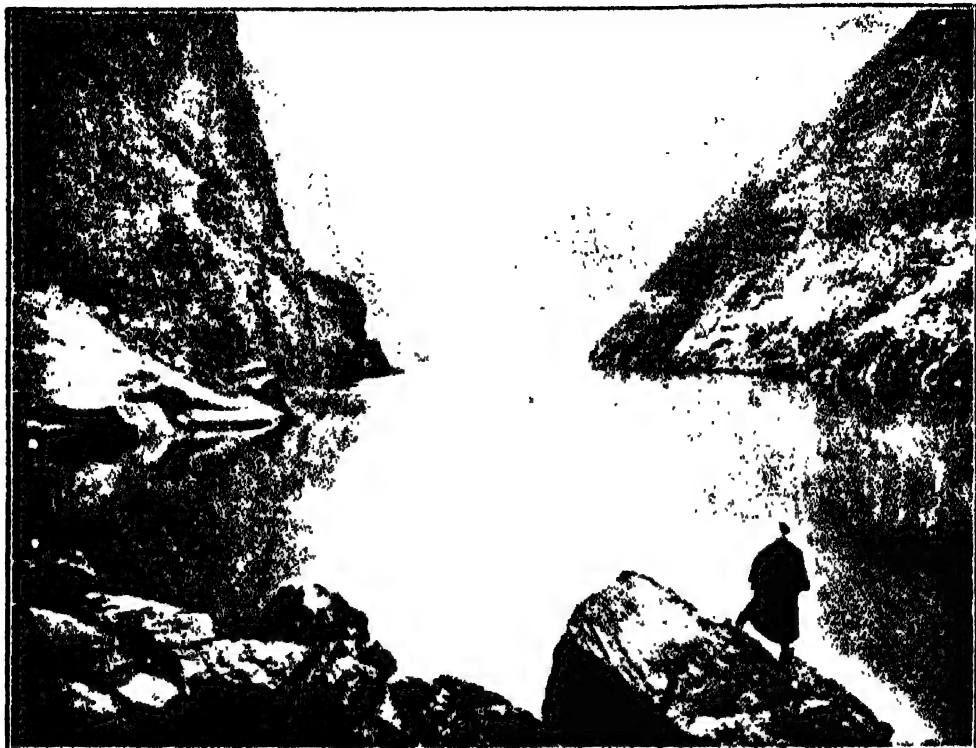
কাৎসুরা নদীর উৎসমুখে--জাপান

ইয়াং-সিকিয়াং নদীর চলাত পথ---চীন

দড়ির পুল---সাঙ্গপো, তিব্বত

ওয়াইমাঙ্গোর উষ্ণপ্রস্রবণ—নিউজিল্যাণ্ড

জাতক কথা

(১) লোভের দণ্ড

১২২৪ পৃষ্ঠার পর
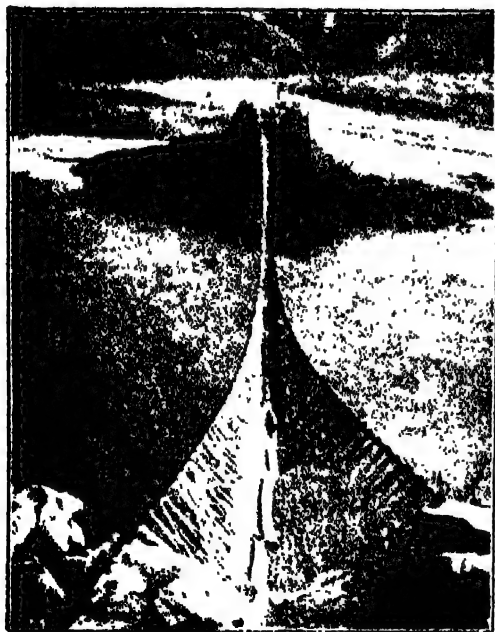
বোধিসত্ত্ব একবার এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সে জন্মে তিনটি কন্যা জন্মে। বেশীদিন পত্নী ও কন্যাদের লইয়া সংসার-সুখ ভোগ করিতে পান নাই, যৌবনেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর তিনি সোণার হাঁস হইয়া জন্মিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের কথা তাঁহার মনে রহিয়া গেল। তখন তিনি হিমালয় প্রদেশের হ্রদ হইতে সমতলে গ্রামে আসিয়া পত্নী ও কন্যাদের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহাদের জন্য তাঁহার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। সন্ধান করিয়া দেখিলেন, তাহারা একটি কুটীরে বাস করিতেছে এবং পরের গৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া অতিকষ্টে সংসার চালাইতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া বোধিসত্ত্বের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার দেহে ত সোণার পালক অনেক, মাসে মাসে এক একটি করিয়া পালক দিলে ইহাদের দুঃখ ঘুচিতে পারে। এই সংকল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাদের ঘরের চালের উপর বসিলেন এবং মানুষের কণ্ঠে পত্নীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, পূর্ব্ব জন্মে আমি তোমার স্বামী ছিলাম। তোমাদের দুর্দ্দশা দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হচ্ছে—আমি একটি ক'রে সোনার পালক দিয়ে যাব, তাই বিক্রি ক'রে তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাক—কন্যাদের একে একে বিয়ে দাও।"

ব্রাহ্মণী ..পালকগুলো উপড়াইয়া লইল

এই বলিয়া তিনি আট দশ ভরি ওজনের পালক দিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপ মাসে মাসে তিনি আসিতেন আর পালক দিয়া যাইতেন। মেয়েরা তাঁহার গায়ে হাত বুলাইত, তাহাতে তিনি সুখ বোধ করিতেন।

ব্রাহ্মণী একদিন ঠিক করিল, এভাবে একটি একটি করিয়া পালক লইলে বিশেষ সুবিধা হইতেছে না। ইনিই বা কত

দিন আসিবেন, তাহারই বা ঠিক কি? কিছুদিন বাদে না আসিতেও পারেন। তার চেয়ে একদিন ইহাকে ধরিয়া সব পালকগুলা ছিঁড়িয়া লইলে এক দিনেই আমরা বড় লোক হইতে পারিব।

ব্রাহ্মণী এ প্রস্তাব মেয়েদের জানাইল—ইহাতে মেয়েরা রাজী হইল না। তাহারা মাকে বারবার নিষেধ করিয়া বলিল,—"মা, আমাদের তাড়াতাড়ি ধনী হ'য়ে কাজ নেই। আমাদের দুঃখ ঘুচেছে, এই যথেষ্ট। বাবাকে কষ্ট দিয়ে অমন কাজ ক'রো না। পালকগুলো উপড়ে নিলে বাবা আর উড়তে পারবেন না, তাতে তিনি মারাও যেতে পারেন।" ব্রাহ্মণী শুনিল না—বোধিসত্ত্ব আসিবামাত্র তাঁহাকে আদর করিবার ছলে কোলে তুলিয়া লইয়া হাতে করিয়া গলাটা চাপিয়া ধরিল, তারপর একে একে সব পালক-গুলো উপড়াইয়া লইল। বোধিসত্ত্ব যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি যত আর্ত্তনাদ করেন—উপড়ানো সোনার পালকগুলো ততই সাদা হইয়া সাধারণ হাঁসের পালক হইয়া গেল। বোধিসত্ত্ব উড়িবার চেষ্টা করিলেন, উড়িতে পারিলেন না, কুটীরেই থাকিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী হায় হায় করিতে লাগিল। কন্যারা বোধিসত্ত্বকে আহারাদি দিয়া বাঁচাইয়া রাখিল। কিছুদিন পরে বোধিসত্ত্বের দেহে নূতন পালক বাহির হইল। এবার যে পালক বাহির হইল, তাহা সোনার নয়—সাধারণ হাঁসের পালক। তারপর একদিন তিনি আকাশে উড়িয়া গেলেন। হাঁসটি ডানা বিস্তার করিয়া নীল আকাশের মাঝে বিলীন হইয়া গেল দেখিয়া বিস্ময় নেত্রে কন্যারা জননীকে ধিক্কার দিতে লাগিল। ব্রাহ্মণী অতিলোভের দণ্ড লাভ করিল।

(১) ত্রিশ বছরের আগুন

ভগবান্ বুদ্ধদেবের সময় ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ যাগযজ্ঞ করাকেই প্রধান ধর্ম্ম মনে করিতেন, অগ্নিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন এবং অগ্নির তুষ্টির জন্য যজ্ঞে নানাবিধ পশুর মাংস আহুতি দিতেন। অন্য দেবতার উদ্দেশে কিছু দিতে হইলেও অগ্নিতেই তাহা সমর্পণ করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, অগ্নিই সে সব বহন করিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য তাহার কাছে পৌছাইয়া দিবে। এইরূপ যাগযজ্ঞ করিয়াই তাঁহারা ভাবিতেন ধর্ম্মকার্য্য সমাপ্ত হইল। এই যজ্ঞ সম্পাদন ও পশুহত্যা যে একেবারে নিরর্থক, তাহাতে যে কোন ধর্ম্মই হয় না, তাহাই শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি লাঙ্গুষ্ঠ জাতক নামে একটি জাতক-কথা বিবৃত করেন।

পুরাকালে ব্রহ্মদত্তের সময় বারাণসীতে ব্রাহ্মণকুলে বোধিসত্ত্ব একবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেদিন জন্মগ্রহণ করেন, সেই দিনই তাঁহার পিতা অগ্নিশালায় সদ্যোজাত পুত্রের জন্য অগ্নিস্থাপন করেন। ষোল বৎসর পর্য্যন্ত পিতা নিজে হোম করিয়া ঐ অগ্নি বাঁচাইয়া রাখেন। বোধিসত্ত্বের ষোল বৎসর বয়স হইলে পিতা বলিলেন, "বৎস, তোমার জন্য আমি এতদিন অগ্নিরক্ষা করেছি। তুমি যদি সংসারী হতে চাও, তবে বেদ অধ্যয়ন কর। আর যদি ব্রহ্মলোক যেতে চাও, তবে ঐ অগ্নি নিয়ে বনে গিয়ে অগ্নির সেবা কর ও নিত্য হোম কর।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি সংসারী হ'তে চাই না,

বোধিসত্ত্ব জল ঢালিয়া…আগুন নিবাইয়া দিলেন।

আমি বনেই যাব।" তারপর তিনি বনে গিয়া একটি

তপোবন রচনা করিয়া ঐ অগ্নিতে ত্রিসন্ধ্যা হোম করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি কোন একটি গ্রামে একটি যজ্ঞ করাইয়া একটি পশু দক্ষিণাস্বরূপে প্রাপ্ত হন। পশুটি পাইয়া তিনি ভাবিলেন, ইহার মাংস ভগবান্ অগ্নিতে আহুতি দিতে হইবে। কিন্তু বিনা লবণে মাংস আহুতি দিলে অগ্নি ও অন্যান্য দেবতারা আহার করিতে গিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইবেন। —লবণ চাই। পশুটিকে তপোবনে বাঁধিয়া রাখিয়া লবণ সংগ্রহের জন্য তিনি একটি গ্রামে গেলেন।

ইহার মধ্যে কতকগুলি ব্যাধ পশুটিকে অরক্ষিত দেখিয়া বধ করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে মাংস রাঁধিয়া আহার করিয়া চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব লবণ ও অন্যান্য সামগ্রী লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, পশুটি নাই—তাহার লাঙ্গুল, শৃঙ্গ ও ক্ষুর পড়িয়া আছে। বোধিসত্ত্ব তখন ঐগুলি অগ্নিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "হে, অগ্নি, তোমার ক্ষমতা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। বৃথাই তোমাকে এতদিন ধরে ঘি ঢেলে সেবা করে এসেছি। তুমি নিজে মাংস খেতে খুব ভালবাস, অথচ তুমি তোমার আহার রক্ষা করতে পারলে না। নিজে তুমি আপন সম্পত্তি রক্ষা করতে পার না—তুমি আমাকে বাঁচাবে কি ক'রে, ঠাকুর? তোমার পুজা করা বোকামি। হায় হায়, এতদিন বৃথাই ধোঁয়ায় চোখ লাল করেছি। তোমার যেমন শক্তি, তোমার আহুতি তেমনি হওয়া উচিত। এই লও শিঙ, ক্ষুর আর লেজ।"

এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব জল ঢালিয়া ত্রিশ বছরের আগুন নিবাইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

(৩) দুই বণিক

মগধ রাজ্যে রাজগৃহ নগরে শঙ্খ বণিক নামে এক মহাশ্রেষ্ঠী ছিলেন। বারাণসী নগরে পিলিয় নামে এক ধনকুবের বণিক্ ছিলেন। দুই জনের মধ্যে যথেষ্ট মৈত্রী ছিল। বারাণসী ও রাজগৃহের মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল, বাণিজ্য-উপলক্ষে দুই জনের প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হইত। দৈবদুর্বিপাকে পিলিয়ের বহু সহস্র শকট পণ্যদ্রব্য ডাকাতে লুঠিয়া লইল। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি রাজভাণ্ডারে ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠীদের নিকট ঋণ করিলেন। শেষে ঋণের দায়ে পিলিয় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন পিলিয় স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া রাজগৃহে বন্ধুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া পাশে বসাইয়া কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পিলিয় বলিলেন, "ভাই, আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে। আমি আজ পথের ফকির, তোমার কাছে সাহায্য ভিক্ষার জন্য এলাম।" শঙ্খ বলিলেন, "সে আর বেশী কথা কি, তুমি আমার সহোদর ভাইয়ের চেয়েও বেশী। আমার অর্দ্ধেক তোমার। আমার দাস দাসী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিও অর্দ্ধেক তুমি নাও। তোমাকে দিয়েও আমার যথেষ্ট থাকিবে।"

পিলিয় অম্লান বদনে বন্ধুর সম্পত্তির অর্দ্ধেক অধিকার করিয়া বারাণসী নগরে ফিরিয়া গেল। কিছুকাল পরে শঙ্খেরও দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। ক্রমে শঙ্খও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িল। তখন তিনি ভাবিলেন—যাই এখন বন্ধুর কাছে। বন্ধু ত বটেই, তা'ছাড়া তাকে আমার সর্ব্বস্বের অর্দ্ধেক দিয়েছি, সে নিশ্চয় আশ্রয় দেবে।

শঙ্খ পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। বারাণসীতে প্রবেশ করিয়া শঙ্খ পত্নীকে বলিলেন, "যদিও আমাদের দুরবস্থা হয়েছে, তা হলেও তুমি নগরের পথ দিয়ে হেঁটে বন্ধুর বাড়ীতে যাবে, সেটা ভাল দেখায় না। তুমি এই ধর্ম্মশালায় অপেক্ষা কর, আমি বন্ধু-ভবনে গিয়ে তোমার জন্য যানবাহন পাঠিয়ে দিচ্ছি।" পত্নী সম্মত হইল। শঙ্খ পত্নীকে রাখিয়া বন্ধুর গৃহে গেলেন। শঙ্খকে দেখিয়াই বন্ধু বুঝিতে পারিলেন, শঙ্খ পথের ভিখারী হইয়াছেন; চিনিয়া শঙ্খকে আদর আপ্যায়ণ করিলেন না—বলিলেন, "কোথা উঠেছ?"

শঙ্খ। আমি এক ধর্ম্মশালায় উঠেছি, কিন্তু সেখানে খাব কি? আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে, তাই তোমার আশ্রয়েই এলাম।

পিলিয়। এখানে আশ্রয়-টাশ্রয় মিল্‌বে না, নিজের দোষে সর্ব্বস্ব হারিয়েছ। তোমার প্রতি আমার দয়া নাই। তাছাড়া তোমার উপর শনির দৃষ্টি পড়েছে।

তোমাকে আমি আশ্রয় দিলে আমারও ক্ষতি-হবে। তুমি এখনি পথ দেখ।

শঙ্খ। পথ ত শেষ পর্য্যন্ত আছেই, ভাই! রাজগৃহ হতে তোমার আশায় এতদূর এলাম, সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় হব? আমার পত্নী ধর্মশালায় রয়েছেন। আমাদের দুদিন খাওয়া হয় নি।

পিলিয়। খাওয়া হয়নি ত আমি কি করিব? আচ্ছা, এক আড়ি ক্ষুদ দিচ্ছি, তাই নিয়ে বিদায় হও; এদিকে আর এস না।

শঙ্খ একবার ভাবিলেন, ক্ষুদ লইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু কি ভাবিয়া ক্ষুদ লইয়া ধর্মশালায় ফিরিয়া গেলেন। পত্নী এ সংবাদ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন - ক্ষুদগুলি রাগিয়া ছড়াইয়া ফেলিলেন। তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া শঙ্খের পূর্ব্বতন দাস একজন সেখানে উপস্থিত হইল।

সে বলিল, "মা, কাঁদবেন না। ভয় কি? আসুন আমার গৃহে, আমি গরীব বটে, কিন্তু আমরা আপনার পুরাণো দাস যারা আছি সকলে মিলে আপনাদের ভার নেব।" রাজগৃহের শ্রেষ্ঠরাজ তখন পত্নীকে সঙ্গে লইয়া দাস গৃহে উপস্থিত হইলেন। দাস দাসীরা সকলে মিলিয়া তাঁহার সেবা পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। তাহারা ইহাতেও তুষ্ট হইল না। দল বাঁধিয়া রাজার নিকট পিলিয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করিল। রাজা দুইজন শ্রেষ্ঠীকেই রাজসভায় তলব দিলেন এবং চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দুই বন্ধুর মধ্যে পরস্পরে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। পিলিয় যে শঙ্খের সর্ব্বস্বের অর্দ্ধেক পাইয়াছেন, তাহা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। তখন রাজা বিচার করিয়া আমাত্যদের বলিলেন, "এত বড় অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড আমার নগরে যদি বাস করে, তবে রাজ্যের অমঙ্গল হবে; আমারও রাজ্য-শাসনের গৌরব রক্ষিত হবে না। ঐ পাষণ্ড যদি ধন-কুবের হয়ে সবার সম্মান লাভ করতে থাকে, তাহলে বড়ই অনাচার হবে। ন্যায়ের চোখে ইহা অতি অশোভনও হবে। এই জন্য আমি আদেশ করছি, তোমরা পিলিয়ের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে শঙ্খ শ্রেষ্ঠীকে দান কর—যাতে শঙ্খ বণিক্ স্বচ্ছন্দে কাল কাটাতে পারে, যাতে আমার রাজ্যে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা পায়। মহাপ্রেত কিনা সর্ব্বস্বের অর্দ্ধেকের বদলে এক আড়ি ক্ষুদ দেয়!

শঙ্খ বলিলেন, "প্রভু, আমার বন্ধুর সর্ব্বস্বে কাজ নেই, আমি দত্ত ধন কিছুতেই ফিরে নেব না। আমি আর ধনকুবের হ'তে চাই না। ধনে যে কোন সুখ নেই, তা আমি বুঝেছি। বন্ধু আমার সকল সম্পত্তি ভোগ করুক, কোন আপত্তি নেই। আমি তার কাছে সম্পদ চাইনি—আমি চেয়েছিলুম একটু আশ্রয় ও দুমুঠো অন্ন।"

রাজা বলিলেন, "ধন্য ধন্য মহাশ্রেষ্ঠী শঙ্খ। আপনার মত আদর্শ মহাপুরুষ আমার বারাণসীর অধিবাসী হ'য়ে থাকবে, এতেই আমি ধন্য হলাম। তাই হবে- আপনার যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ভাবনায় চলে যায়, তাই করছি। কিন্তু ঐ পাষণ্ড পিলিয়কে আমি ধন সম্ভোগ করতে দেব না। ঐ মহাপ্রেত

প্রভু, আমার বন্ধুর সর্ব্বস্বে কাজ নেই।

অগাধ সম্পত্তি ভোগ করলে রাজ্যের অমঙ্গল হবে। আর ওর সব সম্পত্তি পুণ্যকর্ম্মে ও দুঃখিজনগণের প্রতিপালনে ব্যয় করব। আপনি যে অবস্থায় থাকবেন, পিলিয়কে ঠিক সেই অবস্থায় রাখব।" এই বলিয়া ব্রহ্মদত্ত আমাত্যগণকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন—আর যে ভৃত্যগণ শঙ্খকে আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রচুর ধনরত্ন দান করিলেন।

(৪) দুই বলদ

প্রাচীন কালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক গৃহস্থের বাড়ীতে বলদ হইয়া ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল মহালোহিত। তাঁহার সাথী বলদটির নাম ছিল চুল্ললোহিত।

দুইজনে গৃহস্থের জমি চাষ করিত, গাড়ী টানিত, আরও অনেক কাজ করিত। তাহাদের গোহালের কাছে একটি ভেড়ার কুঁড়ে ছিল, সেই কুঁড়েয় একটি ভেড়া থাকিত। এই ভেড়াটিকে বাড়ীর গৃহিণী পাকা ফলের খোসা, ছোলা, মটর, ভাত ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইত এবং খুব যত্ন করিত। পাশেই বলদ দুইটি ঘাস-বিচালী খাইত—আর ভেড়ার আদরের আতিশয্য লক্ষ্য করিত। মহালোহিত ইহা দেখিয়া দুঃখিত হইতেন না,—নির্বিষ্ট মনে ঘাস-বিচালী চিবাইতেন। চুল্ললোহিতের ইহা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। ভেড়াটিকে সুখাদ্য খাইতে দেখিয়া তাহার আহারে অরুচি জন্মিল।

মহালোহিত লক্ষ্য করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভায়া তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

চুল্ললোহিত। না, শরীরের কোন অসুখ করে নি।

মহালোহিত। তবে মনের অসুখ? মনের অসুখের কি কারণ?

চুল্ললোহিত। কারণ কি, তা আবার জিজ্ঞাসা করছ, দাদা? দেখছ না—গিন্নীমায়ের কেমন ব্যবহার!

বাটীর গৃহিণী ভেড়া কে খুব যত্ন করিত

মহালোহিত। কই? আমি ত গিন্নীমার কোন অন্যায় আচরণ দেখ্‌ছি না, ভাই।

চুল্ললোহিত। আমাদের পাশে একটা নিষ্কর্মা ভেড়াকে তিনি নিজ হাতে ভাল ভাল খাবারগুলো খাইয়ে যাচ্ছেন, আর আমাদের পানে চাচ্ছেনও না; আমাদের ভাগ্যে সেই রাখালের হাতে ঘাস-বিচালী!

মহালোহিত। তাতে কি হলো ভাই? ঘাস-বিচালীই ত আমাদের খাদ্য; তাই ত আমরা চিরকাল খেয়ে আস্‌ছি ভাই। আমাদের চৌদ্দপুরুষ তাই খেয়ে আস্‌ছেন।

চুল্ললোহিত। তা ত জানি। কিন্তু আমরা গৃহস্থের জন্য প্রাণপাত ক'রে পরিশ্রম করি—আর ভেড়াটা কোন কাজই করে না। অথচ ভাল খাদ্যগুলো গিন্নিমা আমাদের না দিয়ে ভেড়াটাকে দিচ্ছেন। এমন অন্যায় আচরণ কখনও দেখিনি।

মহালোহিত। রাগ ক'রো না, ভেবে দেখ, কারণ অবশ্যই আছে। আমরা খেটে মরি, তবু ছোলা-মটর আমাদের না দিয়ে ভেড়াটাকে দিচ্ছেন কেন? এটা ত ভাব্‌বার কথা।

চুল্ললোহিত। তাই ত আমি ভেবে পাচ্ছি না। এ কেবল আমাদের অপমান করবার জন্য, আমাদের চোখের সম্মুখে একটা ভেড়াকে আদর করা—এটা ইচ্ছা করে আমাদের অনাদর করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি আর মন দিয়ে এদের কাজ করব না—কাজের ক্ষতি কর্‌বারই চেষ্টা কর্‌ব।

মহালোহিত। ভায়া, অমন কাজ ক'রো না। একটু চিন্তা ক'রে দেখ, গৃহস্থ বড় সজ্জন, তিনি এতদিন আমাদের প্রতিপালন করেছেন,—তাঁর অপকার ক'রো না। আমাদের কাজ আমরা ক'রে যাবো—অপরে আমাদের উপর কিরূপ করবে, এ আমরা দেখতে যাবো কেন?

চুল্ললোহিত। প্রতিপালন করেছেন সত্য। খেতে দিয়েছেন বটে কিন্তু বিনা কারণে ত দেননি। আমরা খেটেছি, খাটছি, তাই খেতে দেন অমনি ত দেন না। অমনি খেতে দিতে হ'লে মস্ত বড় প্রাণ চাই। এত বড় প্রাণ এঁদের নয়!

মহালোহিত। দেখ ভাই! কার কত বড় প্রাণ, অনেক সময়ে তার পরিচয় পাওয়া কঠিন হয়। আমার

মহালোহিত ও চুল্ললোহিত

মনে হয়, গিন্নি মা ভেড়াটাকে অকারণে যত্ন ক'রে খাওয়াচ্ছেন না, সেও ভবিষ্যতে উপকার করবে।

*   *   *

যাহাই হউক, চুল্ললোহিত বুঝিল না—সে বিদ্রোহী হইল। মন দিয়া আর খাটিত না, কাজের ক্ষতি করিত, ভাল করিয়া খাইতও না।

কিছুদিন পরে গৃহস্থকন্যার বিবাহ উপস্থিত হইল। বিবাহের দিন প্রাতঃকালে দুইজন লোক ভেড়াটাকে বধ করিয়া মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিল।

সে দৃশ্য দেখিয়া চুল্ললোহিত মহালোহিতকে বলিল, "দাদা, এক মাস ধরে সুখাদ্য খাওয়ানোর এ কি পরিণাম? দাদা, ব্যাপার কি"

মহালোহিত। ভায়া, আমি ত আগেই বলেছি, ভেবে দেখ, গৃহস্থ কন্যার বিবাহের জন্যই ভেড়াটিকে পুষে ছিলেন। যাতে মাংসের পরিমাণ বেশী হয়, সেজন্য ভাত-রুটি খাইয়ে ওটাকে মোটা করা হচ্ছিল। ওটাকে যেদিন আনা হয়—সেদিন ওর যে ওজন ছিল, আজ তার দ্বিগুণ হয়েছে, বিনা কারণে প্রভু গৃহিণী নিজ হাতে ওকে খাওয়ান নি, তুমি মিছামিছি না বুঝে গৃহস্থের উপর রেগে তার ক্ষতি করছিলে।

চুল্ললোহিত। হাঁ দাদা, আমি এখন বুঝেছি। না বুঝে রাগ ক'রে বড় অন্যায় করেছি। এমন কাজ আর করব না।

মহালোহিত। ভায়া, ঘাস-বিচালী খেয়ে খেটে-খুটে বেঁচে থাকা ঢের ভাল। বাশি বাশি সুখাদ্য খেয়ে শুধু শুয়ে শুয়ে ভুঁড়ি মোটা ক'রে অকালে বিদায় নেওয়া কখনও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ঐ গিন্নীটির মত ভোগ-লালসা অনেক মানুষের দেহে মেদ-মাংস বাড়াবার ব্যবস্থা করে। তাদের দেখে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়াও ঠিক নয়, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করাও ঠিক নয়।

ডেভিড্ লিভিংষ্টোন

৯৪৪ পৃষ্ঠার পর

মধ্য আফ্রিকার ঘন বনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে সুবিখ্যাত আবিষ্কারক লিভিংষ্টোন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। প্রিয়জন কেহই কাছে নাই—শুধু জনকয়েক কৃতজ্ঞ কাফ্রী অনুচর সারারাত জাগিয়া তাহাদের প্রভুর শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে যে মৃত্যু, স্বজন-বেষ্টিত হইয়া গম্ভীর যে মরণ, তাহা লিভিংষ্টোনের ভাগ্যে ঘটে নাই। প্রিয় স্বদেশ হইতে বহুদূরে এক অজ্ঞাত দেশে, অজানা জাতির মধ্যে রোগে ভুগিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু যে কয়জন প্রভু-ভক্ত কাফ্রী অনুচর শেষ-পর্যান্ত তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহারা লিভিংষ্টোনের মৃত দেহের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বহু বাধা বিপদ পার হইয়া তাই আবিষ্কর্ত্তার মৃতদেহ লণ্ডনে আনা সম্ভবপর হইতে পারিয়াছিল।

ডেভিড্ লিভিংষ্টোন

ব্লান্টায়ার (Blantyre) নামক স্কটল্যাণ্ডের এক গণ্ডগ্রামে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এই বিখ্যাত আবিষ্কারকের জন্ম হয়। বাল্যকালে লিভিংষ্টোন সাধারণ বালকের মতই ছিলেন। বিশেষ কোন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অথবা প্রতিভার বিকাশ তাঁহাতে দেখা যায় নাই। পরবর্ত্তী জীবনেও লিভিংষ্টোন প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষা স্থিরবুদ্ধি, অধ্যবসায়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অসাধারণ ধৈর্য্যের পরিচয়ই বিশেষ করিয়া দিয়া গিয়াছেন।
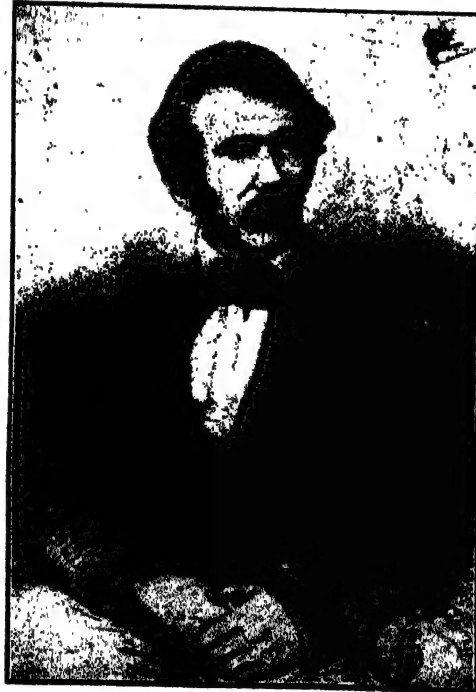
বাল্যকালে লিভিংষ্টোন দেখিতে ভাল ছিলেন। চোখদুটি তাঁর মায়ের মত সুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু তখনকার দিনের দুঃসাহসী অথচ বিলাসী ছেলেদের মত তিনি সুন্দর হওয়া

পছন্দ করিতেন না এবং দশবছর বয়সেই নিজেকে কার্য্যক্ষম বলিয়া ভাবিতেন।

তা ছাড়া লিভিংষ্টোনের পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। সুস্থ-সবল দশবৎসরের বালককে বসাইয়া খাওয়াইবার মত অর্থও তাঁহার ছিল না। কাজেই, এগার বৎসর বয়সেই ডেভিড্ কারখানার (Factory) কাজে ভর্ত্তি হইলেন। ভোর ছয়টা হইতে সুরু করিয়া রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত খাটিতেন। তারপর ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরিয়াই নৈশবিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেন। 'ভার্জ্জিল'ই ছিল তাঁর প্রিয় লেখক; কাজের ভিতর একটু সময় পাইলেই তিনি ভার্জ্জিল পড়িতেন।

অতি শৈশব হইতেই লিভিংষ্টোনের চরিত্রে একটা বিশেষত্ব ছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহাকে খুবই আনন্দ দিত। গাছপালা, ফুল, পাখীর গান, এসব তিনি খুবই ভাল বাসিতেন। তাঁহার লিখিত আফ্রিকার ভ্রমণ-কাহিনী পড়িলে একথাটি বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারা যায়।

লিভিংষ্টোন বই পড়িতেও খুব ভালবাসিতেন। বিশেষ করিয়া ভ্রমণকাহিনী তিনি খুবই পড়িতেন। তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অজানা দেশ আবিষ্কার করিবেন এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে। তাঁহার বয়স যখন বিশ বৎসর, সে সময়ে তাঁহার এই স্বপ্ন কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইবার উপক্রম দেখা গিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া চীনদেশে যাইবেন, স্থির করিয়া তিনি চিকিৎসা বিদ্যা পড়িতে লাগিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে যখন চীন যাওয়ার সব স্থির হইয়া গেল ঠিক সেই সময়েই সেখানে এক যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কাজেই, তাঁহার আর চীন যাত্রা হইল না। লণ্ডনের প্রচারক সমিতি লিভিংষ্টোনকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপে পাঠাইতে চাহিলেন কিন্তু লিভিংষ্টোন সেখানে যাইতে সম্মত হইলেন না। যেখানে কোন ভাল চিকিৎসক নাই, তিনি এমন স্থানে যাইতে চাহিলেন। এই সময় ডাঃ রবার্ট মফাট্ (Dr. Moffat) নামক একজন প্রচারকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই ডাঃ মফাট্ই লিভিংষ্টোনকে তখনকার দিনে ভীতিপ্রদ এবং প্রায় অজ্ঞাত আফ্রিকা মহাদেশে যাইবার সম্বন্ধে উৎসাহিত করিয়া তোলেন। পরে এই ডাঃ মফাটের কন্যাকেই লিভিংষ্টোন বিবাহ করেন। লিভিংষ্টোনের উৎসাহদাতা হিসাবে ডাঃ মফাটের নাম স্মরণীয় হইবার যোগ্য।

গৃহের পরিজনবর্গ, মাতা, পিতা, ভাইবোনদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ১৮৪০ খৃঃ অঃ লিভিংষ্টোন সর্ব্বপ্রথম আফ্রিকা যাত্রা করিলেন। আফ্রিকায় পৌছিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সম্মুখে কি বিরাট্ কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বড় বড় সহর হইতে দূরে সহরের বাহিরে যাহারা থাকিত, তাহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল এই সব দেখিয়া লিভিংষ্টোন খুবই দুঃখিত হইলেন ও সহর হইতে দূরে বেচুয়ানা রাজ্যের কুরুমান নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। ডাক্তার মফাট্ সেখানে থাকিতেন। ডাক্তার মফাট তখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। তিনি না ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত লিভিংষ্টোনকে কোন অভিযান করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। অনেক দিন কাটিয়া গেলেও ডাক্তার মফাট্ যখন ফিরিলেন না, তখন লিভিংষ্টোন কয়েকজন দেশীয় অনুচর ও একজন ইংরাজ সঙ্গী লইয়া সেখান হইতে উত্তর দিকে রওনা হইলেন। এই তাঁহার প্রথম অভিযান।

দুই বৎসর কাল আফ্রিকায় থাকিবার পর আরও উত্তরে অগ্রসর হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিবার অনুমতি আসিল। পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা হইতে লিভিংষ্টোন বুঝিয়াছিলেন যে, মাবৎসাতে (Mabotsa) একটি স্থায়ী কেন্দ্র (station) করিতে পারিলে ভাল হয়। কাজেই, তিনি তাহাই করিলেন।

এই সময় হইতেই নানা বিপদের মধ্য দিয়া লিভিংষ্টোনের ধৈর্য্যের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। আফ্রিকার এই সব জায়গায় জলবায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। জ্বর প্রায়ই হইত, তাছাড়া দেশীয় সর্দ্দারেরা অত্যন্ত সন্দিগ্ধপ্রকৃতির ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। একবার একজন জ্বরাক্রান্ত কাফ্রী অনুচরকে ঔষধ দেওয়ায়, লোকটিকে বিষ খাওয়ান হইতেছে ভাবিয়া অন্য সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাছাড়া বন্যজন্তুর উৎপাত তো ছিলই। লিভিংষ্টোন নিজেই অনেকবার মরণের মুখ হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছেন। একবার তিনি এক সিংহের কবলে পড়েন, তাহাতে তাঁহার বাম বাহুটি প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ইহার বহু বৎসর পরে যখন লিভিংষ্টোনের মৃতদেহ ইংল্যাণ্ডে আনীত হয়, তখন এই পঙ্গু বাম বাহুটি দেখিয়াই মৃতদেহটি বিখ্যাত আবিষ্কর্ত্তা লিভিংষ্টোনের বলিয়া সকলে চিনিতে পারিয়াছিলেন

তিনি আরও কতবার যে কত জলহস্তী, কুমীর, আরও ভীষণ হিংস্র জন্তুর হাতে পড়িয়াছিলেন, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। কিন্তু ভগবানের কৃপায় কোন বারেই বিশেষ কোন আঘাত পান নাই।

দুর্গম, বিপদ্‌সঙ্কুল দেশে নিতান্ত একাকী থাকিতে থাকিতে মাঝে মাঝে লিভিংষ্টোনের মন বাড়ীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। একবার তিনি তাই আত্মীয়-স্বজনদের অসিবার জন্য নিজের সামান্য আয় হইতে অর্থসঞ্চয় করিয়া দেশে পাঠাইয়া দেন কিন্তু তাঁহার পরিবারের কেহই আফ্রিকায় আসিতে চাহিলেন না।

ভৌগোলিক হিসাবে বিখ্যাত প্রথম অভিযানের কিছু পূর্ব্বে লিভিংষ্টোন সকলকে আশ্চর্য্য করিয়া (কারণ সবাই ভাবিয়াছিল তিনি চিরকুমার থাকিবেন) ডাঃ মফাটের কন্যাকে বিবাহ করেন। লিভিংষ্টোন-পত্নী তাঁহার যথার্থ সঙ্গিনী ছিলেন এবং দশবৎসরকাল

বৃদ্ধ বয়সে ডাঃ লিভিংষ্টোন

ক্রমান্বয়ে একসঙ্গে ছিলেন। লিভিংষ্টোন নিজেই পরে স্ত্রীকে চারিটি শিশু সন্তানসহ দেশে পাঠাইয়া দেন। পাঠাইয়া ভালই করিয়াছিলেন। কারণ পরবর্ত্তী বিপদ্‌সঙ্কুল যাত্রাপথে তাঁহারা সঙ্গে থাকিলে তাঁহাদেরও বিপদের আশঙ্কা ছিল।

প্রথম অভিযানে লিভিংষ্টোনের উদ্দেশ্য ছিল স্থানে স্থানে দেশীয় প্রচারকদের প্রতিষ্ঠিত করা। এসময় তিনি এত ভাগ্য বিপর্য্যয়ে পড়েন যে, বলিবার নয়। বাতজ্বর হইয়া তিনি একবার প্রায় বধির হইয়া যান। ঔষধের বাক্সটি এই সময় আবার চুরি হইয়া যায়। ষাঁড়ের পৃষ্ঠে চাপিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময় পড়িয়া গিয়া দারুণ আঘাত পান ও গাছের ডাল লাগিয়া একটি চোখ অন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

কিন্তু এত বিপদে, এত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও তিনি মনের ধৈর্য্য হারাণ নাই। তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য যে কি অসাধারণ ছিল, তাহা ইহাতেই বোঝা যায়।

যে উদ্দেশ্যে অর্থাৎ দেশীয়দের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা কতকাংশে সফল হইলেও তাঁহার এইঅভিযান ভৌগোলিক হিসাবেই বিখ্যাত। ১৮৫৬খৃষ্টাব্দে যখন তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসেন, তখন বিখ্যাত আবিষ্কর্ত্তা হিসাবে তাঁহাকে পরম সমাদরে অভিনন্দিত করা হয়।

এবার তিনি অনায়াসেই ইংল্যাণ্ডে একটি মোটা

লিভিংষ্টোনের স্ত্রী

মাহিনার চাকুরী জোগাড় করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া শান্তি সুখে বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু এই পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায়—যাঁহারা নিশ্চিন্ত আরামে কিছুতেই বেশীদিন থাকিতে পারেন না; বিপদে ঝাঁপ দিতেই তাঁহাদের যত আগ্রহ ও যত আকাঙ্ক্ষা। যত বড় বড় আবিষ্কার, অভিযানের মূলে রহিয়াছে, ইঁহাদের অসীম আগ্রহ–অনায়াস প্রাণদান। তাই ১৮৫৮ খৃঃ ইংল্যাণ্ড হইতে বিদায় লইয়া লিভিংষ্টোন আবার সেই সুদূর আফ্রিকায় রওয়ানা হইলেন। তৃতীয় বারের এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা। এইবার লিভিংষ্টোনের প্রধান প্রচেষ্টা হইল—দাস

ব্যবসায়ের সমূলে উচ্ছেদ করা। বুয়াররা এবং পর্ত্তু-গীজরাই ছিল এই অমানুষিক ব্যবসায়ের প্রধান উদ্যোক্তা। অনেক সময় দেশীয় সর্দ্দারেরাও অর্থ ও নানা দ্রব্যের প্রলোভনে প্রজাদের দাসরূপে বিক্রী করিত। কিন্তু লিভিংষ্টোন আফ্রিকা মহাদেশ হইতে দাস-ব্যবসায়ের উচ্ছেদ সাধন করিতে যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেজন্যও তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই অভিযানে তাঁহার বিপদের চরমপরীক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য অবিচলিত ও শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিল। রোগে জীর্ণ, অসুস্থ লিভিংষ্টোন অবশেষে ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের(Lake Tanganyika)

তীরে পৌঁছিলেন। সেখানে শুনিলেন যে, একটি বিরাট্ নদী সেখান হইতে বাহির হইয়া পশ্চিমদিকে গিয়াছে। হয় ত বা নীল নদের উৎপত্তি স্থান বাহির করিতে পারিবেন ভাবিয়া লিভিংষ্টোন খুসী হইয়া উঠিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ তিনি মোয়েরো হ্রদে (Lake Moero)—যাহাতে লুয়াপুলা (Luapula) নদী পড়িয়াছে—তীরে পৌঁছিলেন। তারপর আরও অগ্রসর হইয়া চলিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুচরেরা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। অনশনে, অর্দ্ধাশনে, অবশিষ্ট কয়েকজন অনুচর লইয়া লিভিংষ্টোন ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

যাহারা লিভিংষ্টোনকে ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছিল, নিজেদের দোষ গোপন করিবার জন্য তাহারা রটনা করিয়া দিল যে,ডেভিড্ লিভিংষ্টোন নিহত হইয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের সংবাদ প্রচারিত হইল। তাঁহার কোন খবর মিলিল না দেখিয়া সংবাদপত্র সমূহে লিভিংষ্টোন নিরুদ্দিষ্ট, এই বার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল।

অথচ এই সময় লিভিংষ্টোন রোগে জীর্ণ, অনুচরগণের অকৃতজ্ঞতায় বিষণ্ণ, ক্লিষ্ট, অনশনে পীড়িত অবস্থায় অদৃষ্টের পরিহাস সহ্য করিতেছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদ, মুয়াবু হ্রদ প্রভৃতির খবর বাহিরের জগৎকে জানাইবেন, এমন উপায়ও তাঁহার ছিল না। লিভিংষ্টোন তাই দুঃখিত মনে যথার্থই বলিয়াছিলেন—"অসম্ভব কিছু করা আমার সাধ্যাতীত বটে তবুও আমি প্রায় তাহার কাছাকাছি করিয়াছি অথবা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।"
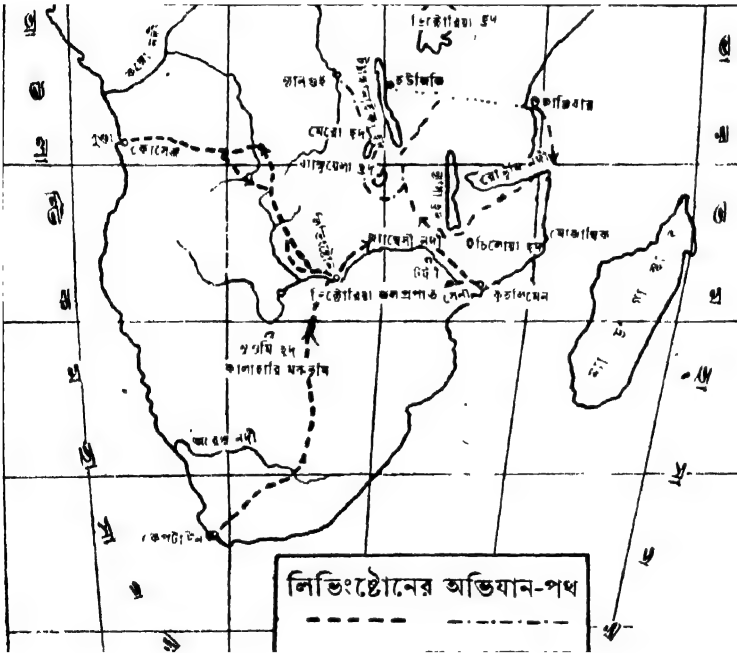
১৮৭১ সালের নবেম্বর মাসে ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের তীরে ইউজিজি (Ujiji) নামকস্থানে ষ্ট্যান্লীর সহিত লিভিংষ্টোনের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎ ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। রুগ্ন, ভগ্নদেহ ও হতাশহৃদয় লইয়া লিভিংষ্টোন বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় পরিচিত স্বদেশবাসীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন—"আপনি কি ডাক্তার লিভিংষ্টোন? বৃদ্ধ লিভিংষ্টোন তাঁহার মাথার টুপি খুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, মহাশয়!" নিউইয়র্ক হারল্ডের (New York Herald) উদ্যমশীল স্বত্বাধিকারী গর্ডন বেনেট লিভিংষ্টোনের অনুসন্ধানের জন্য ষ্ট্যান্লীকে আফ্রিকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সাক্ষাৎ তাহারই ফল। ষ্ট্যান্লী সঙ্গে করিয়া যে সকল চিঠিপত্র, খবরের কাগজ ও সংবাদ আনিয়াছিলেন,

সেই সব পড়িতে শুনিতেই তিন দিন সময় লাগিয়াছিল।

ষ্ট্যান্‌লীর বহু অনুরোধ সত্ত্বেও লিভিংষ্টোন কিন্তু দেশে ফিরিলেন না। তাঁহাকে অনেক টাকাকড়ি, প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রাদি দিয়া ষ্ট্যান্‌লী, লিভিংষ্টোনের ডায়েরী ইত্যাদী লইয়া দেশে ফিরিলেন। লিভিংষ্টোনের ডায়েরী ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে পর সভ্যজগতে সাড়া পড়িয়া গেল—অনেকে আবার লিভিংষ্টোনের বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ষ্ট্যানলী বহু কষ্টে প্রমাণ করিলেন যে, এ সবই সত্য।
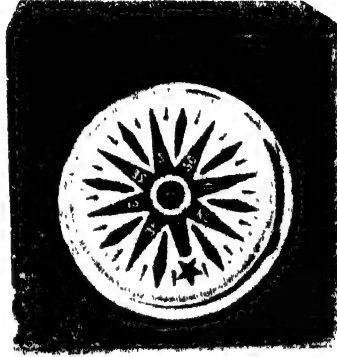
লিভিংষ্টোনের ব্যবহৃত দিগ্‌দর্শন যন্ত্র

লিভিংষ্টোনের ব্যবহৃত সেক্সটাণ্ট

অনুচরেরা তাঁহাকে বহিয়া লইয়া যাইত

কিন্তু লিভিংষ্টোনের শক্তি নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল। ষ্ট্যান্‌লী চলিয়া যাইবার পর তিনি পুনরায় নীলনদের উৎপত্তি-স্থান আবিষ্কারের চেষ্টায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এ সময়ে তাঁহার দেহ এমন অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি আর হাঁটিতে পারিতেন না—অনুচরেরা তাঁহাকে বহিয়া লইয়া যাইত।

ডেভিড লিভিংষ্টোনের নাম সাধারণতঃ মধ্য আফ্রিকার অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কার এবং ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের জন্যই বিখ্যাত। কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে দাস-ব্যবসায়ের উচ্ছেদ সাধনের জন্য তিনি যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। লিভিংষ্টোন আজীবন ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। যখন একটু সামান্য অবকাশ পাইতেন, তখনই তিনি তাঁহার প্রিয়গ্রন্থ 'বাইবেল' পড়িতেন। বাইবেল ছিল তাঁহার একমাত্র সঙ্গী। তাঁহার দেহাবশেষ আজ ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবিতে সমাহিত রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার হৃৎপিণ্ডটি রহিয়াছে আফ্রিকায়। এ ঠিকই হইয়াছে—যে আফ্রিকার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল ছিল—যে আফ্রিকার কথাই তিনি সারাজীবন ভাবিয়াছেন, তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসও ফেলিয়াছেন সেই আফ্রিকারই বুকে।

লিভিংষ্টোনের নাম আবিষ্কর্ত্তা হিসাবেই পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়া থাকিবে। আমরা এখানে তাঁহার আবিষ্কার ও ভ্রমণ কাহিনীই বলিলাম।

লিভিংষ্টোনের আবিষ্কার কাহিনী

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লিভিংষ্টোন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান সহর কেপটাউন (Cape Town) পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল হইতে পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত নানা অজানা দেশের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে পশ্চিম উপকূলে লোয়াণ্ডা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া পরে যাত্রা-পথ সুনির্দ্দিষ্ট করিবেন। তাঁহার পথের সম্বল অতি সামান্য ছিল। সঙ্গে পাথেয় হিসাবে অতি সামান্য অর্থ ছিল। কাজেই, দশটি বলদ ও একটি গাড়ী লইয়া তিনি রওয়ানা হইয়াছিলেন। পথে প্রায়ই গাড়ীটিকে মেরামত করিতে হইত। অতি ধীরে ধীরে তিনি চলিতেছিলেন। পথে ঘাটে প্রায়ই বুয়ারদের সহিত দেখা হইত। বুয়াররা অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করিত, এবং তাহারা তাঁহার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। কাজেই, অরেঞ্জ (Orange) নদী অতিক্রম করিয়া কালাহারি মরুভূমিতে (Kalahari Desert) পৌঁছিতেই ডিসেম্বর মাস লাগিয়াছিল। এদেশটি যে কেবল অনুর্ব্বর মরুভূমি, তাহা নহে, এখানে লম্বা লম্বা বুনো ঘাস, লতান গাছ এবং ঝোপ-ঝাড় খুবই বেশী। এ অঞ্চলে অসংখ্য বুনো পশু দল বাঁধিয়া চরিয়া বেড়ায়। লিভিংষ্টোন কালাহারি মরুভূমির আশে পাশে এক অসভ্য জাতি দেখিতে পাইয়াছিলেন—তাহারা বুশমেন (Bushmen) নামে প্রসিদ্ধ। লিভিংষ্টোন লিখিয়াছেন যে, এই অসভ্য জাতীয় লোকেরা ছোট ছোট কুটীর তৈয়ারী করিয়া বাস করে। ইহারা অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, হাসি-খুসি-মেজাজের লোক ("always merry and laughing") এবং নিরীহ ও সত্যবাদী।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লিভিংষ্টোন 'লিনিয়ানতি' (Linyanti) নামক স্থানে যাইয়া পৌঁছিলেন। এখানকার সর্দ্দার 'সেকেলেতু' (Sekeletu) লিভিংষ্টোনকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। লিনিয়ানতি থাকিতে তিনি বহুবার শিকার করিতে গিয়াছিলেন এবং এই যায়গাটি তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। এখানকার লোকেরা তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। লিভিংষ্টোনের মনে এখানে একটি উপনিবেশ স্থাপনের ইচ্ছাও হইয়াছিল, কিন্তু এখানকার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া তিনি সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। চিকিৎসক বলিয়া এদেশের লোকেরা তাঁহাকে সহজে ছাড়িয়া দিতে চাহে নাই। এজন্য একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে কয়েক দিন থাকিতে হইয়াছিল। লিনিয়ানতি ছাড়িয়া তিনি একে একে লিয়াম্বী (Leeambye) এবং লিবা (Leeba) নদী পার হইয়া উত্তর দিকে যাইতে লাগিলেন। আফ্রিকার গহন বনের ভয়াবহ দৃশ্য এইখানে তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছিল। এইখানে তিনি নানা প্রকারের পশু-পক্ষী ও গাছ-পালা দেখিতে পাইয়াছিলেন। এক জাতীয় পক্ষীর কর্কশ স্বর(hammering wire) শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। এই পক্ষীগুলি কিন্তু এদেশের বৃহদাকার কুমীরগুলির উপকারী বন্ধু। কুমীরগুলির তালুর ভিতর এক রকমের বড় বড় জলজ পোকা লাগিয়া থাকে, এজন্য কুমীরের অত্যন্ত কষ্ট হয়। এই কর্কশকণ্ঠী পাখীগুলি কুমীরের মুখের ভিতর যাইয়া সেই পোকাগুলি খাইয়া ফেলে। লিভিংষ্টোন এখানে আর এক প্রকার অদ্ভুত পাখী দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহাদের নাম দিয়াছিলেন সাপ পাখী (Snake-bird)। সাপ-পাখীগুলি জলের মধ্য দিয়া এমন দ্রুত সাঁতরাইয়া যাইত যে, ইহাদের মাথা আর গলা ভিন্ন কিছুই দেখা যাইত না। হস্তী, গণ্ডার, জেব্রা, হরিণ, সিংহ এবং আরও অনেক বন্যজন্তু এদেশে দলে দলে বিচরণ করিতে দেখিয়াছেন এবং সময় সময় সিংহ শিকারেও গিয়াছেন।

লিভিংষ্টোন তাঁহার এই অভিযানে অনেক অসভ্য জাতিদের ছোট ছোট রাজ্য অতিক্রম করিয়াছেন। পথে দুইজন স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইহারা দুইজনে দুইটি রাজ্যের কর্ত্রী। ইহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকের শরীর অসাধারণ স্থূল ছিল—সে লিভিংষ্টোনকে 'ছোট্ট মানুষটি' বলিয়া ডাকিত। এদেশের নাম চিবোক্ (Chiboques)। পথে অনেক যায়গায় দাস ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে পড়িয়া, তাঁহার প্রাণ হারাইবার উপক্রমও হইয়াছে। তিনি সিংহ ও হস্তীর হাতে যে কতবার পড়িয়াছেন, তাহার তসীমা-সংখ্যাই নাই। এই ভাবে নানা বিপদের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে অবশেষে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে তিনি লোয়াণ্ডাতে (Loanda) যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন। এ সময়ে তাঁহার শরীরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার দেহ কঙ্কালসার হইয়াছিল। কেপটাউন হইতে লোয়াণ্ডা পর্য্যন্ত আসিতে তাঁহার কুড়ি বার জ্বর হয়। লোয়াণ্ডার ইউরোপীয় চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া

তিনি শীঘ্রই রোগের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এখানে কয়েক মাস থাকিয়া ২০শে সেপ্টেম্বর লিভিং-ষ্টোন লিনিয়ানৃতিতে ফিরিয়া আসেন।

লোয়াণ্ডার চারিদিকের ভূ-ভাগ বেশ উর্ব্বর। লিভিং-ষ্টোন এখানে আট ফিট উঁচু তামাকের গাছ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তামাকের পাতাগুলি লম্বায় প্রায় এক হাত ছিল। এখানে নানা জাতীয় পাখী দেখা যাইত। লিভিংষ্টোন পাখী শিকার করিয়া খাদ্যের সংস্থান করিতেন। এখানকার এক জাতীয় পাখীকে তাহাদের দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম চঞ্চুর আঘাতে বড় বড় সাপ মারিয়া ফেলিতে দেখিয়াছেন। নানা সুন্দর সুন্দর ফুল গাছে ও সবুজ সুন্দর তরুলতায় এ দেশের নদীর তীর বিচিত্র শোভাসম্পন্ন ছিল। এদিকের গ্রামগুলি দাস-ব্যাবসায়ীদের অত্যাচারে একেবারে জনশূন্য হইয়া পরিয়াছিল। এইভাবে তিনি লিবা(Leeba)নদীর তীরে আসিলেন। এখানে এদেশীয় লোকদের নিকট হইতে পাত্লা চামড়ার তৈয়ারী কয়েক খানি ছোট ছোট নৌকা সংগ্রহ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইলেন। এই সব নৌকায় করিয়া দেশীয় লোকেরা জলজন্তুদের শিকার করিয়া থাকে। এই সব নদীতে জলহস্তীর সংখ্যা খুবই বেশি। তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই এদেশীয় লোকেরা এইরূপ হাল্কা এবং দ্রুতগামী নৌকা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর লিভিংষ্টোন লিনিয়ানৃতিতে পৌছেন। এ সময় পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাতাইশ বার জ্বরে আক্রান্ত হইতে হইয়াছিল। এখানে অল্প কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া আবার যাত্রা সুরু করিলেন। সেকেলেতু (Sekeletu) ও তাহার অনুচরেরা তাঁহার সঙ্গী হইল। তিনি জ্যাম্বেসি (Zambesi)নদীর উপরদিয়া আসিতে আসিতে প্রায় পাঁচ ছয় মাইল দূর হইতে ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং দেখিতে পাইলেন, রাশি রাশি ধূম নিরন্তর উর্দ্ধে উঠিতেছে। শুষ্ক তৃণাবৃত ভূ-খণ্ডে আগুন লাগাইলে যেমন ধোঁয়া ওঠে, ইহাও তদ্রূপ। ডাক্তার দেখিলেন, পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া স্তম্ভাকারে ধূমরাজি উচ্চ আকাশে উঠিয়া মেঘের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। ক্রমশঃ তাঁহারা একটি বৃহদাকার জল-প্রপাতের নিকট যাইয়া পৌছিলেন—ইহাই "ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত" নামে বর্ত্তমান সময়ে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। লিভিংষ্টোনের পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয় এই প্রতাপ দেখেন নাই। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে ইহার নামকরণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীরা প্রপাত দর্শন সম্বন্ধে তাঁহাকে একটি কৌতুকজনক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত—"আপনার দেশে কি এমন ধোঁয়া আছে—যাহা এরূপ শব্দ করিতে পারে?" তাহাদের ভাষায় প্রপাতের নাম—"মসি-ওয়া-তুন্যা"(Mosi-oa-tunya) অর্থাৎ ধূম এখানে শব্দ করিতেছে। প্রপাতের গভীর গর্জ্জন এবং ধূমবৎ উৎক্ষিপ্ত ফেনরাজি হইতেই এই নাম হইয়াছে।

প্রপাত সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত ডাক্তার লিভিংষ্টোন অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গের লোকদিগকে অনেক বলিয়া কহিয়া তিনি প্রপাতের অতি নিকটে যাইয়া পৌছিলেন। নদীর মধ্যভাগে অবস্থিত এক দ্বীপের উপর দাঁড়াইয়া লিভিংষ্টোন প্রপাতের শোভা দেখিয়াছিলেন। ঐ দ্বীপের একটি বৃক্ষে তিনি স্বীয় নাম অঙ্কিত করেন। তাঁহার নিজের হাতের খোদিত সেই নাম এখনও সেখানে সেই গাছে দেখিতে পাওয়া যায়। ভিক্টোরিয়া প্রপাতের বিস্তৃতি এক মাইল। চারিশত ফিট উচ্চ স্থান হইতে প্রপাতের জলরাশি ভীষণ শব্দে পতিত হইতেছে। নায়েগ্রা প্রপাত অপেক্ষা ভিক্টোরিয়া প্রপাত চারিগুণ বেগশালী। দ্বীপে দাঁড়াইয়া প্রপাত দেখিতে দেখিতে লিভিংষ্টোনের মনে একটা প্রশ্নের

জ্যাম্বেসি নদী

উদয় হইয়াছিল—"এই জলরাশি কোথায় যাইতেছে? পৃথিবীর গর্ভে কি মিলিয়া যাইতেছে?" সর্ব্ব প্রথমে তিনি একটি গহ্বর দেখিতে পাইলেন। ইহার মধ্যে পতিত জলরাশি ভীষণভাবে আবর্ত্তিত এবং এখান হইতেই ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে। অর্দ্ধ ক্রোশ বিস্তৃত জলরাশি ভীষণশব্দে এই যে গভীর ক্ষুদ্রায়তন গহ্বর মধ্যে পতিত হইতেছে, ইহা জ্যাম্বেসি নদীর সহিত লম্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার তটদিকে পাহাড়-প্রাচীর। তিনি দেখিতে পাইলেন, গহ্বরের পূর্ব্ব প্রাচীর-গাত্রের একটা ফাটল দিয়া জল বাহির হইয়া যাইবার পথ রহিয়াছে। ঐ নির্গম পথ দিয়া বিশাল জলরাশি কাঁপিয়া ফুলিয়া ভীষণ বেগে নদীতে পড়িতেছে।

লিভিংষ্টোন প্রপাতের আশে পাশের অধিবাসীদের মধ্যে এক অদ্ভুত রীতি দেখিতে পাইলেন। তাহারা সম্মুখের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে এজন্য নীচের দাঁতগুলি লম্বা এবং বাঁকা হইয়া থাকে। তিনি যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তেমনি নানা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। এক যায়গায় দেখিতে পাইলেন, এ দেশীয়দের কুটীরের মত সারি সারি কি দেখা যাইতেছে। নিকটে যাইয়া দেখিলেন, ঐগুলি কুটীর নহে, 'পিপীলিকার পাহাড়'(Ant Hills)। এসব পাহাড়ের

পিপীলিকার পাহাড়

মত উঁচু উঁচু ঢিবি পিপীলিকারা তৈয়ারী করিয়াছে। ইহার এক একটির গোড়ার দিকের বেড় প্রায় ৪০, ৫০ফিট্, উচ্চতা ২০ ফিটের কম নহে। পথে একবার দেশীয় লোকদের সহিত মিলিত হইয়া তিনি হস্তী শিকার করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু দেশীয় লোকদের শিকারের রীতি তাঁহার ভাল লাগে নাই।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী লিভিংষ্টোন লোয়ানগোয়া (Loangua) নামক স্থানে আসেন। এখানে একদল বুনো মহিষ তাঁহাকে ও তাঁহার লোকদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। অতি কষ্টে তাঁহারা প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন। এইপথে তিনি বন্য হস্তীদিগকে দলেদলে নদীতে সাঁতরাইতে দেখিয়াছেন। ৩রা মার্চ্চ টেট্ (Tette) নামক স্থানে পৌঁছেন। এখানে একদল পর্ত্তুগীজ ঔপনিবেশিক বাস করিতেন টেট্ হইতে সেনা (Senna) অতিক্রম করিয়া কুইলিমেন্ (Quilimane)নামক স্থানে আসেন এবং সেখান হইতে ডিসেম্বর মাসে ইংল্যাণ্ডে গমন করেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লিভিংষ্টোন জ্যাম্বেসি নদীর উৎস-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি একে একে সিরওয়া (Shirwa) হ্রদ, ন্যায়েসা (Nyassa) হ্রদ আবিষ্কার করেন। এইবার তিনজন ইংরাজ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। কাজেই,এবারকার অভিযান তাঁহাদের বেশ মনোরম হইয়াছিল। খাদ্য সংগ্রহের জন্য তাঁহারা অনেক পশু-পক্ষী শিকার করিয়াছিলেন—হাতীও মারিয়াছিলেন অনেক। দেশীয় লোকেরা মনের আনন্দে হাতীর মাংস খাইত। লিভিংষ্টোন ও তাঁহার সঙ্গিগণ যখন ন্যায়েসা হ্রদের উত্তর দিকের ভূ-ভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তখন একদিন অল্প দূরের এক গ্রাম হইতে খুব ধোঁয়া উঠিতেছে দেখিতে পাইয়া সেখানে যাইয়া দেখিলেন যে, অসভ্য অধিবাসীরা এক জাতীয় পোকা (যে প্রায় লক্ষাধিক হইবে) সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া খাইতেছে। এখান হইতে পূর্ব্ব উপকূলে উপস্থিত হইয়া তিনি পুনরায় ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লিভিংষ্টোন পুনরায় শেষবারের মত আফ্রিকায় ফিরিয়া আসিলেন। এইবার তিনি জ্যাম্বেসি নদীর উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া ট্যাঙ্গানায়িকা হ্রদ আবিষ্কার করেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসটা লিভিংষ্টোনের পক্ষে বড়ই অশান্তিজনক হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় সারাটা মাসই জ্বরে ভুগিয়াছিলেন। তিন মাস কাল ভুগিয়া তিনি স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিয়া নানা কষ্ট সহিয়া মোয়েরো (Moero)হ্রদ এবং আরও অনেকগুলি হ্রদ আবিষ্কার করেন। ১৮৬৮খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্গওয়েলো (Lake Bangweulu)আবিষ্কারকরেন। লিভিংষ্টোন এই হ্রদের চারিদিক ঘুরিয়া অনেক কিছু আবিষ্কার করেন। এ সময়ে মহম্মদ মোগারিব (Mohammed Mogharib) নামক একজন আরব সর্দ্দারের সহিত

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের উপরিভাগে জ্যাম্বেসি নদীর দৃশ্য

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত—পূর্ব্ব দিক্ এক মাইল বিস্তৃত

উপরিভাগ হইতে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের দৃশ্য

তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই আরব সর্দ্দার তাঁহার অনেক সাহায্য ও উপকার করিয়াছিলেন। কাজেম্বি (Kazembe) নামক স্থানের রাজা ও রাণী লিভিংষ্টোনকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গওয়েওলো হ্রদ উত্তীর্ণ হইয়া লিভিংষ্টোন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইউজিজি (Ujiji) নামক স্থানে আসিলেন। ইউজিজি সহরটি হ্রদের পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। লিভিংষ্টোন এই সুন্দর স্থানে তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র (headquarters স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এখানে কিছুদিন থাকিয়া এবং সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হইয়া বাম্বেরি (Bambarre) নামক স্থানে আসিলেন। এই পথের সৌন্দর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। চারিদিকে সুন্দর সুন্দর পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে সবুজ সুন্দর তরুশ্রেণী,ফুলের বিচিত্র শোভা তাঁহাকে বিমুগ্ধ,বিস্মিত ও আনন্দিত করিয়াছিল। বামবেরিতে তিনি অনেক দিন লোকজন ও রসদের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক দিন পরে লোকজন আসিয়া পৌছিলে লিভিংষ্টোন আবার উত্তর দিকে যাইতে যাইতে লুয়ালাবা (Lualaba)নদীর উৎস আবিষ্কার করেন। এখানে পাহাড়ে গায়ে গায়ে যে সব ছোট গ্রাম অবস্থিত, সেগুলি তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। গ্রামের পথগুলি পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে বিস্তৃত বলিয়া বৃষ্টির পর সহজেই রৌদ্রে শুকাইয়া যাইত—কাদা হইত না। প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে বারান্দা, বারান্দায় দিনরাত আগুন জ্বলিত। রাত্রিবেলা যখন শীত পড়িত তখন পরিবারের সকলে এক সঙ্গে আগুনের পাশে বসিয়া গল্প-গুজব করিত।

গৃহপালিত পশু-পক্ষীগুলি পথে-ঘাটে ছুটাছুটি করিত স্ত্রীলোকেরা প্রাতে ও সন্ধ্যায় গল্প-গুজব করিয়া সময় কাটাইত। প্রবাসী লিভিংষ্টোনের কাছে আফ্রিকার এই মধ্যপ্রদেশের পল্লীগুলি ইংল্যাণ্ডের পল্লী-দৃশ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিত।

বামবেরি হইতে তিনি নিয়ানগোতে আসিলেন। নিয়ানগো এ অঞ্চলের বড় সহর। এখানকার হাট খুব বড়। চারিদিক হইতে গ্রামের লোকেরা এখানে আসিয়া বেচাকেনা করিত। দুঃখের বিষয়,লিভিংষ্টোন নদী পার হইবার জন্য নৌকা (Canoe) সংগ্রহ করিতে না পারায় বাধ্য হইয়া প্রায় চারি মাসকাল এখানে আটক পড়িয়াছিলেন। এখানে ডুগুম্বি (Dugumbe) নামে তাঁহার একজন প্রাচীন আরব দেশীয় বণিক্ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনিও চেষ্টা করিয়া নৌকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। কাজেই, লিভিংষ্টোন বাধ্য হইয়া আবার ইউজিজিতে ফিরিয়া আসিলেন। ইউজিজি যাইতে তাঁহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। পথঘাট কাদায় ভরা—কোথাও কোথাও এক হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে পথ চলিতে হইয়াছিল। অবশেষে অতি কষ্টে তিনি ইউজিজিতে পৌছিয়াছিলেন। এইখানেই ষ্ট্যানলীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—সে-কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ষ্ট্যানলী চলিয়া গেলেন; লিভিংষ্টোন আবার একাকী হইলেন। বর্ষাকালে তিনি জ্বরে ও রক্তামাশয় রোগে ভুগিলেন। এ সময়ে তাঁহার প্রিয় ভৃত্য সুশি ও তাঁহার অনুচরেরা তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইত। সুশি সময় সময় নৌকা না পাইলে লিভিংষ্টোনকে পিঠে করিয়া নদী পার হইত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে খাদ্যের অভাব হইল। নানা ক্লেশ ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে লিভিংষ্টোন ২৯শে এপ্রিল তারিখে চিতাম্বো (Chitambo) নামক গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন। চিতাম্বো ইলালা প্রদেশের একটি গ্রাম। এই গ্রামের সর্দ্দার লিভিংষ্টোনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। চিতাম্বো গ্রামেই লিভিংষ্টোনের মৃত্যু হইল। ৩০শে এপ্রিল রাত্রিকালে মৃতপ্রায় লিভিংষ্টোন সুশি ও তাঁহার অন্যান্য ভৃত্যদের সহিত অনেক গল্প-গুজব করিয়াছিলেন। ১লা মে প্রত্যুষে ভৃত্যেরা লিভিংষ্টোনের তাঁবুতে যাইয়া দেখিল, লিভিংষ্টোন শয্যা-পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছেন,—কিন্তু দেহে প্রাণ নাই।

[পৃথিবীর সব দেশেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থান আছে। তাহাই তীর্থ নামে পরিচিত। শিশু-ভারতী'তে ভারতবর্ষের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের পরিচয় দিয়া পরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পবিত্র তীর্থের কথাও বলা হইবে।]

ভারত-তীর্থ—বৌদ্ধ তীর্থস্থান

বৌদ্ধ শাস্ত্রে চারিটি তীর্থস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে (১) যেখানে বুদ্ধের জন্ম হয় (২) যেখানে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, (৩) যেখানে প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করেন, (৪) যেখানে তাঁহার নির্ব্বাণ হয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা এই সকল স্থান দর্শন করিবার জন্য ভ্রমণে বাহির হইয়া থাকেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—যিনি এই চারিটি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া পরলোক গমন করেন, তিনি স্বর্গ লাভ করেন। মহানুভব সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এ সমুদয় তীর্থ দর্শনে বাহির হইয়াছিলেন এবং নিজ চক্ষে সে সকল স্থান দর্শন করিয়া বুদ্ধদেবের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ স্তম্ভ, স্তূপ, মঠ, বিহার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সমস্ত বৌদ্ধতীর্থ-ক্ষেত্রের দর্শনীয় স্থানসমূহ কতক ভগ্নপ্রায়, কতক একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে—কতকের চিহ্ন পর্য্যন্তও লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু পুনরায় তাহার উদ্ধার হইয়াছে ও হইতেছে।

লুম্বিনী বন ও অশোক স্তম্ভ

লুম্বিনীবন

—এইখানে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা কপিলবস্তুর অন্তর্গত একটি উদ্যান। এখানে সম্রাট্ অশোকের একটি স্তম্ভ আছে। লুম্বিনী বন কিংবা লুম্বিনী বাগান কোনাগমন নামে একটি স্তূপের নিকট অবস্থিত। কপিলবস্তুর পূর্ব্বদিকে দশ মাইলের মধ্যে 'লুম্বিন্ দেন' অর্থাৎ লুম্বিনী বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। কপিলবস্তুর

শাক্যবংশে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল শুদ্ধোদন। শুদ্ধোদন শাক্যজাতির একজন নায়ক ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম মায়াদেবী। বুদ্ধদেব কপিলবস্তুর শাক্যদিগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহাদের প্রাধান্য খুব বেশী। সেকালের কপিলবস্তু মস্ত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ইহা একটি বৃহৎ নগর এবং এখানে অনেক বড় বড় বাগান এবং বাজার ছিল। ঐস্থানে অনেক অশ্ব, হস্তী এবং রথ পাওয়া যাইত।

বুদ্ধগয়া—এই স্থানে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব (সম্যক্-সম্বুদ্ধ) লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা বৌদ্ধদের মহাতীর্থ। গয়া সহর হইতে ছয় মাইল দূরে বুদ্ধগয়া অবস্থিত। বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষতটে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে যখন তিনি ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, 'মার' তখন

বুদ্ধগয়ার মন্দির ও বোধিবৃক্ষ

নানা প্রকারে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু 'মার' শত প্রলোভনেও বুদ্ধের তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারে নাই। এইভাবে এখানে বুদ্ধ 'সম্যক্সম্বুদ্ধ' হওয়াতেই বুদ্ধগয়া প্রসিদ্ধ পুণ্য তীর্থে পরিণত হইয়াছে। মহারাজ অশোক এইস্থানে এক বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দির বহুবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং নূতন করিয়া সংস্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে উহা যে-ভাবে গঠিত হইয়াছে—তাহার সহিত য়ুয়াং চুয়াং এর বর্ণনা হুবহু মিলিয়া যায়। যে বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এখন সেই বোধিবৃক্ষ আর নাই। মন্দিরের পিছনে তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ এক অশ্বত্থবৃক্ষ তৃতীয় খৃষ্টাব্দে রোপিত হয়; এখনও তাহাই আছে। প্রবাদ এই যে, মূল বৃক্ষের একশাখা মহেন্দ্রের ভগিনী সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে লইয়া যান। সেখানে তাহা প্রকাণ্ড অশ্বত্থে পরিণত হইয়াছে। এখনও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দিরে প্রতিদিন বুদ্ধের পূজা হয়। পৃথিবীর অনেক জাতির লোক এই পবিত্র স্থানটি দেখিতে আসেন।

সারনাথ—বুদ্ধদেব 'সম্যক্সম্বুদ্ধ' এইপদ

সারনাথের ধামেক স্তূপ

প্রাপ্তির পর কোথায় যাইয়া প্রথম ধর্ম্মোপদেশ দান করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বেকার, পাঁচজন শিষ্যের কথা মনে পড়িল। বুদ্ধ ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, এক্ষণে তাঁহারা মৃগদাব (সারনাথ) নামক স্থানে আছেন। ইহা জানিয়া তিনি সারনাথে আসিয়া আপনার ধর্ম্মোপদেশ প্রথমে ঐ পাঁচ জনকে প্রদান করেন।

বুদ্ধদেবের জীবনের এই ঘটনা "ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন" নামে প্রসিদ্ধ। কেননা, এখানেই তিনি তাঁহার সেই পঞ্চ

সারনাথের পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু

বর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

সারানাথের প্রাচীন নাম 'ইসিপতন মিগদাব'। সেখানে বৌদ্ধদের অনেক দেবালয়, দেবমূর্ত্তি এবং একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল। সারনাথ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। উহার চারিদিকে এরূপ ভস্মরাশি পাওয়া গিয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া অনেকে মনে করেন, উহা বৌদ্ধবিদ্বেষীরা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। এইখানে অশোকের সময়
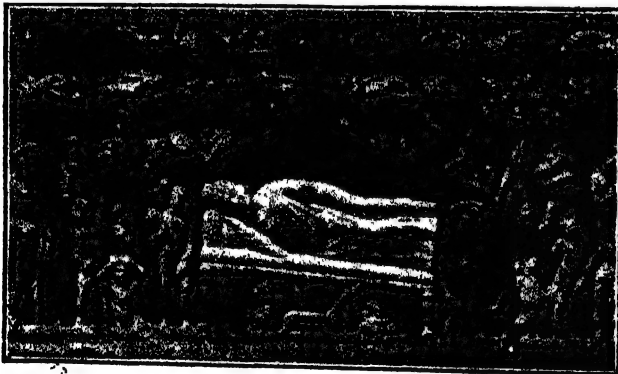
বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ

একটি স্তূপ নির্ম্মিত হয়। সারানাথের মাটি খুঁড়িয়া অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে একটি যাদুঘরও প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। পুণ্যধাম বারাণসীতে ভগবান্ বুদ্ধদেব বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। যখন বুদ্ধদেব ইসিপতন মিগদাবে বাস করিতেছিলেন, তখন ভিক্ষুগণ তাঁহার সহিত ধর্ম্মের অনেক জটিলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে এখানে বৌদ্ধেরা একটি সুন্দর বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

কুশীনগর (কুশীনারা)—ইহা মল্লদিগের নগর ছিল। মল্লদের শালবনে ভগবান্ বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব চণ্ডু নামক একজন কামারের গৃহে নিমন্ত্রণ খাইয়া আমাতিসার রোগাক্রান্ত হন। পীড়িত

কুশীনারা

অবস্থায় তিনি পাবা পুরী হইতে কুশীনারায় গমণ করিয়াছিলেন। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত, তখন তিনি আনন্দকে দিয়া কুশীনারায় মল্লদিগকে সংবাদ দেন। যখন মল্লগণ এই সংবাদ পাইল তখন তাহারা সকলে শালবনে আসিয়াছিল। অনেকে বুদ্ধদেবের নিকট প্রত্যেক মল্ল-পরিবারকে উপস্থিত করিয়াছিল এবং প্রত্যেক মল্ল-পরিবার বুদ্ধদেবকে শেষ অভিবাদন করিয়াছিল।

এখানে ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ তীর্থের কথা বলা হইল। ইহা ছাড়া সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে বুদ্ধের স্মরণ-চিহ্ন সকল বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে।

বৌদ্ধগানের পরে বাংলা সাহিত্য

যে যুগে বৌদ্ধ গান ও দোহা গাওয়া বা লেখা হয়, সে যুগে আর কিছু রচিত হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না। ভবিষ্যতে হয় তো ঐ রকম অনেক গান পাওয়া যাইতে পারে; আবার কিছু নাও পাওয়া যাইতে পারে। যিনি সন্ধান করিতে পারিবেন, তিনি আমাদের জ্ঞানের সীমা বাড়াইয়া দিবেন, এবং যতখানি সন্ধান করিবেন, ততদূর বাড়াইয়া দিবেন। তবে একথা ঠিক যে, এখনকার যত লোকে পড়াশুনা করে, তখন তত লোক পড়িত না, লিখিত না। এখন আমাদের মধ্যে যাহাতে সকলে লেখাপড়ায় খানিকটা সময় কাটায়, তাহাই আমরা করিতে বা দেখিতে চাই; সেকালে লোকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকিত, পড়াশুনা এতদূর এভাবে ছড়াইয়া পড়ে নাই,—লোকে জীবনের অনেক দরকারী কথা জানিত, আমরা হয় তো অনেক পুঁথি পড়িয়াও তাহা জীবনে কাজে লাগাইতে পারি না,—সেরূপ ছিল না। সেকালে যাঁহারা লেখাপড়া করিতেন, বই লিখিতেন, কাব্য রচনা করিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট প্রভেদ – তাঁহাদের গভীর দৃষ্টি ছিল, আর তাঁহারা যাহা লিখিতেন, তাহা ছিল সম্পূর্ণ নিজেদের ভাব, সুতরাং সেকালের অতি সামান্য সাহিত্যেরও একটা বিশেষ মূল্য আছে।

বৌদ্ধ গান ও দোহার পরে অন্য অনেক গান বাংলা দেশে রচিত হয়। ঠিক কোন্ সময়ে এই সকল গান লেখা হয়, তাহা বলা যায় না। তবে এখন হইতে প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘটনা হয় তো আরও আগেকার, তাহার পর আবার আমাদের দেশে বহু বৎসরের মধ্য দিয়া লোকের মুখে মুখে, গানে গানে অনেক বার অনেক অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। তখনকার অনেক কথা এখন চলে না, তখনকার চলিবার ভঙ্গীও ছিল সম্পূর্ণ আলাহিদা ধরণের। এই সকল গানের কিছু কিছু যাহারা গান গাহিত, তাহাদের মুখ হইতে লিখিয়া লওয়া হইয়াছে, কিছু কিছু পুঁথি হইতে পাওয়া যায়, আর কিছু কিছু আমরা অনুমান করিয়া লই বা উল্লেখ পাই, কিন্তু গানগুলি পাই না।

বুদ্ধ যে সদ্‌ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার নানাভাবে রূপান্তর হইল। ঐ ধর্ম্মের মত এক ধর্ম্ম তখন খুব চলিয়াছিল, এবং আমাদের দেশে এখনও আছে—তাহার নাম নাথধর্ম্ম। এই নাথধর্ম্মের গুরু ছিলেন মীননাথ; মীননাথের শিষ্য ছিলেন গোরখনাথ বা গোরক্ষনাথ। মীননাথকে শিব বড় ভাল বাসিতেন। এক-দিন তিনি শিষ্যের প্রশংসা করিতেছেন, তাহাতে পার্ব্বতীর ইচ্ছা হয় যে, তিনি উহাকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। পার্ব্বতীর মায়ায় মীননাথ হার মানিলেন; তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও ভোগবিলাসের মায়া ছাড়িতে পারেন নাই। এইরূপে হাড়িফা, কানফা প্রভৃতি আরও কত সাধুর পরীক্ষা হইল; সকলেই হারিয়া গেলেন। একমাত্র গোরক্ষনাথ পরীক্ষায় জয়ী হইলেন, পার্ব্বতীর তাঁহার নিকটে হার হইল। মীননাথকে ভোগের দেশে পাঠান হইল। সে দেশে রাজা ছিল না, তাঁহাকেই রাজা করা হইল, রাণী হইলেন মঙ্গলা ও কমলা; তাঁহাদের ষোল শত সখী, সকলে আসিয়া বলিল,—

এড় তোহ্মি এহি ভেস ভুঞ্জ এহি রাজ্য দেশ
নব দণ্ড ছত্র ধর মাথাএ।

তুমি এই বেশ ছাড়িয়া দাও, এই রাজ্য দেশ ভোগ কর, নূতন দণ্ড লও, নূতন ছাতি মাথায় দাও।

এই লোভে মীননাথ মজিলেন। তিনি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ভুলিয়া গিয়া ভোগে ঐশ্বর্য্যে ডুবিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার পুত্র জন্মিল, তাহার নাম বিন্দুনাথ। সন্ন্যাসীর কোনও চিহ্নই তাঁহার আর থাকিল না। সাধু সন্ন্যাসী সকলে তাঁহার কথা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। বলিতে লাগিল—

অজ্ঞান হইল মীন জ্ঞান নাই আর।
বলবীর্য্যহীন হইছে অস্থিচর্ম্মসার॥

গুরুর নিন্দা শুনিয়া গোরক্ষনাথের মনে কষ্ট হইল। সাধুরা তাঁহাকেও বাদ দিল না, বলিল যে, যম বলিয়াছেন, মীননাথের আর তিন দিন পর্য্যন্ত আয়ুঃ আছে; এখনও যদি সে না ফেরে, তবে তো একেবারেই গেল। গোরক্ষনাথ যদি তাঁহাকে না বাঁচাইতে পারে, এই বিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পারে, তবে নিতান্তই লজ্জার কথা।

যদি সে আছএ গোর্খ কলঙ্কের ডর।
ঝাটে গিয়া তোহ্মস গুরুর প্রাণি রক্ষা কর॥

গোরখ, যদি কলঙ্কের ভয় থাকে, তবে তাড়াতাড়ি গিয়া তোমার গুরুর প্রাণ রক্ষা কর।

গোরক্ষনাথ এতদূর তেজস্বী ছিলেন যে, যম পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয় করিত। যমপুরীতে গিয়া তিনি গুরুর মৃত্যুরেখা মুছিয়া দিলেন। তাঁহার দুই অনুচর ছিল,—লঙ্গ আর মহালঙ্গ। তাহারা তাঁহার খুব অনুগত;—তাহাদিগকে লইয়া গুরুর সন্ধানে চলিলেন। গোরক্ষনাথ শূন্য দিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন, তাঁহার যাওয়ার কথা কবি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

আসন করিয়া নাথ শূন্যে কৈল ভর।
সাচন উড়এ যেন গগন উপর॥
আলগ আসন নাথ জায়ে ধিরে ধিরে।
চন্দ্র সূর্য্য জেন মত পৃথিবী বেহারে॥
বায়ুপথে জাএ নাথ গগনের স্থলে।
রত্নমণি পতাকা দেখে প্রতি ঘর চালে॥
একে একে গোর্খনাথে সর্ব্ব রাজ্য চাহে।
অগুরু চন্দন গন্ধ সর্ব্ব রাজ্যে পাএ॥
নাথে বোলে এহি রাজ্য বড় হএ ভালা।
চারি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা॥
লোকের পিধন পাটের পাছাড়া।
প্রতি ঘর চালে দেখে সোনার কোমড়া॥
কার পথরির পানি কেহ নাহি খাএ।
মণি মাণিক্য তারা রৌদ্রেতে সুখাএ॥

ক্রমে তিনি মীননাথ যে রাজ্যের রাজা, সেই রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজার সঙ্গে দেখা করা বড় কঠিন। কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হইলে মীননাথের মনে যদি আবার সন্ন্যাসীর ভাব জাগিয়া উঠে তাহা হইলে সর্বনাশ! সুতরাং সে রাজ্যের ত্রিসীমায় কোনও সাধু-সন্ন্যাসীকে আসিতে দেওয়া হয় না। যদি কোনও সাধুর দেখা পাওয়া যায়, তবে—

বুড়া যোগী পাইলে চোপাড়ে ভাঙ্গে গাল।
গাভুর যোগী পাইলে তুলিয়া দেন সাল॥
আধ বস যোগী পাইলে মৈধা দেশে কাটে।
পোলা যোগী পাইলে পাটাতে তুলি বাটে॥

নানা বয়সের যোগী দেখিতে পাওয়া যায়; ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। বুড়া হইলে মারিয়া তাহার গাল ভাঙ্গিয়া দেয়; যুবা হইলে তাহাকে শূলে দেওয়া হয়; আধ-বয়সী হইলে তাহাকে কাটিয়া দুই টুক্‌রা করে, আর শিশু হইলে শিলে রাখিয়া বাটা হয়।

তবে কি করিয়া মীননাথের সম্মুখে যাওয়া যায়? পরামর্শ হইল,—নৃত্য বা অভিনয় করার ছলে যাওয়া যাইতে পারে। যাহারা নৃত্য করে, তাহারা অবাধে রাজপুরীতে প্রবেশ করে।

পুরুষের গতি নাহি পুরির মাঝার।
নাটা নাটুয়া তারা পারে জাইবার॥

সেই পুরীর মধ্যে কোনও পুরুষকে যাইতে দেওয়া হয় না; শুধু যাহারা নর্ত্তক-নর্ত্তকী, তাহাদিগকেই যাইতে দেওয়া হয়।

গোরক্ষনাথ নানারূপ সাজসজ্জা করিয়া মীননাথের পুরীতে নর্ত্তকীবেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার গায়ে কত গহনা—হার, কঙ্কণ, কুণ্ডল ইত্যাদি। এই অভিনব নর্ত্তকী দেখিয়া মঙ্গলার মনে ভয় হইল। মঙ্গলা চাহিলেন, তাহাকে অর্থ দিয়া বিদায় করিতে। কিন্তু এ নর্ত্তকী অমনি বিদায় হইতে রাজী নহেন,—ধনের অভাব নাই, নৃত্য-গীতের দ্বারা যশ অর্জ্জন করিতেই তাঁহার ইচ্ছা। মঙ্গলা তখন লোকজন দিয়া সুন্দরী নর্ত্তকীকে পুরী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। পুরীর বাহিরে গিয়া গোরক্ষনাথ মাদল বাজাইতে লাগিলেন। মাদল মধুরস্বরে রাজাকে কতকথা সঙ্কেতে বলিতে লাগিল,—অন্য লোকে তাহা কিছু বুঝিল না,—শুধু তাহাদের এই মাদলের শব্দ এত মধুর লাগিল যে, তাহারা ইহা শুনিবার জন্য পুরী হইতে বাহির হইয়া নর্ত্তকীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বহু সমাদরে তাহাকে তখন রাজার কাছে লইয়া যাওয়া হইল। কি সে

জলের মধ্যে থালা রাখিয়া…নৃত্য করিলেন

সুন্দর নৃত্য! কি মধুর! রাজার মন গলিল। তখন গোরক্ষনাথ নানাপ্রকার শক্তির পরিচয় দিলেন,—জলের মধ্যে থালা রাখিয়া তাহাতে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিলেন। দেহ চঞ্চল কিন্তু পদ স্থির। সকল নৃত্যের, সকল বাদ্যের মধ্যে একটা কথাই বার বার বাজিতে

লাগিল, কায়া সাধ, কায়া সাধ,—অর্থাৎ দেহ শুদ্ধ কর, দেহ শুদ্ধ কর! ক্রমে গোরক্ষনাথ গুরুকে তিরস্কার করিলেন এবং যোগ শিক্ষাও দিলেন। মীননাথ অস্থির হইলেন, জ্ঞানের প্রভাবে তাঁহার ভ্রম দূর হইল। দেশের সকলে ভয় পাইল, ভয় পাইয়া তাঁহাকে কত বুঝাইতে চাহিল। মীননাথ আবার জ্ঞানের কথা ধর্ম্মের কথা সকলই ভুলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার মায়া দূর করিবার জন্য গোরক্ষনাথ রাজপুত্র বিন্দুনাথকে মারিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বাঁচাইলেন; এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার চৈতন্য হইল। এই মীনের চেতন সম্পাদন করায় গোরক্ষনাথের বিজয় লাভ হইল। গোরক্ষ বিজয়ে অনেক ঘটনা যেমন আছে, ধর্ম্মের কথা, মায়ামোহের কথাও তেমনিই আছে। ইহাতে প্রায় এক হাজারেরও বেশী শ্লোক আছে।

গোরক্ষনাথের এক শিষ্যা ছিলেন, তাঁহার নাম ময়নামতী। ময়নামতীর স্বামীর নাম মাণিকচাঁদ। মাণিকচাঁদের পুত্রের নাম গোবিন্দচন্দ্র। গোবিন্দচন্দ্র বেশ বড় রাজা ছিলেন; তাঁহার সময়ে দক্ষিণ ভারতে রাজেন্দ্র চোল নামে এক পরাক্রান্ত নৃপতি রাজত্ব করিতেন,—তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে কে জেতে কে হারে, সে খবর লইয়া পণ্ডিতেরা কলহ-বিবাদ করেন। ময়নামতী যখন শিশুমতি ছিলেন, তখন গোরক্ষনাথ তাঁহাকে যোগ শিক্ষা দেন। গুরুরমত ময়নামতিও মরা মানুষকে বাঁচাইতে পারিতেন। ময়নামতীর ইচ্ছা ছিল, স্বামীকেও তিনি এই বিদ্যা শিখাইয়া দেন, কিন্তু মাণিকচাঁদ কিছুতেই স্ত্রীর নিকটে কোনও বিদ্যা শিখিতে রাজী হইলেন না। তাঁহার মনে হইল, তাহাতে অপমান হইবে। রাজার মৃত্যু হইলে গোবিন্দচন্দ্র রাজা হইলেন। তখন তাঁহার বয়স অতি অল্প। ময়নামতী দেখিলেন, উনিশ বৎসর বয়সে গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যু অনিবার্য্য; তাহার আগে গোবিন্দ সন্ন্যাসী হইলে এই ফাঁড়া কাটিয়া যায়। তাই তিনি পুত্রকে সন্ন্যাসী হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের দুই রাণী—অদুনা পদুনা; তাঁহাদের রূপ অসাধারণ। কবির ভাষায়ঃ—

> অন্ধকারে শোভে যেন মাণিক উজ্জ্বল।
> অদুনা পদুনারূপে লজ্জিত কমল॥
> অদুনা পদুনারূপ জলন্ত আগুনি।
> মেঘের আড়েতে যেন শোভে সৌদামিনী॥

রাজসভার মধ্যে গিয়া ময়নামতী পুত্রকে বুঝাইতে লাগিলেন, সংসারে কিছুই স্থির থাকে না, সকলেই চঞ্চল—যোগসিদ্ধ যোগী হইলে তবে অমর হওয়া যায়। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা, তুমি ত যোগ শিখিয়াছ, তোমার কি মৃত্যু নাই? ময়নামতি কহিলেন, না, তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। আগুনে পোড়াইয়া, ফুটন্ত তেলের বড় কড়াইয়ে ফেলিয়া ও অন্য উপায়ে দেখা গেল,—ময়নামতী কিছুতেই মরিলেন না। তখন গোবিন্দচন্দ্র (অন্য নাম গোপীচন্দ্র) সন্ন্যাসী হইতে এবং যোগ শিক্ষা করিতে রাজী হইলেন। অদুনা পদুনা কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন,—রাজার তাহাতে অসুবিধা, কারণ পথে নানা রূপ বিপদ বনে আছে বাঘ, আর শহরে আছে দুষ্ট লোক, তাহারাও বাঘের মত।

> সেটে আছ বনর বাঘ দুর্জ্জন বাঘর ভয়।

অর্থাৎ:—সেথায় আছে বনের বাঘ দুর্জ্জন বাঘের ভয়।

অদুনা-পদুনার কান্নায় কিছুতেই যখন রাজা বাধা মানিলেন না, তখন সমস্ত রাজ্য জুড়িয়া হাহাকার পড়িয়া গেল।

> গাছ কাঁদে গাছালি কাঁদে গাছের কাঁদে পাতা।
> বনের হরিণী কাঁদে হেঁট করিয়া মাথা॥

ঘাটোয়ালের ঘাটে কাঁদে বাইশ কাহন নাও।
বাইশ কাহন নৌকা কাঁদে তেইশ কাহন দাঁড়ী।
তাহার মাঝে মাঝে কাঁদে বিশ্বম্ভর কাণ্ডারী॥
হাতীশালার হাতী কাঁদে ঘোড়াশালার ঘোড়া।
রাণীরা যে কাঁদে তাতে ভিজে জামাযোড়া॥
এক শত গাভী কাঁদে গলায় লেজ দিয়া।
নয় বুড়ী কুত্তা কাঁদে চরণে পড়িয়া॥
এক শত রাণী কাঁদে মৃত্তিকায় গড়াইয়া।
অদুনা পদুনা কাঁদে দুই চরণ ধরিয়া॥

রাজা সন্ন্যাসী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, গুরুর আদেশে বহু দুঃখ কষ্ট তাঁহাকে সহ্য করিতে হইল ; এমন কি, অন্যের কেনা দাস হইয়া অনেক হীন কর্ম্মও তাঁহাকে করিতে হইল। গুরুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহু বৎসর প্রবাসের পরে তিনি

রাজবাড়ীর পুরাতন হাতী···তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল

গুরুর আশীর্ব্বাদ লইয়া নিজ প্রাসাদে ফিরিলেন। রাজবাড়ীর পুরাতন হাতী, মনিবকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। শোকে দুঃখে রাণীদের দিন কাটিতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া সকলে সুখী হইল। রাজা সিংহাসনে বসিলেন,—রাজার রাজ্য সুখময় হইল।

এই গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের উপাখ্যান আমাদের দেশে বহু স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে, উড়িষ্যায় গোবিন্দ চন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনী কাব্যে চলিত আছে। বাংলা দেশেই বহু স্থানে ময়না-মতীর ও গোবিন্দচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। রংপুর, কুড়িগ্রাম মহকুমায় অদুনা-পদুনা নদীর নাম আছে ; সেখানে এখনও ময়না-মতীর ভিটা বা গোপীচন্দ্রের ভিটা দেখান হয়। গুরুদের মধ্যে গোরক্ষনাথ জলন্ধরের লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল,—জলন্ধরী।

এই সময়ে পালরাজাগণ বাংলাদেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ লইয়া অনেক গান রচিত হইত। সে সকল গান লোকেরা শুনিতে খুব ভালবাসিত।

যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥

এই বংশের একজন রাজা ছিলেন রাম-পাল। রামপাল খুব ন্যায়বিচারক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রজার উপর অত্যাচার করিত,—রাজার ছেলে, কেহ কিছু বলিবে না, অনেকে এই ভয়ে তাহার উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিত। কিন্তু রাজা সে কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে শূলে দেন। রাজা রামপালের এই কীর্ত্তি লোকে মুখে মুখে গান গাহিয়া প্রচার করিত। পাল বংশের আর একজন রাজা ছিলেন মহীপাল। দিনাজ-পুর সহর হইতে ১৬।১৭ মাইল দূরে এখনও মহীপাল দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে তাঁহার কীর্ত্তির সহিত এতই পরিচিত ছিল যে, কথায় বলিত,—"ধান ভানতে মহীপালের গীত।" এখনও খোঁজ করিয়া মহীপালের গানের সন্ধান বা পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

[সেকালের জীবজন্তুদের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এখন বর্ত্তমান জগতের পশু-পক্ষী ও অন্যান্য সমুদয় প্রাণীর কথা বলা হইবে।]

প্রাণী-পরিচয়

৯০৬ পৃষ্ঠার পর

আমরা চারিদিকে নানাজাতীয় প্রাণী দেখিতে পাই। পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি কত জাতীয় প্রাণী যে আছে, তাহা কি কেহ গণিয়া শেষ করিতে পারে? বিজ্ঞানের যে শাখার সাহায্যে আমরা নানা প্রাণীর কথা জানিতে পারি, তাহার নাম প্রাণী-বিজ্ঞান। পূর্ব্বে প্রাণীদের বিষয়ে তেমনভাবে আলোচনা হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রাণী-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এখন নানা নূতন নূতন তথ্যের সাহায্যে আমরা প্রাণীদের পূর্ণ পরিচয় দিতে পারি। কি ভাবে উহা সম্ভবপর হইয়াছে এবং কি ভাবে প্রাণিগণের বিবিধ শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে, এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। ইহা হইতে তোমরা প্রাণীদের সহিত অতি সহজেই পরিচয় লাভ করিতে পারিবে।

আমরা প্রাণীদের নাম দিয়া তাহাদের পরিচয় দেই। যেমন কুকুর। কুকুর বলিতে তোমরা বিশেষ একজাতীয় প্রাণীকে বুঝিয়া থাক, যদিও বহু-জাতীয় কুকুর আছে। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে, এক গিরগিটি জাতীয় প্রাণীর সংখ্যা হ‌ইবে কুড়ি পঁচিশ হাজার! বল দেখি, যদি আমরা ঐ সমুদয় গিরগিটির প্রত্যেকটির এক একটা ভিন্ন ভিন্ন নাম দেই, তাহা হইলে সেই হাজার হাজার নাম একজন শ্রুতিধরের পক্ষেও মনে রাখা কঠিন। এজন্যই একটা সাধারণ নাম দিয়া এক এক জাতীয় প্রাণীর পরিচয় দেওয়া হয়। অনেক জাতীয় প্রাণীর আবার কোন নামই থাকে না, আমরাও তাহাদের সকলের নাম দিয়া উঠিতে পারি না—তবে আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিয়া এক একটা সাধারণ সংজ্ঞার মধ্যে ফেলিয়া দেই। আমরা ঘাটেমাঠে ছোট-বড় কত রকমের প্রাণী দেখিতে পাই তাহাদের সকলেরই কি নাম জানি?

শ্রেণী বিভাগ

দেশভেদে জীবজন্তুরও নানারূপ নাম হইয়া থাকে। বিড়ালকে কেহ বিড়াল বলেন, কেহ বলেন "মেকুর"। কাজেই বুঝিতে পার যে,একই প্রাণী দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। এক বিড়ালেরই নানাদেশে নানা নাম। ইংরাজী cat, সংস্কৃত মার্জ্জার, বাঙ্গলা বিড়াল, বিলাই, মেকুর—আরও কত নামেই না অভিহিত হইয়া থাকে। এই ভাবে আমরা এক জাতীয় জন্তুরই নানা বিভিন্ন নাম পাই। এই নামের দ্বারা আমরা বিজ্ঞানের শ্রেণী-বিভাগানুরূপ প্রকৃত পরিচয় পাইতে পারি না।

দেশভেদে বিভিন্ন নাম

প্রাণিবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা প্রাণীসমূহের দেহের গঠন-প্রণালী দেখিয়া তাহাদের জাতিনির্ণয় করেন। তোমরা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, কতকগুলি
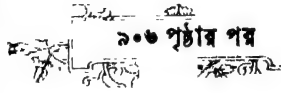
১ সিংহ, ২ পেঁচা, ৩ মাকড়সা, ৪ বাদুড়, ৫ প্রজাপতি, ৬ সাপ, ৭ বেঙ, ৮ উদ্বিড়াল,
৯ সীল, ১০ জেলিফিস্, ১১ কুমীর, ১২ কচ্ছপ, ১৩ মাছ, ১৪ কাঠপোকা, ১৫ কাঁকড়া

প্রাণীর দেহে অস্থি বর্ত্তমান এবং উহা একটি মেরুদণ্ড অবলম্বনে অবস্থিত। আবার কতক গুলিপ্রাণীর দেহে অস্থি নাই। তাই অস্থিহীন। পশু, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি প্রথম প্রকারের এবং কীট, পতঙ্গ, কৃমি প্রভৃতি জীব দ্বিতীয় প্রকারের। এই বিশেষত্বকে অবলম্বন করিয়া প্রাণিগণকে পণ্ডিতেরা দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাগ

একটি ভাগ—মেরুদণ্ডী জীব বা পঞ্জরী (Vertebrate)

দ্বিতীয় ভাগ—অপঞ্জরী জীব বা অমেরুদণ্ডী (Invertebrate)

এই দুইটি বিভাগ লইয়াই সমুদয় প্রাণিরাজ্য গঠিত।

আমাদের সহিত মেরুদণ্ডী প্রাণীদেরই সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। এই শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই কতকগুলির হাত, পা, এই সব বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নাই, কতকগুলি ডানার সাহায্যে উড়িতে পারে।

মেরুদণ্ডী প্রাণী

পাখী

কতকগুলি আবার বুকে ভর দিয়া যাতায়াত করে। কতকগুলি স্তন্যদান করিতেও পারে। এইরূপ বিভিন্ন রূপ কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া ইহাদিগকে আবার পাঁচটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(১) স্তন্যপায়ী জীব (Mammals)—এই শ্রেণীর জীবের দেহে নিম্নলিখিত রূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। (ক) রক্ত—উষ্ণ ও লোহিত বর্ণ, দেহ লোমে আবৃত (খ) ফুস্‌ফুস্‌ দ্বারা (Lungs) ইহারা শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে। (গ) ইহারা সন্তান প্রসব করে ও তাহাদিগকে স্তন্যদানে জীবিত ও পরিপুষ্ট করে। বৃহদাকারের এবং বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব-নিচয়ের প্রায় সকলগুলিই এই শ্রেণীভুক্ত।

(২) পক্ষী সম্প্রদায় (Birds) (ক) এই শ্রেণীর প্রাণীর দেহের রক্ত উষ্ণ ও লোহিত। দেহ পালকাবৃত, পুচ্ছ এবং ডানাযুক্ত। (খ) ফুস্‌ফুসের সাহায্যে ইহারাও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে। চঞ্চু বা মুখ মস্তকের নিম্ন প্রদেশে অবস্থিত। (গ) এই জাতীয় প্রাণীরা সচরাচর উড়িয়া বেড়ায়। পায়ে হাঁটিয়া চলিতে এবং সাঁতরাইতেও পারে। বিহঙ্গ জাতীয় প্রাণীরা ডিম্ব প্রসব করে এবং ডিম্বে তা দিয়া শাবক জন্মায়। (ঘ) এই জাতীয় প্রাণীরা কৌশলের সহিত গাছের শাখায় কুলায় বা নীড় নির্ম্মাণ করে। অন্যান্য দু' একটি প্রাণী বাসা তৈয়ারী করিতে পারিলেও ইহাদের মত দক্ষ ও নিপুণ নহে।

(৩) সরীসৃপ সম্প্রদায় (Reptiles)…এই জাতীয় প্রাণীদের রক্ত লোহিত, চর্ম্ম শল্কাবৃত (scales) কিংবা বর্ম্মে ঢাকা (Bony scutes) এবং শীতল। ইহারাও ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকে জলে ও স্থলে সমানভাবে সন্তরণ ও চলাচল করিতে পারে। ইহারা অনেকে উভচর। কতক স্থলে বাস করে, কতক জলেও বাস করে। কতকগুলির গায়ে অস্থিময় আবরণ আছে; আবার কতকগুলির শল্কযুক্ত আবরণ আছে। ইহারাও ডিম্ব প্রসব করিয়া শাবক উৎপাদন করে। শীতকালে ইহারা আড়ষ্ট অবস্থায় জীবন ধারণ করে। এই শ্রেণীর জীবদের প্রাণ সহজে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। এমন কি, দেহের অনেক অংশ ধ্বংস হইলেও বাঁচিয়া থাকে। কূর্ম্ম-জাতীয় প্রাণীদের মস্তক দেহচ্যুত হইলেও ইহাদিগকে দশ বার দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়। কূর্ম্ম, কুম্ভীর, সরট (কাঁকলাস), সর্প প্রভৃতি সরীসৃপ সংজ্ঞার অন্তর্ভূত।

(৪) উভচর প্রাণী সম্প্রদায় (Amphibious)—এই জাতীয়

প্রাণীদের রক্ত লোহিত বর্ণ এবং শীতল। গ্রীবা—বিহীন—মাথা দেহের সঙ্গে সংবদ্ধ। মসৃণ ও এক প্রকার ক্লেদময় পদার্থের দ্বারা আবৃত। ইহাদের প্রায় সকলেই জলে ও স্থলে সমান ভাবে বিচরণ

সাপ

গিরগিটি

করে। বেঙ (Frog) নিউট (Newt)—বেঙ জাতীয় প্রাণী এই সংজ্ঞার অন্তর্গত।

(৫) **মৎস্য সম্প্রদায়** (Fishes)—(ক) রক্ত লোহিত ও শীতল। দেহ বৃত্তাকার ও সূক্ষ্মাগ্র (Elongated) (খ) মস্তক দেহের সহিত সংবদ্ধ। গ্রীবা নামক অংশ রহিত। (গ) চর্ম্ম মসৃণ কিংবা শল্কাবৃত। পুচ্ছ সঞ্চালন দ্বারা সন্তরণশীল। **(ঘ)** এই জাতীয় প্রাণীরা কানসারা বা কান্‌কো **(Gill)** নামক দেহযন্ত্রের দ্বারা জলের মধ্যেও বায়ু গ্রহণ করে। (ঙ) ডিম্বের সাহায্যে ইহারা বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মৎস্যজাতীয় প্রাণীরা শব্দ করিবার ক্ষমতাবিহীন। জলের মধ্য হইতে দ্রব বায়ু গ্রহণ করিবার ক্ষমতাই হইতেছে ইহাদের বিশেষত্ব।

এখন তোমরা সহজেই কোন্‌টি কোন্ জাতীয় প্রাণী, তাহা বুঝিতে পারিবে। আমরাও একে একে ইহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। তোমরা কিন্তু কয়েকটি প্রাণিসম্বন্ধে বড়ই ভুল করিয়া থাক।

কুমীর

যেমন ধর, **চিংড়ি** মাছ। ইহারা কোনরূপেই মৎস্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে না। কেননা, ইহাদের দেহে অস্থিও নাই, কান্‌সারাও

গিরগিটি

নাই। তার পর মৎস্য হইতেছে 'মেরুদণ্ডী' প্রাণী, ইহাদের মেরুদণ্ড কোথায়? কাজেই, তোমরা চিংড়িকে চলতি কথায় মাছ বলে বটে, কিন্তু তাহারা আদৌ মাছ নহে।

'বাদুরেরা ঝুলে থাকে তেঁতুলের ডালে'—একথা হয়ত 'পদ্যমালায়' পড়িয়া থাকিবে। বাদুড় সাধারণতঃ পক্ষী বলিয়া পরিচিত হইলেও ইহারা পক্ষী নহে। পক্ষীজাতীয় প্রাণীদের সহিত ইহাদের কোন সাদৃশ্য নাই। বাদুড়ের না আছে ডানা, না আছে পালক। পক্ষীমাত্রেরই দেহে পালক থাকে। বাদুড় ডিম্ব প্রসব করে না—উহারা শাবক প্রসব করে এবং ইহারা বুকের স্তন্য দিয়া সন্তান পরিপোষণ করে অতএব বাদুড়কে আমরা পক্ষীসম্প্রদায়ে না ফেলিয়া

স্তন্যপায়ী জীবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত বলিতে পারি। তিমিকেও আমরা সচরাচর মৎস্য নামে অভিহিত করি। তিমিও কিন্তু মৎস্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে না। কেননা, তিমির কানসারা নাই এবং তিমি ডিম্ব প্রসব করে না—পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে। এজন্য তিমিকে স্তন্যপায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত জলচর প্রাণীরূপে অভিহিত করিতে পারি।

এই ত গেল মোটামুটি পাঁচটি ভাগ। এই পাঁচটি

সিংহ

ভাগ ছাড়াও দেহের গঠন, খাদ্য-প্রণালী, চর্ম্মের গুণ ইত্যাদি দেখিয়া আবার প্রাণীদিগকে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এখানে স্তন্যপায়ীদের সংজ্ঞা দিলাম।

মাংসাশী (Carnivora)—এই জাতীয় প্রাণীরা হিংস্র ও শিকারী হইয়া থাকে। ইহাদের দন্তের গঠন ভিন্নরূপ। অর্থাৎ উপরের দাঁতগুলি নীচের চোয়াল এবং নীচের দন্ত উপরের চোয়াল স্পর্শকরে।

কীটভুক্ শ্রেণী (Insectivora)—ইহারা মাটি খুঁড়িতে পারে। সামনের পা ত্ব'খানি ক্ষুদ্র। পায়ের আঙ্গুলদিয়া মাটি আঁচড়াইতে পারে। মাটির ভিতরে যে সব কীট বাস করে, তাহাদিগকে কিংবা মাটির উপরে বিচরণশীল কীট ইত্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এই জাতীয় প্রাণীরা রাত্রিকালে বিচরণ করে। কাঁটাচুয়া (Hedge-hog) এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

দ্বিগর্ভা প্রাণী (Marsupilas)—এই জাতীয় প্রাণীরা সন্তান প্রসব করিয়া পেটের নীচে চর্ম্মের ন্যায় একটি থলিয়ার আবরণে সন্তান রাখিয়া দেয়। প্রথম জন্ম সময়ে উহাদের দেহ অনেকটা মাংসপিণ্ডের মত থাকে, ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়া উপযুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত হয়। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইহারা বাসকরে। ক্যাঙ্গারু এই জাতীয় প্রাণী।

কৃন্তদন্তী (Rodentia) ইহারাও নিশাচর জীব। সচরাচর উদ্ভিদ্‌ভোজী। ইহাদের কর্ত্তনদন্ত

য়াক

(Incissor teeth) এত তীক্ষ্ণ যে, অনায়াসে কাঠ প্রভৃতি কঠিন পদার্থ কাটিয়া ফেলে। সম্মুখের পা অপেক্ষা পিছনের পা অধিকতর দীর্ঘ। সজারু, খরগোস, পাৰ্ব্বত্য মূষিক, কাঠবিড়াল, নেংটে ইন্দুর প্রভৃতি এই জাতীয় প্রাণী।

অদন্তী শ্রেণী (Edentuta)—ইহাদের দাঁত নাই বলিলেই চলে। থাকিলেও অপ্রকাশিত। বর্ম্মিল (Armadillo), বজ্রকীট (Pangelis) প্রভৃতি জাতীয় প্রাণী এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

স্থূলচর্ম্মী শ্রেণী (Pachidermata)—এই জাতীয় প্রাণীদের চর্ম্ম স্থূল এবং দেহ নির্লোম হয়। ইহারা সাধারণতঃ শক্তিশালী জীব হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর প্রাণীদের দুই এক জাতির শুণ্ড আছে।

যথা :—হস্তী, গণ্ডার, জলহস্তী (Hippopotamus), শূকর, নদীঘোড়া এই সব।

রোমন্থক প্রাণী (Ruminantia)—এই জাতীয় প্রাণীদের খুর দ্বিখণ্ডিত থাকে। মাথায় শিং বা শৃঙ্গ থাকে। ইহারা উদ্ভিদ্‌ভোজী জীব।

বাদুড়

বনমানুষ

এই রোমন্থক প্রাণীরা খাদ্যদ্রব্য দুইবার চর্ব্বণ করিয়া থাকে। ইহাদের অসম্পূর্ণভাবে জীর্ণ খাদ্য প্রথম পাকস্থলী হইতে পুনরায় মুখে ফিরিয়া আসে। গরু, ঘোড়া ইত্যাদি এই জাতীয় প্রাণী।

উভচর স্তন্যপায়ী প্রাণী (Amphibious mammalia)—ইহারা জলে ও স্থলে সমভাবে বাস করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর প্রাণীরা মেরু-প্রদেশ বাসী। হস্ত-পদ খর্ব্বাকার। সন্তরণ-দক্ষতা সম্পন্ন। ইহারা মৎস্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে। সিন্ধুঘোটক (Walrus), সীল (Seal) এই জাতীয় প্রাণী।

বানর

বানর (অন্য জাতি)

তিমি জাতীয় জীব (Cetacea)—এইশ্রেণীর প্রাণীরা মৎস্যাদির ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। মেরু-প্রদেশের নিকটস্থ সমুদ্রে ইহারা বাস করে। ইহাদের পুচ্ছ বিদ্যমান। জলের মধ্য

হইতে দ্রব বায়ু গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই বলিয়া ইহারা বায়ু গ্রহণের জন্য জলের উপর ভাসিয়া উঠে। এই জাতীয় জীবদের মধ্যে তিমি, ডল্‌ফিন (Dolphin), নরহাল (Narwhal) ইত্যাদি প্রধান।

করপক্ষী শ্রেণী (Cheiroptera)—এই শ্রেণীর প্রাণীরা নিশাচর। ইহাদের দেহে পালক থাকে না। হস্তদ্বয় পাতলা চামড়া দ্বারা একত্র সংবদ্ধ। এই জন্য ইহারা পাখীর মত উড়িবার ক্ষমতাযুক্ত। পায়ের অগ্রভাগে বঁড়শীর কাঁটারমত বাঁকানখ আছে বলিয়া ইহারা সেই নখের সাহায্যে গাছের শাখায় ঝুলিয়া থাকিতে পারে। ইহাদের মুখে সরু সরু দাঁত আছে। বাদুড় এই শ্রেণীর জীব।

চতুষ্করা শ্রেণী (Quadrumana)—বানর প্রভৃতি এই শ্রেণীর জীব। দেহ লোমাবৃত মুখমণ্ডল সাধারণতঃ নির্লোম, রঙ্গিন চর্ম্ম দ্বারা দেহ আবৃত। ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় প্রখর। ইহাদের ঠিক্ পা না থাকিলেও হাত চারি খানি দীর্ঘ

নেকড়ে বাঘ

অঙ্গুলিযুক্ত এবং কোন কিছু মুঠা করিয়া শক্ত ভাবে ধরিয়া থাকিবার কিংবা ঝুলিয়া থাকিবার উপযোগী। এই বানর জাতীয় জীবের বুদ্ধিবৃত্তি ও আচরণ ইত্যাদি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ডারুইন (Darwin)-প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিরা ক্রমবিকাশের (Evolution theory) নির্দ্দেশ অনুযায়ী বানরকে মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

উদ্বিড়াল বংশ (Mustelae)—ইহারা মাংসাশী জীব। কখন কখন উদ্ভিদ্‌ভোজী। ইহারা সাহসী এবং নিশাচর প্রাণী। নকুল (Weasel), উদ্বিড়াল (Otter), মার্টেন (Marten) এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

গন্ধগোকুল বংশ(Civet animals)—ইহাদের দেহ ক্ষীণ, নখরযুক্ত। ইহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। বাঘডাসা বা খটাস ও বেজি (Icneumon) প্রভৃতি ইহাদের অন্তর্ভূত।

এতদ্ব্যতীত **মার্জ্জার বংশ** (Felidae)—সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বন-বিড়াল, গৃহপালিত মার্জ্জার এই বংশের অন্তর্গত। এই জাতীয় প্রাণীর মস্তিষ্ক গোলাকার, মুখমণ্ডল প্রশস্ত, কর্ণ সরু ও সঞ্চরণশীল। ইহাদের চক্ষু এইরূপ ভাবে গঠিত যে, অন্ধকারের ভিতরও দেখিতে পায়। চোয়াল অত্যন্ত দৃঢ়, পেষণ দন্ত প্রবল, কৃন্তন দন্ত (Incissor teeth) তীক্ষ্ণ ও ধারাল। জিহ্বা এইরূপ ধারাল যে, উহার দ্বারা অস্থি হইতে মাংস চাটিয়া বাহির করিতে পারে। গুম্ফ দীর্ঘ; কণ্ঠ-প্রদেশ খর্ব্ব ও পেশীযুক্ত। অঙ্গুলি সম্মুখ ও পশ্চাৎ পদে চারিটি করিয়া। নখর টানিয়া আনিবার মত বক্র। চর্ম্ম মসৃণ ও কোমল, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রখর। এই জাতীয় প্রাণীরা রক্তপিপাসু ও হিংসা-পরায়ণ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা নিশাচর জীব। সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, নেকড়ে, বন-বিড়াল ও গৃহপালিত বিড়াল এই মার্জ্জার বংশের অন্তর্গত।

তরক্ষু বংশ (Hyenas)—এই জাতীয় জীবদের দন্ত অসাধারণ শক্তিশালী হয়। মস্তক লম্বিত নাসাযুক্ত। কর্ণ, দীর্ঘ সরল ও সূক্ষ্মাগ্র। পৃষ্ঠদেশ বক্র ও শূকরের লোমের ন্যায় কেশ দ্বারা আবৃত কেশরযুক্ত। গমন মন্থর। ইহারা উচ্চতায় ২ হইতে ২½ ফিট্ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দৈর্ঘ্য ৪½ ফিট্। এই শ্রেণীর প্রাণীরা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। রাত্রি-কালে শিকার সন্ধানে বাহির হয়। ইহারা এশিয়া ও আফ্রিকায় বাস করে।

জীবসমূহের বিস্তারিত ভাবে শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে প্রকাণ্ড একখানি অভিধান হইয়া পড়ে। এজন্য সংক্ষেপে তোমাদের কাছে প্রাণীগণের সম্প্র-দায়, শ্রেণী ও বংশ-পরিচয় দিলাম। এই পরিচয় সব দেশের প্রাণীদের পক্ষেই প্রযোজ্য।

বাবা নানক

শিখ ইতিহাসের সহিত বাবা নানকের নাম অমর হইয়া আছে। ভারতবর্ষে যে সময়ে বাবা নানকের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে সময়ে তাঁহার মত মহাপুরুষের জন্মের আবশ্যকতা ছিল। নানক, পৃথিবীর সকল মানুষই যে ধর্মকে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে এমন এক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মে কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না; তাঁহার কাছে কোন জাতিবিচার ছিল না— সকলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিত। পৃথিবীর সকল মানুষই ছিল তাঁহার আপনার জন। সঙ্কীর্ণ পৌরাণিক ধর্মের বন্ধন হইতে তাঁহার হৃদয় মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং সেই মুক্তি তিনি সকলের কাছে প্রচার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।
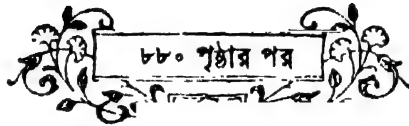
বাবা নানক ইংরাজী ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ৮৯২ সালে) লাহোরের নিকটবর্ত্তী তালবণ্ডী নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে শুভ পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কালু এবং মাতার নাম ত্রিপতা। ইঁহারা দেবীবংশীয় ক্ষত্রিয়। পিতা কালু জাতিতে জাঠ ছিলেন। তিনি কৃষি ও সামান্য ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন।

স্বাভাবিক বৈরাগ্য লইয়াই নানক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ যে বয়সে শিশুরা খেলাধুলায় মাতিয়া থাকে, সেই বয়সেই নানক চিন্তাশীল, মিতভাষী এবং ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। ছেলেবেলাতেই তাঁহার বুদ্ধির বেশ বিকাশ হইয়াছিল। পাঁচ বছর বয়সে তিনি তাঁহার গ্রামের গুরু মহাশয় গোপাল পাঁধার পাঠশালায় পড়িতে গিয়াছিলেন। সেই অতটুকু বয়সেই তিনি "ঈশ্বর আছেন তার প্রমাণ কি?" এইরূপ নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিতেন। পাঠশালার লেখাপড়া শেষ করিয়া নানক বৈদ্যনাথ নামক একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ও মৌলবী কুতবুদ্দীন মোল্লা সাহেবের নিকট পারসী শিক্ষা করেন। নানক সংস্কৃত ও পারসী উভয় ভাষার বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণ লইয়া এক একটি ভাবপূর্ণ সুন্দর শ্লোক রচনা করিয়া শিক্ষক দুইজনকে বিস্মিত করিয়াছিলেন।

নানকের সম্বন্ধে নানারূপ গল্প প্রচলিত আছে। এখানে তাহার একটি মাত্র গল্প বলিলাম।

একদিন বালক নানক বিপাশা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। নিকটে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে তর্পণ করিতে দেখিয়া তিনি হস্ত দ্বারা তীরে জল সেচন করিতে লাগিলেন। অল্পবয়স্ক বালককে বিনা প্রয়োজনে এইরূপ জল সেচন করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা বলিয়া উঠিলেন—"বালক, তুমি জল লইয়া কি করিতেছ?" নানক প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই পাল্টা প্রশ্ন করিলেন—"আপনারা জল দ্বারা ও কি করিতেছেন?" একজন ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—"আমাদের পরলোকগত

পূর্ব্বপুরুষদের জল দান করিতেছি।" নানক উত্তর করিলেন—"আমি আমার তালবণ্ডীর শাকের ক্ষেতে জল সেচন করিতেছি।" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"তুমি কি নির্ব্বোধ, তোমার শাকের ক্ষেত রহিয়াছে তালবণ্ডীতে, আর এখানকার ভূমিতে তুমি জল ছড়াইতেছ, এই জল দ্বারা কি সেই ক্ষেত্র সিঞ্চিত হইবে?" নানক বলিয়া উঠিলেন—"কে বেশী নির্ব্বোধ? তুমি না আমি? তুমিই বলিতেছ যে, আমায় এইজল কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী তালবণ্ডীতে পৌঁছিবে না; তবে তোমার প্রদত্ত ঐ জল কি করিয়া তোমার পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষদের নিকট পৌঁছিবে?" ব্রাহ্মণেরা অবাক্ হইয়া গেলেন।

বাবা নানক

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানকের ধর্ম্মানুরাগ বাড়িতে লাগিল। সাধু সন্ন্যাসী ও ফকিরদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সংসারের কোন কার্য্যে কিংবা অর্থ-উপার্জ্জনের দিকে তাঁহার খেয়াল ছিল না। পিতা কালু ইহাতে দুঃখিত ছিলেন। ধনলোভী কালু তাঁহার মতি ধনোপার্জ্জনের দিকে ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে গো-মহিষ-চারণে ও কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। নানক পিতার আদেশ মানিয়া লইয়া গো-মহিষ লইয়া প্রান্তরে যাইতেন, কিন্তু তথায় যাইয়া পশুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া নিজে গাছের শান্তশীতল ছায়ায় বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন। গো-মহিষগুলি কাহার শস্য নষ্ট করিত, নানক তাহার খোঁজ লইবার অবসর পাইতেন না। পিতা কালু নিরুপায় হইয়া নানককে ঐ কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিলেন। পিতা তাঁহাকে বারংবার কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে বলায়, নানক সেই সময় বলিয়াছিলেন—

"বাবা! আমি একখানি নূতন ক্ষেত পাইয়াছি, সেই ক্ষেতের চাষ আরম্ভ হইয়াছে, নূতন নূতন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে, এই সময়ে আমাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইতেছে। এমন সময় আমার অন্যের ক্ষেতের প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর নাই, তাহার ভারও লইতে পারি না।" এইভাবে নানক তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের বিষয় পিতাকে নানারূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। সংসারী পিতা তাঁহার ভাবের গভীরতা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি নানককে অকর্ম্মণ্য মনে করিলেন।

নানকের পিতা তাঁহাকে সংসারের কাজে লাগাইবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার হাতে কিছু টাকা দিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"এক গাঁয়ে নুন কিনিয়া আর এক গাঁয়ে বিক্রয় করিয়া এস।" নানক টাকা লইয়া বালসিন্ধু নামক এক ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া নুন কিনিতে গেলেন। এমন সময়ে পথের মধ্যে কতকগুলি ফকিরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুদিগকে দেখিয়া নানকের মনে খুব আনন্দ হইল। ফকিরদের সহিত ধর্ম্মালাপ করিবেন ভাবিয়া তিনি তাঁহাদের কাছে গেলেন। কাছে গিয়া দেখেন তিন দিনের উপবাসে তাঁহাদের কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। তাঁহাদের এইরূপ ক্লেশ দেখিয়া নানকের মনে দয়া হইল। তিনি কাতরভাবে বালসিন্ধুকে বলিলেন—"আমার পিতা কিছু অর্থ লাভের জন্য নুনের ব্যবসা করিতে আদেশ দিয়াছেন; কিন্তু সে লাভের টাকা কতদিন থাকিবে? আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে, এই টাকা দিয়া দরিদ্র সাধুদিগের দুঃখ দূর করি।" বালসিন্ধু নানকের এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। নানক সমস্ত অর্থ ফকিরদিগকে দান করিলেন। তাঁহারা আহারাদির পর সুস্থ হইয়া নানককে মধুর ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। নানকের অতুল আনন্দ হইল। নানকের পিতা পুত্রের এই দানে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি এইজন্য নানককে শাস্তি দিয়াছিলেন।

নানক এখন আর ছেলেমানুষ নহেন। তাঁহার বয়স বিশ বছর হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঈশ্বর-প্রীতি বাড়িতেছিল। পিতার একান্ত চেষ্টায়ও তাঁহার মন সংসারের দিকে গেল না। তিনি সন্ন্যাসী ও ফকিরের সহিত মিশিতেই ভালবাসিতেন। আর একবার তিনি জনৈক সন্ন্যাসীকে একটি সোণার অঙ্গুরী ও পানপাত্র দান করেন। পুত্রের এই দানের কথা পিতা শুনিবামাত্র ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া নানককে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

কালু তালবণ্ডী গ্রামের ভূ-স্বামী রায় বুলারের অনুগত কর্ম্মচারী। বুলার নানককে পরম সাধুজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। তিনি এই সময়ে নানককে তাঁহার একমাত্র ভগিনী নানকীর নিকটে সুলতানপুরে পাঠাইয়া দিলেন। ভগ্নীপতি জয়রাম নবাব দৌলত খাঁ লোদীর অধীনে রশদ বিভাগের মুদিখানার কর্ত্তা ছিলেন। কিছুকাল নানক এই মুদিখানার কার্য্য করিয়া ছিলেন। তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, সাধুসেবাতেই তাহা ব্যয় করিতেন।

কিছুতেই নানকের মন সংসারের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে না দেখিয়া পিতা কালু এই সময়ে সুলখনা-চৌণী নামে এক সুন্দরী বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। বিবাহ করায় নানকের মনের গতির কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি আগে যেমন ছিলেন, তেমনি সংসারের প্রতি উদাসীন ভাবে আরও কিছু কাল মুদিখানার কাজ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এক দিন তাঁহার জীবনে হঠাৎ এক পরিবর্ত্তন ঘটিল। একটি ঘটনায় তিনি তাঁহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্য বুঝিয়া ফেলিলেন।

একদিন বাবা নানক তাঁহার মুদিখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি কথা-প্রসঙ্গে নানককে বলিলেন,—"ভগবান আপনাকে অতি মহৎ কার্য্যের ভার দিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন। আপনার নাম 'নানক নিরহঙ্কারী'; আপনি কি ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিবেন, না মুদিখানার কার্য্যে জীবন পাত করিবেন?

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আসিল। তিনি ৩২ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলেন। তাঁহার পত্নী সুলখনা, চারিবৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীচাঁদ, শিশু পুত্র লক্ষ্মীদাস, পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন কেহই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না।

নানকের চরিত্রের একটা আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি ছিল। তিনি সকলকে ছাড়িয়া চলিয়াছেন, কিন্তু সকলে তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না। চাকর বালসিন্ধু (ভাই বালা) তাঁহার সঙ্গী হইলেন। পিতা কালু নানকের গৃহ-ত্যাগের খবর পাইয়া মর্দ্দানা

মিরাজীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। মর্দ্দানা নানককে ধরিতে যাইয়া নিজেই তাঁহার কাছে ধরা দিলেন। নানকের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সংসারত্যাগী হইলেন। মর্দ্দানা সুগায়ক ছিলেন। নানক যে সকল শ্লোক ও স্তোত্র রচনা করিতেন, তিনি রবাব যন্ত্রসহকারে সেইগুলি গান করিতেন।

নানক ফকিরের বেশে দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। কোন্ পথ তিনি অবলম্বন করিবেন, কোন্ ধর্ম্মমত শ্রেয়ঃ, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র—সিংহল, মক্কা, পারস্য, কাবুল প্রভৃতি নানাদেশ ভ্রমণ করেন। এইরূপ কথিত আছে যে, দেশ-ভ্রমণকালে রাস্তায় শিশুদের সহিত দেখা হইলে তিনি তাহাদের সহিত মিশিয়া শিশু হইয়া যাইতেন, তাহাদের খেলাধুলায় যোগদান করিতেন।

বাবা নানক ঈশ্বর-প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া উৎসাহের সহিত সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। বিশ্বময় তিনি ভগবানের আশ্চর্য্য মহিমা দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

এ সময়ে তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া ভগবানের মহিমা বর্ণনা করেন। তিনি গাহিয়াছেন—

গগনময় থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকা-মণ্ডলা জনক মোতি।
ধূম মলয়ানিলো, পবন চবঁরো করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।
ক্যায়সী আরতি হোবে, ভব্‌খণ্ডনা তেরী আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।
সহস তব্ নয়ন, নানা নয়ন হয় তোহেকো,
সহস মুরতি, ননা এক তোহি;
সহস পদ বিমল, ননা এক পদ; গন্ধ বিন
সহস তব গন্ধ যুঁ চলত মোহি।
সবমেঁ জ্যোত জ্যোত হয়্ সোই,
তিস্‌কে চানন সব্ মেঁ চনান হোই;
গুরু-সাথী জ্যোত নিত প্রগট হোই,
জো তিস্ ভাবৈ, সো আরতি হোই।
হরি চরণ কমল-মকরন্দ-লোভিত মনো,
অনুদিনো মোহি আহী পিপাসা;
কৃপা-জল দেও নানক সারঙ্গ্‌কো,
হোরে জাতে তেরে নাম বাসা।

হে ঈশ্বর! গগনরূপ থালে রবি-চন্দ্র, প্রদীপ স্বরূপ হইয়াছে। তারকামণ্ডল মুক্তাস্বরূপ শোভা পাইতেছে। সুগন্ধ মলয়ানিল ধূপস্বরূপ হইয়াছে এবং পবন চামর ব্যজন করিতেছে, বনরাজী উজ্জ্বল পুষ্প প্রদান করিতেছে। হে ভবখণ্ডন, এইরূপে কেমন তোমার অনাহত শব্দ সকল ভেরী বাজাইতেছে। তোমার সহস্র নয়ন, অথচ একটিও নয়ন নাই, সহস্র মূর্ত্তি আছে, অথচ একটিও মূর্ত্তি নাই। সহস্র বিমল পদ, অথচ একটিও পদ নাই, গন্ধ নাই, অথচ সহস্র তোমার গন্ধ. এইরূপ তোমার মনোহর চরিত্র।

তু সুন হরি রস ভিন্নে প্রীতম্ আপনে।
মন তন রবনে ঘড়ী ন বিসরৈ।
কিউ ঘড়ী বিসারী হউ বলহারী
হউ জীবা গুণ গাএ।
না কোঈ মেরা হউ কি সকেরা
হরি বিন রহন ন জাএ।
ওট গহী হরি চরণ নিবাসে
ভও পবিত্র শরীরা।
নানক ত্রিসট দীরঘ সুখ পাবৈ
গুরু সবদী মন ধীরা।

ওগো, হরি! তোমার প্রীতিতে, তোমার প্রেমে আমি সরস হইয়াছি—আমার হৃদয় গলিয়া গিয়াছে—আমার প্রার্থনা শোন।

তোমার সঙ্গে যে আমার মনে ও প্রাণে মাখামাখি—একথাটা কি কখনও ভুলিয়া থাকিতে পারি? আমি কি তোমাকে ক্ষণিকের জন্যও ভুলিতে পারি? কেন পারিব? আমি যে তোমার চরণে আপনাকে ডালি দিয়াছি। তোমার গুণ গাহিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি! আমার যে কেহ নাই—আমি যে কার, তাও ত জানি না! ওহে হরি! আমি যে তোমাকে ছাড়া থাকিতে পারি না। তোমার আশ্রয় পাইয়া, তোমার চরণে স্থান পাইয়া, আমার শরীর ও মন পবিত্র হইয়াছে। নানক বলিতেছেন—যদি তোমার কৃপা দৃষ্টি হয় তাহা হইলেই সুখী হওয়া যায়, গুরুর উপদেশে মন শান্ত হয়।

নানক যখন সন্ন্যাসীর বেশে ধর্ম্মপ্রচারে বাহির হইয়াছিলেন, তখন একদিন বিপাশা নদীর তীরে ক্রোড়ীরা নামক এক ধনিসন্তানের সহিত তাঁহার দেখা হয়। নানকের অলৌকিক ভাবে মুগ্ধ হইয়া ক্রোড়ীরা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। ক্রোড়ীরা বিপাশা তীরে নানককে একটি নগর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। নানকের আদেশ অনুসারে ক্রোড়ীরা

ঐ নগরটির নাম "কর্ত্তারপুর" রাখিয়াছিলেন। ঐ নগরটি শিখদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র হইয়াছে। "সাহাজাদ" অর্থাৎ নানকের বংশ এখনো এখানে বাস করিতেছেন।

নানক নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করিয়া তিনি আবার গৃহী হইলেন।

বাবা নানকের সাধনা ছিল, মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা। তিনি হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। ভগবান এক, মানুষ ভাই ভাই। এই সত্যটি তিনি প্রচার করিতেন।

শেষ জীবনে বাবা নানক সপরিবারে বিপাশা নদীর তীরে কর্ত্তারপুরে বাস করিতেন। তখন নানা স্থান হইতে সর্ব্বশ্রেণীর লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। তাঁহার মধুর বচন, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সরল সৌজন্য সকলকে মোহিত করিত। তিনি হিন্দুকে উপদেশ দিবার সময় হিন্দুশাস্ত্রের উল্লেখ করিতেন, মুসলমানদিগকে উপদেশ দিবার সময় কোরাণ শরীফ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ দিতেন। এইরূপে ভক্তগণের আগমনে নানকের বাসস্থান কর্ত্তারপুর পরমতীর্থ হইয়া উঠিল – দলে দলে লোক আসিয়া তথায় পুণ্য ও শান্তি লাভ করিত।

নানকের সহচর ভক্তদিগের মধ্যে মর্দ্দানা, বালসিন্ধু, তুঙ্গগ্রামের রামদাস নামে এক রাখালও ছিলেন। রামদাস বয়সে প্রাচীন বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'বুড্ডা' বলিয়া ডাকিত। তাঁহার সহচরগণের মধ্যে লহনা ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নানক তাঁহার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধর্ম্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি লহনাকে "গুরু-অঙ্গদ" নাম দিয়া দ্বিতীয় গুরুর পদে বরণ করিয়া গিয়াছিলেন। লহনা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। একবার কোনও পর্ব্ব উপলক্ষে কাঙ্গরায় দেবতা দর্শন করিতে যাইবার সময় পথে বাবা নানকের সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। নানকের সুমধুর ধর্ম্মকথা শুনিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মহাত্মা নানক দীর্ঘকাল ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ৭১ বৎসর বয়সে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের দশমীর দিনে পরলোক গমন করেন।

নানকের বাণী

ভগবান্ এক, মানুষ ভাই ভাই

বেদ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করিয়া সাময়িক আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না।

ভগবান্‌কে লাভ করিলে কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।

আমি কেবলমাত্র পবিত্র ধর্ম্মের কথা জানি, আর কিছু জানি না। একমাত্র ঈশ্বর সত্য, আর সব অস্থায়ী।

* * * *

ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইবার কোন আবশ্যক নাই।

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ভগবান্ মিশিয়া রহিয়াছেন।

* * * *

ঈশ্বরের কাছে গুহাবাসী কঠোর যোগীও যেমন, অট্টালিকাবাসী ধনবান্‌ও তেমন—দুইই তাঁহার চক্ষে সমান।

* * * *

কে, কোন্ জাতি, ভগবান্ কখন তাহার সন্ধান লইবেন না, সংসারে আসিয়া কে কি করিলাম, তাহাই তিনি দেখিবেন।

* * * *

তিনিই প্রকৃত হিন্দু—যিনি ন্যায়নিষ্ঠ, তিনিই প্রকৃত মুসলমান—যিনি পবিত্র।

* * * *

সকলের মধ্যে যে জ্যোতিঃ, তাহা তাঁহারই জ্যোতিঃ। তাঁহার প্রকাশে সকলি প্রকাশিত হয়।

ধাঁধার শ্রেণী-বিভাগ

৮৫৬ পৃষ্ঠার পর

ধাঁধাসকলকে মোটামুটি পাচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) হেঁয়ালী (ইংরাজীতে Riddles ও Conundrums)।

(২) শব্দের মারপ্যাচ ও শব্দ সাজান।

(৩) সমস্যা (ইংরাজীতে Problems)।

(৪) হিসাব বা অঙ্ক ও রাশির ধাঁধা।

(৫) চোখের ধাঁধা (ইংরাজীতে Optical Illusions)।

১। হেঁয়ালী—

যত প্রাচীন ধাঁধার কথা জানা গিয়াছে তাহার অধিকাংশই হেঁয়ালি। চলিত কথায় আমরা হেঁয়ালিকে "ঠকানে প্রশ্ন"ও বলিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও (শিশু-ভারতী···৭···সংখ্যা, ৫৫৮।৫৫৯ পৃষ্ঠা) কিছু বলা হইয়াছে ; হেঁয়ালির কয়েকটি নমুনাও দেওয়া হইয়াছে। আধুনিক বাংলা ধাঁধার মধ্যে হেঁয়ালির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।

দু' একটি নমুনা দিলেই বুঝা যাইবে, হেঁয়ালি কিরূপ হয় :—

(ক) হেঁয়ালি :—

গলায় দড়ি গোল গা,
পেটের ভিতর হাত পা,
সেটি কে তা বল না ?
উত্তর—ট্যাঁক ঘড়ি

(খ) হেঁয়ালি :—

"জানালা দিয়ে ঘর পালা'ল
গৃহস্থ রইল বন্ধ"। উত্তর—
"জালে মাছ ধরা পড়িল ;
জালের জানালা অর্থাৎ ছিদ্র দিয়া মাছের 'ঘর' অর্থাৎ জল বাহির হইয়া গেল।

২। শব্দের মারপ্যাচ ও শব্দ সাজান—

বহু প্রকারের ধাঁধা এই শ্রেণীতে ভুক্ত করা যাইতে পারে। যথা :—শব্দের বিভিন্ন অর্থ লইয়া ধাঁধা, শব্দের বিভিন্ন অক্ষর লইয়া ধাঁধা, শব্দ উল্টাপাল্টা করিয়া তাহার ধাঁধা, কয়েকটি শব্দ সাজাইয়া তাহা হইতে (প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট) অর্থ বাহির করা লইয়া ধাঁধা (যেমন—শব্দচৌকি, শব্দছক প্রভৃতি), লুকানো শব্দ বাহির করা, শব্দের অক্ষরের পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য শব্দ প্রস্তুত করা, প্রভৃতি। সামান্য কয়েকটির নাম দিলাম। শব্দ লইয়া বহু প্রকারের ধাঁধা হইতে পারে। এই সকল ধাঁধা লেখায় হয়, ছবিতেও হইতে পারে। একই ধাঁধা রূপান্তর করিয়া দুই বা ততোধিক ভাবেও দেওয়া চলে।

এবার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক :—

(ক) শব্দের বিভিন্ন অর্থ লইয়া ধাঁধা—

(১) ধাঁধা :—"কোন্ জন্তু দুই হাত ?
উত্তর :—"গজ" (অর্থাৎ দুই হাত।)

২) ধাঁধা "কোন্ সহর বাড়িয়া যাইতেছে ?"
উত্তর :—"বর্দ্ধমান"।

(৩) ধাঁধা : কোন্ পাখী ওড়ে না বা চলে না ?
উত্তর :—"জানালার পাখী" (খড়খড়ি)।

(৪) ধাঁধা : "কোন্ মাসে দাড়ি গজায় ?"
উত্তর :—"গালে যে মাস (মাংস) থাকে"।

(৫) ধাঁধা : "কোন্ জায়গা জন্তুর জায়গা ?"
উত্তর : —"শিয়ালকোট"।

(৬) ধাঁধা : "ছোট জন্তু কেন বাচ্চা নয় ?"
উত্তর : —"কারণ ছোট জন্তু ছানা।"।

(৭) ধাঁধা : "নীচের লাইনের—চিহ্নিত অংশগুলি একই শব্দে (বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত) দিয়া পূর্ণ কর :—"সাঙ্গ হ'লো—,—এবার বাড়ী পানে।"
উত্তর : - "সাঙ্গ হ'লো পালা, পালা এবার বাড়ীপানে"।

দ্বিতীয় ত্যজিলে হয় কোন এক জাতি।
জোগায় প্রত্যহ খাদ্য, উপকারী অতি।

উত্তর :—গোলাপ (গোলা, গোপ)

(গ) উল্টা-পাল্টা শব্দ :—

ধাঁধা :—নীচের পদটির চিহ্নিত স্থান দুটি একই শব্দের কথাগুলি সোজাভাবে ও উল্টাইয়া বসাইয়া পূরণ করিতে হইবে।—,—রাতি বড় লোক হয়ে গেল।'
উত্তর :—"তারা রাতারাতি বড় লোক হয়ে গেল।"
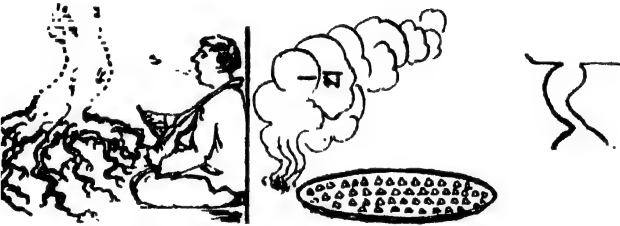
এই ধাঁধাগুলির উত্তর আগামী সংখ্যায় বাহির হইবে

এইরূপ আরও ছয়টি ধাঁধা উপরের ছবিতে দেওয়া হইল। ছয়টি ছবিতে ভারতবর্ষের ছয়টি স্থানের নাম লুকায়িত আছে। ছবির অর্থ বাহির করিয়া স্থানগুলির নাম বাহির করিতে হইবে।

(খ) শব্দের বিভিন্ন অক্ষর লইয়া ধাঁধা :-

ধাঁধা : তিনটি অক্ষর নামে, দেখিতে সুন্দর,
তৃতীয় ত্যজিলে সেটি কাটে ভয়ঙ্কর।

(ঘ) শব্দ সাজাইয়া তাহা হইতে অর্থ বাহির করা অথবা অর্থ শুনিয়া শব্দ বাহির করিয়া সাজান :—

শব্দ-ছক (Cross Words) এই শ্রেণীর মধ্যে। ইহার উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

শব্দ-চৌকিও (Word squares) এই শ্রেণীর মধ্যে। উদাহরণ :—"প্রথমটি বহু উচ্চে থাকে ; দ্বিতীয়টির

জন্ম পৃথিবীর লোক লালায়িত, মানুষ তৃতীয়টি হয় অসুখ-বিসুখ হ'লেই। চৌকিটি ৩ অক্ষরের।"

উত্তর :—তা র কা

উত্তর :—র জ ত

উত্তর :—কা ত র

(ঙ) লুকানো শব্দ বাহির কর :—

উদাহরণঃ—নীচের লাইনে কয়েকটি পশু-পাখীর নাম লুকানো আছে। বাহির কর :—'কাকা কত বার পাঁচিল টপ্‌কিয়েছেন, বাইরে বা ঘরে কেউ টের পায় নি।'

উত্তর :—'কাক, চিল, বাঘ, কেউটে।'

(চ) শব্দের অক্ষরের পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য শব্দ প্রস্তুত করা :—

উদাহরণঃ—'কালো'কে 'সাদা' কর। এক বারে একটি অক্ষর পরিবর্ত্তন করা চলে এবং প্রত্যেকটি পরিবর্ত্তিত কথার অর্থ থাকা চাই।

উত্তরঃ—'কালো—কালা—কাদা—সাদা।

৩। সমস্যা—

এই শ্রেণীরও বহু প্রকারের ধাঁধা হয়। মাপ-জোক, ভাগা-ভাগি, চলা-ফেরা, সাজান প্রভৃতির ব্যাপার লইয়া নানা প্রকারের সমস্যার ধাঁধা হইতে পারে। ছবির মধ্যে লুকানো জিনিষ খুঁজিয়া বাহির করা লইয়াও বহু সমস্যার ধাঁধা হয়।

শিশু-ভারতীর ১১শ সংখ্যার ৮৬৫ পৃষ্ঠার ছবিতে সমস্যার ধাঁধা প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪। হিসাব বা অঙ্ক ও রাশির ধাঁধা—

অনেক ধাঁধাতে অঙ্ক বা হিসাব থাকে। যেমন, বয়সের হিসাব, দূরত্বের হিসাব, ওজনের হিসাব, মাহিনার হিসাব, লাভ-লোকসানের হিসাব প্রভৃতি। ইহার অধিকাংশেরই উত্তর অঙ্ক কষার নিয়ম অনুসারে বাহির করা যায়। অনেক সময় ধাঁধাটি বলিবার বা লিখিবার সময় একটু হেঁয়ালীর ভাবে লেখা হওয়ায় উত্তর বাহির করিতে মুস্কিল হয়। অনেক ধাঁধা শুধু অঙ্ক বা রাশি সাজান লইয়াই হয়। (যেমন Magic suqares)।

৫। চোখের ধাঁধা—

আমাদের চোখ অনেক সময় ভুল দেখে—অর্থাৎ বাস্তবিক যাহা, চোখে তার বিপরীত মনে হয়। কোন কোন অবস্থায় সোজা জিনিষ বাঁকা দেখায়, গোল জিনিষ বাদামী দেখায়, দুটি একই আকারের জিনিষ বিভিন্ন দেখায়, সমদূর (Parallel) রেখা (Lines) যেন মিশিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। এরূপ আরো নানা প্রকারের চোখের ধাঁধা হইতে পারে।
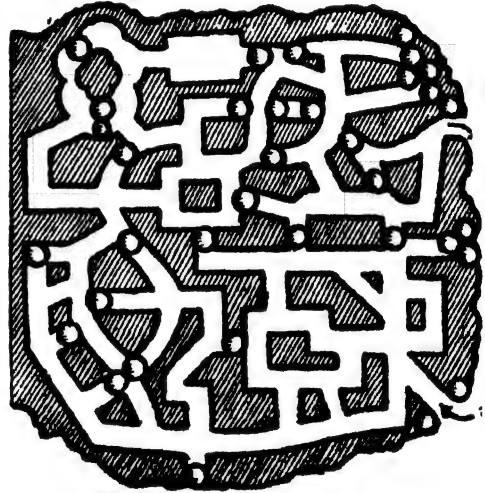
এবার ধাঁধা সম্বন্ধে মোটামুটি কথাগুলি বলিলাম। পরে বিস্তৃতভাবে উদাহরণ দিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর ধাঁধা দেওয়া হইবে।

আমরা কি ইচ্ছা করিলেই লম্বা হইতে পারি?

১২২৪ পৃষ্ঠার পর

পথে চলিতে গেলে দেখা যায়, যে সব লোক পথ দিয়া যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে কেহ লম্বা এবং কেহ বেঁটে। এরূপ কেন হয়? তুমি কি ইচ্ছা করিলেই লম্বা হইতে পার? মানুষের বাড়িবার একটা বয়স আছে। সে বয়সে না বাড়িলে মানুষের আর লম্বা হইবার সম্ভাবনা থাকে না। গাছ এবং অন্যান্য উদ্ভিদের পক্ষে এ যুক্তি খাটে না। তাহারা বরাবরই বাড়িতে থাকে। কিন্তু মানুষের বাড়ন্ত বয়স চলিয়া গেলে আর সে দীর্ঘ বা লম্বা হইতে পারে না।

লম্বা হওয়ার সঙ্গে পায়ের দীর্ঘতার হইতেছে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রত্যেক মানুষেরই,—কি ঢেঙ্গা, কি বেঁটে কাহারও মেরুদণ্ডের দৈর্ঘ্যের বড় বেশী তফাৎ থাকে না। কিন্তু পায়ের তফাৎ থাকে অনেক বেশী। মানুষের বাড়িবার বয়সের সময় পায়ের হাড়ের নীচের দিকে যে কোষ আছে, তাহার বৃদ্ধির সঙ্গে দীর্ঘ হইবার সম্বন্ধ খুব বেশী। আমরা যখন আমাদের বাড়িবার বয়সের শেষ সীমায় আসিয়া পড়ি, তখন পায়ের হাড়ের নীচের দিকের এই কোষের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। এই কোষগুলির বিস্তারের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ হইবার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর।

আমরা আমাদের মাতাপিতার নিকট হইতেও উত্তরাধিকার-সূত্রে লম্বা বা বেঁটে হইয়া থাকি। যাহাদের পিতামাতা দীর্ঘকার, তাহারা প্রায়ই খর্ব্বাকার হয় না। যাহারা বেঁটে, তাহারা কিরূপে দীর্ঘকার হইতে পারে? ইহার প্রধান লক্ষ্য হইবে, স্বাস্থ্যবান হওয়া। মানুষ ১২ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। এই সময়ে যাহারা পায়ের ব্যায়াম স্বরূপ বেশী রকমের হাঁটাহাঁটি করিবে, তাহাদের শরীরই দীর্ঘ হইবে। কেননা, পায়ের ব্যবহার বেশী করিলে হাড়ের নীচের সেই কোষগুলিও তাহাদের খাদ্যস্বরূপ রক্ত-কণিকা বেশী পাইবে এবং পায়ের হাড়ের দৈর্ঘ্য বিস্তারের সহায়ক হইবে। যাহারা পায়ের ব্যবহার বেশী হয় এইরূপ খেলা করে,—যেমন দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, স্কিপিং (Skipping) ইত্যাদি, তাহারাই সাধারণতঃ লম্বা হয়। কেননা এইরূপ ব্যায়াম দ্বারা পায়ের দিকে রক্ত সঞ্চালন অধিক হয়।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে—লম্বা লোকেরাই যে বুদ্ধিমান, চতুর, উৎসাহী এবং কর্ম্মঠ হয়, তাহা কিন্তু একেবারেই সত্য নহে। শরীরের দৈর্ঘ্যের সহিত া, বুদ্ধি ও জ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নাই।

আফ্রিকা

হিব্রুজাতি ও ওল্ড টেষ্টামেণ্ট

১২৯১ পৃষ্ঠার পর

ইফ্রেম্ পর্ব্বতে মিকা (Micah) নামে এক ব্যক্তি ছিল। তাহার মা একটি রৌপ্য দেবমূর্ত্তি ও একটি খোদাই-করা দেবতার রৌপ্য প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়াছিলেন। মিকা ঐ মূর্ত্তি দুইটি তাঁহার নিজের দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার একপুত্রকে দেবপূজার জন্য পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিল। একদিন বেথলেম-জুদা হইতে লেভিবংশীয় একজন লোক সেখানে আশ্রয় খুঁজিতে আসে। মিকা তাহাকে সাদরে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়া তাহাকে দেবপূজার পুরোহিত নিযুক্ত করে ও বৎসরে দশ সেকেল (Shekel) বা রৌপ্য মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হয়।

এই সময়ে ড্যানের বংশধরেরা তাহাদের বাসের জন্য জায়গা খুঁজিতে ছিল। তাহারা পাঁচজন গুপ্তচরকে উপযুক্ত দেশের সন্ধান করিতে পাঠাইল। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ইফ্রেম্ পর্ব্বতে মিকার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে তাহারা লেভির সন্তানদের কাছে সমুদয় বৃত্তান্ত জানিয়া তাহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পুনরায় রওনা হইল। এবার তাহারা লায়াসে (Laish) উপস্থিত হইল। এখানকার লোকেরা খুব শান্তিপ্রিয় ও অসতর্ক ছিল। গুপ্তচরেরা দেশে আসিয়া এই সংবাদ দিলে ৬০০ লোক এই দেশ অধিকার করিতে রওনা হইল। পথে তাহারা ইফ্রেম্ পর্ব্বতে মিকার বাটী হইতে মূর্ত্তি দুইটি ও পুরোহিতকে লইয়া ঐ লায়াসের দিকে অগ্রসর হইল। তখন মিকার লোকজন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইল। তখন ড্যানের সন্তানেরা মিকাকে বলিল, "যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, তবে ভালোয় ভালোয় চলিয়া যাও।" মিকা দেখিল যে, তাহারা সংখ্যায় অনেক বেশী ; কাজেই বিনা বাক্যব্যয়ে সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এদিকে ড্যানের সন্তানেরা লায়াসে উপস্থিত হইয়া সেখানকার লোকদের হত্যা করিয়া সহরটিকে পোড়াইয়া ফেলিল। এইখানে তাহারা একটি নূতন সহরের পত্তন করিল। ইহার নাম রাখা হইল ড্যান।

একবার বিচারকদের শাসনকালে দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখন এলিমেলেক্ (Elimelech) নামে বেথ্লেম্-জুদার একজন অধিবাসী তাহার স্ত্রী নাওমিকে (Naomi) ও মালোম্ ও চিলোন্ নামে দুই পুত্রকে লইয়া মোয়াব রাজ্যে (Moab) গমন করে। কিছুদিন পরে এলিমেলেকের মৃত্যু হয়। তাহার পুত্রেরা এখানে মোয়াব-রমণী বিবাহ করে। এক-জনের স্ত্রীর নাম ওর্ফা (Orpha), অন্য জনের স্ত্রীর নাম রুথ (Ruth)। দশ বৎসর পরে মালোম্ ও চিলোনের মৃত্যু হয়। তখন নাওমি দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিছু দূর যাইবার পরে নাওমি তাঁহার পুত্রবধূদের আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাছা, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও। আমি তোমাদের ব্যবহারে খুবই প্রীত হইয়াছি। ভগবান্ যেন তোমাদের উপ-যুক্ত স্বামী জুটাইয়া দেন।" তিনি তাহা-দিগকে চুম্বন করিয়া বিদায় দিতে চাহিলে তাহারা কাঁদিয়া বলিল, "মাগো, আমরা তোমার সঙ্গেই যাইব।" নাওমি তাহাদিগকে নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। "আমি ত বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার ত আর পুত্র নাই যে, তোমাদের সঙ্গে বিবাহ দিব। তবে কি আশায় তোমরা আমার সঙ্গে যাইতে চাহিতেছ?" তখন ওর্ফা তাহার শ্বশ্রূকে চুম্বন করিয়া ফিরিয়া গেল। রুথ্ কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অস্বীকার করিল। নাওমি কত বুঝাইলেন, সে কিন্তু কিছুতেই টলিল না। কাকুতি মিনতি করিয়া সে বলিল, "মা, আমায় ফিরিয়া যাইতে বলিও না। তুমি যেখানে যাইবে আমিও সেইখানেই যাইব। তোমার গৃহই আমার গৃহ হইবে। তোমার আত্মীয়েরাও আমার আত্মীয়। তোমার ভগবান্ও আমার ভগবান্। তুমি যেখানে মরিব, আমিও সেইখানেই মরিব; মৃত্যু ছাড়া কেহই আমাকে তোমার কাছ-ছাড়া করিতে পারিবে না।

রুথ্ ও নাওমি

তখন নাওমি রুথ্কে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা বেথ্-লেমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেথ্লেম্বাসীরা নাওমিকে দেখিয়া বলিল, "কে— নাওমি নাকি? নাওমি বলিলেন, "আমাকে আর নাওমি (সুখী) বলিয়া ডাকিও না। এখন হইতে আমাকে মারা (Mara) 'দুঃখী' বলিও। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ আমাকে অশেষ দুঃখ দিয়াছেন।"

নাওমির বোয়াজ (Boaz) নামে একজন ধনী জ্ঞাতি ছিল। শ্বশ্রূর অনুমতি লইয়া

রুথ্ ঘটনাচক্রে তাহার মাঠে শস্যকণা কুড়াইতে গেল। বোয়াজ মাঠে আসিয়া নাওমিকে দেখিয়া ভৃত্যদের জিজ্ঞাসা করিল, "এই মেয়েটি কে?" ভৃত্যদের সর্দ্দার বলিল, "নাওমির সঙ্গে যে মোয়াব্ কন্যা আসিয়াছে এ সেই।" মেয়েটি আমাদের অনুমতি লইয়া শস্যকণা কুড়াইতেছে।"

তখন বোয়াজ রুথ্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ বৎস, তুমি আমার মাঠেই রোজ আসিও; অন্য কোথাও যাইও না। আমার ভৃত্যদের আদেশ দিয়াছি, কেহ যেন তোমার সহিত অন্যায় ব্যবহার না করে।"

তখন রুথ্ তাহার পদতলে পড়িয়া বলিল, "আমি বিদেশী—তবু আপনি আমার প্রতি এত সদয় হইলেন কেন?"

বোয়াজ বলিল, "তুমি তোমার শ্বশ্রূমাতার জন্য যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছে, তাহা আমি সব শুনিয়াছি। ভগবান্ তোমার ত্যাগের পুরস্কার নিশ্চয়ই দিবেন।"

তখন রুথ্ বলিল, "প্রভো, আপনি মহান্। আপনার অনুগ্রহ যেন আমি সব সময়ে পাই।"

রুথ্

বোয়াজ ভৃত্যদের বলিলেন—তোমরা রুথ্‌কে শস্য সংগ্রহ করিতে দিও

বোয়াজ বলিল, "আহারের সময় তুমি এখানে আসিয়া আহার করিও।" তাহার কথামত রুথ্ সেইখানে আহার করিল। তারপর আবার যখন সে শস্য সংগ্রহ করিতে উদ্যত হইল, তখন বোয়াজ ভৃত্যদের বলিল, "দেখ, উহাকে শস্যের আঁটি হইতেও শস্য সংগ্রহ করিতে দিও। তোমরা কেহ উহাকে কিছু বলিও না।" তা ছাড়া ও যাহাতে প্রয়োজন মত শস্য পায়, সেইজন্য তোমরা

ইচ্ছা করিয়া মাঠে কিছু শস্যকণা ফেলিয়া রাখিবে।”

রুথ্ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শস্যকণা সংগ্রহ করিল। তারপর সহরে ফিরিয়া শ্বশ্রূকে তাহা দিল। নাওমি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাহার মাঠে আজ তুমি উঞ্ছবৃত্তি করিয়াছ?” রুথ্ বলিল, “বোয়াজের।” নাওমি তখন বোয়াজকে তাহার সহৃদয়তার জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া রুথ্‌কে বলিলেন, “লোকটি আমাদের নিকট-আত্মীয়।”

ইহার পর প্রত্যহ রুথ্ বোয়াজের দাসীদের সঙ্গে তাহার মাঠেই শস্য সংগ্রহ করিতে লাগিল।

একদিন নাওমি রুথ্‌কে বলিলেন, “বৎসে, আমার খুবই ইচ্ছা, তুমি আবার সংসারী হও। দেখ, বোয়াজ আমাদের জ্ঞাতি। আজ সে ঢেঁকি-ঘরে শস্য বাছাই করিবে। স্নান ও প্রসাধন করিয়া তুমি সেখানে যাও। কিন্তু তাহার আহারের আগে তাহার কাছে দেখা দিও না। সে শয়ন করিলে তুমি তাহার পদসেবা করিবে। তখন সে তোমাকে তোমার কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিবে।” রুথ্ ইহাতে স্বীকৃত হইল।

আহারের পর বোয়াজ শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে রুথ্ তাহার পদসেবা করিতে লাগিল। বোয়াজের ঘুম ভাঙ্গিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, “কে তুমি?” উত্তর হইল, “আমি আপনার দাসী রুথ্। আপনি আমার নিকট-আত্মীয়। বোয়াজ বলিল, “ভগবান্ তোমার ভাল করুন। তুমি এখন যাহা করিলে, এত ভাল কাজ আর কখনও কর নাই। ভয় নাই, তুমি সাধু, আমি তোমার ব্যবস্থা করিব। আমি অবশ্য তোমার নিকট-আত্মীয় কিন্তু আমা অপেক্ষা তোমার আর একজন নিকট-আত্মীয় আছে। আজ অপেক্ষা কর। কাল সকালে তাহাকে তাহার আত্মীয়ের কাজ (অর্থাৎ রুথ্‌কে বিবাহ করা) করিতে বলা হইবে। সে যদি স্বীকৃত হয় ত ভালই। নতুবা আমিই-তোমাকে গ্রহণ করিব।” পরদিন অতি প্রত্যূষে কোন লোকজন জাগিবার পূর্ব্বে বোয়াজ রুথের সঙ্গে কিছু বার্লি দিয়া নাওমির কাছে পাঠাইল। নাওমি সব শুনিয়া বলিলেন, “দেখ আজই বোয়াজ এই ব্যাপারের চূড়ান্ত করিবে।”

এদিকে বোয়াজ সহরের দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিল। রুথের নিকট-আত্মীয় আসিলে দশজন বৃদ্ধকে সাক্ষী রাখিয়া বলিল, ‘নাওমি আমাদের জ্ঞাতি-ভ্রাতা এলিমেকের একখণ্ড জমি বিক্রয় করিবে, তুমি তাহা ক্রয় করিবে কি? তুমি না নিলে আমিই লইব।” সেই ব্যক্তি জমি ক্রয় করিতে রাজী হইলে, বোয়াজ বলিল, “জমির সঙ্গে কিন্তু রুথকেও গ্রহণ করিতে হইবে।” ইহাতে সেই ব্যক্তি রাজী না হইয়া তাহার অধিকার বোয়াজকে ছাড়িয়া দিল।

তখন বোয়াজ বলিল, “তোমরা সবাই সাক্ষী রহিলে, আমি আজ এলিমেকের জমি ক্রয় করিলাম ও তাহার বিধবা পুত্রবধূকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলাম।” সবাই সাক্ষী হইল ও বোয়াজ ও রুথকে আশীর্ব্বাদ করিল।

বোয়াজ রুথ্‌কে বিবাহ করিল। কিছুদিন পরে তাহাদের একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। প্রতিবেশীরা নাওমিকে আনন্দ জানাইতে আসিয়া বলিল, “ভগবান্ তোমাকে একটি বংশধর দিয়াছেন। ইহার নাম রাখা হউক ওবেদ (Obed)। নাওমি শিশুকে বুকে তুলিয়া লইলেন ও তাহার ধাত্রী হইলেন। এই ওবেদরই কালে জেস্ (Jesse) নামে একটি পুত্র জন্মে। তাহারই পুত্র রাজা ডেভিড্।

ইফ্রেম পর্ব্বতের রামা (Ramah) সহরে এলকানা (Elkanah) নামে এক ব্যক্তি

বাস করিত। তাহার পেনিনা ও হানা (Hannah) নামে দুই স্ত্রী ছিল। পেনিনার সন্তান ছিল—কিন্তু হানা ছিল নিঃসন্তানা। প্রত্যেক বৎসর এলকানা শিলোতে ভগবানের পূজা দিতে যাইত। পূজা সমাপনান্তে সে স্ত্রী-পুত্রদের লইয়া ভোজ খাইত। কিন্তু ভোজের সমস্ত আনন্দ হানার পক্ষে বিষময় হইয়া উঠিত, কারণ তাহার সপত্নী নিঃসন্তান বলিয়া তাহাকে নানারূপ বিদ্রূপ করিত। তাহার স্বামী তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত কিন্তু কোন প্রবোধ সে মানিত না। একদিন ভোজ-সভায় অপমানিত হইয়া হানা ভগবানের বস্ত্রাবাসে গেল। সেখানে সে ভগবানের নামে শপথ করিল যে, যদি তাহার একটি পুত্র জন্মে, তবে তাহাকে সে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করিবে। সেখানে পুরোহিত এলি (Eli) ছিলেন। তিনি সব শুনিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, ভগবান্ তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

রামায় প্রত্যাবর্ত্তনের পরে হানার একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। সে তাহার নাম রাখিল স্যামুয়েল (Samuel)। ছেলেটি যখন তিনচার বৎসরের হইল, তখন হানা তাহাকে লইয়া শিলোর মন্দিরে এলির কাছে গিয়া বলিল, "এই নিন্ আমার পুত্রকে—ইহাকে আমি ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছি।" কাজেই, স্যামুয়েল এলির কাছেই থাকিয়া গেল এবং মন্দিরের কাজকর্ম্ম করিত।

একদিন রাত্রে ভগবানের আর্কের পাশে স্যামুয়েল ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ ভগবান্ ডাকিলেন, "স্যামুয়েল।" সে তৎক্ষণাৎ এলির নিকট গিয়া বলিল, "এই যে আমি আসিয়াছি—আমাকে কেন ডাকিয়াছেন ?" এলি বলিলেন, "যাও ঘুমাও গিয়া। আমি ত তোমাকে ডাকি নাই।" বার বার তিনবার স্যামুয়েল ডাক শুনিয়া এলির নিকটে আসিল। তখন বৃদ্ধ পুরোহিত বুঝিতে পারিলেন যে, এ আর কেহ নয়, স্বয়ং ভগবানের কাজ। তখন তিনি বালককে শিখাইয়া দিলেন যে, এবার আবার যখন ডাক শুনিবে তখন সে যেন বলে, "প্রভো, আদেশ করুন, আপনার ভৃত্য প্রস্তুত।" বালক আবার আর্কের পাশে গিয়া শুইল—

বালক স্যামুয়েল

এবার কিন্তু সে জাগিয়া রহিল। ভগবান্ তাহার সম্মুখে আসিয়া ডাকিলেন, "স্যামুয়েল, স্যামুয়েল।" তখন বালক এলির শিক্ষা-মত বলিল, "প্রভো, আদেশ করুন, ভৃত্য প্রস্তুত।" ভগবান্ বলিলেন, "শোন, আমি ইস্রেলে এমন কাজ করিব যে, সকলে চমৎকৃত হইবে। এলির পুত্রেরা পাপী এবং এলি তাহাদিগকে শোধ্‌রাইতে চেষ্টা

করে না। আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিব।”

পরদিন সকালে এলি সামুয়েলের নিকট রাত্রির ঘটনা জানিতে আসিলে সে আদ্যোপান্ত সব সব বলিল। তাহা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, “ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এখন থেকে সবাই জানিল যে, স্যামুয়েল একজন ভবিষৎ-বক্তা (Prophet)।”

কিছুদিন পরে ফিলিষ্টিয়দের সঙ্গে যুদ্ধে ইস্রেল সন্তানেরা পরাজিত হইলে নেতারা ঠিক করিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবানের আর্ক আনিয়া যুদ্ধ করিবে। কাজেই শিলো হইতে আর্ক আনা হইল। সঙ্গে আসিল এলির পুত্রদ্বয়—হফ্‌নি ও ফিনিয়াস্। এবার হিব্রুদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? আর্ক আসিয়াছে এবং তাহাদের জয় নিশ্চিত। সোরেকে যুদ্ধ হইল। কিন্তু এবারও হিব্রুরা ভয়ানক ভাবে পরাজিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে ত্রিশ সহস্র হিব্রুবীর প্রাণ হারাইল। এলির পুত্রেরাও হত হইল। ফিলিষ্টিয়রা তাহাদের সঙ্গে ভগবানের আর্ক লইয়া গেল। শিলোতে এই খবর যখন পৌঁছিল, তখন বৃদ্ধ এলি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। চল্লিশ বৎসর কাল তিনি ইস্রেলের বিচারক ছিলেন।

এদিকে ফিলিষ্টিয়রা ত আর্ককে অ্যাস্‌ডড্ (Ashdod) সহরে লইয়া গেল এবং ড্যাগনদেবের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিল। পরদিন সকালে তাহারা দেখে যে, ড্যাগনদেবের মূর্ত্তি আর্কের সম্মুখে পড়িয়া আছে। তাহাকে আবার সোজা করিয়া বসান হইল। কিন্তু পরদিন একি ব্যাপার! ড্যাগনের হাত ও মাথা কাটা। তাঁহাদের অনেকে হঠাৎ অসুখ হইয়া মারা যাইতে আরম্ভ করিল। তখন আর্ককে স্থানান্তরিত করা হইবে, ঠিক হইল। কিন্তু যেখানে পাঠান যায়, সেখানেই হুলুস্থুল ব্যাপার ঘটে। অবশেষে ঠিক হইল যে, ইহা হিব্রুদের কাছে ফেরত পাঠান হইবে। তখন একটি নূতন গরুর গাড়ীতে অনেক ধনরত্ন সঙ্গে করিয়া আর্ককে ইস্রেলের দিকে পাঠান হইল। পাঁচজন ফিলিষ্টিয় সর্দ্দার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বেথ্ সেমেসের সীমা (Beth-Shemsh) পর্য্যন্ত গেল।

এই সময়ে বেথ্‌সেমেসের লোকেরা মাঠে শস্য কাটিতেছিল। দূর হইতে আর্ককে আসিতে দেখিয়া তাহারা আনন্দধ্বনি করিতে করিতে সেই দিকে দৌড়াইয়া গেল। লেভির সন্তানেরা আর্ককে তুলিয়া লইল এবং গরুর গাড়ীর গরু দুইটিকে মারিয়া ভগবানের কাছে উৎসর্গ করিল। কিন্তু তাহাদের অনাচারের জন্য ভগবান্ অনেক লোকের প্রাণনাশ করিলেন। তখন ভয় পাইয়া হিব্রুরা আর্ককে জঙ্গলে পাঠাইয়া দিল। আর্কটি বিশ বৎসরকাল সেই খানেই রহিল

এদিকে যিহোবা তাহাদের পরিত্যাগ করাতে ইস্রেল সন্তানদের মনে বিশেষ দুঃখ হইল। তখন স্যামুয়েল বলিলেন, ‘সত্য সত্যই যদি তোমরা যিহোবাকে চাও, তবে অন্য দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেল—শুধু তাঁহারই শরণাপন্ন হও।” তারপর মিজ্‌পেতে (Mizpeh) স্যামুয়েল হিব্রুদের সবাইকে আসিতে বলিলেন। সেখানে সবাই উপবাস করিয়া তাহাদের অপরাধ স্বীকার করিল।

এদিকে ফিলিষ্টিয়রা মিজ্‌পেতে হিব্রুদের আক্রমণ করিল। কিন্তু স্যামুয়েল যিহোবার আরাধনা করিলে ভগবান্ বজ্রধ্বনি করিয়া উত্তর দিলেন। ইহা শুনিয়া ফিলিষ্টিয়রা রণে ভঙ্গ দিল; আর হিব্রু-যোদ্ধারা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে বধ করিল।

এই ভাবে ইস্রেলের পরিত্রাণ হয়। যত দিন স্যামুয়েল বাঁচিয়া ছিলেন, ফিলিষ্টিয়রা বড় সুবিধা করিতে পারে নাই।

১৮—মাইকেল এঞ্জেলো।

স্যামুয়েল যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ইস্রেলের বিচারক ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে তিনি তাঁহার পুত্রদেরও বিচারক-পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাহারা ছিল বিশেষ লোভী; কাজেই ঘুষ খাইয়া অন্যায় বিচার করিত। একদিন গ্রাম-বৃদ্ধেরা সমবেত হইয়া রামাতে স্যামুয়েলের নিকট আসিয়া বলিলেন, "আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; আপনার পুত্রেরা আপনার আদর্শ অনুসরণ করিয়া সৎপথে চলিতেছে না। কাজেই, অন্যান্য জাতিদের মত আমাদেরও একজন রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া দিন্।" স্যামুয়েল অসন্তুষ্ট হইয়া রাজার অত্যাচারের কথা তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। ইহাতেও তাঁহারা না দমিয়া রাজা নির্ব্বাচনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন স্যামুয়েল ভগবানের উপদেশ লইয়া তাঁহার নির্দ্দেশ-মত রাজা নির্ব্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সে সময়ে বেঞ্জামিনে কিস নামে একজন লোক ছিলেন। তাঁহার পুত্র সলের (Soul) মত বলিষ্ঠ ও সুপুরুষ কেহ ছিল না। একদিন কিসের গাধা হারাইয়া যায়। সে তাহার পুত্রকে গাধা খুঁজিতে পাঠায়। সল্ গাধার খোঁজ করিতে করিতে জুফ্ দেশে (Land of Zuph) উপস্থিত হইল। তখন তাহার ভৃত্য বলিল, "চলুন, এখানে একজন ভগবৎজ্ঞানিত সাধু বাস করেন, তাঁহার কাছে যাই। তিনি আমাদের পথ বলিয়া দিবেন।" তখন তাহারা স্যামুয়েলের উদ্দেশ্যে রওনা হইল। নগরে পৌঁছিবামাত্রই তাহাদের সঙ্গে স্যামুয়েলের দেখা হইল। সলের উপর স্যামুয়েলের দৃষ্টি পতিত হইলে ভগবান্ বলিলেন, "দেখ এই সেই লোক, ইহার বিষয়ে কাল তোমাকে বলিয়াছিলাম। এই আমার সন্তানদের উপর রাজত্ব করিবে।" সল্ অগ্রসর হইয়া স্যামুয়েলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় বলিতে পারেন কি ভবিষ্যদ্বক্তা মহাপুরুষ কোথায় বাস করেন? স্যামুয়েল বলিলেন, "আমিই সেই। তোমাদের গাধা পাওয়া গিয়াছে। আর শোন বৎস! তুমি ইস্রেলের অধীশ্বর।" সল্ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কি বলিতেছেন আপনি। ক্ষুদ্র বেঞ্জামিন গোষ্ঠির আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি। আপনি আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছেন।" তখন স্যামুয়েল তাহার সন্দেহ নিবারণের জন্য নানারূপ আশ্চর্য্য প্রমাণ দিলেন। ইহার পর তিনি মিজ্‌পেতে সমস্ত ইস্রেল-সন্তানকে আহ্বান করিয়া এক সভা করেন। সেখানে ভাগ্য-পরীক্ষার খেলার দ্বারা তিনি সল্‌কে রাজা নির্ব্বাচিত করেন। সমবেত জনতা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মহারাজের জয় হউক।" তারপর সল্ গিবিয়াতে (Gibeah) নিজের গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একদল লোকও চলিল।

এই সময়ে আমোনীয়েরা জ্যাবেস্ আক্রমণ করিল। সল্ লোকজন লইয়া গিয়া তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিলেন ও গিলিয়াদ্ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। গিল্‌গল্ সহরে পুনরায় সল্‌কে রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সল্ রাজা হইয়া ইস্রেলের শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া আপনার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পুত্র জোনাথান্‌ও অনেকবার ফিলিষ্টিয় সৈন্য-দিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সল্, মোয়াব্, আমন, এডম্, জোবা প্রভৃতি দেশের শত্রুদের ও আমালেকদেরও পরাজিত করেন। এই সব যুদ্ধের ফলে ইস্রেল নিরাপদ হইল।

একদিন স্যামুয়েল আসিয়া সল্‌কে বলিলেন, "ভগবানের আদেশ শোন। আমালেকরা হিব্রুদের উপর আবার অনেক অত্যাচার করিয়াছে, তাহার

প্রতিশোধ লইতে হইবে। যাও, তুমি তাহাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কর। একজন লোক অথবা একটি জন্তুও যেন রেহাই না পায়।”

তখন ইস্রেলের লোকজন একত্র করিয়া সল্ হাভিলা হইতে মিশরের সীমান্ত পর্য্যন্ত আমালেকদের রাজ্য ছারখার করেন। সমস্ত লোককে তিনি হত্যা করেন—শুধু তাহাদের রাজা আগাগকে (Agag) শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন ও ভাল ভাল পশু যিহোবার কাছে উৎসর্গ করিবার জন্য রাখেন। ইহাতে ভগবান্ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্যামুয়েলকে বলেন, “সল্ আমার আদেশ অমান্য করিয়াছে। কি কুক্ষণে তাহাকে রাজা করিয়াছিলাম।”

স্যামুয়েল সলের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন, “আগাগ ও সমস্ত পশুকে হত্যা না করিয়া তুমি ভগবানের আদেশ অমান্য করিয়াছ। তিনি ত তোমাকে সকল প্রাণী বিনাশ করিতে বলিয়াছিলেন। ভগবানের কাছে পশু বলি দেওয়া অপেক্ষা তাঁহার আদেশ পালন করা অনেক ভাল। তুমি তাঁহার আদেশ অমান্য করাতে যিহোবা তোমাকে আর ইস্রেলের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন না।”

তখন সল্ বলিলেন, “আমি অপরাধ করিয়াছি। আমি আমার প্রজাদের ভয়ে এইরূপ করিয়াছি। আমায় ক্ষমা করুন। চলুন আমি ভগবানের আরাধনা করিব।”

স্যামুয়েল বলিলেন, “না, আমি যাইব না। ভগবান্ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তুমি আর রাজা নও।”

সল্ অনেক কাকুতি মিনতি করাতে স্যামুয়েল তাঁহাকে বলিলেন, আগাগ্‌কে এখানে লইয়া আইস।” আগাগ্‌কে আনা হইলে তিনি স্বহস্তে তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি রামায় চলিয়া গেলেন। সলের জন্য কিন্তু তাঁহার মনে খুবই দুঃখ হইল।

একদিন ভগবান্ স্যামুয়েলকে বলিলেন, “আর কতকাল সলের জন্য দুঃখ করিবে? বেথ্‌লেহেমে জেসের (Jesse) বাড়ী যাও। সেখানে ইস্রেলের নূতন রাজাকে দেখিতে পাইবে।”

তখন স্যামুয়েল সকলের সাক্ষাতে তাহাকে অভিষেক করিলেন

স্যামুয়েল বেথ্‌লেহেমে গেলেন। সেখানে জেসের পুত্র এলিয়াব্‌কে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল এই ইস্রেলের রাজা। ভগবান্ কিন্তু তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, “না, এ নয়।” তখন জেস্ অন্যান্য পুত্রদের ডাকিলেন। তাহারা আসিল, কিন্তু কাহাকেও স্যামুয়েলের মনে ধরিল না। তিনি জেসকে বলিলেন, “তোমার কি আর কোন পুত্র নাই?” জেস্ বলিল, “আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র মেষপালক।” স্যামুয়েল বলিলেন, “তাহাকে ডাকিয়া পাঠাও।” ডেভিড্ আসিলে তাহার সৌন্দর্য্যে

ডেভিড্ তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া একটা পাথর ছুঁড়িল

স্যামুয়েল আকৃষ্ট হইলেন। তাহার গায়ের রঙ্ ছিল রক্তবর্ণ ও সে দেখিতে ভারি সুশ্রী ছিল। সে আসিলে ভগবান্ বলিলেন, "ইহাকে রাজ-পদে অভিষিক্ত কর। এই আমার নির্ব্বাচিত রাজা।" তখন স্যামুয়েল সকলের সাক্ষাতে তাহাকে অভিষেক করিলেন। তখন হইতে ডেভিডের শরীরে ভগবানের আত্মার অধিষ্ঠান হইল। এদিকে সলের শরীরে দুষ্টাত্মা নির্ভর করিল। তাহার ফলে তাঁহার জীবনে আর কোন আনন্দ রহিল না। সব সময়ে কেমন মন-মরা হইয়া থাকেন। তাঁহার পরিষদেরা বলিল, "আপনার আদেশ পাইলে আমরা একজন নিপুণ বীণা-বাদক খুঁজিয়া বাহির করি। যখনই আপনার শরীরে দুষ্টাত্মার আবির্ভাব হইবে, সে এমন সুন্দর বীণা বাজাইবে যে, আপনি তখনই ভাল হইয়া যাইবেন।"

সল্ বলিলেন, "বেশ, লইয়া আইস।" তখন একজন বলিল, "মহারাজ, আমি এরূপ একজন বীণাবাদককে জানি, সে বেথ্‌লেহেমের জেসের পুত্র ডেভিড্। সে যেমন সুন্দর বাজায়, দেখিতেও তেমনি সুন্দর ও বলিষ্ঠ। তাহা ছাড়া সে শক্তিশালী যোদ্ধা ও জ্ঞানী।"

তখন রাজা ডেভিড্‌কে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। ডেভিড্‌কে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন ও নিজের অস্ত্রবাহক নিযুক্ত করিলেন। ইহার পরে যখনই রাজার শরীরে দুষ্টাত্মার ভর হইত, ডেভিড এমন সুন্দর ভাবে বীণা বাজাইতেন যে, তখনই তিনি ভাল হইয়া যাইতেন।

এ সময়ে ইহুদীদের পরম শত্রু ছিল ফিলিষ্টিয় জাতি। তাহারা প্রায়ই ইহুদীদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। ফিলি-ষ্টিয়েরা আবার অনেক সৈন্যসামন্ত লইয়া ইস্রেল আক্রমণ করিল। সোকোর নিকট একটি পাহাড়ের উপর তাহারা শিবির স্থাপন করিল। সল্‌ও তাঁহার লোকজন লইয়া অন্য একটি পাহাড়ের উপর অবস্থান করিতে লাগিলেন। দুইদল সৈন্যের মধ্যে একটি উপত্যকা ছিল। ফিলিষ্টিয় সৈন্যদের মধ্য হইতে গলিয়াথ (Goliath) নামে এক বিশালাকার দৈত্য ইস্রেল-সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিল, "এত সৈন্য-লইয়া যুদ্ধ করিবার কি দরকার। তোমা-দের মধ্যে একজনকে নির্ব্বাচিত কর। সে আসিয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক। যদি সে আমাকে পরাস্ত করিয়া হত্যা করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের লোকেরা তোমাদের আনুগত্য স্বীকার করিবে। আর আমি যদি তাহাকে হত্যা করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে তোমরা আমাদের দাস হইবে।"

গলিয়াথের দম্ভ শুনিয়া সল্ ও তাঁহার সৈন্যদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

এদিকে ডেভিড্ তাহার পিতা জেসের কাছে ফিরিয়া গিয়াছিল। জেসের জ্যেষ্ঠ তিন পুত্র সলের সৈন্যদলে ছিল। একদিন জেস্ ডেভিডকে বলিল, "অনেক দিন যাবৎ তোমার ভাইদের খবর পাই না, যাও এই খাবারগুলি তোমার ভাইদের জন্য লইয়া যাও। আর তাহারা কেমন আছে জানিয়া আইস।" কাজেই ডেভিড যুদ্ধস্থলের দিকে রওনা হইল। সে আসিয়া দেখে যে, একজন ফিলিষ্টিয় বীর ইস্রেল-সন্তানদের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। কিন্তু কেহই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেছে না—সকলেই পলায়ন করিতে ব্যস্ত। ডেভিড তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, যে এই লোকটাকে মারিতে পারিবে সে কি পুরস্কার পাইবে?" তাহারা উত্তর করিল, "রাজা তাহাকে প্রচুর অর্থ ও রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ দিবেন।" ডেভিডের বড় ভাই তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল,

"তুই কেন এখানে আসিয়াছিস্? ভেড়াগুলি কোথায়, কি করে এলি? আমি বেশ জানি তোর অহঙ্কার ও দুষ্টুমি। তুই কি যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছিস্ নাকি?"

এদিকে ডেভিডের কথা সলের কাণে গেলে তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া বলিল, "এই অসভ্য ফিলিষ্টিয়-টাকে ভয় করার কারণ নাই। আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব।"

রাজা বলিলেন, "না হে যুবক, তুমি ইহার সঙ্গে পারিবে না। তুমি ত ছেলে মানুষ, আর লোকটা পাকা যোদ্ধা।"

ডেভিড বলিল, "মহারাজ, আপনার এই দীন ভৃত্য তাহার পিতার মেষদল চরাইয়া থাকে। একদিন একটা সিংহ ও একটা ভল্লুক আসিয়া একটা ছানাকে লইয়া যায়। আমি পশ্চাদ্ধাবন করিয়া খালি হাতে সিংহ ও ভাল্লুকটাকে বধ করিয়া মেষশাবকটিকে উদ্ধার করি। আমি নিশ্চয়ই ফিলিষ্টিয়টাকে বধ করিতে পারিব। ভগবান্ আমার সহায় হইবেন।"

অগত্যা সল্ বলিলেন "বেশ, যুদ্ধে যাও।" তিনি তাহাকে নিজের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিতে চাহিলেন, কিন্তু ডেভিড রাজী হইল না। সে একটা লাঠি হাতে করিয়া অগ্রসর হইল। নদী পার হইবার সময় পাঁচটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ড সে তুলিয়া লইল। ওদিকে গলিয়াথও তাহার দিকে আগাইয়া আসিল। তাহাকে ভাল্ করিয়া দেখিয়া ঘৃণাভরে সে বলিল, "কি হে, কি মনে করিয়াছ? আমি কি কুকুর যে, আমার প্রতি ঢিল ছুঁড়িতে চাও? বেশ আইস। তোমাকে বধ করিয়া শৃগাল, কুকুর ও চিল-শকুনকে খাইতে দেই।"

ডেভিড উত্তর করিল, "তুমি ত নানা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিয়াছ। আমি কিন্তু ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছি। আজ তোমাকে হত্যা করিয়া ভগবানের মহিমা প্রচার করিব।"

গলিয়াথ যখন অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল ডেভিড দৌড়াইয়া গিয়া তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া একটা পাথর ছুঁড়িল। পাথরটা তাহার কপালে বসিয়া যাওয়াতে সে মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন ডেভিড তাহার উপর উঠিয়া তাহার তরবারী লইয়া

তাহার তরবারী লইয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিল

তাহার শিরশ্ছেদ করিল। ইহা দেখিয়া অন্যান্য ফিলিষ্টিয় সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া গেল। হিব্রুসৈন্যেরা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল।

যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেনাপতি আবনার (Abner) ডেভিডকে সলের নিকট লইয়া আসিল। সল্ তাহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? তোমার পরিচয় কি?" সে বলিল, "আমি বেথ্লেহেম্ নগরের জেসের পুত্র।"

সেই দিন হইতে সল্ ডেভিডকে কাছে কাছে রাখিতেন। তাহাকে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। জোনাথানেরও ডেভিডকে খুব ভাল লাগিল। তাহারা পরস্পর বন্ধুতাপাশে আবদ্ধ হইল।

সন ঘোড়াকে বর্শা ছুঁড়িয়া মারিলেন

এদিকে ফিলিষ্টিয়দিগের পরাজয়ের পর ইস্রেলের বিভিন্ন সহর হইতে পুরস্ত্রীরা সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে করিতে সল্‌কে অভিনন্দন করিতে আসিল। তাহাদের গানের এক চরণ ছিল—"সল্ যুদ্ধে বধ করিয়াছিলেন হাজার হাজার যোদ্ধা, ডেভিড্ করিয়াছেন লক্ষ লক্ষ।" ইহা শুনিয়া সলের সাতিশয় ক্রোধ হইল। "ইহারা ডেভিড্‌কে আমা অপেক্ষা অনেক বড় বীর বলিতেছে। ইহার পর সে ত আমার রাজ্য কাড়িয়া লইবে।" এখন হইতে সল্ তাহাকে হিংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

পরদিন সলের উপর আবার দুষ্টাত্মা ভর করিল। ডেভিড্ তাহার বীণা বাজাইতে আরম্ভ করিল। রাজার হাতে ছিল একটা বর্শা। তিনি দুই দুই বার ডেভিডের দিকে উহা ছুড়িয়া মারিলেন। সে অবশ্য ক্ষিপ্রপদে দুইবারই আত্মরক্ষা করিল।

ইহার পর হইতে সল্ তাহাকে হত্যা করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

একদিন সল্ ডেভিড্‌কে বলিলেন, "দেখ, আমার কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব বলিয়া ঠিক করিয়াছি।" ডেভিড্ বলিল "আমি দীন-দরিদ্র, আমার কি যোগ্যতা আছে যে, রাজ-জামাতা হইব?" রাজা বলিলেন, "কোন ভয় নাই। আমি কোন পণ চাই না। শুধু একশত ফিলিষ্টিয়ের গায়ের চামড়া পাইলেই আমি খুসী হইব।" তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া ডেভিডের মৃত্যু হইবে। ডেভিড্ অবশ্য রাজার আজ্ঞা পালন করিল। সল্ তখন তাহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিলেন কিন্তু তাহার উপর তাঁহার বিদ্বেষ বাড়িয়াই চলিল।

তিনি পুত্র জোনাথান ও অন্যান্য অনুচরদের ডেভিড্‌কে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। জোনাথান ডেভিডের জীবন রক্ষার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন সে ডেভিড্‌কে সাবধান করিয়া দিল। সে পলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজা তাহাকে হত্যা করিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। ইহার পর একদিন ডেভিড্ ও জোনাথান পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইল। ডেভিড্ দক্ষিণ দিকে পলাইয়া গেল। এখন হইতে ডেভিড্ স্থান হইতে স্থানান্তরে পলাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এই সময়ে ফিলিষ্টিয়েরা কিলার লোকদের আক্রমণ করিয়া তাহাদের শস্য লুঠপাট করিতে লাগিল। এই খবর শুনিয়া ডেভিড্ তাহার লোকজন লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গেল। ফিলিষ্টিয়েরা তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। সে তাহাদিগকে বধ করিয়া তাহাদের ছাগল ভেড়া লইয়া আসিল।

সলের কাণে এই সংবাদ পৌছিলে তিনি তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া কিলা অবরোধ করিতে আসিবেন বলিয়া ঠিক করিলেন। এদিকে ডেভিড্ তাহা জানিতে পারিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিয়া জিফের অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে আশ্রয় লইল।

ফিলিষ্টিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করিয়া সল্ ডেভিডের খোঁজে এগ্‌গিদিতে আসিলেন। একদিন তিনি একটি গুহার ভিতর ঘুমাইয়া পড়িলেন। ডেভিড্ ও তাহার লোকজন নিকটেই ছিল। তাহারা বলিল, "এই সুযোগ, এইবার সল্‌কে বন্দী করিয়া তাঁহার প্রতি যাহা খুসী করিতে পারেন।" ডেভিড্ আস্তে আস্তে সেই গুহায় ঢুকিয়া সলের পোষাকের প্রান্তভাগ কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর কিন্তু তাহার অনুশোচনা হইল। সে তাহার অনুচরদের বলিল, "কাজটা ভয়ানক অন্যায় হইয়াছে। একে প্রভু,

তাহার উপর ঈশ্বর তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন—তাঁহার বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করা ঘোরতর পাপ।" এই বলিয়া সে তাহার লোকজনকে নিরস্ত করিল। সল্ নিদ্রা হইতে উঠিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। ডেভিড্ও তাঁহার পিছনে পিছনে গিয়া ডাকিল, "প্রভো, রাজাধিরাজ।" সল্ তাহার দিকে ফিরিলে সে আভূমি প্রণত হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনি কেন অন্যের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন যে, আমি আপনার অনিষ্ট করিতে চাই। আজ ত আপনাকে হাতে পাইয়াছিলাম। অনেকে আপনাকে হত্যা করিতে বলিয়াছিল। কিন্তু আমি প্রভুর বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করি নাই। এই দেখুন আমার হাতে আপনার পোষাকের প্রান্তভাগ। আমি ইহা কাটিয়া লইয়াছি কিন্তু হত্যা করি নাই। আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন দুরভিসন্ধি নাই। তবে কেন আপনি আমাকে অনুসরণ করিতেছেন? ভগবান্ আমাদের বিচার করিবে।"

তখন সল্ বলিলেন, "সত্যি কি তুমি ডেভিড্? তুমি কত মহান। তুমি আমার হিংসার পরিবর্তে আমার প্রতি অশেষ করুণা প্রদর্শন করিয়াছ। আজ তুমি আমাকে হাতে পাইয়াও হত্যা কর নাই। ভগবান্ নিশ্চই তোমার মঙ্গল করিবেন। আজ আমি বুঝিতে পারিতেছি, নিশ্চয়ই তুমি ইস্রেলের রাজা হইবে। ঈশ্বরের নামে শপথ কর যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার সন্তানদের বিনাশ করিবে না।" ডেভিড্ শপথ করিলে সল্ সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার অল্প দিন পরে স্যামুয়েলের মৃত্যু হইল। ইস্রেল-সন্তানেরা খুব ঘটা করিয়া রামায় তাঁহাকে সমাধিস্থ করিল।

এদিকে ডেভিড্ পারাণের (Paran) জঙ্গলে আশ্রয় লইল। এই সময়ে মাওনে একজন খুব বড় মানুষ ছিল। তাহার নাম ছিল নাবাল (Nabal) আর তাহার স্ত্রীর নাম ছিল আবিগাইল (Abigail)। নাবাল ছিল খুবই খারাপ লোক, কিন্তু তাহার স্ত্রী ছিল বেশ সুন্দরী ও সৎপ্রকৃতির। নাবালের জমিদারী ছিল কার্ম্মেলে। তাহার ৩০০০ ভেড়া ও ১০০০ ছাগল ছিল। ডেভিড্ শুনিতে পাইল যে, নাবাল তাহার ভেড়াদের লোম কাটিতেছে। সে দশ জন লোককে তাহার কাছে এই বলিয়া পাঠাইল যে, "আমরা আপনার মেষপালকদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করিয়াছি। কোন অনিষ্ট করি নাই। আমাদের কিছু দান করুণ।" ইহা শুনিয়া নাবাল বলিল, "ডেভিড্কে আমি জানি না। কেন আমি তাহাকে আহার্য্য যোগাইব?

ডেভিডের লোকেরা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে এই সংবাদ দিলে সে লোকজনদের প্রস্তুত হইতে বলিল। নাবালকে বিশেষ শিক্ষা দিতে হইবে।

এদিকে একজন মেষপালক নাবালের স্ত্রী আবিগাইলকে বলিল, ডেভিড্ আমাদের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করিয়াছে। সে আমাদিগকে বিপদে আপদে রক্ষা করিয়াছে। আর আমাদের প্রভু তাহার লোকজনদের বিদ্রূপ করিয়া খালি হাতে ফিরাইয়া দিয়াছেন। এইবার আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আপনি ইহার প্রতিবিধান করুন।"

তখন কালবিলম্ব না করিয়া আবিগাইল নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ডেভিড্কে উপহার দিতে রওনা হইল। পথে ডেভিডের সঙ্গে দেখা হইলে সে তাড়াতাড়ি গাধা হইতে নামিয়া তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া কহিল, "প্রভু আমি আপনার দাসী।

আপনি যখন আমার স্বামী নাবালের কাছে লোক পাঠাইয়াছিলেন, আমি তখন সেখানে ছিলাম না। দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। এই সামান্য উপহার আপনার অনুচরদের জন্য আনিয়াছি ; দয়া করিয়া গ্রহণ করুন। আপনি ভগবানের সৈনিক ; আপনি সর্ব্বদা ধর্ম্ম-পথে চলেন, কখন অধর্ম্ম আচরণ করেন না। ভগবান্ নিশ্চয়ই আপনার মঙ্গল করিবেন। আপনি ইস্রেলের রাজা হইবেন। আপনি কখনও বিনা কারণে রক্তপাত করিবেন না।"

ইহা শুনিয়া ডেভিড্ বলিল, "তুমি ধন্য। ভগবান্ তোমাকে আমার কাছে পাঠাইয়াছেন। আমি তোমার পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। কোন ভয় নাই। আমি আর রক্তপাত করিব না। এই আমি তোমার উপহার গ্রহণ করিলাম। এবার গৃহে প্রত্যাগমন কর।"

আবিগাইল গৃহে ফিরিয়া আসিল। দশ-দিন পরে নাবালের মৃত্যু হইল।

নাবালের মৃত্যু-সংবাদ জানিতে পারিলে ডেভিড্ তাহার পত্নীর পাণি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল। আবিগাইল তৎক্ষণাৎ সানন্দে তাহার লোকদের সঙ্গে ডেভিডের কাছে আসিল। ডেভিডের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। ডেভিড্ অবশ্য জেজরিলের আহিনোয়াসকেও বিবাহ করিল।

এদিকে ফিলিষ্টিয়েরা ইস্রেলের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের সৈন্যসামন্ত একত্র করিল। আকিস্ ডেভিড্‌কে তাহার দেহ রক্ষী করিয়া সঙ্গে লইলেন। কিন্তু ফিলিষ্টিয় অন্য রাজারা ডেভিড্ ও তাহার অনুচরদের দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহারা তাহাকে মোটেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কাজেই, তাহাদের প্ররোচনায় আকিস্ তাহাকে জিক্‌লাগে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। আর ফিলিষ্টিয়েরা জেজারিল অভিমুখে রওনা হইল।

ওদিকে ফিলিষ্টিয়দের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সল্ সমস্ত হিব্রুসৈন্যদের গিল্‌বোয়াতে (Gilboa) সমবেত করিলেন। কিন্তু ফিলিষ্টিয়-বাহিনী দেখিয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি ভগবানের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন। কিন্তু প্রত্যাদেশ পাইলেন।

পরদিন যুদ্ধে ইস্রেল-সন্তানেরা পরাজিত হইয়া ফিলিষ্টিয়দের হাতে নিহত হইল। সল্ পুত্রদের লইয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু শত্রুরা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া জোনাথান, আবিনাদাব প্রভৃতি সলের পুত্রদের বধ করিল। সল্‌ও বিশেষ আহত হইলেন। কিন্তু শত্রু-হস্তে পড়ার ভয়ে নিজের তরবারির উপর পড়িয়া আত্মহত্যা করিলেন। হিব্রুরা বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ফিলিষ্টিয়েরা তাহা অধিকার করিল।

এদিকে ডেভিড্ জিক্‌লাগে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে, আমালেকীয়েরা সহরটি আক্রমণ করিয়া ভস্মীভূত করিয়াছে ও শিশু ও স্ত্রীলোকদের লইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও ছিল। ইহা দেখিয়া মনের দুঃখে সে কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর অনুচরদের সঙ্গে লইয়া স্ত্রী-পুত্রদের উদ্ধার করিবার জন্য আমালেকীয়দের অনুসরণ করিল। যখন সে তাহাদের কাছে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা পান-ভোজন ও নৃত্য-গীতে মত্ত। তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া সে স্ত্রী-পুত্রদের ও অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্য উদ্ধার করিল।

ইহার পর ভগবানের প্রত্যাদেশ পাইয়া ডেভিড্ সপরিবারে হিব্রনে (Hebron) গেলেন। সেখানে জুদার (Judah) লোকেরা সমবেত হইয়া তাঁহাকে জুদার রাজপদে

অভিষিক্ত করিল। এদিকে সলের সেনাপতি আবনার তাঁহার পুত্র ইস্‌বোসেথকে (Ishbosheth) মহানেইমে (Mahanaim) লইয়া গিয়া ইস্রেলের রাজা করিল। তার পর অনেকদিন জুদা ইস্রেলের মধ্যে যুদ্ধ চলিল। দিন দিন ডেভিডের শক্তি বাড়িতে লাগিল আর ইস্‌বোসেথের শক্তি কমিতে লাগিল। শেষে একদিন ইস্‌বোসেথের সঙ্গে তাঁহার সেনাপতি আবনারের বচসা হইল। ফলে, আবনার তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া ডেভিডের পক্ষে যোগদান করিতে হিব্রনে আসিল। ডেভিড্ অবশ্য তাঁহার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করিল। কিন্তু জোয়াব নামে এক ব্যক্তি তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করিল। ডেভিড্ ইহাতে খুবই অসন্তুষ্ট হইলেন এবং আবনারের মৃত্যুতে প্রকাশ্যে শোক প্রকাশ করিল।

আবনারের মৃত্যু সংবাদে ইস্‌বোসেথ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। একদিন তিনি যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, বানা (Baanah) ও রিশাব (Reashab) নামে তাঁহার দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে হত্যা করিল। তারপর পুরস্কারের আশায় তাঁহার ছিন্ন মস্তক লইয়া হিব্রনে ডেভিড্‌কে উপহার দিল। এই বিশ্বাসঘাতকতায় ডেভিড্ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইল এবং তাহাদিগকে বধ করিতে আদেশ দিল।

এই ঘটনার পর ইস্রেল-সর্দারেরা হিব্রন উপস্থিত হইয়া ডেভিড্‌কে ইস্রেলের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। এইবার ডেভিড্ ঠিক করিল যে, জায়ন (Zion) পর্ব্বতের উপর জেরুসালেমে তাহার রাজধানী স্থাপন করিবে। এই সময়ে জেরুসালেমে জেবুসীয় (Jebusites) নামে এক জাতি বাস করিত। তাহারা তাহাদের দুর্গ ডেভিড্‌কে বিনাযুদ্ধে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিল। কাজেই ডেভিড্ সসৈন্যে উহা অবরোধ করিল এবং অল্প আয়াসেই অধিকার করিল। এখন হইতেই জেরুসালেমই তাহার রাজধানী হইল। টায়ারের রাজা হিরাম তাহার শৌর্য্যবীর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া তাহার নিকট দূত পাঠাইল এবং বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ সিডার বৃক্ষ ও সূত্রধর প্রেরণ করিল। তাহারা তাঁহার জন্য সুন্দর একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল। এই সময়ে ফিলিষ্টিয়েরা বারবার তাহার রাজ্য আক্রমণ করে। ডেভিড্ প্রতিবারই তাহাদের পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দিতে থাকেন।

ইহার পর ডেভিড্ গিবিয়া হইতে যিহোবার আর্ক আনিয়া জেরুসালেমে প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করে। ইস্রেলের নেতাদের এই জন্য সে সমবেত করিল। তারপর মহাসমারোহে গিবিয়া হইতে আর্কটি আনা হইল। ডেভিড্ স্বয়ং আর্কবাহকদের পুরোভাগে নাচিতে নাচিতে আসিল। অবশেষে ইহা একটি বস্ত্রাবাসে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। কিন্তু ডেভিডের মনে একটা খট্‌কা লাগিল। সে নিজে থাকিবে কাষ্ঠ-প্রাসাদে আর স্বয়ং ভগবান্ বাস করিবেন বস্ত্রাবাসে? ইহা হইতেই পারে না। কাজেই, ডেভিড্ ঠিক করিল যে, যিহোবার আর্কের জন্য একটি কাষ্ঠ-মন্দির নির্ম্মাণ করিবে। এই কথা ডেভিড ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ন্যাথানকে (Nathan) বলিল। ন্যাথানও তাহা সমর্থন করিলেন। কিন্তু সেইদিন রাত্রেই ন্যাথান ভগবানের বাণী শুনিতে পাইলেন—"ডেভিড্‌কে বলিও, আমার জন্য কাঠের মন্দির তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন নাই। আমি ত বরাবরই বস্ত্রাবাসে আছি। সেই জন্য কি আমি কখন অভিযোগ করিয়াছি? আমিই হিব্রুদের রক্ষা করিয়াছি ও এই দেশে আনিয়াছি। ডেভিড্‌কে ত আমিই সামান্য মেষপালক হইতে রাজা করিয়াছি। তাহার মৃত্যুর

পর তাহার বংশধরদেরও ইস্রেলের রাজা করিব। আমার আশীর্ব্বাদ চিরদিন তাহাদের উপর থাকিবে। তাহারই পুত্র আমার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিবে।" ভগবানের এই আশীর্ব্বাদ শুনিতে পাইয়া ডেভিড্ তাঁহার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইল।

ইহার পর ডেভিড্ রাজ্য বিস্তারে মন দিল। প্রথমে ডেভিড্ ফিলিষ্টিয়দের পরাজিত করিয়া স্ববশে আনিল। তার পর তিনি মোয়াবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মোযাববাসীদের পদানত করিল। সিরিযাতেও তাহার অধিকার বিস্তৃত হইল। ডামাস্কাসে সে একদল সৈন্য মোতায়েন করিল এবং সিরিয়াবাসীরা তাহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিল। হামাথের রাজাও তাহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং নানাবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। ইহার পর ডেভিড্ সমগ্র এডোমরাজ্য জয় করে। এইরূপে ডেভিডের প্রভাব অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল।

এদিকে জোনাথানের মেফিবোসেথ (Mephibosheth) নামে এক পুত্র ছিল। ডেভিড্ তাহাকে আনিয়া সলের সমুদয় ধন-সম্পত্তি ও জমিজমা প্রত্যর্পণ করিল। তাহাকে নিজের বাটীতেই রাখিল এবং তাহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিল। এই সময়ে ডেভিড্ খুব অন্যায় করিয়া বাথ্‌সেবা নামে একটি মহিলাকে বিবাহ করে।

ডেভিডের এবংবিধ পাপাচারে ভগবান্ তাহার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং ন্যাথানকে তাহার নিকট পাঠাইলেন। ন্যাথান ডেভিড্‌কে বলিলেন, "কোন একটি সহরে একজন ধনী ও একজন দরিদ্র লোক বাস করে। ধনী ব্যক্তির অনেক ছাগল-ভেড়া আছে। গরীব লোকটির কিন্তু থাকার মধ্যে একটি ছোট স্ত্রীমেষশাবক ছিল। এই মেষশাবকটিকে সে অতি যত্নে লালনপালন করিয়া বড় করিল এবং কন্যার ন্যায় সর্ব্বদা বুকে করিয়া রাখিত। একদিন ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে একজন অতিথি উপস্থিত হইল। সে কিন্তু নিজের অতিথির সেবার জন্য নিজের মেষ না কাটিয়া গরীব লোকটির মেষশাবকটি কাটিয়া রান্না করিল।" ন্যাথানের মুখে এই কথা শুনিয়া ডেভিড্ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, এই অত্যাচারী ধনীর প্রাণদণ্ড হইবে। আর তাহাকে চারিগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।" তখন ন্যাথান বলিলেন, "তুমিই সেই নিষ্ঠুর লোক। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি তোমাকে সলের সিংহাসনে বসাইয়াছেন; এত ধন-সম্পত্তি দিয়াছেন; —তোমার কত স্ত্রী রহিয়াছে, সমগ্র ইস্রেলের তুমি রাজা, ইহাতেও তোমার আকাঙ্ক্ষা না মিটিলে তোমায় আরও কত ঐশ্বর্য্য দিতেন; তবু কেন তুমি তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছ? তুমি উরিয়াকে হত্যা করিয়া তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছ। এই পাপে এখন হইতে তোমার বংশে অশান্তি আর দূর হইবে না।" ডেভিড্ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "আমি ঘোরতর পাপী।" ন্যাথান উত্তর করিলেন, "ভগবান্ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। তুমি মরিবে না। কিন্তু তোমার এই পুত্রের মৃত্যু হইবে।" এই বলিয়া ন্যাথান চলিয়া গেলেন। ইহার পরেই ডেভিডের নবজাত পুত্রের সাংঘাতিক অসুখ হইল। ডেভিড্ কত ভগবানকে ডাকিল—কত কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিল। কিছুতেই কিছু হইল না। সাতদিনের দিন পুত্রটি মারা গেল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার মৃত্যুর পর ডেভিড্ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে

সংবরণ করিয়া ঈশ্বরের আরধনা করিল। যত দিন আশা ছিল, ডেভিড্ যথাসাধ্য ঈশ্বরকে ডাকিয়াছে। মৃত্যুর পর সে আর ফিরিবে না। ইহার পর বাথসেবার গর্ভে ডেভিডের আর একটি পুত্র জন্মে। তাহার নাম সলোমন (Solomon) রাখিলেন। সলোমন ভগবানের খুব প্রিয় হইল।

এ সময়ে ডেভিডের এক পুত্র আবসালেম বিদ্রোহী হইয়া উঠে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জন্য ডেভিড্‌কে পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধে আবসালেম পরাজিত ও নিহত হয়।

দূতমুখে আবসালেমের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া ডাক ছাড়িয়া ডেভিড্ কাঁদিয়া উঠিল, "আবসালেম আবসালেম! প্রিয় পুত্র আমার! ভগবান্ একি করিলে? কেন আমার মৃত্যু হইল না? আবসালেমের পরিবর্ত্তে কেন আমি মরিলাম না?"

শত্রুর মৃত্যুতে রাজার এমনভাবে বিলাপ করা উচিত নহে। ইহাতে প্রজাদের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। আত্মীয়-স্বজনেরা তাহাকে এইরূপ পরামর্শ দিলে পর ডেভিড্ রাজকার্য্যে মন দিল।

ইহার পর ফিলিস্তিয়দের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ হয়। প্রতি যুদ্ধেই ডেভিড্ জয়লাভ করে। ডেভিড ভগবানের কাছে তাঁহার কৃতজ্ঞতা জানায়, "ভগবানই আমার আশ্রয়, আমার দুর্গ, আমার রক্ষক। আমি তাঁহার উপরই নির্ভর করি।..."

এসময়ে ডেভিড্ খুব বৃদ্ধ হইয়াছিল। সেই সুযোগে তাহার পুত্র আদোনিজা জোয়াব আবিয়াথার প্রভৃতির সঙ্গে যোগ দিয়া নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল ও বিরাট এক ভোজের বন্দোবস্ত করিল। কিন্তু শিমি, পুরোহিত জাদক ও ভবিষ্যদ্বক্তা ন্যাথান তাহার দলে যোগ দিলেন না। ন্যাথানের প্ররোচনায় বাথসেবা ডেভিডের কাছে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ আপনি ত আমাকে কথা দিয়াছিলেন যে, আপনার মৃত্যুর পর আমার পুত্র সোলোমোন রাজা হইবে। এদিকে ত আদোনিজা নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। প্রভু, ইহার একটা প্রতিবিধান করিতে হইবে। আপনি ইস্রেলের লোকদের জানান যে, আপনি কাহাকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছেন। ঠিক এই সময়ে ন্যাথান আসিয়াও সোলোমনের স্বপক্ষে অনুরোধ করিলেন। ডেভিড্ তখন বাথসেবাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, সোলোমনই রাজা হইবে। তারপর জাদক, ন্যাথন প্রভৃতিকে আদেশ দিল যে, রাজার অশ্বপৃষ্ঠে চড়াইয়া সোলোমনকে গিহনে (Gihon) লইয়া গিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করা হউক। ডেভিডের আদেশমত গিহনে সোলোমনের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সমবেত জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল, "জয় মহারাজ সোলোমনের জয়।" তারপর চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

এদিকে আদোনিজার ভোজসভায় এই সংবাদ পৌছিলে তাহার অনুচরেরা ভীত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইল। স্বয়ং আদোনিজা প্রাণভয়ে বেদীর পার্শ্বে আশ্রয় লইল। সোলোমন তাহাকে অভয় দিলে সে আসিয়া তাহাকে রাজা বলিয়া অভিবাদন করিল।

ডেভিড্ বুঝিতে পারিল যে, তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। সে পুত্র সোলোমনকে ডাকাইয়া অনেক উপদেশ দিল। তারপর ডেভিডের মৃত্যু হইল।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা—হিন্দুযুগ

[শিক্ষার ইতিহাস পৃথিবীর গৌরবের ইতিহাস। মানুষ আদিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজপর্য্যন্ত যে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে—শিক্ষা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শিক্ষা-রীতির মধ্যেও নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর সব সভ্য দেশের শিক্ষার কথা ক্রমশঃ বলা হইবে।]

হিন্দুর সমাজনীতি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতি যে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং ইহাদের কোনও একটিকে বাদ দিয়া অন্যগুলির বিকাশ সম্ভব নহে তাহা প্রাচীন হিন্দুগণ স্বীকার করিতেন। শিক্ষা যে সমাজ-সেবার একটি বিশিষ্টদিক, তাহা অতি প্রাচীনকালেই হিন্দুগণ বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য মানুষের জীবনের সকল স্তরেই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পরিবারের মধ্যে, গুরুর গৃহে বা সামাজিক জীবনে যে শিক্ষা লাভ করিতে হইত, তাহা শুধু ব্যক্তিগত সম্পদ্ মনে করা হইত না। সমাজের উন্নতির জন্য এবং সমাজের সেবার জন্যই যে সে শিক্ষা আবশ্যক, তাহা আমাদের শাস্ত্র-কর্ত্তারা মনে করিতেন। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের এই দেশে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, প্রাচীন ঋষিরা জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা সমাজের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের কাছে পররর্ত্তী লোকেরা ঋণী। এই ঋণকে ঋষিঋণ বলা হইত। প্রাচীন ঋষিদের মতে বেদপাঠ দ্বারা এই ঋণ শোধ করা হইত। শিক্ষার এইরূপ বিরাট্ ও মহৎ আদর্শ প্রাচীন ভারতের মানসিক উন্নতির পরিচয় দেয়, এবং প্রাচীনকালের সহিত বর্ত্তমানের ও বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যতের যোগ সাধন করে।

ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তখন ধর্ম্মের নানা অনুষ্ঠান ছিল। এই অনুষ্ঠানগুলির নাম ছিল যজ্ঞ। গৃহে ও সমাজে কোন কার্য্যই যজ্ঞের অনুষ্ঠান ছাড়া করা হইত না। এই যজ্ঞের জন্য প্রতি গৃহে অগ্নি রক্ষিত হইত এবং সেই অগ্নিতে হোম করা হইত। হোম উপলক্ষে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে সব স্তোত্র গান করা হইত তাহাই পরবর্ত্তীকালে সংগৃহীত হইয়া বেদ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল বেদ-পাঠ ও আয়ত্ত করা এবং সেই সব মন্ত্র দ্বারা দেবতা-দিগের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া। গৃহস্থ জীবনের নানা অবস্থায় এবং সামাজিক জীবনের নানা কার্য্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত।

বিদ্যা

প্রাচী আর্য্যসমাজে বিদ্যার খুব সমাদর ছিল। ব্রাহ্মণেরা সারা জীবন বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন বলিয়াই সমাজে তাঁহাদিগকে সকলের উচ্চে স্থান দেওয়া হইয়াছিল।

বেদ সর্ব্বপ্রধান বিদ্যা বলিয়া হিন্দুসমাজে স্বীকৃত। এই বেদবিদ্যা অভ্যাস করার পাঁচটি অঙ্গ ছিল,—গুরুর নিকট হইতে বেদ গ্রহণ করা, বিচার করা, অভ্যাস করা, জপ করা, তারপর শিষ্যদিগকে বেদ

পড়ান। ইহার কোন একটি বাদ গেলে বিদ্যা সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করা হইত না।

ধনসম্পত্তি, আত্মীয়স্বজন, বয়স, কর্ম্ম ও বিদ্যা, ইহাদের মধ্যে বিদ্যার গৌরব সকলের অপেক্ষা বেশী ছিল। জীবনের যেদিন নিজে বিদ্যাচর্চ্চা না করিয়া বা অন্য কাহাকেও না পড়াইয়া অতিবাহিত হইত, সে দিনকে বৃথা মনে করা হইত।

বিদ্যা বিনামূল্যে দান করিবার জিনিষ বলিয়া গণ্য হইত। গো, ভূমি ও বিদ্যা-দান 'অতিদান' বলিয়া কথিত হইত। ইহাদের মধ্যে অন্যগুলি অপেক্ষা বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠ ছিল। টাকা-পয়সা লইয়া পড়ান অতি নীচ কাজ বলিয়া মনে করা হইত।

কোন রকমে বিদ্বান্ ব্যক্তির যশঃ নষ্ট করিলে বা তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার বিদ্যাকে নিজের কাজে লাগাইলে বিদ্যাচুরি করা হইল, এইরূপ ধারণা ছিল।

যে গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাচর্চ্চা না করিত, রাজা সেই গ্রামকে শাস্তি দিতেন। কেননা, সেই গ্রামের সমাজ, অর্থ ও খাদ্য দ্বারা সেই সব ব্রাহ্মণকে বৃথা পোষণ করিত; তাহাতে যেন চোরকে ভাত দেওয়া হইত।

যে গ্রামে বিদ্যা-উপার্জ্জনের কোন সুবিধা থাকিত না, সে গ্রামে বাস করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষেধ ছিল। বিদ্যালাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের দ্বারস্থ হইতেন। "শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও বিদ্যা গ্রহণ করিবে।" "অতি অন্ত্যজ অর্থাৎ নীচ চণ্ডাল প্রভৃতির নিকট হইতে পরম ধর্ম্ম লাভ করিবে।" বাধ্য হইয়া অব্রাহ্মণকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে সেই গুরুকে সম্মান দেখাইতে হইত। "ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারী আপৎকালে অব্রাহ্মণ বর্ণাদির নিকট অধ্যয়ন করিতে পারেন এবং যে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবেন সে পর্য্যন্ত পা ধোয়ান ও উচ্ছিষ্ট লওয়া ছাড়া অন্য রকমে তাঁহার শুশ্রূষা করিবেন।"

পিতা-মাতা

শিশুর শিক্ষা স্বাভাবিক ভাবে আরম্ভ হয় পিতা-মাতার দ্বারা। বৈদিক যুগে শিশুর জন্মের পূর্ব্বে ও পরে নানা রকমের সংস্কার বা অনুষ্ঠান পিতা-মাতা দ্বারা করা হইত। এই উপলক্ষে পিতা যে মনের কামনা প্রকাশ করিতেন তাহাতে হিন্দুর জীবন ও শিক্ষার আদর্শ জানা যায়। সে যুগের শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে এই আদর্শ সম্বন্ধে একটু ভাবিয়া দেখিতে হয়। শিশুর জন্মের পূর্ব্বে পিতা এই উপনিষৎ-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন—

"আমার এমন এক পুত্র হউক যে পণ্ডিত, প্রখ্যাত ও সভায় বিচার-সমর্থ হইবে, রমণীয় বাক্য উচ্চারণ করিবে, সর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিবে এবং পূর্ণায়ুঃ প্রাপ্ত হইবে।"

"আমার পণ্ডিতা দুহিতা উৎপন্ন হউক ও পূর্ণায়ুঃ প্রাপ্ত হউক।"

"পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবার পর পিতা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করেন এবং কাংস্য-পাত্রে দধিমিশ্রিত ঘৃত রাখিয়া তাহা অল্পে অল্পে আহুতি দেন এবং এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন 'আমি এই পুত্র দ্বারা নিজের গৃহে বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র মানব ও পশুকে যেন পোষণ করিতে পারি। ইহার বংশে প্রজা ও পশু যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে। স্বাহা! হে পুত্র, আমাতে যে প্রাণ আছে তাহা আমি মন দ্বারা তোমাতে আহুতি দিতেছি। স্বাহা!"

শিশুর নামকরণ সংস্কারের সময়ে পিতা তাহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—"হে বীরে! তুমি বীর পুত্র প্রসব করিয়াছ, তুমি আমাদিগকে বীরবান্ করিয়াছ। তুমি বীরবতী হও। এই শিশুর বিষয়ে লোকে যেন এইরূপ বলে, তুমি পিতাকে অতিক্রম করিয়াছ, তুমি পিতামহকে অতিক্রম করিয়াছ।"

পুত্রবান্ গৃহী প্রার্থনা করিতেন—"আমি যেন পুত্র সম্বন্ধীয় দুঃখে রোদন না করি।" পুত্রকে কাছে ডাকিয়া ও তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া পিতা বলিতেন—"হে পুত্র, তুমি আমার প্রত্যেক অঙ্গ হইতে নির্গত ও হৃদয় হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ। হে পুত্র, তুমি আমার নিজেরমত ও আমার রক্ষাকারী। তুমি শত বৎসর জীবন ধারণ কর। তোমার নাম অমুক (এই বলিয়া পুত্রের নাম বলিবে)। তুমি পাষাণের মত দৃঢ় হও! তুমি কুঠারের মত তীক্ষ্ণ হও।"...ইত্যাদি বলিয়া তিনবার পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিতে হইবে।

নিজের মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতা পুত্রকে কাছে ডাকিবেন। "নবীন তৃণ দ্বারা গৃহ আচ্ছাদন পূর্ব্বক অগ্নি স্থাপন করিয়া পূর্ণপাত্র সহিত জলপূর্ণ কলস স্থাপন ও তদুপরি নূতন বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং শ্বেত মালা ও বসন পরিধানান্তর সমাগত পুত্রের সহিত সাম্মিলিত হইবেন। নিজের ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা পুত্রের ইন্দ্রিয়সমূহ স্পর্শ করিবেন। অনন্তর পুত্রের সম্মুখে উপবেশন করিবেন।

পরে পুত্রকে নিজের বাগাদি সম্প্রদান করিবেন। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। পিতা বলিবেন,—আমার বাক্য তোমাতে ধারণ করিতেছি।" পুত্র বলিবেন, "আমি তোমার বাক্য ধারণ করিতেছি।" পিতা বলিবেন,- আমার জ্ঞান, জ্ঞাতব্য ও কাম্য তোমাতে ধারণ করিতেছি।" পুত্র বলিবেন, তোমার জ্ঞান, জ্ঞাতব্য ও কাম্য সকল আমাতে ধারণ করিতেছি।" অনন্তর পুত্র পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিবেন। তখন পিতা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, "পুত্র, তোমার লৌকিকী ও শাস্ত্রীয়া কীর্ত্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ হউক।"

ইহা হইতে দেখা যায়, বৈদিক যুগের আর্য্যগণ জীবনে সুখ,সম্পদ্, যশঃ ও বিদ্যার প্রাচুর্য্য কামনা করিতেন; তখনও আর্য্য সমাজে দুঃখবাদের স্থান হয় নাই। জীবনে এই আদর্শ ছিল বলিয়া শিক্ষা-বিধানও সেইরূপ ভাবে রচিত হইয়াছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা

অতি প্রাচীনকালে শিক্ষা গৃহে পিতার নিকট আরম্ভ হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির শিশুগণের তিন বৎসর বয়সের মধ্যে চূড়াকরণ হইত। এই সংস্কার শেষ হইলে পাঠ আরম্ভ করিতে হইত। কৌটিল্যের বিধান অনুসারে চূড়ার পর লিপি ও অঙ্ক শিখিতে হইত এবং উপনয়নের পর বেদ পড়িতে হইত। পরবর্ত্তী যুগের প্রাথমিক শিক্ষা কিরূপ ছিল, তাহার কিছু কিছু বিবরণ আমরা নানা গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। 'বিদ্যালয়কে 'লেখশালা' বলা হইত, ছোট ছোট ছেলেরা যে সব গল্প শুনিতে ভালবাসিত, সেগুলিকে 'পরিকথা' বলা হইত; লিখিবার জন্য যে লেখনী ব্যবহার করা হইত, তাহার নাম ছিল 'তুলা' এবং অঙ্ক শিখাইবার জন্য 'জনিত্র' ব্যবহৃত হইত। কাঠের পাটায় লেখা হইত, তাহার নাম ছিল 'ফলক' এবং কলমকে বলা হইত 'বর্ণক'। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাথমিক শিক্ষার লিখন, পঠন ও অঙ্ক শিখাইবার সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। সেকালে শিশুদিগের নানারূপ খেলার পরিচয় কোন কোন পুস্তকে পাওয়া যায়। এইরূপ একটি খেলার নাম ছিল 'অকৃথরিকা'। ইহা বর্ত্তমান কালের অক্ষর দ্বারা শব্দ রচনা খেলার মত। তখনকার ছাত্রেরা এখনকার ছাত্রদের মতই কলরব করিয়া অধ্যয়ন করিত; এইজন্য বেদের একটি মন্ত্রে ছাত্রদের কলরবকে বর্ষাকালের ভেকের কোলাহলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

গুরুকুল

সেকালের বিদ্যালয়কে গুরুকুল বলিত। কিন্তু ইহা পড়াইবার জন্য প্রাণহীন প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল না। নগর বা রাজসভা হইতে দূরে প্রকৃতির শান্তিময় ক্রোড়ে মানুষ এমন কি গাছপালা ও পশু-পক্ষীদেরও লইয়া এক সঙ্গে বাস করিবার জন্য যেন এই সব গুরুকুল স্থাপিত হইত। এই বিদ্যালয়গুলি আশ্রম নামেও অভিহিত হইত। সরল জীবন যাপন ও উচ্চ চিন্তার পক্ষে এরূপ স্থানের আবশ্যকতা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এইরূপ গুরুকুল বা আশ্রম প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট বস্তু ছিল। এইগুলি সমাজের এক প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সমাজেরই এক অঙ্গ ছিল; শুধু তাহাই নয়, এই আশ্রমের চিন্তাশীল মস্তিষ্কই সমাজের সকল অঙ্গ চালাইত। এইরূপ আশ্রমে গুরু ও গুরুর পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া সেকালের ছাত্রগণ বাড়ীর অভাব বুঝিতে পারিত না। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধযুগে সন্ন্যাসী-পরিচালিত বৌদ্ধ-বিহারগুলি এই সামাজিক আবেষ্টন হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল। বৈদিক যুগের ছাত্রেরা গৃহী গুরুর সঙ্গে বাস করিতে অসামাজিক ভাবে গড়িয়া উঠিত না। এই সব গুরুকুলে বহুসংখ্যক ছাত্র থাকিত বলিয়া জানা যায়। গুরুকুলের অধ্যক্ষকে 'কুলপতি' বলা হইত।

পৌরাণিক যুগে নৈমিষারণ্যের তপোবনের কথা বহু গ্রন্থে পাওয়া যায়। এইখানে ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম হইতে মুনিরা আসিয়া একত্র হইতেন এবং বেদ, পুরাণ প্রভৃতি আলোচনা করিতেন। এই আশ্রমের কুলপতি ছিলেন শৌনক; তাঁহার প্রশ্ন অনুসারে সৌতি মহাভারত-কথা শুনাইয়াছিলেন।

গুরু

সেকালে বিদ্যা ছিল আচার্য্যগত; ছাত্রেরা তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হইয়া এবং বুদ্ধি ও সেবা দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদ্যালাভ করিত। শুধু নিজে নিজে পাঠ করিয়া কেহ বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত না। গুরুর অনুগ্রহের উপর বিদ্যা নির্ভর করিত। গুরুও নিজের পুত্রের মত

করিয়া শিষ্যকে নিজের গৃহে রাখিয়া খাওয়াইয়া-পরাইয়া বিদ্যাদান করিতেন।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে গুরুর খুব গৌরব ও প্রশংসা ছিল। মাতা-পিতা ও আচার্য্যের স্থান খুব উচ্চ ছিল। তাহার মধ্যে আবার আচার্য্যকে বেশী সম্মান করা হইত।

ব্রাহ্মণ গুরু বয়সে ছোট হইলেও সম্মানের পাত্র বলিয়া গণ্য হইতেন। জ্ঞানের উপর ব্রাহ্মণদিগের জ্যেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। "ঋষি অঙ্গিরার পুত্র বালক হইয়াও সাতিশয় বিদ্বান্ ছিলেন বলিয়া পিতৃব্য এবং বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃব্য-পুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন।" তাহারা দেবতাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে দেবতারা এই অল্পবয়স্ক অধ্যাপককে সম্মান করিতে আদেশ দেন।

গুরুর নিন্দা করা পাপ বলিয়া গণ্য হইত এবং এই পাপ যে করে, ইহ ও পরলোকে তাহার নানা শাস্তির কথা পুস্তকে লেখা আছে।

গুরুর সম্মানও যেরূপ ছিল, দায়িত্বও সেইরূপ ছিল। গুরু হইবার উপযুক্ত না হইয়া গুরুর কাজ করিতে গেলে নিন্দা হইত। "যে নরাধম, শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করে, যে ব্যক্তি শাস্ত্র না জানিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দান, চিকিৎসা, জ্যোতিষ-গণনা বা ধর্ম্মনির্ণয় করে, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়াছেন।"

সেকালের গুরুকুল

উপবীত

প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুদিগের পোষাক দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—একখানা বস্ত্র পরা হইত, তাহার নাম ছিল 'অন্তরীয়' আর একখানা গায়ে দেওয়া হইত তাহার নাম ছিল 'উত্তরীয়'। গৃহে বা সমাজে কোন মঙ্গল-অনুষ্ঠানই এই উত্তরীয় পরিধান না করিয়া, করিবার রীতি ছিল না। এই উত্তরীয়ের নামই উপবীত, কেননা, ইহা শরীরের উপরের দিকের প্রায় সমস্তটা ঢাকিত। আজকাল উপবীত বলিলে আমরা সূতার নির্ম্মিত পৈতা বুঝি; কিন্তু প্রাচীনকালে বস্ত্র, চর্ম্ম বা কম্বলের চাদরকে উপবীত বলা হইত।

এইরূপ চাদর ডান হাতের নীচে দিয়া ও বাঁ কাঁধের উপর দিয়া পরিতে হইত। এই চাদর এই ভাবে না পরিয়া অন্যভাবে পরিলে উহাকে অন্য অন্য নাম দেওয়া হইত। উপনয়ন সংস্কারের সময় উপবীত ধারণ করিতে হইত। শুধু উপনয়নের সময় নয়, যজ্ঞ ও বেদপাঠ করিতে, গুরু ও অতিথির কাছে যাইতে, আহার করিবার সময় ও আচমন করিবার সময় উপবীত ধারণ করিবার নিয়ম ছিল। ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারীর উপবীত কৃষ্ণসার নামক হরিণের চামড়া বা কার্পাস-সূত্রের, ক্ষত্রিয়-ব্রহ্মচারীর উপবীত রুরু নামক মৃগের চামড়া বা শণ-সূত্রের, এবং বৈশ্য-ব্রহ্মচারীর উপবীত ছাগচর্ম্ম বা ভেড়ার লোমের হইত। কোন কোন সময়ে গরুর চামড়া ব্যবহার করা হইত। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কম্বলও চলিত ছিল। কালক্রমে ভারতবর্ষের মত গরম দেশে চর্ম্ম, বস্ত্র বা কম্বল চাদর রূপে সকল শুভকর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যবহার করা বোধহয় অসুবিধাজনক মনে হয়। সেইজন্য পরবর্ত্তীযুগে সূতা দ্বারা উপবীত নির্ম্মিত হইতে থাকে। এইরূপে চাদর ক্রমে পৈতায় পরিণত হয়। এই সময়ে পৈতা কুশ, শণ, গরুর লেজের লোম, গাছের ছাল বা অন্য কোন জিনিষ দিয়াও তৈয়ারী হইত।

উপনয়ন

পিতৃগৃহে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিবার পর আচার্য্যের নিকট হইতে বেদশিক্ষা করিবার পূর্ব্বে যে সংস্কারের নিয়ম ছিল, তাহার নাম উপনয়ন; ইহার অর্থ 'নিকটে লইয়া যাওয়া,' অর্থাৎ শিক্ষার জন্য গুরুর কাছে প্রেরণ করা। এই উপনয়ন না হইলে কাহারও বেদপাঠ করিবার অধিকার জন্মিত না। এই অনুষ্ঠানের এত গৌরব ছিল যে, ইহাকে দ্বিতীয় জন্ম বা ব্রহ্মজন্ম বলা হইত। মানুষের জন্ম পশু-পক্ষীর মতই সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু শাস্ত্রপাঠ দ্বারা মানুষের যে জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তাহাতে সে যেন নূতন করিয়া জন্মলাভ করে। কেননা শরীরের জরা ও মরণ আছে, কিন্তু জ্ঞানের জরা বা মরণ নাই।

অতি প্রাচীনকালে শিষ্যগণ আচার্য্যের কাছে গিয়া মুখে বলিতেন,—'আমি উপনীত হইলাম'। তাহাতেই আচার্য্যেরা তাহাদিগকে পড়াইতেন। অতি প্রাচীন কোন গ্রন্থে উপনয়নের কথা পাওয়া যায় না। ইহা পরে প্রবর্ত্তিত হয় এবং কালক্রমে ইহার বিস্তৃত পদ্ধতি গড়িয়া উঠে। অথর্ব্ববেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থে ইহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। পরিণত অবস্থায় যে অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে বেশ একটু গাম্ভীর্য্য আছে; তাহাতে বিদ্যারম্ভের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে শিষ্যের মনে তাহার নূতন জীবনের কর্ম্ম ও দায়িত্ব সম্বন্ধে একটি মহত্ত্বপূর্ণ ধারণা জন্মিত; এবং ইহার ছাপ তাহার পরবর্ত্তী কর্ম্ম ও জীবনের উপরেও পতিত হইত। অতি অল্প বয়সেই উপনয়ন দিবার নিয়ম ছিল। ব্রাহ্মণের চার, ক্ষত্রিয়ের পাঁচ ও বৈশ্যের সাত বৎসরের সময় উপনয়ন দিবার রীতি ছিল, তবে কোন কারণে না হইলে পরেও হইতে পারিত। কিন্তু উপনয়ন না হইলে সমাজে নিন্দিত হইতে হইত, এমন কি পতিত বলিয়া লোকে ঘৃণা করিত।

উপনয়নের দিন বালককে অতি ভোর বেলায় উঠিতে হইত। তারপর তাহাকে কিছু খাইতে দেওয়া হইত, তাহার চুল পরিপাটি করিয়া দেওয়া হইত, স্নান করান হইত, অলঙ্কার এবং নূতন বস্ত্র পরান হইত। তাহাকে আচার্য্যের কাছে লইয়া গেলে তিনি প্রথমতঃ অগ্নির উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠ করিতেন। বালক অগ্নিকুণ্ডের উত্তরপশ্চিম দিকে চাহিয়া হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইত; আর আচার্য্যও হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বালকের হাতের উপরে রাখিতেন। আর এক জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ অগ্নিকুণ্ডের দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইতেন এবং তিনি আচার্য্যের অঞ্জলিবদ্ধ হাতে জল ঢালিয়া দিতেন। শিষ্য গুরুর দিকে চাহিয়া থাকিত, এবং গুরু এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন—"যে আমার কাছে আসিয়াছে তাহার শান্তি হউক।" ইহার পর গুরু শিষ্যকে এক নূতন নাম দিতেন, অভিবাদন করিবার সময় এই নাম উচ্চারণ করিতে হইত। আচার্য্যের অঞ্জলিবদ্ধ হাত হইতে জল শিষ্যের অঞ্জলিতে দেওয়া হইত। তাহার পর আচার্য্য নিজ হাতের মধ্যে শিষ্যের হাত লইয়া মন্ত্র পাঠ করিতেন। আচার্য্য শিষ্যকে বলিতেন—"সূর্য্যের গতি অনুসরণ কর, তিনি তোমাকে বাম হইতে দক্ষিণ দিকে চালাইবেন।" শিষ্য অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিতে থাকে এবং গুরু এই কথা বলিতে থাকেন—"আমরা যেন শান্তিতে বিচরণ করি; এ (শিষ্য) যেন শান্তিতে বিচরণ করে, গৃহে ফিরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত এ যেন শান্তিতে বিচরণ করে।" গুরুর বচন অনুসারে শিষ্য বলিত—"আমি শিষ্য হইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমাকে দীক্ষা দিন্।" এই সময় হইতে বালককে ব্রহ্মচারী বল

হইত। গুরু ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন—"তুমি এখন ব্রহ্মচারী হইলে। তুমি অগ্নিতে কাষ্ঠ প্রদান কর। অন্তর শুদ্ধ কর। সেবা-ব্রত গ্রহণ কর। দিনের বেলায় ঘুমাইও না। ইহার পর আচার্য্য উপবেশন করিবেন এবং শিষ্য তাঁহার সম্মুখে দক্ষিণজানু নতকরিবে এবং হাত জোড় করিয়া থাকিবে। আচার্য্য শিষ্যের কটিদেশে, বামহস্তে দক্ষিণদিকে, মুঞ্জানামক এক রকমের ঘাসের মেখলা বাঁধিয়া দিবেন। তখন ব্রহ্মচারী গুরুর কাছে বসিবে এবং গুরুকে পাঠ দিতে অনুরোধ করিবে। গুরু সাবিত্রী-মন্ত্র পাঠ করাইবেন, এইসব হইয়া গেলে আচার্য্য শিষ্যকে কোন কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত দণ্ড (লাঠি) দিবেন। শিষ্য এই কথা বলিবে —"হে মহান্, আমাকে মহীয়ান্ করুন্।" তারপর আচার্য্য তাঁহার দক্ষিণ হাত দ্বারা শিষ্যের দক্ষিণকাঁধ এবং বামহাত দ্বারা বাম কাঁধ স্পর্শ করিবেন, এবং তাঁহার দক্ষিণবাহু নিজের দিকে টানিয়া লইয়া সাবিত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার হৃদয় স্পর্শ করিবেন এবং বলিবেন—"তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে অবস্থান করুক্, তুমি তোমার মনদ্বারা আমার মনকে অনুসরণ করিবে, তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে আমার বাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিবে,বৃহস্পতি তোমাকে আমাতে যুক্ত করুন্। তুমি শুধু আমার প্রতি অনুরক্ত হইবে। আমাতে যেন তোমার সকল চিন্তা অবস্থান করে। আমার প্রতি তোমার ভক্তি হউক্। আমি যখন কথা বলি তখন তুমি মৌন থাকিবে। আমি যেন তোমার প্রিয় হই।

উপনয়ন হইয়া গেলে ব্রহ্মচারীগণকে দণ্ড ধারণ করিয়া সূর্য্যের উপাসনা পূর্ব্বক তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে হইত, তাহার পর তাহাদিগকে ভিক্ষা করিতে হইত। প্রথম ব্রহ্মচারী মা, ভগিনী বা মাসী বা অন্যকোন আত্মীয়ার কাছে যাইয়া "মহাশয় ভিক্ষা দিন্" বলিয়া ভিক্ষা চাহিত। যতটা দরকার ততটা মাত্র ভিক্ষা পাইলেই ব্রহ্মচারী গুরুকে নিবেদন করিয়া আচমন পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে শুচি হইয়া বসিয়া ভোজন করিত।

ব্রহ্মচারী

সেকালে ছাত্রাবস্থার নাম ছিল ব্রহ্মচর্য্য এবং ছাত্রকে বলা হইত ব্রহ্মচারী; কেননা, ব্রহ্ম বা বেদ চর্চ্চা করিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করা হইত। শুধু জ্ঞান-লাভ করাই যথেষ্ট ছিল না, ছাত্রদিগের চরিত্রগত শিক্ষার দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইত। এই জন্য ব্রহ্মচারী মনে শুধু বেদপাঠকারী নয়, চরিত্রগঠনকারীও। চরিত্র-গঠনের জন্য কতকগুলি কাজ ছাত্রদিগকে করিতে হইত, আর কতকগুলি কাজ করা নিষেধ ছিল। যতদিন ছাত্রেরা গুরুর গৃহে বাস করিত, ততদিন ব্রহ্মচর্য্যের সুকঠিন নিয়মগুলি উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র সকল ছাত্রকেই মানিয়া চলিতে হইত। ইহাকে ছাত্র-জীবনের কর্ম্মযোগ বলা হইয়াছে:

গুরু, শিষ্যের উপনয়ন দিয়া প্রথমে তাহাকে স্নান, আচমন প্রভৃতি শৌচক্রিয়া শিখাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার, সকালে বিকালে অগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করা, হোম এবং সান্ধ্যোপাসনা শিক্ষা দিবেন। বেদ পড়িতে আরম্ভ করিবার এবং শেষ করিবার সময় শিষ্য নিজের হাত দুটি আড়াআড়ি করিয়া গুরুর পা ধরিবে, যেন তাহার ডান হাত গুরুর ডান পা এবং তাহার বাঁ হাত গুরুর বাঁ পা স্পর্শ করে। তারপর পড়িবার জন্য শিষ্য, শাস্ত্রানুসারে আচমন করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক উত্তরদিকে মুখ করিয়া ও দুই হাতে অঞ্জলি করিয়া পবিত্র বেশে বসিবে। তখন গুরু তাহাকে পড়াইবেন। শিষ্য যখন পাঠ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিবে তখন গুরু তাহাকে "ওহে, অধ্যয়ন কর," বলিয়া পাঠ আরম্ভ করাইবেন ও "এই খানে পাঠ রহিল" বলিয়া অধ্যয়ন শেষ করাইবেন। বেদপড়িবার গোড়াতে ও শেষে প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত

ব্রহ্মচারীদিগকে অতি ভোরে ঘুম হইতে উঠিতে হইত এবং শৌচক্রিয়ার পর প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে হইত। প্রাতঃকালে সূর্য্য না দেখা পর্য্যন্ত এক জায়গায় দাঁড়াইয়া সাবিত্রী মন্ত্র জপ করিতে হইত আবার সন্ধ্যাকালেও নক্ষত্র না দেখা পর্য্যন্ত আসনে বসিয়া জপ করিবার নিয়ম ছিল। ছাত্র অবস্থায় অর্থাৎ যত দিন ছাত্র গুরুকুলে বাস করিত, ততদিন তাহাকে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে হোমকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি জ্বালাইতে হইত, ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতে হইত, বিছানায় না শুইয়া মাটির উপর শুইতে হইত। বিদ্যা ও বয়সে যাঁহারা বড়, তাঁহাদের শয্যা বা আসন ব্যবহার করিবার বিধান ছিল না। গুরুজনকে প্রণাম করিবার সময় নিজের নাম বলিয়া "আমি অমুক, আপনাকে প্রণাম করিতেছি" বলিতে হইত।

ব্রহ্মচারী প্রতিদিন স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পন এবং দেবতাদের পূজা করিবে। ব্রহ্মচারী মধু ও মাংস খাইবে না, গন্ধদ্রব্য ব্যবহার

করিবে না বা মালা পাড়িবে না, গুড় প্রভৃতি রস-দ্রব্য ও দই খাইবে না, প্রাণি-হিংসা করিবে না। ব্রহ্মচারীর পক্ষে সারা গায়ে তেল মাখা, চক্ষুতে কাজল দেওয়া জুতা বা ছাতা ব্যবহার করা, নাচ, গান বা বাজনা বা পাশা খেলা প্রভৃতিতে যোগ দেওয়া এবং কোথায় কি হইল সে সব খবর লওয়া নিষেধ। তাহার পক্ষে সকল জায়গাতেই একা শুইবার নিয়ম।

আচার্য্যের প্রয়োজন অনুসারে ব্রহ্মচারী কলসে করিয়া জল, পুষ্প, গোবর, মাটি ও কুশ আহরণ করিবে এবং ভিক্ষা করিবে। ভাল গৃহস্থের বাড়ী হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার নিয়ম ছিল। ব্রহ্মচারীর পক্ষে আলস্য খুব নিন্দনীয় ছিল। অসুস্থ না হইয়াও যে সাতদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষা ও হোম না করিত, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। প্রতিদিন এক-জনের নিকট হইতে ভিক্ষা লওয়ার রীতি ছিল না। ব্রহ্মচারীকে দিনে একবার খাইতে হইত বলিয়া তাহার নাম ছিল 'একান্ন'। ব্রহ্মচারী শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলেও ব্রহ্মচারীর মত খাদ্য খাইতে পারিত।

গুরুর সেবা করা ও গুরুর প্রতি সম্মান দেখান সেকালের ছাত্রদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। গুরুর গা মলিয়া দেওয়া, গুরুকে স্নান করান, গুরুর পা ধোয়ান এবং গুরুর উচ্ছিষ্ট খাইবার নিয়ম ছিল। গুরুর সম্মুখে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত, এবং বস' বলিলে বসিতে হইত। যে কোন প্রকারে হউক, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইত। গুরুকে সেবা দ্বারা বশ করিয়া শিষ্য ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিবে, ইহাই ছিল সেকালের প্রথা।

শিক্ষার বিষয়

সাধারণভাবে বেদশিক্ষা করিবার জন্যই প্রাচীন গুরুকুলে যাইতে হইত। তিন উচ্চ বর্ণের ছাত্রেরা সকলেই কম বেশী বেদ পাঠ করিত। বেদের ছয়টি অঙ্গ ছিল, যথা—শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, কল্প ও জ্যোতিষ। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি বেদমন্ত্র ঠিক করিয়া পাঠ করিবার জন্য, পরের দুইটি মন্ত্রের অর্থ ঠিক করিয়া বুঝিবার জন্য এবং শেষ দুইটি উহা যজ্ঞে ব্যবহার করিবার জন্য দরকার হইত। ক্রমে বেদ চর্চ্চা হইতে অন্য অন্য শাস্ত্র উদ্ভূত হয়। বেদের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে গিয়া ব্যাকরণ ও নিরুক্ত সৃষ্ট হয়। যজ্ঞের বেদী নির্ম্মাণ করিতে গিয়া জ্যামিতি ও বীজ-গণিত এবং যজ্ঞের সময় নিরূপণ করিতে গিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্র সৃষ্টি হয়। পরে বেদের নানা শাখা বিশেষ বিশেষ গুরুকুলে পঠিত হইত। বৈদিক সাহিত্য পরে আরও বিস্তৃত হয়। আরণ্যক, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ প্রভৃতি রচিত হয়। তাহার পর পুরাণ, সূত্র প্রভৃতি রচিত হয়। এই সমস্ত গুলিও পাড়তে হইত। ব্রাহ্মণ ছাত্রেরাই বিশেষ করিয়া এইগুলি শিক্ষা করিত।

বিশেষ শিক্ষা

সকল ব্রাহ্মণই যে কেবল শাস্ত্র লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন তাহা নহে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমরা পৌরাণিক যুগে ব্রাহ্মণদিগকে অস্ত্ররূপেও দেখিতে পাই। মহাভারতের যুগে কুরুপাণ্ডবের শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, পরশুরাম ইত্যাদির কথা জানা যায়।

ক্ষত্রিয় ছাত্রগণ তাহাদের ভবিষ্যতের উপযোগী শিক্ষা পাইত। তাহারা দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী বিশেষভাবে পড়িত। ইহাতে তাহাদের রাজাশাসন কার্য্যে সাহায্য হইত। বিশেষভাবে তাহাদিগকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে হইত।

বৈশ্য ছাত্রগণ বার্ত্তা ও শিল্প শাস্ত্র শিক্ষা করিত। ইহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহাদের সাহায্য হইত।

এই সব ছাড়া চিকিৎসা এবং জ্যোতিষ শিখাইবার কথাও পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এই সব কাজ করিলে নিন্দার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত।

হিন্দুযুগের শেষ দিকে আমরা তক্ষশিলায় ও কাশীতে গন্ধৰ্ব্ব বিদ্যালয়, আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ধনুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখিত দেখিতে পাই।

চরক

এক শ্রেণীর ছাত্রের কথা আমরা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। ইহারা এক গুরুর নিকট শিক্ষা সমাপন করিয়া অন্য গুরুর নিকট উচ্চতর শিক্ষার জন্য যাইত। ইহাদের নাম ছিল 'চরক'। দেশে বহুস্থানে বহু গুরুকুল ছিল, যাহাতে দেশবিখ্যাত আচার্য্য ও উপাধ্যায়গণ পাঠ দিতেন। তাঁহাদের সুনামে আকৃষ্ট হইয়া শিষ্যগণ অন্য গুরুকুল হইতে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য আসিত।

অধ্যয়ন কাল

সেকালে অধ্যয়নের একটি বিশিষ্ট সময় ছিল। অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার সময় উপাকর্ম্ম বা শ্রাবণী

উৎসব করা হইত। বর্ষার ঠিক পরে শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে এই সব উৎসব হইত। এই সময় হইতে পৌষ বা মাঘ মাস পর্য্যন্ত প্রায় ছয় মাস পড়া হইত।

দিনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিবার প্রথা ছিল।

অনধ্যায়

ছাত্রেরা স্বভাবতঃই পড়িতে যেমন ভালবাসে ছুটিও সেইরূপ পছন্দ করে। সেকালে ছুটির নাম ছিল 'অনধ্যায়' অর্থাৎ পাঠ না করা। আজকালকার মত সেকালেও নানা কারণে ছুটি হইত। কতকগুলি তিথিতে পড়িবার নিয়ম ছিল না। যেমন, প্রতিপদ, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা। কতকগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটিলে পড়া বন্ধ থাকিত। যেমন, সূর্য্যমণ্ডল হইলে, সন্ধ্যাকালে বা অকালে মেঘগর্জ্জন হইলে, ভূমিকম্প, উল্কা বা বজ্রপাত হইলে, চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণ হইলে, উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন দিনে, খুব বেগে ঝড় উঠিলে। ছুটির কতকগুলি ব্যক্তিগত কারণ ছিল; যেমন অসুখ-বিসুখ হইলে (যেমন, বমি, উদ্গার, অজীর্ণ), কোন মন্দির, শ্মশান, চৌরাস্তা প্রভৃতি স্থানে গেলে, বা কোন যান-বাহনে কোথাও যাইতে থাকিলে পড়া বন্ধ থাকিত। কোন কোন পারিবারিক ও সামাজিক কারণেও ছুটি হইত, যেমন, গৃহে শ্রোত্রিয় উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ অপমানিত হইলে, গ্রামে ঝগড়া বা আগুন লাগিলে, ব্রাহ্মণ মারা গেলে, শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলে, দেশে যুদ্ধ লাগিলে। আজকাল যেমন অনেক সময় অতি সামান্য ব্যাপারের জন্যও ছুটি হয়, সেকালেও যে সেরূপ হইত না তাহা বলা যায় না। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, কুকুর, শেয়াল ও গাধা ডাকিলেও ছুটির নিয়ম ছিল! বীণা, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাজনা বাজিলে অথবা রথের শব্দ হইলেও পড়াশুনা বন্ধ রাখিতে হইত।

শাস্তি

সেকালের গুরুকুলে সকলকেই নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত। যাহার যখন যে কাজ, তাহার ব্যতিক্রম করিবার উপায় ছিল না। কেহ কর্ত্তব্য করিতে ত্রুটি করিলে নিন্দার পাত্র হইত, তাহাই যথেষ্ট শাস্তি ছিল। গুরু ইচ্ছা করিয়া বা রাগান্বিত হইয়া সহজে শাস্তি দিতেন না। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত লালন-পালন করিয়া পনর বৎসর পর্য্যন্ত তাড়না করিবার নিয়ম দেখা যায়; আর ষোল বৎসর বয়স হইলে পুত্রকে মিত্রের মত দেখিতে হইত। গুরুর প্রতি সেকালে এইরূপ আদেশ ছিল—"অতি তাড়না সহকারে শিষ্যাদিগকে শিক্ষা দিবে না। ধর্ম্ম-কামনায় যিনি শিক্ষা দান করেন, শিষ্যের প্রতি তিনি মধুর এবং নম্র বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন।" কোনরূপে ছাত্রের চরিত্র শোধিত না হইলে নানারূপ শাস্তির বিধান ছিল। বকা, ভয় দেখান, ঠাণ্ডা জল গায় দেওয়া ও গুরুর সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দেওয়া প্রভৃতি শাস্তি দেওয়া হইত।

স্ত্রী-শিক্ষা

বৈদিক যুগে স্ত্রী-শিক্ষার বেশ প্রচলন ছিল; অন্ততঃ উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা পাইতেন। উপনিষদের ঋষি পণ্ডিতা দুহিতার কামনা করিয়াছেন। যে সব স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিয়া বিবাহ করিতেন, তাঁহাদিগকে সদ্যোবধূ বলা হইত; তাঁহারা গৃহস্থালীর কাজও শিক্ষা করিতেন। আর যাঁহারা বহুদিন বা সারাজীবন বেদ আলোচনা করিতেন এবং বিবাহ করিতেন না, তাঁহাদের উপাধি ছিল ব্রহ্মবাদিনী। বেদের কোন কোন মন্ত্র ব্রহ্মবাদিনীদিগের দ্বারা রচিত বলিয়া জানা যায়। সদ্যোবধূ ও ব্রহ্মবাদিনী উভয় শ্রেণীর ছাত্রীদেরই উপনয়ন ও উপবীত ধারণ করিবার অধিকার ছিল। পরবর্ত্তী যুগে তাঁহাদের এই অধিকার অস্বীকার করা হইয়াছিল।

দক্ষিণা

প্রাচীনকালে বিদ্যা দানের বস্তু বলিয়া মনে করা হইত। সেইজন্য শিষ্যগণ বিনা খরচে শুধু বিদ্যা নয়, খাওয়া-পরাও পাইত। তবে গুরুর গৃহ হইতে পড়াশুনা শেষ করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইবার সময় গুরুকে সন্তুষ্ট করিতে হইত। ইহার নাম ছিল দক্ষিণা। এ সম্বন্ধে নিয়ম এইরূপ ছিল—"যে শিষ্য ধর্ম্ম কি তাহা জানে সে গুরুর গৃহ হইতে বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে গুরুকে দক্ষিণাস্বরূপ দান দিবে না; পরে যখন গুরুর আজ্ঞানুসারে পড়া শেষ করিবে, তখন গুরুকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। তখন ক্ষেত্র, সুবর্ণাদি, গো, অশ্ব, ছত্র, চর্ম্মপাদুকা, আসন, ধান্য, শাক, বস্ত্র—যাহা কিছু হউক, গুরুকে দিয়া গুরুর প্রীতি উৎপাদন করিবে।" অনেক সময়ে গুরু এমন সব জিনিষ চাহিতেন; যাহা সংগ্রহ করিতে শিষ্যকে বড় বেগ পাইতে হইত।

সমাবর্ত্তন

ব্রহ্মচর্য্য বা বেদভ্যাস শেষ করিয়াও গুরুকে দক্ষিণা দিয়া বাড়ী ফিরিবার নাম ছিল 'সমাবর্ত্তন।' ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হইলে বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল, স্নান; স্নান করিলে ব্রহ্মচারীকে 'স্নাতক' বলা হইত। গুরু নিজে সুবাসিত জলে শিষ্যকে স্নান করাইতেন এবং তাহাকে নূতন বস্ত্র ও অলঙ্কার দিতেন। স্নাতক তিন রকমের ছিল। যে বেদপাঠ সমাপ্ত করিত কিন্তু যে-সব ব্রত করণীয় ছিল তাহা সমাপ্ত করিতনা, তাহাকে বিদ্যা-স্নাতক' বলা হইত। যে ব্রত সমাপ্ত করিত কিন্তু বেদ অসমাপ্ত রাখিত, তাহার নাম ছিল 'ব্রত স্নাতক'; আর যে বেদ ও ব্রত উভয়ই সমাপ্ত করিত, তাহাকে বলা হইত, 'বিদ্যা-ব্রত-স্নাতক'। স্নাতক সেকালের 'গ্র্যাজুয়েট' ছিল বলিয়া মনে হয়। এই স্নাতক-ব্রাহ্মণের এতদূর সম্মান ছিল দেখা যায় যে, রাস্তায় যে-কাহারও সঙ্গে দেখা হউক, এমন কি রাজাকেও, সকলের আগে স্নাতক ব্রাহ্মণকে পথ ছাড়িয়া দিতে হইত।

সকল ছাত্রই যে গুরুকে দক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তন করিত, তাহা নহে; অনেকে সারা জীবন গুরুর গৃহে থাকিয়া বেদভ্যাস করিত। ইহাদিগকে 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী' বলিত।

পরীক্ষা

সেকালে গুরুগৃহে শিক্ষালাভ হইত বলিয়া যে একেবারে পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, তাহা নহে। আমরা দেখিতে পাই যে, সেকালের পরীক্ষা আরও শক্তছিল, কেননা গুরুর সঙ্গে কোনও পরিষদে উপস্থিত হইয়া ছাত্রগণকে বিচার করিতে হইত। যে শিক্ষা গুরুর গৃহে থাকিয়া লাভ করা হইত তাহার পরিচয় ও পরীক্ষা পণ্ডিত সমাজের কাছে দিতে হইত। এই সমাজের নাম ছিল পরিষদ বা গোষ্ঠী। এই পরিষদে শুধু বিশিষ্ট গুরু ও পণ্ডিতদিগেরই স্থানছিল এমন নহে, উহাতে ছাত্রদের প্রতিনিধি থাকিত। এইরূপ বহু পরিষদের কথা প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা "পাঞ্চাল পরিষদের" উল্লেখ পাই। উহা হইতে জানিতে পারি যে, সেই সুদূর যুগেও ঐ সব পরিষদে কিরূপ উচ্চ অঙ্গের আলোচনা হইত।

অধিকার

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলেরই উপনয়ন সংস্কারের পর শিক্ষালাভ করিতে হইত। কাহাকেও পরীক্ষা না করিয়া গুরুকুলে ভর্ত্তিকরা হইত না। কে বিদ্যালাভের উপযুক্ত এবং কাহার বিদ্যার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা আছে, তাহা বুঝিবার জন্য নানারকম কাজের মধ্য দিয়া পরীক্ষা লওয়া হইত। অপাত্রে বিদ্যাদান করা খুব নিন্দার বিষয় ছিল। যে শুধু লেখাপড়া শিখিতে পারে কিন্তু যাহার চরিত্র গঠিত হয় নাই, তাহাকে বিদ্যা দান করিবার রীতি ছিল না। বিশেষ করিয়া বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র যাহাকে তাহাকে পড়াইবার নিয়ম ছিল না। 'অপুত্র' অর্থাৎ অযোগ্য পুত্র, এবং 'অশিষ্য' অর্থাৎ অযোগ্য শিষ্যকে বেদবিদ্যা দেওয়া হইত না। আমরা এইরূপ একটি গল্প পাই—বিদ্যাদেবী যেন ভয়ে ভীত হইয়া এক অধ্যাপকের নিকট আসিয়া বারবার অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন—'হে আচার্য্য আমি রত্নস্বরূপা, আমাকে যত্ন করিয়া রক্ষা করিও, যাহার মনে শ্রদ্ধা নাই, যাহার চরিত্রে নানা দোষ আছে, এমন অপাত্রে আমাকে কখনও দিওনা, তাহা হইলে আমার তেজ নষ্ট হইয়া যাইবে।' কাহারও নিকট হইতে কিছু জানিতে হইলে প্রশ্ন করিবার কতকগুলি নিয়ম ছিল। যেমন তেমন করিয়া অশ্রদ্ধার সঙ্গে প্রশ্ন করিলে 'প্রশ্নধর্ম্ম' রক্ষিত হইত না; এই অবস্থায় গুরু জানিয়া শুনিয়াও উত্তর দিতেন না। ভাল বীজ যেরূপ লোণা ভূমিতে বুনিতে হয়না, সেইরূপ যেখানে ধর্ম্ম বা সেবা-শুশ্রূষার সম্ভাবনা নাই সেখানে বিদ্যাদান কর্ত্তব্য নয়— এইরূপ ধারণা সে-কালে ছিল। যে কেহ শুধু চাহিলেই বা টাকা দিলেই পড়িবার অধিকার পাইত না।

শিক্ষার সহিত জীবনের সম্বন্ধ

আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কতকগুলি স্পন্দন লাভ করি মাত্র, তাহাদের অর্থ বোধ হয় মনের শক্তি আমাদের মধ্যে আছে বলিয়া। আবার, আমাদের জীবনীশক্তি না থাকিলে ইন্দ্রিয় বা মনের কাজ চলিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দ, রূপ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুভূতি হয়, এবং মন দ্বারা চিন্তা করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু প্রাণ না থাকিলে ইহার কিছুই হইতে পারে না। এই কথা উপনিষদে এইরূপ ভাবে বুঝান হইয়াছে "বাক্‌শক্তিহীন ব্যক্তিরও জীবন দেখা যায়, মূক সকলই তাহার দৃষ্টান্ত। দর্শনশক্তিহীন ব্যক্তিরও জীবন দেখা যায়, অন্ধ সকলই তাহার দৃষ্টান্ত। শ্রবণশক্তিহীন ব্যক্তিরও জীবন দেখা যায়, বধির সকলই

F. 4

তাহার দৃষ্টান্ত। চিন্তাশক্তিহীন ব্যক্তিরও জীবন দেখা যায়, বালক সকলই তাহার দৃষ্টান্ত।'' আর আমাদের যদি প্রজ্ঞা বা মনের শক্তি না থাকে তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গুলি যাহা কিছু আমাদের মনের দরজায় লইয়া আইসে, তাহা আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তখন আমরা বলি 'আমি উহা জানিতে পারি নাই, আমার মন অন্য দিকে ছিল।'

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিন্তা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, তাহারা বলিয়াছেন—যে সব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এবং যে মনের বলে আমরা জ্ঞানলাভ করি, শুধু সেগুলিকে জানিলেই মানুষের তৃপ্তি হয় না, মানুষের আত্মা, যাহা এইসব জ্ঞানের বিষয় জানে, তাহাকে জানিতে হইবে। ''শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে জানিতে হইবে না, শ্রোতাকে জানিতে হইবে, ইত্যাদি। মনকে জানিতে হইবে না, মননের কর্তাকে জানিতে হইবে।'' সকল জ্ঞানকে ছাড়াইয়া গিয়া আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, ইহাই প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই মন ও বুদ্ধির দ্বারা যে বাহিরের জ্ঞান লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞানই প্রাচীন ভারতীয়গণ অনুসন্ধান করিতেন।

প্রাচীন কালের আচার্য্যগণ যে সব উপদেশ দিতেন তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি তাহারা মানুষের জীবনে জ্ঞানের স্থান কোথায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাহারা শুধু জ্ঞানকে জ্ঞান হিসাবে চাহিতেন না, জীবনকে উন্নত ও তেজস্বী করিবার জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন, ইহাই তাঁহাদের উপদেশের মর্ম্ম ছিল।

উপনিষদের ঋষি শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ''আমাদের উভয়ের অর্থাৎ শিষ্য ও আচার্য্যের যশ হউক। আমাদের উভয়ের ব্রহ্মতেজ হউক। আমাদের দুজনের জ্ঞান বর্দ্ধিত হউক।'' আচার্য্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন ''আমি যেন কর্ণে বহু শ্রবণ করি।...আমার শ্রবণ দ্বারা উপার্জ্জিত জ্ঞানকে রক্ষা কর। ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুক, ব্রহ্মচারিগণ শীঘ্র শীঘ্র আমার নিকট আসুক।'' ঋষি আরও প্রার্থনা করিয়াছেন, যেন সংসারের সমুদয় কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপন যত্নের সঙ্গে করিতে পারেন, কেননা অধ্যয়ন না করিলে অর্থজ্ঞান হয় না; আর অর্থজ্ঞান স্মরণ রাখিবার জন্য এবং ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য অধ্যাপনের প্রয়োজন।

সকল শিক্ষা শেষ হইলে আচার্য্য শিষ্যকে এই উপদেশ দিতেছেন ''সত্য বলিবে। ধর্ম্মাচরণ করিবে। বেদাধ্যয়নে ঔদাস্য করিবে না। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। সত্য হইতে বিচলিত হইবে না। কুশল হইতে বিচলিত হইবে না। মঙ্গললাভে ঔদাস্য করিবে না। বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনে ঔদাস্য করিবে না। দেব ও পিতৃকার্য্যে ঔদাস্য করিবে না। মাতাকে দেবীবৎ পূজা করিবে। পিতাকে দেববৎ পূজা করিবে। আচার্য্যকে দেববৎ পূজা করিবে। যে সকল কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সেই সকল কর্ম্ম করিবে।''

মোঙ্গোলিয়া

১৩০২ পৃষ্ঠার পর

মোঙ্গোলিয়া দেশটি বেশ বড়। এসিয়ার মধ্যস্থলে ইহার অবস্থান। মোঙ্গোলিয়া মালভূমি—উচ্চতা ৩০০০ তিন হাজার হইতে ৪০০০ চার হাজার ফিট। পরিমাণ ফল ১,৮৭৫,০০০ বর্গমাইল চারিদিক বেড়িয়া উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। এখানকার জলবায়ুতে কোনও বৈচিত্র্য নাই। শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই প্রখর। এদেশে নদী নাই—বৃষ্টিও নাই। দেশের বেশীর ভাগ ভূমিই গোবী বা সামো মরুভূমির অন্তর্ভুক্ত। ইহার পূর্ব্বসীমা মাঞ্চুরিয়া, দক্ষিণ সীমা চীনগণতন্ত্র, পশ্চিম ও উত্তর সীমা সোবিয়েট গণতন্ত্র। মোঙ্গোলিয়ার একাংশ গণতন্ত্র শাসিত দেশ—উহার সহিত সোবিয়েট ইউনিয়ানের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে।
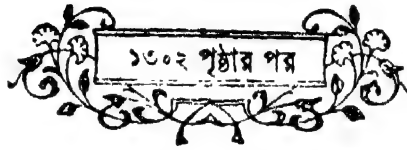
এদেশের লোকেরা তাতার জাতীয়। ইহারা যাযাবর। কোনও নির্দ্দিষ্ট বাড়ী ঘর নাই। অনেকটা আমাদের দেশের বেদেদের মত। ঋতু ভেদে মোঙ্গলেরা উট, ঘোড়া, প্রভৃতি লইয়া চীন, রুশ প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করে।

মোঙ্গোলিয়ার রাজকর্ম্মচারী

মোঙ্গলদিগের গায়ের রঙ্ পীত। ইহাদের নাক চেপ্টা, চোখ ছোট, মাথার চুল খাড়া এবং অল্প দাড়ী-গোঁপ হয়।

মোঙ্গোলিয়ার জনসংখ্যা মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা আর নাই। বর্ত্তমান সময়ে ২,৬০০,০০০। পূর্ব্বে মোঙ্গোলিয়ার কর্ত্তৃত্বটা চীনের মাঞ্চুদের উপর থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কোনও প্রভুত্ব ছিল না। মাঞ্চু-রাজকর্ম্মচারীরা অনেকে এখানকার মাটিতে পা দিয়াছেন কিনা তাহাই সন্দেহ। মোঙ্গলেরা নিজ দেশে নিজেরা স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে। এই সব শাসন-ভার দেশীয় রাজাদের উপরেই ন্যস্ত আছে। মাঞ্চুরা চলিয়া গেলে মোঙ্গলেরা চীনাদের কোন প্রভুত্ব আর মানিয়া লয় নাই। তাহারা নিজেদের শাসনকর্ত্তা নিজেরাই নিযুক্ত করিয়া লইল। শাসনকর্ত্তার নাম 'হুতুকথিউ' (Hutukhtiu) বা বোগ্‌দা খান্। শেষটায় চীন গণতন্ত্র যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহাদের ভাগ্যের

পরিবর্ত্তন ঘটিল—চীন গণতন্ত্র ইহাদের অনেকাংশের শাসনভার গ্রহণ করিল।

মোঙ্গোলিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিয়াছিল তাহার অবস্থানের জন্য। পথঘাট নাই—চারিদিক বেড়িয়া পাহাড়-পর্ব্বত ও মরুভূমি; কাজেই, এমন দুর্গম দেশে চলাফেরার কোনও সুবিধা ছিল না বলিয়াই মোঙ্গোলিয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ছিল। সম্প্রতি রেলপথ তৈয়ারী হওয়ায় চীনের সহিত ইহার সংযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন মোঙ্গলেরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকের খবরাখবর রাখে।

এদেশে সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতির খনি আছে কিন্তু মোঙ্গলেরা তাহার দ্বারা কোনওরূপ লাভবান্ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কেননা, মোঙ্গলেরা সেদিকে বড় একটা লক্ষ্যই করে নাই। এই যাযাবর জাতি···পথঘাট, বাড়ীঘর, পল্লী ও নগর নির্ম্মাণ করিবার কোনও আবশ্যকতা মনে করে নাই। ষ্টেপ (Stepp) নামক তৃণাকীর্ণ ভূমির (মালভূমির) উপর দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে করিতে যেখানে সন্ধ্যা হয় সেইখানেই তাহারা শুইয়া পড়ে। জলেরও তেমন প্রয়োজনীয়তা নাই। কাজেই, স্নানের জন্য তাহাদের জলের কোনও আবশ্যকতা নাই। মোঙ্গলদের একমাত্র প্রিয় তাহাদের ঘোড়া ও উট। এই দুইটি প্রাণীর দ্বারাই তাহাদের জীবন-যাত্রা সহজে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের খাদ্য বল, বস্ত্র বল, জ্বালানি কাঠ বল, যানবাহন বল, সবই এই দুইটি জীব হইতে তাহারা পাইয়া আসিতেছে। সেই সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত একই ভাবে তাহারা তাহাদের জীবনধারা পরিচালিত করিতেছে। এক কথায় মোঙ্গলদের প্রধান কাজ··· পশু পালন।

উটের গাড়ীর যাত্রীদল

বরফের উপর উটের দল

তাতারদের জীবন, স্বাধীনতার জীবন। বাল্যকাল হইতেই তাতারেরা স্বাধীনতার আস্বাদ পায়। উন্মুক্ত প্রান্তরে বাস করিতে করিতে তাহারা নির্ভীক ও স্বাধীন প্রকৃতির হইয়া থাকে। বিধি-ব্যবস্থা, যুক্তিতর্ক, প্রহরী ও বিচারকের শাসন ও বিচার-বিধান তাহাদিগকে কোনদিন পীড়ন করিতে পারে নাই। তাহারা পূর্ব্বপুরুষদের রীতি-নীতি অনুসরণ করিয়াই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের ভেড়ার পাল, ঘোড়া, উটও বিভিন্ন দেশের সংমিশ্রণে আসে নাই।

যাত্রা-পথে উটের সারি

মোঙ্গোলিয়ার উটের সহিত অন্য কোন দেশের উটের তুলনা হয় না। আরব দেশের শীর্ণকায় কুৎসিত উটের সহিত মোঙ্গোলিয়ার উটের অনেকখানি প্রভেদ। বরফে ঢাকা দেশে বাস বলিয়া এদেশের উটদের গায়ে দীর্ঘ রোম হইয়া থাকে। দীর্ঘ রোমাবৃত মোঙ্গোলিয়ার উট দেখিতে অতি

সুন্দর। গ্রীষ্মকালে দীর্ঘ রোমাবলি খসিয়া পড়িলে দেখিতে বিশ্রী হয়—কিন্তু আবার যেমন শীত দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পূর্ব্বের শ্রী ফিরিয়া পায়। এ দেশের উট-চালকেরা বেশী দিন বাঁচে না।

কেননা, উটের শ্বাস ও প্রশ্বাস বিষাক্ত। উটের গায়ে এত জোর যে, পায়ের আঘাতে একখানি হাওয়া গাড়ীও চূর্ণ করিয়া দিতে পারে। মোঙ্গলেরা দুর্দ্দান্ত উটের গলায় লাল কাপড় বাঁধিয়া দেয়—সকলের সতর্কতার জন্য। উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমির উপর দিয়া উটেরা পিঠে বোঝা লইয়া স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে।

উটের চেয়েও এদেশের লোকের কাছে ঘোড়ার আদর বেশী। মোঙ্গোলিয়ায় ঘোড়াগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। কষ্টসহিষ্ণুতায়, দ্রুত গমনে ও বুদ্ধির হিসাবে মোঙ্গোলিয়ার টাট্টু ঘোড়ার (Pony) তুলনা মিলে না। শীতকালে মোঙ্গলেরা ঘোড়ার থাকিবার বা খাইবার কোন ব্যবস্থাই করে না। ঘোড়াগুলি স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়ায়। দারুণ শীতঋতুতে ইহাদের শরীরে দীর্ঘ রোম হয়, কাজেই, ইহারা শীতের আক্রমণে কাবু হইয়া পড়ে না। সে সময়ে পায়ের খুর দিয়া বরফ সরাইয়া ঘাস বাহির করিয়া লইয়া খায়। চীনদেশে মোঙ্গল-পনি খুব বেশী বিক্রয় হয়। মোঙ্গলেরা ঘোড়দৌড় খেলিতে বড় ভালবাসে। পঞ্চাশ হইতে একশত মাইল পর্য্যন্ত তাতার ও মোঙ্গলেরা ঘোড়া দৌড়াইতে পারে। এ দেশের লোকের এ কথা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও এদেশীয় ঘোড়া খুব ছুটিতে পারে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

মোঙ্গোলিয়ার লোকদের আমোদ-প্রমোদ, খেলা ধূলা, যা কিছু সব বৌদ্ধ মঠে হয়। মঠকে তাহারা যে শুধু ধর্ম্ম-কেন্দ্র মনে করে, তাহা নহে—উহাই তাহাদের একমাত্র মিলন ক্ষেত্র। তান্ত্রিক বৌদ্ধমত এদেশে প্রচলিত। নানাপ্রকার ভয় ভীতি দেখাইয়া মঠের পুরোহিতেরা যে শুধু অর্থ উপার্জ্জন করে তাহা নহে, নিরীহ অধিবাসীদিগকে পীড়নও করিয়া থাকে। মঠের বাড়ীগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। মূল্যবান্ দ্রব্যাদি ও সোনারূপার নানারূপ কারুকার্য্যশোভিত মঠগুলির ঐশ্বর্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। মঠগুলি কোনও উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

মোঙ্গোলিয়ার মঠ

টাট্টু ঘোড়া

বৌদ্ধ বিহার—মোঙ্গোলিয়া

বৌদ্ধ মঠ

মোঙ্গলেরা বিশ্বাস করে যে, সবচেয়ে বড় মঠের যিনি লামা বা পুরোহিত, তিনি বুদ্ধদেবের অবতার। তাঁহার যখন মৃত্যু হয় অর্থাৎ 'চক্রের পরিবর্ত্তন' হয়, তখন পুনরায় জন্মিবার পরও তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। একজন প্রধান লামার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে আবার নির্ব্বাচনের সময় অল্প বয়স্ক ছেলেদের মধ্য হইতে বাছনি হইয়া থাকে। পুরোহিতেরা যাহাকে প্রধান লামা মনোনীত করিতে চাহেন, তাহাকে পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। কাজেই, নূতন বুদ্ধের অবতারটিকে চিনিয়া লইতে কাহারও কোন কষ্ট হয় না। সাধারণে লামাদের এই চালাকি যে বুঝিতে পারে না তাহা নহে, তবে এই ব্যাপার লইয়া কেহ কোনরূপ বিরুদ্ধ কথাও বলে না।

মঠের কাছে আসিলে দেখা যায়, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত 'ধর্ম্মচক্র' ঘুরাইতেছে। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া মঠের মধ্যস্থিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিবার রীতিও প্রচলিত আছে। এদেশের সবচেয়ে আনন্দপ্রদ উৎসব হইতেছে ভূতের নাচ। বসন্তকালেই মঠের প্রাঙ্গণ মধ্যে এই নাচ হইয়া থাকে। সে সময়ে ছোট-বড়

লামার পূজা

উটচালক ও তাহার উট

রাজকর্ম্মচারীদের ছেলে

লামাদের শিবির

ভূতের নাচ

মেয়ে ঘোড়সওয়ার

সকলে এই নাচ দেখিতে আসিয়া মিলিত হয়। কিন্তু মোঙ্গোলিয়ার বিখ্যাত উৎসবের নাম হইতেছে বসন্ত-উৎসব। এসময়ে মোঙ্গোলিয়ার নানাস্থান হইতে লোক-সমাগম হয়। দূর অঞ্চল হইতেও উটের পিঠে চড়িয়া, ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া দলে দলে যাত্রী আসে।

গরুর গাড়ী

সে সময়ে মঠের চারিদিকে সাজ-সজ্জার আড়ম্বর হইতে থাকে। চীনা ব্যবসায়ীরা দলে দলে পণ্যদ্রব্যের দোকান সাজায়। ধনীরা উটের গাড়ীতে করিয়া তাঁবু লইয়া আসিয়া উৎসব স্থানে উপস্থিত হয়। ভিন্ন

ওবো পাহাড়ের তীর্থযাত্রী

ওবো পাহাড়

ভিন্ন মঠের লামা বা পুরোহিতদেরও তাঁবু পড়ে। কেহ কেহ স্ত্রী-পুত্র লইয়া গরুর গাড়ীতে আসে। তবে বেশীর ভাগ লোকই ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতে থাকে। পুরুষ, স্ত্রী, ছেলেমেয়েরাও যেমন এই উৎসবে যোগদান করে, তেমনি দুষ্ট চোর ডাকাতেরাও আসিয়া মিলিত হয়।

উৎসবের দিন প্রধান লামা (জীবিত বুদ্ধ) এবং অন্যান্য লামারা মিলিত হইয়া থাকেন। এ সময়ে তাঁহারা মূল্যবান্ সাজ-পোষাকে সজ্জিত হইয়া থাকেন। পরে যাত্রীদল, পুরোহিত দল, দোকানী পশারী অর্থাৎ সমবেত জনতা ঘোড়ায় চড়িয়া 'ষ্টেপ' ভূমি উত্তীর্ণ হইয়া 'ওবো' (Obo) নামক পবিত্র পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিয়া প্রস্তর গঠিত দেবতার মনস্তুষ্টির জন্য নানারূপ নিশান, পাথর, গাছের ডাল, কাগজের তৈয়ারী নিশান এ সকল দিয়া থাকে। এই উৎসবের ভোজের সময় যে জন্তুর মাংস খাওয়া হয় লামারা তাহাকে মন্ত্রপূত করিয়া দেন। এই তুষ্ট দেবতার তৃপ্তির নিমিত্ত মোঙ্গলেরা যে যে মাংস খায় না, তাহাই ওখানে দিয়া আসে। লামারা নানারূপ মন্ত্র-তন্ত্র পড়িয়া পূজা সারেন। এ সময়ে পর্ব্বতের উপরিভাগে প্রধান লামার জন্য তাঁবু খাটান হয়, রাজকীয় কর্ম্মচারীরাও আশে পাশে ছোট ছোট তাঁবুতে বা'স করেন। যাত্রীদল পাহাড়ের গায়ে নিজ নিজ সুবিধা মত বাস করিতে থাকে। পূজার সময় ছয় ফিট লম্বা ব্রোঞ্জ ধাতুর তৈয়ারী তূরী বাজায়, শঙ্খ বাজায় এবং অদ্ভুত রকমের করতাল বাজাইতে থাকে।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পর্ব্বতের উপরিস্থিত উৎসব শেষ করিয়া সকলে মঠে ফিরিয়া আসে। মাঠের মধ্যে

সাইবেরিয়ার ষ্টেপ ভূমিতে মোঙ্গলদের ভোজন

তৈয়ারী পাত্রে অতিথিরা আইরক (airak) এবং কোমিস্ (Koumis) নামক এক প্রকার মদ্য পান করিতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে ভোজও চলিতে থাকে। এইরূপ ভোজে ভেড়ার মাংসই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।

মোঙ্গলদের খেলা-ধূলা ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদের মধ্যে কুস্তি খেলা প্রধান। এক দলের পর আর এক দল কুস্তি খেলিতে থাকে। খেলায় জয়ী হইলে পরে লামার

মোঙ্গল রাজকুমার

মোঙ্গল রাজকুমারীর রূপসজ্জা

সারিসারি তাঁবু পড়ে—সুবৃহৎ তাঁবুটি কার্পেট ও অন্যান্য সাজ সজ্জা দিয়া সুশোভিত করা হয় এবং সেখানেই বিশিষ্ট অভ্যাগতগণ মিলিত হইয়া খাওয়া দাওয়া করেন। বিষনাশক জাবিয়া (Zabia) নামক কাঠের

নিকট হইতে পুরস্কার পায়। লামা তাহাকে একখানি রেশমের কাপড় ও রূপার বাটি উপহার দেন।

মোঙ্গোলিয়ার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পোষাক অনেকটা একই প্রকারের। তবে পুরুষেরা কোমরে

একটা পেটি বা কোমর-বন্ধ (Belt) ব্যবহার করে। পোষাক—লম্বা পিরাণের মত কোট। শীতকালে
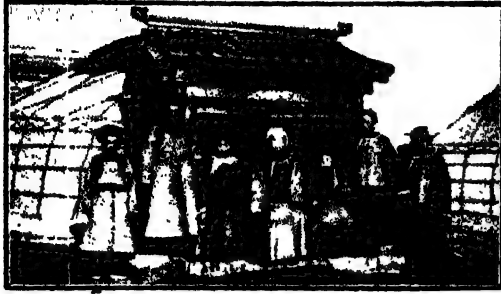
মোঙ্গলদের অতিথির তাঁবুর দরজা

তাহার বোতাম আঁটা থাকে—গরমকালে খোলা থাকে। এই জামার রঙ খুব গাঢ় কি। উৎসব প্রভৃতিতে এই উপরের জামা গাঢ় লাল বা হলদে রঙের হয়।

মোঙ্গল মহিলাদের যা কিছু অলঙ্কার, তা তারা তাদের মাথায় বা চুলে

কুস্তিগির

সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কেশবিন্যাস

পরে—হাত বা অন্য শরীরে নয়। তবে গলায় মালা বা হার পরিতেও দেখা যায়। ইহাদের মস্তকাবরণ বেশ দেখিবার জিনিষ। অবস্থা অনুযায়ী মাথার পোষাকও নানারকমের হইয়া থাকে। মাথার পোষাক দেখিয়া তাহাদের সামাজিক পরিচয় বুঝিয়া লইতে কোনও অসুবিধা হয় না। চুল মনের মত করিয়া রাখিবার জন্য তাহারা একপ্রকার আঠার ব্যবহার করে। আঠা দিয়া বেশ করিয়া চুল বাঁধিয়া তাহা হইতে নানাপ্রকার রূপার গহনা, মুক্তার হার, পুঁতির মালা এইসব ঝুলাইয়া দেয়। ধনীরা অলঙ্কার বেশী পরে। কোন কোন জাতীয় নারীরা মাথায় ধাতুনির্ম্মিত পেটির ব্যবহার করে এবং উহা হইতে নানাপ্রকার অলঙ্কার ঝুলাইয়া দেয়। এই অলঙ্কার-গুলি যাহাতে ঝুলিয়া না পড়ে সেজন্য হুকের সাহায্যে
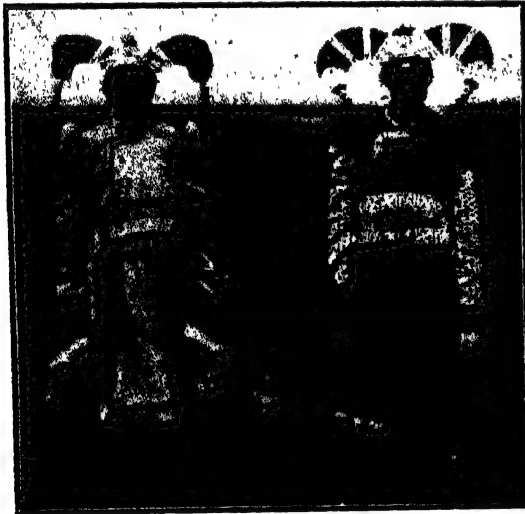
মোঙ্গোলিয়ার সুন্দরী স্ত্রীলোক

কানের সঙ্গে গাঁথিয়া দেয়। এইভাবে গহনার স্থান ঠিক্ রাখিবার দরুণ কানে এত টান পড়ে যে,

কান চিরিয়া যাইবার মত হয়; তবুও গহনা খুলিয়া পড়ে না। অন্য অন্য দেশের মেয়েদের মধ্যে যেমন রূপ বাড়াইবার ইচ্ছাটা খুব বেশী দেখা যায়, মোঙ্গল-নারীদের মধ্যেও যে তাহার চেয়ে কিছু কম, তাহা নহে। মোঙ্গল-নারীরা সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে নস্যের ডিবা রাখে। এই ডিবাগুলি পাথরের তৈয়ারী এবং তাহাতে অতি সামান্য পরিমাণ নস্য ধরে। অতিথি অভ্যাগতকে নস্য দিয়া অভ্যর্থনা করা হয়।

মোঙ্গলদের মধ্যে বিবাহে তেমন গোলমাল নাই। পাত্র ও পাত্রী নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ করিয়া থাকে। বিবাহের যৌতুক মোটামুটি এক পাল ভেড়া ও গরু। যাহার অবস্থা খারাপ, সে অনেক সময় একটা মাত্র ভেড়া দিয়াই কাজ শেষ করে। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয় পক্ষ হইতেই উপহার দেওয়া হয়। বিবাহের উৎসবটা বেশ জাঁকজমকের সহিতই হয়। উৎসবে বিরাট্ ভোজ হয় এবং উহা অনেকদিন ধরিয়া চলে। মোঙ্গল-দের মধ্যে অনেক স্থলে সেকালের রীতি অনুযায়ী বিবাহ হয়, বর জোর করিয়া কন্যাকে লইয়া যায়—ইহা শুধু অভিনয় মাত্র। মোঙ্গল যুবকেরা কন্যাকে তাহার ঘোড়ায় তুলিয়া দৌড় দেয়, সে সময় কন্যা চীৎকার করিয়া বিবাহে তাহার অমত প্রকাশ করে—বস্তুতঃ কিন্তু তাহার মনের ভাব থাকে অন্যরূপ। বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর দাসীর মত হয়।

বিবাহ

মোঙ্গলেরা অতিথি পরায়ণ। কোন অজানা অতিথি আসিলেও তাহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে। বিদেশীই হউক আর স্বদেশীই হউক, তাঁবুতে যদি রোগী কিম্বা অন্য কোনরূপ বাধার কারণ না থাকে তাহা হইলে বিনা বাধায় অতিথিকে নিজনিজ তাঁবুতে গ্রহণ করে। মোঙ্গলদের তাঁবুগুলি সাদাসিধা গড়নের। তাহারা তাবুতেই রাত্রি যাপন করে। তাঁবুগুলি শক্ত বনাতের তৈয়ারী। সকলে তাঁবুর ভিতরে আসিলে তাঁবুর পরদা ও দুয়ার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তখন হাওয়া বা আলো উপরের ছিদ্র-পথে ভিতরে আসে। তাঁবুর ভিতরে লোহার তৈয়ারী আগুন জ্বালাইবার জায়গা আছে। আগুন সর্ব্বদাই জ্বলে।

অতিথি সেবা

তাঁবুর উপরের ছিদ্র দিয়া ধোঁয়া বাহির হইয়া যায়। তাঁবুর ভিতরে আশে পাশে সিন্দুক, পেটারা ও অন্যান্য গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সজ্জিত থাকে। চীনদেশের বাটি, পেয়ালা ও অন্যান্য বাসন কোসনই ইহারা বেশীরভাগ ব্যবহার করে। ভেড়ার চামড়ার তৈয়ারী বিছানা, সোফা, চেয়ার ইহাদের গৃহসজ্জা। তাঁবুর ভিতর জমিতে কার্পেট বা গালিচা পাতা থাকে।

অতিথিরা অনেক সময় গৃহপালিত গরু-বাছুর ও

মোঙ্গলদের তাঁবুর ভিতরকার দৃশ্য

ভেড়ার পাশে ঘুমাইয়া থাকে। অতি বড় দরিদ্র যে মঙ্গল, সেও কোন অতিথি উপস্থিত হইলে এইরূপ বলিয়া অভ্যর্থনা করে—"মহাশয়, আমার প্রত্যেকটি তাঁবুই আপনার। আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকুন।" অতিথিদের কিন্তু মোঙ্গলদের রীতি-নীতি মানিয়া চলিতে হয়। তাঁবুতে সম্মুখের দরজা দিয়া ঢুকিতে হইবে। তাঁবুর কাছাকাছি আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিবে—'নোহোই'! (No hoi)। নোহোই শব্দের অর্থ কুকুর। মোঙ্গলদের কুকুরগুলি বড় ভয়ানক হয়। কাহার সাধ্য যে গ্রামের লোকেরা বা অতিথি সেবক কুকুরকে সংযত না করিয়া তাঁবুতে প্রবেশ করে। মোঙ্গল কুকুরগুলি আকারে প্রকারে সকল বিষয়েই নেকড়ে বাঘের মত।

অতিথি হাতে লাঠি লইয়া তাঁবুতে প্রবেশ করিলে উহা সৌভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। স্ত্রী-লোকেরা তাঁবুর দুয়ারের কাছে শোয়। শুইবার পূর্ব্বে কেহ গাত্রবস্ত্র ত্যাগ করে না। অতিথি দরজার কাছে আসিলে তাহাকে 'মেণ্ডু' (Mendu) বলিতে হয় এবং অগ্নিকুণ্ড ডিঙ্গাইয়া যাইয়া গৃহস্বামীর কাছে বসিলে পর নস্যাধারের অদল বদল হয়। বিদেশী-দের নস্যাধার থাকে না, এ-জন্য তাহারা নস্যাধার বিনিময় করিতে পারে না, শুধু গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে মেয়েরা চা তৈয়ারী করে। কর্ত্রী সকলের আগে বিছানা ত্যাগ করে এবং চা তৈয়ারী করে।

এদেশে মৃতদেহের কবর দেওয়ার রীতি নাই। মৃতদেহ ষ্টেপের তৃণাচ্ছাদিত ভূমির মধ্যে ফেলিয়া রাখে। কুকুর ও নেকড়ের দল মৃতদেহ খায় এজন্যই মোঙ্গোলিয়ার মাঠে সর্ব্বত্র মড়ার হাড়, মাথার খুলি এই সব ছড়ান দেখিতে পাওয়া যায়। বিশিষ্ট লোকদের
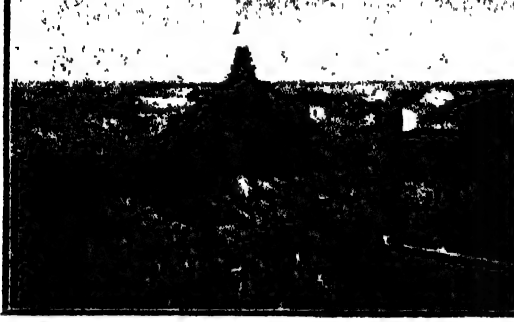
সমাধিস্থান

শব কাঠের বাক্সে পুরিয়া ফেলিয়া রাখে। এদেশের অপরাধীদের প্রতি সাজা অতি ভীষণ। অপরাধীদের হাত পা বাঁধিয়া একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে পুরিয়া জনহীন প্রান্তরে রাখিয়া আসে হতভাগ্য অনাহারে প্রাণ হারায়, পরে তাহার শব কুকুর, নেকড়ে প্রভৃতির খাদ্য হয়।

অপরাধীর দণ্ড

মোঙ্গলেরা জমি-জমা বা টাকা-কড়িকে তাহাদের ধন সম্পদ্ বলিয়া মনে করে না। গোরু, ঘোড়া, উট, ভেড়াই তাহাদের সম্পত্তি। প্রতি বৎসর ১,২০০,০০০ উট এবং ৩০০,০০০ গরুর গাড়ী অনবরত পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া মোঙ্গোলিয়ার নানা অঞ্চলে যাতায়াত করে। গোবি মরুভূমির উত্তরাংশ উর্ব্বরদেশ। মোঙ্গলেরা বৎসরের একটা সময়ে গৃহপালিত জীব জন্তুগুলিকে চরাইবার জন্য ঐ অঞ্চলে লইয়া যায়। মোঙ্গোলিয়া দেশ মোটামুটি দুইটি ভাগে বিভক্ত—ভিতর ও বাহির। বাহিরের দিকের বনভূমিতে নানা প্রকার মূল্যবান্ গাছ জন্মে। এখান হইতেই ভাল ভাল

শবাধার

মোঙ্গোলিয়ার সীমান্ত প্রদেশের বন

কাঠ, চীন ও রুশিয়া দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে

মোঙ্গলেরা ভেড়ার মাংসই বেশী আহার করে। ভেড়ার মাংসের সহিত বাজ্‌রার মত একপ্রকার শস্য মিশাইয়া ভোজন করে। তারপর খাদ্য চিম্‌টা দিয়া মাংস তুলিয়া লইয়া পাত্রে করিয়া খায়। মোঙ্গলেরা রুটি কিংবা শাক-সব্জী কখনও খায় না। মাংসের সুরুয়া বা ঝোল তাহাদের প্রিয় খাদ্য। তাহারা দিনে একবার মাত্র খায়—সে দুপুরেই হউক বা সন্ধ্যায়ই হউক। এই একবার মাত্র খাইবার সময় তাহারা এক এক জনে প্রায় আড়াই সের হইতে পাঁচ সের পর্য্যন্ত মাংস খাইয়া থাকে। শীতের সময় কোনস্থানে যাইতে হইলে তাহারা ঘোড়ার বা উটের জীনের নীচে মাংস লইয়া থাকে। এই ভয়—পাছে জমাট বাঁধিয়া যায়! আর তাঁবুতে থাকিবার সময় তাঁবুর বাহিরে একটা খাঁচায় জমানো বা শুক্‌নো মাংস থাকে। ইহা হইতে টুক্‌রা টুক্‌রা মাংস কাটিয়া লইয়া সিদ্ধ করে।

সিদ্ধ হইলে পর পাত্র হইতে আঙুলে করিয়া মাংস তুলিয়া খায়।

মোঙ্গলেরা কখনও জল অথবা অন্য কোনও ঠাণ্ডা জিনিষ খায় না। তাহারা ইট-চা (brick-tea) হইতে চা তৈয়ারী করিয়া পান করে। ইট-চা চীনদেশে প্রস্তুত হয়। এগুলি পাথরের মত শক্ত। মোঙ্গলদের

মোঙ্গল শিক্ষক

মোঙ্গল বালক

যখন চা করিতে ইচ্ছা হয়, তখন চায়ের ইটখানা কাপড় দিয়া জড়াইয়া লইয়া ঘুঁটের আগুনের উপর রাখে। যখন উহা নরম হইয়া আসে, তখন উহার গা হইতে একটি টুকরা ভাঙ্গিয়া লইয়া হামানদিস্তাতে ছেঁচিয়া লইয়া গরম জলে ফেলিয়া ভিজাইয়া লয়। পরে উহার সহিত দুধ ও চর্ব্বি মিশাইয়া পান করে। ইহারা চায়ে চিনির ব্যবহার করে না। চিনির পরিবর্ত্তে লবণ মিশায়। অনেকে চায়ের সঙ্গে চর্ব্বি ও মাখন

বুরিয়াত জাতির মোঙ্গল

মিশাইয়া খায়। চায়ের সঙ্গে পনীর মিশাইয়াও অনেকে খাইয়া থাকে। দুধ জ্বাল দিতে দিতে ইহারা ক্ষীরের মত করিয়া ফেলে।

মাঞ্চুদের প্রভুত্ব মোঙ্গলদের উপর হইতে চলিয়া গেলে পর মোঙ্গলেরা কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহাদের পূর্ব্ব-

শিক্ষা

পুরুষদের শাসনতন্ত্রের অনুসরণ করিয়াছিল। মাঞ্চুদের যাইবার পর তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব হইতেই সাধারণ মোঙ্গলেরা শিক্ষাসম্বন্ধে উদাসীন হইলেও তরুণদের দল চীনদেশের শিক্ষা-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ঠিক্ চীনা স্কুলেরই মত ছেলেদের পোষাক-

পরিচ্ছদ এবং পাঠ্য-সূচী নির্ব্বাচিত করিয়া দিতে আরম্ভ করে। এখনও সেইভাবেই শিক্ষা চলিতেছে। মোঙ্গল বালকেরা 'কাণামাছি' (কতকটা ইংরাজবালকের "Blind Man's Buff" এর মত) খেলা, খেলিতে ভালবাসে। ঐ দেখ মোঙ্গল বালকেরা কেমন খেলিতেছে এখনও এদেশের লোকেরা শিক্ষার উপকারিতা তেমন ভাবে বুঝিতে পারে নাই। ক্রমশঃ এদেশে শিক্ষার বিস্তার হইবে এইরূপ আশা করা যায়। মোঙ্গল শিক্ষকেরা বেশীর ভাগই চীনদেশের পিকিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। কোন কোন শিক্ষক বহুভাষাবিদ্—চীন ভাষা, মোঙ্গলভাষা, রুশভাষা এবং কিছু কিছু ইংরাজীও বলিতে পারে। মোঙ্গল বালকেরা স্কুলে মোটামুটিভাবে ভূগোল, ইতিহাস এবং সাহিত্য শিখে। পাঠ্য-পুঁথি অধিকাংশই চীনদেশের।

মোঙ্গলদের সৈন্যেরা এখন পর্য্যন্তও তেমনভাবে বর্ত্তমান রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে চীন ও রুশের প্রভাব বশতঃ তাহারা দিনদিনই আধুনিক বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অনুযায়ী সাজপোষাক পরিতেছে—অস্ত্রশস্ত্রও গ্রহণ করিতেছে। মোঙ্গল সেনাপতির পোষাক পরিচ্ছদের একটু বৈচিত্র্য আছে ঐ দেখ একজন মোঙ্গল সৈন্যাধ্যক্ষ পাজামার পকেটের মধ্যে হাতদুটি ঢুকাইয়া দিয়া কেমন শিবিরের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মাথার টুপি ও পোষাক কিরূপ অদ্ভুত ধরণের।

মোঙ্গলদের বিদ্যালয়

মোঙ্গল সৈনিক তামাক খাইতেছে

মোঙ্গল সৈন্যাধ্যক্ষ

কবি বলিয়াছেন—'তাতার নির্ভীক্ অশ্বারূঢ়। একথা মোঙ্গলদের পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য। কি বালক-বালিকা, কি পুরুষ নারী, কি লামা ও কৃষক, সকলেই ঘোড়সওয়ার। ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া তাহারা সর্ব্বত্র যাতায়াত করে—কোন ক্লান্তি অবসাদ তাহাতে তাহাদের হয় না। তাহারা পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়া নির্ভীক্ ভাবে চলাফেরা করে।

মোঙ্গোলিয়া—মোঙ্গল ও তাতারদের দেশ। এ দেশের প্রধান সহরটির নাম উর্গা (Urga), বৌদ্ধদের ইহা একটি প্রধান

তীর্থস্থান। যাত্রীদল প্রতিবৎসর উর্গাতে যাতায়াত করে। ঐরূপ যাত্রীদলে সাধারণতঃ দশ পনেরটি উট থাকে। যাত্রীরা কম্বল, কাপড়, তামাক এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া উর্গা সহরে যাইয়া বিক্রয় করে। ফিরিবার সময় খালি হাতে ফিরে।

সে প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে চিঙ্গিজ খাঁ ছিলেন মোঙ্গলদের রাজা। চিঙ্গিজ খাঁ ভয়ানক প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহাকে সমস্ত এশিয়ার লোক ভয় করিত।

বালক ঘোড়সওয়ার

উর্গা সহরে বাণিজ্য-যাত্রা

ভারতবর্ষে যখন সামসুদ্দীন ইলতুৎমিস (১২১১—১২৩৬) রাজত্ব করিতেন, সে সময়ে খিবা বা খোয়ারিজম্ নামক স্থানের জালালুদ্দীন মঙ্গবর্ণী নামক একজন সুলতান চিঙ্গিজ খাঁর কাছে পরাজিত হইয়া দিল্লীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। চিঙ্গিজ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একেবারে সিন্ধু নদের তীরে আসিয়া পাঞ্জাব লুণ্ঠন করেন। চিঙ্গিজ খাঁ তারপর পেশোয়ার হইতে দেশে ফিরিয়া গেলেন। মাতামহ বংশের দিক্ দিয়া মোগল-সম্রাট্ বাবর চিঙ্গিজ খাঁর অধস্তন ত্রয়োদশ বংশধর। তইমুরলঙ্গও একজন দক্ষ মোগল নেতা ছিলেন। সমরকন্দ নামক সহরে তাঁহার নির্ম্মিত মস্‌জিদ্, কলেজ, গ্রীষ্মাবাস প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকলের স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য উল্লেখযোগ্য। তইমুরলঙ্গের সমাধি-মন্দির অতি মনোহর। তইমুর ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা শিক্ষানুরাগী এবং স্থাপত্যানুরাগী ছিলেন।

তইমুরলঙ্গের কবরের দরজা

হেন্‌রি মটন ষ্ট্যান্‌লি

১৩৩৭ পৃষ্ঠার পর

বর্ষাকাল। এবিসিনিয়ার এ সময়ে ভয়ানক অবস্থা। দিনরাত্রি বৃষ্টি হইতেছে। বন্যার জলে গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ ভাসিয়া গিয়াছে। নদীর জল ফুলিয়া ফুলিয়া দুই কূল ভাসাইয়া বহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তীরের গাছপালা উপড়াইয়া, গরু-বাছুর, ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া, এমন কি ছোট ছোট পাহাড় পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করিয়া বন্যার জল ছুটিয়াছে। আকাশে মেঘের পর মেঘ জমাট বাঁধিয়া বৃষ্টির ধারা নামাইয়া দিয়া এই প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছে. এতটুকু বিরাম নাই! এমন দুর্দ্দিনে একটি বড় পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়াইয়া একদল লোক প্রকৃতির এই ভীষণ অবস্থা দেখিতেছিল। তাহারা ভয়ে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন-নাশের আশঙ্কা করিতেছিল। এই ক্ষুদ্র দলে একজন ইংরাজ ছিলেন। তিনিই এই দলের নেতা। অন্য সকলে তাঁহার আরবদেশীয় ভৃত্য। তাহারা যে পাহাড়ের উপর ছিলেন, তাহার দুই দিক্ দিয়া পাগলের মত উদ্দাম উচ্ছ্বাসে বন্যার জল অতি বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল। সেই জলে অসংখ্য মানুষের মৃত-দেহ, গরু-মহিষের মৃত-দেহ ভাসিয়া যাইতেছিল। কি ভয়াবহ দৃশ্য! নীচে বন্যা, উপরে বৃষ্টি; কাজেই, জল বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত দেশ ডুবাইয়া অবশেষে তাহাদের পাহাড়ের চূড়ার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এমন অবস্থায় মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহা তোমরা সহজেই বুঝিতে পার!

হেন্‌রি মটন ষ্ট্যান্‌লি

একদিন প্রাতঃকালে আরব-ভৃত্যগণের আনন্দ চীৎকারে ষ্ট্যান্‌লি কুটীরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন

আকাশে প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে ; বৃষ্টি আর নাই—বৃষ্টি থামিয়াছে।

বৃষ্টি থামিবার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বন্যার প্লাবনও কমিয়া আসিল। তখন এই ক্ষুদ্র দল জোলা (Zoulla) নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল রবার্ট নেপিয়ারের (Robert Napier's) বিজয়ী সৈন্যদের সহিত মিলিত হওয়া। কিছুকাল পরে তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে, রবার্ট নেপিয়ার মাগডালা (Mugdala) জয় করিয়াছেন। তখন ১৮৬৮ সালের এপ্রিল মাস। এ বিজয়-বার্ত্তা 'নিউইয়র্ক হেরল্ড' (New York Herald) নামক কাগজে তারযোগে পাঠাইয়া এই ক্ষুদ্র দলের নেতা নিশ্চিন্ত হইলেন।

এই ক্ষুদ্র দলের নেতার নাম হেন্‌রি মর্টন ষ্ট্যান্‌লি—'নিউ ইয়র্ক হেরল্ড' কাগজের যুদ্ধের সংবাদদাতা-রূপে আফ্রিকায় আসিয়াছিলেন। নানা বিপদ-আপদকে তুচ্ছ করিয়া, জীবনের মায়া না করিয়া, যুদ্ধের সংবাদ দাতারূপে ষ্ট্যান্‌লি অল্প সময়ের মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

ষ্ট্যান্‌লির প্রকৃত নাম জন্ রোলাণ্ড (John Rowland)। তিনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ডেনবিগ্ (Denbigh) নামে একটি ছোট সহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ডেনবিগ্ ওয়েল্‌সের (Wales) অন্তর্গত। ষ্ট্যান্‌লি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশের লোকেরা এক সময়ে যুদ্ধ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কাজেই, তাঁহার রক্তধারার মধ্যে নির্ভীকতা এবং সাহসিকতা পুরা মাত্রায়ই বিদ্যমান্ ছিল।

হেন্‌রির বাল্যজীবন দুঃখময়। তাঁহার জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মা তাঁহাকে প্রতিবাসীদের অনুগ্রহের উপর ফেলিয়া রাখিয়া লণ্ডনের এক কারখানায় কাজ করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। হেন্‌রির আত্মীয় স্বজনেরা কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দিল না। নিরাশ্রয় বালককে তাহারা এক অনাথাশ্রমে পাঠাইয়া দিল। সেখানে বালক হেন্‌রির উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিত। একজন শিক্ষক এই অনাথ বালককে এমন ভাবে প্রহার করিতেন যে, হেন্‌রি জীবনে কোন দিন সেই ভয়াবহ স্মৃতি ভুলিতে পারেন নাই। হেন্‌রি তাঁহার আত্মজীবন-চরিতে লিখিয়াছেন—"জীবনে আমি কখনও কাহারও নিকট হইতে স্নেহ বলিয়া কোন জিনিষ পাই নাই।" ষ্ট্যান্‌লির বাল্য জীবনের করুণ কাহিনী পড়িলে চোখের জল রোধ করা যায় না। তিনি অনাথ আশ্রমে থাকিবার সময় সেণ্ট আসপ্ (St. Asaph) নামক অনাথ আশ্রমেরই একটি বিদ্যালয়ে কিছু কিছু পড়াশুনা করিয়াছিলেন। পড়িতে তাঁহার খুব ভাল লাগিত। ভূগোল পড়িয়া দেশ-বিদেশের কথা জানিবার জন্য তাঁহার একটি বিশেষ আগ্রহ ছিল। হেন্‌রি নক্সা আঁকিতেও বেশ শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই অনাথাশ্রমে থাকিবার সময় একদিনের জন্যও শান্তি পান নাই। দিনরাত্রি অমানুষিক অত্যাচার, মার-ধর তাঁহার জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল। একদিন তিনি অনাথাশ্রম হইতে লিভারপুলে পলাইয়া আসিলেন। তিনি লিভারপুলে আসিয়া জাহাজের বালক-ভৃত্যের কাজ লইয়া আমেরিকার নিউওলিয়েন্স (New Orleans) নামক স্থানে গমন করেন।

নিউওলিয়েন্সে হেন্‌রির ষ্ট্যান্‌লি নামক একজন ধনী সদাগরের সহিত পরিচয় হইল। এই ভদ্রলোক হেন্‌রিকে আপন সন্তানের মত স্নেহ ও যত্ন করিতে লাগিলেন। ষ্ট্যান্‌লি তাঁহার জীবনে এই মাত্র প্রথম স্নেহ ও দয়ার মধুর আস্বাদন লাভ করিলেন। বালক হেন্‌রি সদাশয় মিঃ ষ্ট্যান্‌লির প্রতি এতদূর শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার পোষ্যপুত্র স্বরূপ হইয় তাঁহার নাম বদ্‌লাইয়া ষ্ট্যান্‌লি নাম গ্রহণ করেন। দুভাগ্যক্রমে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মিঃ ষ্ট্যান্‌লির মৃত্যু হইল—গৃহ-হারা হেন্‌রি আবার পথে বাহির হইলেন।

এসময়ে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। ষ্ট্যান্‌লি সৈন্যদলে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিতে গেলেন। সিলোরের (Shiloh) যুদ্ধে তাঁহাকে শত্রুহস্তে বন্দী হইতে হইয়াছিল। বন্দী অবস্থায় তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মুক্তি পাইয়া ষ্ট্যান্‌লি জন্মভূমি ডেনবিগে (Denbigh) ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা আবার পূর্ব্বের মত দুর্ব্যবহার করিতে লাগিল এবং স্পষ্টতঃই বলিল, তুমি আমাদের বংশের ও জাতির কলঙ্ক, যত পার দেশ ছাড়িয়া যাও

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যান্‌লি নাবিকের কাজে প্রবেশ করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। কত বার যে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছে, কত বার যে তাঁহার প্রাণ

যাইবার অবস্থা হইয়াছে, তাহার ঠিক্ ঠিকানা ছিল না। অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁহার চোখের সামনে ঘটিয়াছে। এই সকল যুদ্ধের সঠিক সুন্দর বিবরণ লিখিয়া তিনি সংবাদপত্রে পাঠাইতেন। এই ভাবে তিনি একজন সংবাদপত্রসেবী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আপনার জন কেহই ছিল না। কাজেই, নিত্য নূতন দেশ দেখা—বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়াই হইল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। একবার কনস্তান্তিনোপলে আসিয়া ষ্ট্যান্‌লি তিব্বত দেখিবার জন্য রওয়ানা হইলেন। এ সময়ে দুই জন আমেরিকাবাসী পর্য্যটক তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। পথে তাঁহারা একদল দুর্দান্ত দস্যুর হাতে পড়িয়াছিলেন। হেন্‌রি ও তাঁহার সঙ্গীগণ ঐ দুর্দান্ত দস্যুদলের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন। মুক্তি পাইবার পর তাঁহার মন হইতে এশিয়া ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা দূর হইল।

এশিয়ামাইনর ভ্রমণের সময় তিনি যে সকল বিপদে পড়িয়াছিলেন, সেই সকল বিপদের কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে পর অনেকের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া তিনি নিউইয়র্ক ট্রিবিউন (New York Tribune) নামক একখানি সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা নিযুক্ত হইলেন। এ সময়ে তিনি নিউইয়র্ক হেরাল্ড (New York Herald) নামক কাগজে প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেন। এশিয়ামাইনর ভ্রমণের সময় তিনি যে অসাধারণ সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেইজন্য ইংল্যাণ্ডের সহিত এবিসিনিয়ার যখন যুদ্ধ বাধে, তাঁহার সংবাদদাতারূপে নিউইয়র্ক হেরাল্ডের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে আফ্রিকায় পাঠাইয়া দিলেন। সুয়েজ হইতে তার করিয়া সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা হওয়ায় এই যুদ্ধের বিবরণ ষ্ট্যান্‌লি বিলাতের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইবার আগে তাঁহার কাগজ নিউইয়র্ক হারল্ডে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। ষ্ট্যান্‌লির এইরূপ কর্মদক্ষতায় নিউইয়র্ক হেরাল্ডের স্বত্বাধিকারী মিঃ গর্ডন বেনেট (Gordon Bennet) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই সংবাদ পত্রসেবীর কার্য্যের মধ্য দিয়া তিনি যে অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছেন, তাহারই ফলে ষ্ট্যান্‌লি নিজের নাম যে শুধু অমর করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে—সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও গৌরবস্থানীয় হইয়াছেন।

স্পেনদেশে যে বিদ্রোহ বা আত্মকলহ ঘটিয়াছিল, সে যুদ্ধের সংবাদদাতারূপে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার পর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যানলি পারস্য দেশ ভ্রমণে গমন করেন। এ সময়ে হঠাৎ তাঁহার মনিব মিঃ গর্ডন বেনেট ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারিসে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আদেশ দেন। এ সময়ে ইউরোপের সর্ব্বত্রই আফ্রিকা পর্য্যটক ডাঃ লিভিংষ্টোনের পরিণাম সম্বন্ধে একটা আশঙ্কাজনক জনরব প্রচারিত হইয়াছিল। ষ্ট্যানলি প্যারিসে আসিলে পর মিঃ গর্ডন তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি ডাঃ লিভিংষ্টোনকে আফ্রিকা হইতে খুঁজিয়া বাহির করুন।" মিঃ বেনেট বলিলেন, "আপনার টাকাকড়ির ভাবনা নাই, আপনি যেরূপেই পারেন তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন। কি ভাবে কি করিতে হইবে সে বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন।"

পূর্ব্ব আফ্রিকায় যাইবার পূর্ব্বে ষ্ট্যান্‌লি পারস্যদেশ হইয়া বোম্বাই সহরে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশে তিনি বেড়াইয়াছিলেন, সে সকলের অতি সুন্দর বর্ণনা বিলাতের ও আমেরিকার নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই তরুণ ও দুঃসাহসী যুবক (এ সময়ে হেন্‌রির বয়স ত্রিশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই) পূর্ব্ব আফ্রিকায় আসিলেন। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইল ডাঃ লিভিংষ্টোন্‌কে খুঁজিয়া বাহির করা। আফ্রিকার ভীষণ জঙ্গলে অজানা দেশের অজ্ঞাত পথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে ষ্ট্যান্‌লি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না, কাজেই লোকজন ও প্রচুর পরিমাণে রসদ সংগ্রহ করিয়া লইলেন। দুইজন ইংরাজ নাবিক এবং দুই শত দেশীয় সঙ্গী লইয়া ষ্ট্যান্‌লি ডাঃ লিভিংষ্টোনের সন্ধানে অগ্রসর হইলেন।

ইউজিজি (Ujiji) নামক স্থানের দিকে লক্ষ্য করিয়া ষ্ট্যান্‌লি চলিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সেখানে গেলেই তিনি ডাঃ লিভিংষ্টোন্ সম্বন্ধে সংবাদ পাইবেন। ইউজিজি পৌঁছিতে তাঁহাদের ৯০০ মাইল পথ ভীষণ জলাভূমির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

ষ্ট্যানলি যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে দেখিলেন, তাহার বিপরীত। পদে পদে নানা বিপদ। জলাভূমির পর জলাভূমি, বুনো ঘাস মানুষের মাথার উপর পর্য্যন্ত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিছুদিনের পরে তাঁহাকে ভীষণ জ্বরে আক্রমণ করিল। তাঁহার

ঘোড়াটি মরিয়া গেল, দেশীয় ভৃত্যেরা বিদ্রোহ করিল, অনেকে পলাইয়া গেল, কেহ কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতেও ইতস্ততঃ করিল না। ষ্ট্যান্‌লি অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহাদিগকে দমন করিলেন। কিন্তু হায়! একটি বিপদের পর আর একটি বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ষ্ট্যানলি কিছুতেই ভীত হইলেন না। খাদ্যাভাব ঘটিল, দলের লোকেরা বিদ্রোহ করিল, অনেক লোকজন পলাইয়া গেল—নিজে দুইবার গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইলেন, তবু এই নির্ভীক বীর অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডাঃ লিভিংষ্টোনকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে, এই হইল তাঁহার দৃঢ় পণ।

অবশেষে ইউজিজির পথ পাইলেন। কিন্তু পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল আফ্রিকার একজন দুর্দ্দান্ত সর্দ্দার। তাহার নাম মিরাম্বো (Mirambo)। মিরাম্বোকে সকলে নাম দিয়াছিল "মধ্য আফ্রিকার নেপোলিয়ান" (Napolion of Central Africa) তাঁহার এ যাত্রা ব্যর্থ হইল ; মৃত্যু নিকট। দিনের পর দিন যাইতেছে, অথচ তাঁহারা তেমনভাবে ত অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। খাদ্যদ্রব্যাদিও কমিয়া আসিতেছে! এদেশে খাদ্যই বা মিলিবে কোথায়? আর ডাক্তার লিভিংষ্টোনেরও কোন সংবাদই পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু ষ্ট্যান্‌লি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া টাঙ্গানিকা হ্রদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে সংবাদ পাইলেন যে, এই হ্রদের অনেকটা দূরে একজন 'সাদা মানুষ' আছেন। অবশেষে ষ্ট্যান্‌লি তাঁহার দলবল সহ ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের তীরে আসিয়া পৌছিলেন। হ্রদের তীরের ছোট গ্রামটিতে পৌছিয়া ষ্ট্যান্‌লির দলের লোকেরা নিশান তুলিয়া বন্দুক ছুড়িয়া হৈ চৈ চীৎকার করিয়া হ্রদের তীরস্থ নির্জ্জন স্থানটিকে মুখরিত করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ষ্ট্যান্‌লি অল্পসময় মাত্র বিশ্রাম করিয়া ইউজিজি গ্রামের দিকে চলিলেন। একটি ছোট পাহাড়ের উপর উঠিয়া দেখিলেন —একখানি বড় কুটীরের পাশে কতকগুলি লোকজন দাড়াইয়া আছে। একজন কালো লম্বা লোক তাড়াতাড়ি তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিয়া ইংরাজীতে বলিল, Good morning sir! (সুপ্রভাত মহাশয়!) এ আর কেহই নহে—লিভিংষ্টোনের প্রিয় ও বিশ্বাসী ভৃত্য সুসি। তারপর ষ্ট্যান্‌লি ও লিভিংষ্টোনের দুই জনের দেখা হইল। ষ্ট্যান্‌লি এই সাক্ষাতের যে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, সেকথা তোমরা পুর্ব্বেই পড়িয়াছ (শিশু ভারতী ১৩৫২ পৃষ্ঠা)। তবুও আবার তাহার উল্লেখ করিলাম।

ডেভিড্ লিভিংষ্টোন্ ও ষ্ট্যান্‌লির সাক্ষাৎ

কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ইউজিজি যাইবার এই পথ ছাড়িতে হইল। দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। এই সময়ে একজন ইংরাজ অনুচরও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আর দলের লোকদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি, সে ছিল নিত্যকার ঘটনা!

একদিন রাত্রিকালে ষ্ট্যানলি তাঁহার তাঁবুতে আসিয়া একান্ত নিরাশ মনে বসিয়া পড়িলেন। মনে হইল,

ষ্ট্যান্‌লি লিখিয়াছেন—"আমি দূর হইতে দেখিলাম, একজন প্রৌঢ় ইংরাজ ভদ্রলোক লাল ফ্লানেলের জামা এবং ধূসর রঙ্গের পাজামা পড়িয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার মাথায় নীল রঙের কাপড়ের টুপি। আমি তাঁহার কাছে যাইয়া মাথার টুপি তুলিয়া লইয়া বলিলাম—আপনিই বোধ হয় ডাঃ লিভিংষ্টোন।

ডাক্তার দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথার টুপি খুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ মহাশয়।" আমি আমার হাত বাড়াইয়া দিলাম এবং বলিলাম, "ঈশ্বরের দয়ায় আজ আপনার সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করিলাম।" ডাঃ লিভিংষ্টোন্ আমার হাত খানি তাঁহার হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন "আমি যে আপনাকে এখানে এই ভাবে অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম, সেজন্য ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি।"

ষ্টান্‌লি ডাঃ লিভিংষ্টোন্‌কে দেশে ফিরিবার জন্য নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন কিন্তু লিভিংষ্টোন্‌কে আবিষ্কারের নেশা এমনই ভাবে অভিভূত করিয়াছিল যে, তিনি কিছুতেই ফিরিতে চাহিলেন না। চারি মাস কাল ষ্টান্‌লি ও লিভিংষ্টোন্ এক সঙ্গে ছিলেন। এসময়ে তাঁহারা দুইজনে ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের উত্তর দিকের ভূ-ভাগ পর্য্যবেক্ষণ করেন। সেই সময়ে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, এলবর্ট নিয়েন্‌জার সহিত ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের কোনও সংযোগ নাই।

একদিন এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। ষ্ট্যান্‌লি সঙ্গে একজন মাত্র দেশীয় অনুচর লইয়া শিকার করিতে যাইয়া এক ভয়ানক বুনো হাতীর হাতে পড়িয়াছিলেন। হাতীকে দেখিবামাত্র তাঁহার দেশীয় ভৃত্যটি ছুটিয়া পলাইল। ষ্ট্যান্‌লিও এত বড় জানোয়ার শিকার করিবার মত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত ছিলেন না, কাজেই তিনিও পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আফ্রিকার জঙ্গলে ষ্ট্যান্‌লির হাতী শিকার

মাগালা দেশের লোকদের সঙ্গে হেন্‌রি ষ্ট্যান্‌লি ও ডেভিড্ লিভিংষ্টোন্

মাগালা (Magala) অঞ্চলের লোকেরা ডাঃ লিভিংষ্টোনের ও ষ্ট্যান্‌লির সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিত। তাহারা নানা-ভাবে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিত এবং অবাক্ হইয়া তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিত। এসময় তাঁহারা দুইজনে প্রায় ৭০০ মাইল পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ফলে, দুইজনের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। লিভিংষ্টোন্ পণ করিয়াছিলেন তিনি কঙ্গো নদীর তীরের দেশগুলি আবিষ্কার করিবেন। এজন্য ষ্টান্‌লির একান্ত অনুরোধেও তিনি তাঁহার প্রিয় আফ্রিকা ত্যাগ করিলেন না। অগত্যা ষ্টান্‌লি ডাঃ

লিভিংষ্টোনের কাগজপত্র, ডায়েরি ইত্যাদি লইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন।

ষ্ট্যান্‌লি-লিখিত ডাঃ লিভিংষ্টোনের সংবাদ 'হেরাল্ডের' মারফতে সমুদয় সভ্য-জগতে প্রচারিত হইল। যে পর্য্যন্ত না তিনি ইংল্যাণ্ডে পৌছিলেন, সে পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁহার প্রেরিত সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডে পৌছিয়া তিনি ডাঃ লিভিংষ্টোনের নিকট হইতে যে সমুদয় কাগজ-পত্র পাইয়াছিলেন তাহা যখন সকলের কাছে উপস্থিত করিলেন, তখন কেহ আর একটি কথাও বলিলেন না, বরং ষ্ট্যান্‌লিকে খুব সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন।

এই যাত্রায় দেশে ফিরিবার পর হইতে ষ্ট্যান্‌লির মনে কেবল আফ্রিকার কথাই জাগিতেছিল। ইংল্যাণ্ড আর তাঁহার ভাল লাগিল না। আফ্রিকার ভীষণ বনজঙ্গল, জলাভূমি,জ্বর-জ্বালা—সব কথা স্মরণ করিয়াও তিনি বিচলিত হইলেন না। আফ্রিকা এক অদ্ভুত নূতন জগৎ—সেদেশের কোথায় কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার মন উৎসুক হইয়া উঠিল—কিছুতেই তাঁহাকে দেশে থাকিতে দিল না। এ সময়ে ডাঃ লিভিংষ্টোনের মৃত্যু হইয়াছিল। লিভিং ষ্টোনের মৃত্যুতে তিনি নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প হইল, ভিক্টোরিয়া এবং ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের চারিদিকের অজানা দেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন এবং নীল নদের উৎস-স্থান আবিষ্কার করিবেন। তখন নীল নদের উৎস-স্থান সম্বন্ধে নানারূপ আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছিল। দ্বিতীয় বার আফ্রিকা অভিযানে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য আবার যুদ্ধের সংবাদ-দাতার কাজ করিতে হইয়াছিল।

ষ্ট্যান্‌লির দ্বিতীয় বার অভিযানে আমেরিকার "নিউ ইয়র্ক হারল্ড" এবং লণ্ডনের "ডেইলি টেলিগ্রাফ" (Daily Telegraph) সংবাদ পত্রের সম্পাদকদ্বয় তাঁহাকে মিলিতভাবে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

ষ্ট্যান্‌লির এইবার পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা ছিল। কাজেই, জাঞ্জিবারে (Zanzibar) আসিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নানারূপ পরীক্ষা করিয়া লোক সংগ্রহ করিলেন। এইবার দলে প্রায় চারিশত লোক ছিল। এইবার অনেক বাধাবিঘ্ন ঘটিলেও ষ্ট্যান্‌লি নিরাপদে 'ভিক্টোরিয়া নিয়ানজাতে' পৌছিতে পারিয়াছিলেন। এযাত্রায় ষ্ট্যানলি 'লেডি এলাইস্' (Lady Alice) নামে একখানি ছোট নৌকা সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন। এই নৌকায় করিয়া তিনি হ্রদের চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এ সময়ে তাঁহাকে বহুবার দেশীয় অসভ্য জাতিদের হাতে পড়িতে হইয়াছিল। তাহারা নানাভাবে তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রত্যেকবারই তিনি কৌশল করিয়া বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। এসব বিষয়ে অনেক গল্প আছে।

একবার একদল রণমুখো অসভ্য অধিবাসী বল্লম হাতে করিয়া আসিয়া জলে নামিয়া তাঁহার নৌকা আক্রমণ করিয়াছিল। ষ্ট্যান্‌লি পিস্তল ছুঁড়িয়া আত্ম-রক্ষা করিয়াছিলেন। দুই একজন গুলি খাইয়া মরিয়া যাওয়ায় অসভ্যেরা প্রাণভয়ে পলাইয়া যায়। ভিক্টোরিয়া নিয়ানজা পর্য্যবেক্ষণ করিবার পর ষ্ট্যান্‌লি ইউগাণ্ডা (Uganda) প্রদেশে গমন করেন। এ রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় ২,০০০,০০০ কুড়ি লক্ষ। এদেশের সর্দ্দার মিতেসা (Mitesa) তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন। ষ্ট্যান্‌লি যখন মিতেসার দেশে আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে আর একজন সর্দ্দারের যুদ্ধ চলিতেছিল। ষ্ট্যান্‌লির সাহায্যে মিতেসা তাঁহার শত্রুকে পরাজিত করিতে পারায় সে ষ্ট্যান্‌লির একান্ত অনুগত হইয়া পড়ে।

আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হইতে হইতে ষ্ট্যান্‌লির সহিত তাঁহার পূর্ব্ব শত্রু মিরাম্বোর দেখা হয়। ষ্ট্যান্‌লি ভাবিয়াছিলেন, না জানি মিরাম্বো কি বিপদ ঘটায়; এজন্য তিনি উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুতও ছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না—মিরাম্বো তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিল এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতেও সে কৃপণতা করে নাই। নানারূপ বিপদের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে অবশেষে তিনি নীল নদের প্রধান উৎস আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া নিয়ান্‌জা হ্রদের চারিদিকের ভূভাগ হইতেও তিনি অনেক কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। এ সময়ে তাঁহার প্রিয় সঙ্গী 'বুলডগ' 'বুলের' (Bull) মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। এই কুকুরটি তাঁহার সঙ্গে প্রায় ১,৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল।

ষ্ট্যান্‌লি এইবার পণ করিলেন, লুয়াবালা (Luabala) নদীর আশে পাশের দেশের কোথায় কি আছে, তাহার অনুসন্ধান করিবেন। ডাঃ লিভিংষ্টোন্ এই নদীটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নদীটিকে উত্তরবাহিনী

দেখিয়া লিভিংষ্টোন ঠিক্ করিয়াছিলেন যে, এই নদীই নীল নদ। কিন্তু ষ্ট্যান্‌লি দেখিলেন যে, নদীটি পশ্চিম দিকে চলিয়াছে। তখন তাঁহার মনে হইল যে, এই নদীটিই কঙ্গো নদী। তাঁহার এই অনুমান শেষে যথার্থ বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়াছিল। ষ্ট্যান্‌লি কঙ্গো-নদীর উৎস হইতে শেষ পর্য্যন্ত নদীর বুকে বুকে যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা নানাবিস্ময়কর ঘটনাবলীতে পূর্ণ। প্রায় ২,০০০মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে নদীর মুখে আসিয়া তিনি পৌঁছিয়াছিলেন। এইভ্রমণে তাঁহার তিনজন ইংরাজসঙ্গী ও অনেক দেশীয় ভৃত্য প্রাণ হারাইয়াছিল। ষ্ট্যান্‌লি যখন আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের মুখে আসিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে অতি অল্প সংখ্যক সঙ্গীই বাঁচিয়াছিল। ষ্ট্যান্‌লির পূর্ব্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজনাবিক ডিয়াগোকেও প্রথম কঙ্গো নদী আবিষ্কার করেন। তিনি নদীর মোহনা ছাড়িয়া বেশী উপরদিকে যান নাই। তাহার কিছুকাল পরে ডাক্তার লিভিংষ্টোন্ নারানউঙ্গ নামকস্থানে এইনদীতে পৌঁছেন। তিনি কঙ্গোনদীকে নীলনদ বলিয়া মনে করেন। তারপর ষ্ট্যান্‌লিই সমস্ত কঙ্গোনদী আবিষ্কার করেন। তিনি নূতন করিয়া কঙ্গোনদীর 'লিভিংষ্টোন্' নাম দেন। কিন্তু এই নাম লোপ পাইয়াছে।

এই অভিযানে তিনি অনেক হ্রদ, নদী ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। এই দেশে ইংরাজ একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এই আশা লইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, কঙ্গো রাজ্য দ্বারা ভবিষ্যতে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রচুর বিস্তারলাভ হইবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। অবশেষে তিনি বেল্‌জিয়ামের রাজা লিওপোল্ডের নিকট এই প্রস্তাব করিলে পর তিনি উহার সমর্থন করিলেন। কঙ্গো রাজ্য বেল্‌জিয়ান্ রাজা লিও-পোল্ড স্থাপন করেন। এ রাজ্যের পরিমাণ ৮০০,০০০ বর্গ মাইল এবং লোক-সংখ্যা প্রায় ১২,০০০,০০০ হইবে। রাজা লিওপোল্ডের কাজের ভার লইয়া ষ্ট্যান্‌লি আবার আফ্রিকায় ফিরিয়া আসিলেন। এইবার তিনি আফ্রিকার এই দুর্গম প্রদেশে পাঁচ বৎসরকাল ছিলেন। নিঃস্বার্থভাবে দিনরাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিবার ফলে অবশেষে তাঁহার অভিপ্রেত কঙ্গো ফ্রি ষ্টেট্ (কঙ্গো স্বাধীন রাজ্য) প্রতিষ্ঠিত হইল। ষ্ট্যান্‌লিকে সে দেশের অসভ্য অধিবাসীরাও অত্যন্ত ভালবাসিত। কেননা, তাহাদের উন্নতি, শিক্ষা ও সভ্যতার জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন।

ষ্ট্যান্‌লি আফ্রিকার গহন বনে কত নূতন নূতন অসভ্যজাতি যে দেখিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিওয়ে (Kiwyeh) নামক স্থানে তিনি যখন বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন দেখিতে পাইলেন যে, একটী অসভ্য জাতি তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী অন্য একটি অসভ্য জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে চলিয়াছে তাহাদের হাঁটুর নীচে ও পায়ে গোড়ালির উপরে ছোট ছোট ঘণ্টা বাধা, গলাবদিকে বাঁধা একখানি কাপড় পিঠের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পরণে বাঘের ছাল—ডান হাতে লম্বা বর্শা—বাঁ হাতে তীরধনু; চীৎকার করিতে করিতে তাহারা ছুটিয়া চলিয়াছে, কোন দিকেই তাহাদের লক্ষ্য নাই। এইরূপ অনেক ভয়াবহ দৃশ্য তিনি দেখিয়াছেন।

কঙ্গো রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর আর একবার তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু আমিন পাশাকে মুক্ত করিবার জন্য ষ্ট্যানলি আফ্রিকা গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আবার দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার স্বাস্থ্য এ সময়ে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যানলি ডোরোনি টেনাণ্ট (Doroney Tenant) নাম্নী এক ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করেন। দুই বৎসর কাল আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ষ্টানলি তাঁহার বিচিত্র অভিযানের বিষয় বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহাকে স্যার উপাধি দিয়া সম্মানিত করা হয়। জীবনের শেষ দুই বৎসর কাল তিনি রুগ্ন অবস্থায় নির্জ্জনে কাটাইয়াছেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ১০ই মে এই নির্ভীক বীরের মৃত্যু হইল। ষ্ট্যান্‌লির লিখিত "In Darkest Africa" (১৮৯০) "Through the Dark Continent" (১৮৭৮) এবং "Autobiography" (১৯০০) নামক বই কয়েক খানায় আফ্রিকার গহন বনের বিচিত্র কাহিনী আছে।

এখানে একজনের কথা বলা দরকার। সে হইতেছে—ষ্ট্যান্‌লির আফ্রিকা দেশীয় ভৃত্য,—তাহার নাম সেলিম (Selim)। সে আফ্রিকার এই অভিযানে তাঁহার নিত্য সহচর ছিল এবং নানা বিপদের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। সে শিকারদক্ষ ছিল এবং আফ্রিকার গহন বনেও তাহার অজানা স্থান বড় কম ছিল।

পিথাগোরাস্

(আনুমানিক ৬০০—৫০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ)

১৩৫৬ পৃষ্ঠার পর

সামোস্ (Samos) নামক স্থানে আনুমানিক খৃঃ পূর্ব্ব ৬০০ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পিথাগোরাস্ (Pythagoras) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কতকগুলি কাল্পনিক কাহিনী ব্যতীত তেমন আর কিছুই জানা যায় না। বোধ হয় তিনি মিশর দেশে গিয়াছিলেন, কেননা সে সময়ে সামোস্ ও মিশরে যাতায়াত ছিল। পিথাগোরাসের ন্যায় একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি মিশর দেশের পুরোহিতদের নিকট হইতে কোনরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

৫৩০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইটালির অন্তর্গত ক্রোতোনা (Crotona) নামক স্থানে পিথাগোরাস্ একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি শিষ্যগণের নিকট তাঁহার শিক্ষার আদর্শ প্রচার করিতেন। ধর্ম্ম ও নীতিই ছিল তাঁহার শিক্ষার মূল আদর্শ। লোকে তাঁহাকে দার্শনিক পণ্ডিত বলিলেও তিনি নিজে আপনাকে জ্ঞানভিক্ষু বলিয়া প্রচার করিতেন। তাঁহার মতে পৃথিবীর সুখ বল, টাকা-কড়ি বল, এ সকল কিছুই নহে। প্রকৃত জ্ঞানের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই হইতেছে মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। সেকালের আমোদপ্রিয় বিলাসী লোকদের কাছে তাঁহার এই সংযম ও ত্যাগের কথা ভাল লাগিবে কেন? কাজেই তাঁহার দেশ ছাড়িতে হইল।

পিথাগোরাস্

পিথাগোরাসের শিষ্য হইতে যাহারা আসিত, তাহাদের অনেক কিছু পরীক্ষা দিয়া আসিতে হইত। পাঁচ বৎসর কাল তাহাদের নির্জ্জনে থাকিতে হইত, তারপর তাহাদিগকে ত্যাগের আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্য নানারূপ হীন কাজ করিতে হইত এবং শেষটায় তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি কিছু আছে কিনা সেবিষয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। পিথাগোরাস্ নিজে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান ও গণিতে পারদর্শী ছিলেন।

পিথাগোরাস্ সেকালে অনেক নূতন কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, এই যে গ্রহগুলি

ঘুরিতেছে—আমাদের পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাহার ফলে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। পিথাগোরাস্ নিজে সঙ্গীত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কিছু নূতন আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। সেকালে গ্রীকেরা এক তার দিয়া তৈয়ারী (Monochord) নামে একরূপ তারযন্ত্র বাজাইতেন। পিথাগোরাস্ উহার সহিত আরও অনেকগুলি তার সংযুক্ত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া নানা বিভিন্ন সুরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আত্মার অমরত্ব ও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে পিথাগোরাস্ যে মতবাদ প্রচার করেন, তাহা সে সময়ে এক নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। অনেকে বলেন, তাঁহার এই মতবাদ তিনি মিশরীয় পুরোহিতদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। পিথাগোরাসের প্রভাব সে সময়ে গ্রীকদেশে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। অনেক বড় লোক তাঁহার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও পুরুষ সকলের কাছেই নিজের মতবাদ প্রচার করিতেন। পিথাগোরাসের স্ত্রীও স্বামীর ন্যায় একজন দার্শনিক ছিলেন। পিথাগোরাস্ অভিজাত সম্প্রদায়ের তরুণ ও তরুণীদের মধ্যে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই শ্রেণীর লোকেরা যদি তাঁহার মত গ্রহণ করে তাহা হইলে তাঁহার মতবাদ প্রচারিত হইবার সুযোগ ঘটিবে। প্রকৃতপক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। সে সময়ে পিথাগোরাসের দল রাষ্ট্রীয় জগতেও প্রাধান্য লাভ করিতে পারিয়াছিল। সে কেবল ক্রোতোনা সহরে নয়—ইটালির অন্যান্য সহরেও তাঁহার মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি আপনাকে একজন জ্ঞানভিক্ষু বলিয়া পরিচিত করিলে কি হইবে ? তাঁহার দলের লোকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও প্রভুত্বলাভের প্রয়াসী হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য তাঁহার ও তাঁহার দলের বিরুদ্ধে একদল লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহাতে পিথাগোরাসের দলের লোকের অনেকের মৃত্যু হয়। পিথাগোরাস্ নিজেও বিদ্রোহীদের হাতে পড়িয়া মারা যান কিনা, তাহা জানা যায় না। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। পিথাগোরাস্ মারিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি-কথা আজও অমর হইয়া বাচিয়া আছে।

হেরাক্লিটাস্

(আনুমানিক ৫৩৫—৪৭৫ খৃষ্টঃ পূর্ব্বাব্দ)

হেরাক্লিটাস্ (Heraclitus) ইপেসাস্ নামক স্থানে ৫৩৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সারা জীবন তাঁহার জন্মভূমি ঐ ক্ষুদ্র সহরটিতেই অতিবাহিত করেন। ষাট বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। হেরাক্লিটাসের কাছে ধন-সম্পদ ও সম্মানের, কোন মূল্যই ছিল না। কতবার তাঁহার দেশের লোকেরা তাঁহাকে শাসনকর্ত্তার পদ দিতে চাহিয়াছে কিন্তু তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন। গ্রীক্ দার্শনিক ডেমোক্রিটাসকে যেমন লোকে আদর করিয়া নাম দিয়াছিল 'খোসমেজাজের দার্শনিক, তেমনি হেরাক্লিটাসকে তাঁহার দেশের লোকেরা নাম দিয়াছিল "কাঁদুনে দার্শনিক" (Weeping philosopher)। গল্পে আছে যে, তিনি সহর ছাড়িয়া দূর পাহাড়ের উপর যাইয়া বাস করিতেন এবং গাছের শিকড়, পাতা ও ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। পারস্যের সম্রাট্ দরায়ুস্ (Darius) তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। দরায়ুসের সভায় উপস্থিত হইয়া হেরাক্লিটাস্ বলিলেন—"আমি এপিসাস্ (Ephesus) নগরের ব্লিসটাস্ পেমেসের পুত্র হেরাক্লিটাস্—আপনার সুখ ও স্বাস্থ্য কামনা করি। আমার নিবেদন এই যে, পৃথিবীর লোকেরা সত্য ও ন্যায়ের পথ ছাড়িয়া দিয়া দিন দিন পাপ ও প্রলোভনের পথে যাইতেছে, মিথ্যা অহঙ্কার ও গৌরবের জন্যই সকলে লালায়িত! আমার কথা কি জানেন ? আমার কাহারও প্রতি হিংসাও নাই—দ্বেষও নাই; আমাকে হিংসা করিবার মতও কাহারও কিছু নাই। আমি রাজসভার জাঁকজমক ভালবাসি না। আর আমি জীবনে কোনদিন পারস্য দেশে কিংবা পারস্য সম্রাটের দরবারে আসিব না।
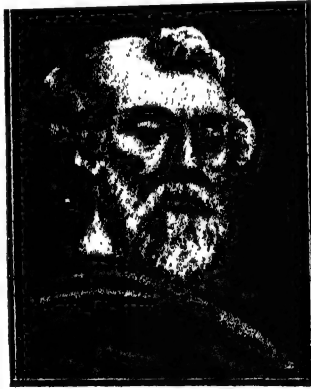
হেরাক্লিটাস্

আমি অল্পেতেই সন্তুষ্ট, আমি যে ভাবে জীবন যাপন করিয়া সুখী হই আমাকে সে ভাবে থাকিতে দিন্।"

হেরাক্লিটাস্ ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। মানুষের জীবনে সুখ, নাই, শান্তি নাই, উহা বিষাদময় -'যাতনে জলিয়া পুড়িয়া মরিতে শুধু মানব জীবন লয়' এই ছিল তাঁর ধারণা। জীবনের অনিত্যতা তিনি সর্ব্বদা প্রচার করিতেন। এইরূপ দুঃখবাদী ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহার কাছে বড় একটা ঘেঁসিতে চাহিত না এবং এই জন্যই তাঁহার নাম দিয়াছিল কাঁদুনে দার্শনিক। হেরাক্লিটাসের লিখিত কোন বই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার লিখিতগ্রন্থ ছিল একথা অসত্য নহে, সামান্য যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহার মধ্যে তিনি 'প্রকৃতি' (Nature) সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহাতে অনেক কিছু পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি কেবল অন্ধকারই দেখিয়াছেন, কোথায় ইহার আরম্ভ এবং কোথায়ই বা ইহার শেষ তাহার কোনও কার্য্য-কারণ খুঁজিয়া পান নাই।

অভিব্যক্তিবাদ বা ক্রমবিকাশতত্ত্বের (Evolution) আলোচনা তাঁহার আগে কেহ করেন নাই। তিনি বলিতেন—এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত জগৎ কেবলি ছুটিয়া চলিয়াছে—কেহ স্থির নাই। এই যে যাত্রা, এই যে গতি, তাহা একটি সুনিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া চলিতেছে। একদিনেই বিশ্বজগৎ বা পৃথিবীর তরুলতা ও জীবজন্তু গড়িয়া উঠে নাই। আমরা আজকাল যাহাকে ক্রমবিকাশ বলি, হেরাক্লিটাসই উহার প্রথম প্রবর্ত্তক।

অতি সরল ভাবে তিনি একথাটি বুঝাইতেন—তুমি কাল যে মানুষ ছিলে, আজ সে মানুষ নাই, কাল যে গাছকে দেখিয়াছে, আজ সে গাছের অনেক কিছু বদল হইয়াছে। তিনি একটি কথায় তাঁহার মনের ভাবটি প্রকাশ করিতেন—"To live is to change" অর্থাৎ জীবন পরিবর্ত্তনশীল।

ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। "মানুষের চরিত্রই তাঁহার ভাগ্যের পথ নির্দ্দেশক।" বিশ্বজগৎ যেমন একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া চলিয়াছে, মানুষেরও তেমনি নীতি ও ধর্ম্মের শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া চলিতে হইবে। প্রকৃতির বাঁধা নিয়মের মত মানুষের দেহ ও মনেরও একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে। তাহাকে অতিক্রম করিলেই মানুষের নৈতিক অবনতি হয়। যাহা কিছু ভাল তাহাই সৎ এবং সেই সৎপথেই মানুষকে চলিতে হইবে।

এই প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত ক্রমবিকাশ ও মানবজীবনের নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা লইয়াই বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিত সমাজ নানারূপ আলোচনা করিতেছেন।

এম্‌পেডোক্লেস্

(আনুমানিক ৪৯০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ)

এম্‌পেডোক্লেস্ (Empedocle) একজন কবি ও দার্শনিক ছিলেন। ৪৯০ খৃঃ পূঃ অব্দে সম্ভ্রান্ত গ্রীক্‌বংশে সিসিলি দ্বীপে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে গ্রীক্ ছিলেন। রসায়ন-বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, রাজনীতিতে তিনি এমন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তাঁহার নগরবাসী এগ্রিজেন্টামের (Agregentum) লোকেরা তাঁহাকে দেশের রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন। এম্‌পেডোক্লেস গণতন্ত্র মতের পক্ষপাতী ছিলেন। কাজেই রাজা হইলেন না।

এম্‌পেডোক্লেস্

এম্‌পেডোক্লেস্ তাঁহার এই অভিনব মতবাদ কবিতার আকারে লিখিয়া গিয়াছেন। ভূমি, জল, বায়ু ও অগ্নি এই সকলই পৃথিবী সৃষ্টির মূল উপাদান এবং ধ্বংসের পর সৃষ্টি, আবার সৃষ্টির পর ধ্বংস এই নিয়মে বিশ্বজগৎ চলিয়া আসিতেছে, এই মত তিনি পোষণ করিতেন। এম্‌পেডোক্লেস্ পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধেও অনেক নূতন কথা বলিয়া গিয়াছেন।

আমরা এই মহাপণ্ডিতের জীবনী সম্বন্ধে তেমন ভাবে কিছুই জানিতে পারি না। কথিত আছে যে, এট্‌না আগ্নেয়গিরির মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের অনেক গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন যাহা আজ পর্য্যন্তও বৈজ্ঞানিকেরা মানিয়া লইতেছেন।
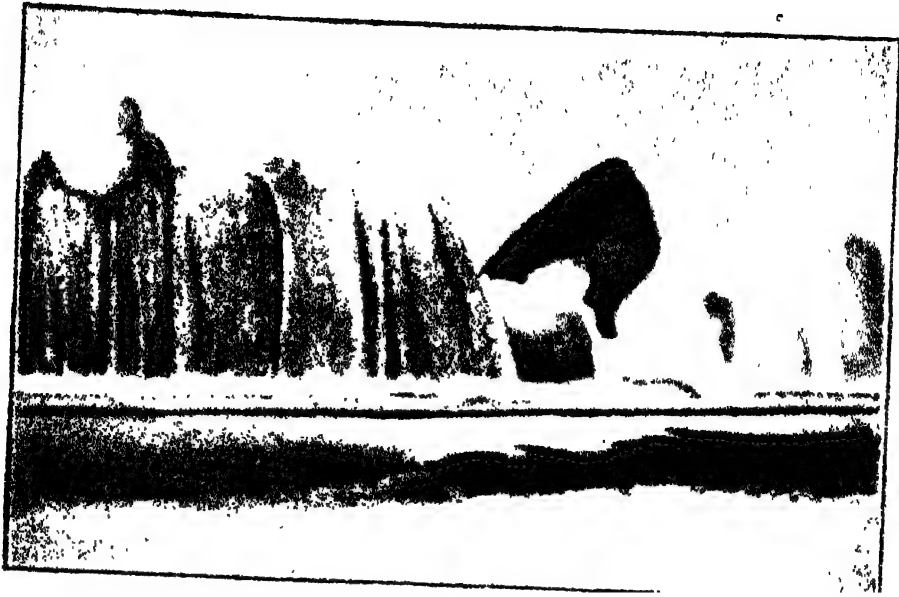
[illegible]

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি
কিয়াটাং—চীন

চূণাপাথরের মন্দির
জেনোলান্ গুহা দক্ষিণওয়েলস্

সব চেয়ে বড় খোদাই পাথর—বালবেক (সিরিয়া)
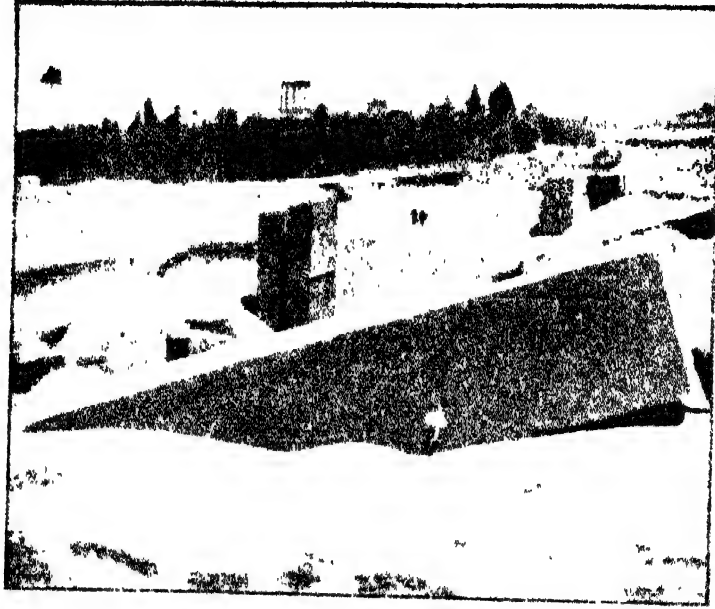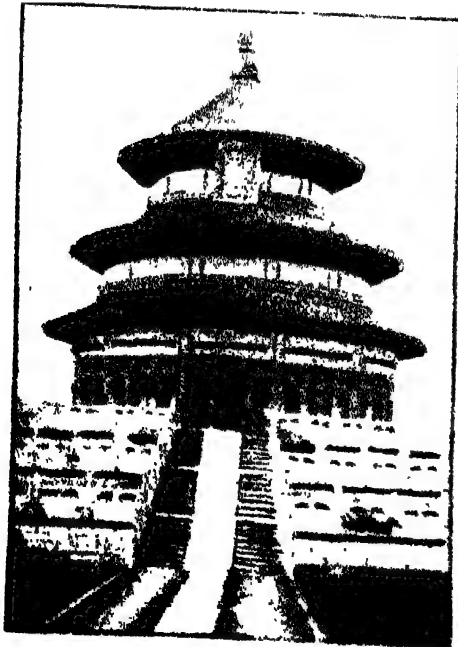
স্বর্গ মন্দির—পিকিং

কায়েকতিয়োর দোলাল মন্দির—ব্রহ্মদেশ

এপিকিউরাস্

(আনুমানিক ৩৪২— -২৭০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ)

এপিকিউরাস যে দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন, তাহাই "এপিকিউরিয়ান' দার্শনিক মত Epicurean Philosophy) বলিয়া খ্যাত। ৩৮২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সামোস্ নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি সেইখানেই বাস করেন। তার পর এথেন্সে যান। সে ন অনেক বিদ্বান্ ও পণ্ডিতের কাছে নানা বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া জ্ঞান লাভ করেন। কিছুদিন পরে এপিকিউরাস্ তাঁহার নিজের মত লইয়া বক্তৃতা দিতে থাকেন। ছত্রিশ বৎসর বয়সের সময় এথেন্স সহরের এক প্রান্তে একটি বাগান ক্রয় করিয়া তিনি সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। এ সময়ে তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাহার ফলে গ্রীস ও এসিয়ামাইনর হইতেও অনেক বিদ্যার্থী আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিত।

এপিকিউরাস বলিতেন, "সুখই হইতেছে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। জীবনকে সর্ব্বদা দুঃখময় বলিয়া ভাবিলে চলিবে কেন? এমন ভাবে জীবনকে গড়িয়া তুলিবে, যাহাতে তোমার জীবনে কোন দিন দুঃখ ও অবসাদ না আসে তাঁহার এই শিক্ষাকে লোকে নানারূপ ভিন্ন অর্থ করিয়া অন্যরূপ বুঝিয়াছে। তিনি বলিতেন, এই দেহ ও মনকে এমনভাবে গঠন করিবে ও এমন ভাবে জীবন যাপন করিবে, যে জন্য তোমায় দৈহিক কোন পীড়ায় আক্রান্ত হইতে না হয় এবং মনকে এমন ভাবে সৎচিন্তা দ্বারা পূর্ণ করিবে যেন কখনও কোন দুশ্চিন্তা আসিয়া মনকে পীড়িত না করে।

এপিকিউরাস

এপিকিউরাস অতি সরল সাদাসিধা ভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার বাড়ীর সদর দরজার গায়ে লেখা ছিল—"এই বাড়ীর দরজা অতিথি ও অভ্যাগতের জন্য মুক্ত, এখানে আসিলে আপনি মনের মধ্যে অসীম শান্তি ও সুখলাভ করিবেন। আপনাকে যবের তৈয়ারী পিষ্টক খাইতে দিব। আর বাড়ীর পাশের ঝরণার জল পান করিতে দিব। কৃত্রিম কোনও খাদ্য এখানে পাইবেন না। আপনি কি এই আদর-অভ্যর্থনা সমাদরে গ্রহণ করিবেন না?"

এপিকিউরাস বলিতেন, "দর্শন মানুষকে যুক্তি ও কারণ দেখাইয়া সৎপথে পরিচালিত করিয়া প্রকৃত সুখের সন্ধান বলিয়া দেয়।" পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ আনন্দ লাভ করে এবং সুখে জীবন কাটায় এই ছিল তাঁহার আন্তরিক কামনা। মানুষ দুই প্রকারে সুখী হয়—দেহে ও মনে। দেহ সুস্থ থাকিলে তাহার মন আনন্দময় হয়, মন আনন্দ-পূর্ণ হইলে আত্মা পবিত্র ও নির্ম্মল আনন্দ ভোগ করে। তাঁহার এই দার্শনিক মতবাদ যে তিনি কেবল মুখে প্রচার করিতেন, তাহা নহে, নিজে বন্ধুবান্ধবের সহিত ঐরূপ সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়াও তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

ঐ যে পথ দিয়া লোকটি যাইতেছে, তাহার প্রাণের কামনা কি? তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে উত্তর দিবে—সে চায় সুখ। এই সুখ কি? তাহার প্রকৃত অর্থ কি? তাহাকে কি ভাবে পাওয়া যায়, ইহা বুঝাইয়া দিতে হইলেই তাহাকে একটু দর্শন বুঝিতে হইবে মানুষের মনের মধ্যেই সুখ-দুঃখ বাসা বাঁধিয়া আছে। নিজের মনে সুখ না থাকিলে সুখের আস্বাদ কেমন করিয়া লাভ করিবে? মানুষ যেখানে একজনের সহিত অন্যের তুলনা করিতে বসে, সেখানেই সে সুখকে হারাইয়া ফেলে। কাজেই সুখ মুহূর্ত্তের বিলাস নয়, সুখ জীবনের সাধনা—সারা জীবনের আদর্শ। কাজেই, এই অনাবিল সুখলাভ করিতে হইলে ধর্ম্মপরায়ণ হইতে হইবে। দেহের সুখ আত্মা ও মনের সুখের তুলনায় ক্ষণিক।

এপিকিউরাস মানুষকে সংযম শিক্ষা দিতেন। কি খাওয়া-দাওয়া, কি পোষাক-পরিচ্ছদ প্রত্যেক বিষয়েই সংযমী হইবে। দেহের মন্দির মধ্যে যে মহান্ দেবতা (আত্মা) বাস করিতেছেন, তাঁহার পূজার জন্য

মন্দির রূপ দেহকে সর্ব্বদা পবিত্র ও নির্ম্মল রাখিবে। প্রকৃত অর্থ হইতেছে—

আমার এই দেহখানি তুলে ধর।
তোমারই দেবালয়ের প্রদীপ কর॥

সুখ ও আনন্দ লাভ করিতে হইলে সাধনা করিতে হইবে। সংযমের ভিতর দিয়াই তাহার আদর্শ পাওয়া যায়। যুগে যুগে প্রত্যেক দেশের জ্ঞানী ব্যক্তি এই নির্ম্মল আনন্দের পথ ধরিয়াই জীবন কাটাইয়াছেন।

এপিকিউরাস ভ্রমণের ভিতর দিয়াও শিক্ষালাভ হয় একথা বিশ্বাস করিতেন। এজন্য তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, নানা বিখ্যাত পণ্ডিতদের সহিত আলাপ ও আলোচনা করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে উপদেশ দিতেন।

তাঁহার কাছে এই জড় পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহাই প্রকৃতির একটা বাঁধা নিয়মের ভিতর দিয়া চলিতেছে, এইরূপ বিশ্বাস ছিল। এপিকিউরাস আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিতেন, দেহের সহিতই আত্মারও বিনাশ। মৃত্যুর পরে আর কিছুই নাই।

এইরূপ তাঁহার বিশ্বাস হইলেও তিনি কখনও "Let us eat and drink, for to-morrow we die"। 'হেসে নাও দু'দিন বইত নয়—খাও দাও বাস্—দুদিন পরে ত সবই শেষ হইবে এই মতের পোষণ করিতেন না।

এপিকিউরাস অনেক বই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সে সব বেশীর ভাগই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জীবনের শেষ অবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্য নাশ হইয়াছিল, তবু তিনি একদিনের জন্যও তাঁহার মনের আনন্দ হারান নাই। ২৭০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এই দার্শনিক পণ্ডিত অমরধামে গমন করেন।

হিপারকাস্

(আনুমানিক ১৭০——১২৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ)

জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের মধ্যে হিপারকাসের (Hipparchus) নাম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এসিয়ামাইনরের অন্তর্গত নিশিয়া (Nicaea) নামক স্থানে হিপারকাসের জন্ম হইয়াছিল। এই সুপণ্ডিত ব্যক্তি রোডস্ (Rhodes) দ্বীপে বাস করিতেন এবং সেখান হইতেই জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি এক হাজারের ও বেশি তারার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে এক থেলস্ ব্যতীত এইরূপ সঠিক ভাবে তারার সংখ্যা গণনা ও সংখ্যা নির্দ্দেশের চেষ্টাও কেহ করেন নাই। কথিত আছে যে, Astrolobe বা নক্ষত্র যন্ত্র তাঁহারই আবিষ্কার।

সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় নিরূপণও তাঁহার গবেষণার ফল। সেকালের অসম্পূর্ণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে হিপারকাস্ যে সমুদয় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক।

গণিত-শাস্ত্র সম্বন্ধে হিপারকাস স্বাধীন চিন্তার দ্বারা খ্যাতিমান্ হইয়া গিয়াছেন। অনেকের মতে ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) বিজ্ঞানের তিনিই স্রষ্টা। সেকালের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতরূপে নিঃসন্দেহে বরণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। টলেমি, হিপারকাস্ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, হিপারকাসের ন্যায় সত্যানুরাগী, এবং শ্রমশীল ব্যক্তি দুর্লভ। তিনি সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিয়া ঋতুর পরিবর্ত্তন, গ্রহণের সময় নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়ে নির্ভুল গণনার পথ নির্দ্দেশ করেন।

ইংরাজীতে জ্যোতির্ব্বিদ্যা বুঝাইতে Astronomy শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। এই Astronomy শব্দটিও গ্রীকদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। গ্রীক্ Astron শব্দের অর্থ নক্ষত্র বা তারা, (Star) এবং nomos শব্দের অর্থ পর্য্যায় (order-arrangement)।

এপিক্‌টেটাস্‌

(আনুমানিক প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ)

খৃষ্ট জন্মের প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে হেরোপোলিসের (Hieropolis) অন্তর্গত ফ্রিগিয়া নামক স্থানে এপিক্‌টেটাসের (Epictetus) জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। ক্রীতদাস থাকিবার সময়ও তাঁহার মনিব তাঁহাকে গ্রীকদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। এইভাবে শিক্ষা লাভ করিয়া কিছুদিন পরে এপিক্‌টেটাস্‌ নিজেই দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয়, এপিক্‌টেটাস্‌ কিছুই লিখিয়া যান নাই।

এপিক্‌টেটাস্‌ ছিলেন খোঁড়া ও দরিদ্র। রোম-সম্রাট্‌ ডোমিসিয়ান্‌ (Domitian) তাঁহাকে রোম হইতে নির্ব্বাসিত করিলে পর তিনি এপিরাস্‌ (Epirus) নামক স্থানে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। এন্টোনিনাস্‌ পায়াস্‌ (Antoninus Pius) নামক একজন পরবর্ত্তী রোম-সম্রাট্‌ এই মহাপুরুষের আদর্শ নীতির অনুসরণ করিয়া নিজের জীবনকেও যেমন সুখপূর্ণ করিয়াছিলেন, তেমনই দেশেরও অনেক কল্যাণ সাধন করিতে পারিয়াছিলেন।

এপিক্‌টেটাসের উপদেশ দান

এপিক্‌টেটাস্‌ ছিলেন নীতিবাদী। মানব-প্রকৃতি ও মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি যেসকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আজও আদর্শ মানব-রীতিরূপে সকলের কাছে সমাদর লাভ করিতেছে। বিনয়, দয়া এবং পরোপকার ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সাধারণের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন

এপিক্‌টেটাস্‌ জাতিতে গ্রীক্‌ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের মধ্য দিয়া তাঁহার মহত্ব ফুটিয়া উঠিত। সত্য আপনা হইতেই প্রকাশিত, একথা তিনি স্বীকার

করিতেন না। প্রকৃত সত্যের সন্ধান আমাদিগকে করিতে হইবে, এইরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিলেই আমরা প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে পারিব।

পৃথিবীর ধন সম্পদ্, ভোগবিলাসকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। এমন কি, শারীরিক পীড়ার যন্ত্রণাকেও তিনি তুচ্ছ মনে করিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার শিষ্যেরা এই মহাপুরুষের উপদেশ হইতে যাহা কিছু লিখিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে আমরা এপিক্‌টেটাসের শিক্ষা ও উপদেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারি। এপিক্‌টেটাসের জীবনী সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। কিভাবে তাঁহার জীবন কাটিত, কি ভাবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাও আমাদের অজ্ঞাত। আমরা তাঁহার উপদেশ হইতে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, এখানে তাহাই উল্লেখ করা গেল।

এপিকটেটাসের বাণী

যদি তুমি ভাল হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সকলের আগে এই কথাটা মনে কর যে, তুমি মন্দ।

* * * * *

যে ব্যক্তি টাকা-কড়ি, আমোদ-প্রমোদ এবং যশঃ ও খ্যাতির আশা করে, সে কখনও মানুষকে ভালবাসিতে পারে না। যে ধার্মিক, যাহার মনে কোনরূপ অনুদার ভাব নাই, তিনিই মানবপ্রেমিক হইতে পারেন।

* * * * *

ভোজে যাইয়া মনে রাখিবে যে, তোমার দুইজন অতিথি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, এক দেহ, অপর আত্মা। দেহকে যাহা দিবে, তাহার কোন মূল্যই নাই, তাহা হাতে হাতে শেষ হইবে। কিন্তু আত্মাকে যাহা দিবে, তাহাই হইবে চিরস্থায়ী।

* * * * *

জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও বাহিরের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয় না—সে মানুষকে বিচার করে তাহার কর্ম্মের ভিতর দিয়া।

সময় নির্বোধের জন্য কেবল দুঃখই বহিয়া আনে। প্রকৃত সুখ ও আনন্দ আনে জ্ঞানীর জন্য।

* * * * *

নির্বোধ যাহারা, তাহারা বাহিরের বেদনাকেই বড় করিয়া দেখে, জ্ঞানী যাহারা, তাহারা মন ও আত্মার অবনতি ও অজ্ঞানতার বিন্দুমাত্র আভাস পাইলেই ব্যথিত হয়।

* * * * *

জ্ঞানী ব্যক্তির পরিচয়—সে কখনও পরের নিন্দা করে না। মূর্খ ও অজ্ঞানের পরিচয়—সে পরের নিন্দা ও গ্লানি না করিয়া এক মুহূর্ত্তও শান্ত থাকিতে পারে না।

* * * * *

নগরের বাহ্য আড়ম্বর, উচ্চ প্রাসাদ ও সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কিছুই নাই। কেননা সে সব ত কাঠ-পাথরের তৈয়ারী, —কিন্তু নগরের অধিবাসীরা যদি সৎ ও মহৎ হয়, তাহা হইলেই সে নগর সুন্দর ও মনোহর।

নদী

১২৮০ পৃষ্ঠার পর]

ওরে তোরা কি জানিস্ কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ।
ওরে দিবস রজনী নাচে,
তাহা শিখেছে কাহার কাছে ?
শোন্ চল্‌চল্ ছল্‌ছল্
সদাই গাহিয়া চ'লেছে জল।
আমি বসে' বসে' তাই ভাবি,
নদী কোথা হ'তে এলো নাবি'
কোথায় পাহাড় সে কোন্ খানে,
তাহার নাম কি কেহই জানে ?
তাহার মাথার উপরে শুধু
শাদা বরফ করিছে ধু ধু।
সেথা শাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমায় স্বপন সুখে।
কবে মুখে তা'র রোদ লেগে ;
নদী আপনি উঠিল জেগে ;
তাই ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে ভাবিল, যা আছে ভবে
সবই দেখিয়া লইতে হবে।
নীচে পাহাড়ের বুক জুড়ে'
গাছ উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে।
তাদের তলে তলে নিরিবিলি
নদী হেসে চলে খিলি খিলি।
পথে শিলা আছে রাশি রাশি, :
তাহা ঠেলি' চলে হাসি' হাসি'।
পাহাড় যদি থাকে পথ জুড়ে'
নদী হেসে যায় বেঁকে চুরে।

নদী যত আগে আগে চলে
ততই সাথী জোটে দলে দলে

তা'রা তারি মতো ঘর হ'তে
সবাই বাহির হ'য়েছে পথে ;

শেষে পাহাড় ছাড়িয়ে এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।

হেথা যেখানে চাহিয়া দেখে
চোখে সকলি নূতন ঠেকে।
হেথা চারিদিকে খোলা মাঠ,
কোথাও চাষীরা করিছে চাষ,
কোথাও গোরুতে খেয়েছে ঘাস ;
কোথাও বৃহৎ অশথ গাছে
পাখী শিস্ দিয়ে দিয়ে নাচে ;
কোথাও রাখাল ছেলের দলে
খেলা করিছে গাছের তলে ;

সেথা শেয়াল লুকায়ে থাকে,
রাতে হুয়া হুয়া করে' ডাকে।
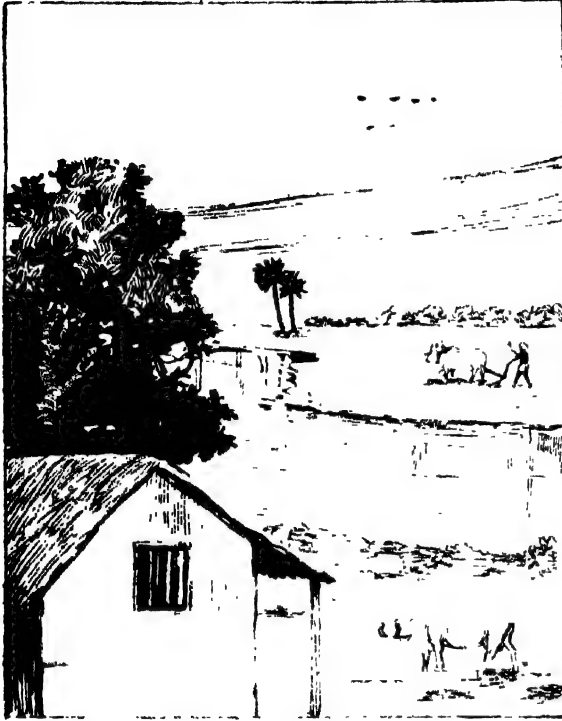
দেখে এই মতো কত দেশ,
কে-বা গনিয়া করিবে শেষ !
কোথাও কেবল বালির ডাঙা,
কোথাও মাটিগুলো রাঙা রাঙা,
কোথাও ধারে ধারে উঠে বেত,
কোথাও দু-ধারে গমের ক্ষেত,
কোথাও ছোটখাটো গ্রামখানি,
কোথাও মাথা তোলা রাজধানী ;
কোথাও শাদা পাথরের পুলে
নদী বাঁধিয়াছে দুই কূলে।
কোথাও লোহার সাঁকোয় গাড়ি
চলে ধকো ধকো ডাক ছাড়ি' ;
নদী এই মতো অবশেষে
এলো নরম মাটির দেশে।
হেথা যেথায় মোদের বাড়ি
নদী আনিল দুয়ারে তারি।

হেথায় নদী নাল বিল খালে
দেশ ঘিরিছে জলের জালে,

কত মেয়েরা নাহিছে ঘাটে,
কত ছেলেরা সাঁতার কাটে;
কত জেলেরা ফেলেছে জাল,
কত মাঝিরা ধ'রেছে হাল,
সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি,
কত খেয়া তরী দেয় পাড়ি।
কোথাও পুরাতন শিবালয়
তীরে সারি সারি জেগে রয়।
সেথায় দু'বেলা সকালে সাঁঝে
পূজার কাঁসর ঘণ্টা বাজে।
কত জটাধারী ছাই-মাখা
ঘাটে বসে' আছে যেন আঁকা
তীরে কোথাও ব'সেছে হাট,
নৌকা ভরিয়া র'য়েছে ঘাট;
মাঠে কলাই সরিষা ধান,
তাহার কে করিবে পরিমাণ;

কোথাও ধূ ধূ করে বালুচর
সেথায় গাঙ্‌শালিকের ঘর।

সেথায় কাছিম বালির তলে
আপন ডিম পেড়ে আসে চ'লে

সেথায় শীতকালে বুনো হাঁস
কত ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস;
সেথায় দলে দলে চখাচখী
করে সারা দিন বকাবকি।
সেথায় কাদা খোঁচা তীরে তীরে
কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরে।
কোথাও ধানের ক্ষেতের ধারে,
ঘন কলাবন বাঁশঝাড়ে
ঘন আম-কাঁটালের বনে,
গ্রাম দেখা যায় এক কোণে।
সেথা আছে ধান গোলা ভরা
সেথা খড়গুলো রাশ করা;
সেথা গোয়ালেতে গোরু বাঁধা
কত কালো পাট্‌কিলে শাদা।
কোথাও কলুদের কুঁড়ে খানি,
সেথায় ক্যাঁ কোঁ করে' ঘোরে ঘানি;

কোথাও কুমারের ঘোরে চাক্,
দেয় সারাদিন ধরে' পাক।
মুদী দোকানেতে সারাখন
বসে' পড়িতেছে রামায়ণ।
কোথাও বসি' পাঠশালা ঘরে
যত ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ে,
বড়ো বেতখানি ল'য়ে কোলে
ঘুমে গুরুমহাশয় ঢোলে।

হেথায় এঁকে বেঁকে ভেঙে চুরে'
গ্রামের পথ গেছে বহু দূরে।
সেথায় বোঝাই গরুর গাড়ি
ধীরে চলিয়াছে ডাক ছাড়ি'।
রোগা গ্রামের কুকুরগুলো
ক্ষুধায় শুঁকিয়া বেড়ায় ধুলো।
যেদিন পুরণিমা রাতি আসে
চাঁদ আকাশ জুড়িয়া হাসে;

বনে ও-পারে আঁধার কালো,
জলে ঝিকমিকি করে আলো,
বালি চিকিচিকি করে চরে,
ছায়া ঝোপে বসি' থাকে ডরে।
সেথায় গহন গভীর বন,
তীরে নাহি লোক নাহি জন।
শুধু কুমীর নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝোপে,
ঘাড়ে পড়ে আসি' এক লাফে।
কোথাও দেখা যায় চিতা বাঘ,
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ।
রাতে চুপি চুপি আসে ঘাটে,
জল চকো চকো করি' চাটে।
হেথায় যখন জোয়ার ছোটে,
নদী ফুলিয়ে ফুলিয়ে ওঠে।
নদী চলে' যায় যত দূরে,
ততই জল উঠে পূরে পূরে।
শেষে দেখা নাহি যায় কূল,
চোখে দিক হ'য়ে যায় ভুল;
নীল হ'য়ে আসে জলধারা,
মুখে লাগে যেন নুন-পারা;
ক্রমে নীচে নাহি পাই তল,
ক্রমে আকাশে মিশায় জল;
ডাঙা কোন্ খানে পড়ে' রয়;
শুধু জলে জলে জলময়।
ওরে এ কী শুনি কোলাহল,
হেরি এ কী ঘন নীল জল।

হেথায় ফুরাইল সব দেশ,
নদীর ভ্রমণ হইল শেষ;
এখন কোথাও হ'বে না যেতে,
সাগর নিল তা'রে বুক পেতে।

নদী চিরদিন চিরনিশি,
র'বে অতল আদরে মিশি'।

লাঙ্গলের ঈষ

জাতকের গল্প

১৩২৮ পৃষ্ঠার পর

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসী নগরে একটি বিরাট্ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। পাঁচশত ছাত্র তাঁহার কাছে শিক্ষা লাভ করিত। তাহাদের মধ্যে একটি শিষ্য এতই নির্ব্বোধ ছিল যে, কিছুতেই তাহার মাথায় কিছুই ঢুকিত না। বোধিসত্ত্ব সহস্র চেষ্টাতেও তাহাকে কিছু শিখাইতে পারিতেন না। কিন্তু তাহার একটি গুণ ছিল—তাহার মত গুরু-সেবা আর কেহই করিতে পারিত না—তজ্জন্য আচার্য্য তাহাকে বড় স্নেহ করিতেন।

আচার্য্য আহারের পর যখন শয্যায় শয়ন করিতেন তখন সে প্রত্যহ তাঁহার পা টিপিয়া দিত। আচার্য্যের নিদ্রা আসিলে সে নিজে নিদ্রা যাইত। এক দিন এইভাবে আচার্য্য নিদ্রিত হইয়া পড়িলে সে চলিয়া যাইবার সময় দেখিল—খাটের একটি পায়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ছাত্রটি পায়াটিকে ঠিক করিয়া দিতে গিয়া দেখিল, আচার্য্য যদি ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরিতে যান, তাহা হইলে খাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইবেন। তখন কোন উপায় ঠিক করিতে না পারিয়া শিষ্যটি আপনার ঘাড়ে খাটের একটি কোণ চাপাইয়া সারারাত্রি বসিয়া কাটাইল। প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আচার্য্য ঐ ভাবে শিষ্যকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, কেন সে ঐ ভাবে বসিয়া আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্য তাহার সেই বিষম সমস্যার কথা বলিলে গুরু শিষ্যের ভক্তি লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গুরু ভাবিতে লাগিলেন—আমার এমন ভক্তেরও যদি বিদ্যা না হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয় হইবে।

শিষ্য ঘাড়ে খাটের একটি কোণ চাপাইয়া সারারাত্রি বসিয়া কাটাইল

গুরু দেখিলেন, কোন প্রকারে ইহার বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত করিতে হইবে—'উপমানের' সাহায্যে ইহার বুদ্ধির উন্মেষের চেষ্টা করা যাক। প্রত্যহ ইহাকে নগর ভ্রমণে পাঠান যাইবে,—তারপর কি কি দেখিয়া আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করা যাক,—সেগুলি কিসের মত, জিজ্ঞাসা করিলে বাধ্য হইয়া শিষ্যকে 'উপমান' প্রয়োগ করিয়া বুঝাইতে হইবে—তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ সাধিত হইতে পারিবে।

প্রথমদিন শিষ্য ফিরিয়া আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—তুমি আজ কি দেখেছ?

শিষ্য—একটি সাপ দেখেছি।

গুরু—আচ্ছা, বল ত সাপ কিসের মত?

শিষ্য—লাঙ্গলের ঈষের মত।

গুরু ভাবিয়া দেখিলেন—হাঁ, অনেকটা লাঙ্গলের ঈষের মতই বটে।

প্রথম প্রথম ঠিক হইবে না—কাছাকাছি যাইবে—তারপর ক্রমে উপমানের বোধ নিশ্চই বাড়িবে।

দ্বিতীয় দিন শিষ্য ফিরিয়া আসিলে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ কি দেখ্‌লে বৎস?

শিষ্য—আজ রাজপথে একটা হাতী দেখেছি।

গুরু—বল দেখি হাতী কিসের মত?
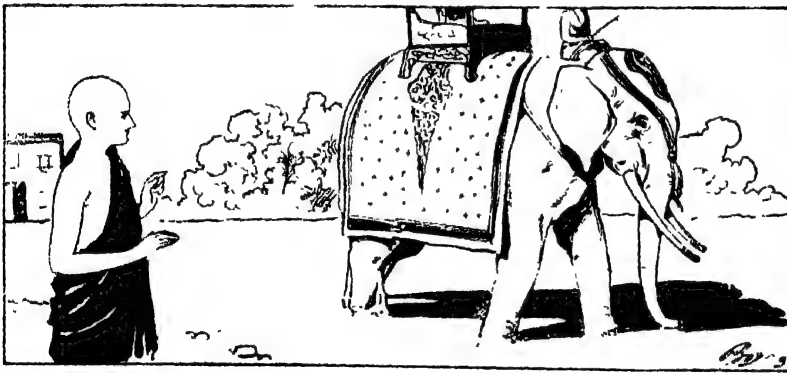
শিষ্য আজ রাজপথে একটা হাতী দেখিল

শিষ্য না ভাবিয়া চিন্তিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলিল—লাঙ্গলের ঈষের মত।

গুরু ভাবিয়া দেখিলেন—সমগ্র হস্তীটার কথা শিষ্য ভাবিতে পারে নাই।

শুঁড় ও দাঁতের কথাই ভাবিয়াছে। অংশটাই লক্ষ্য করিয়াছে, ক্রমে সমগ্র সম্বন্ধে জ্ঞান হইবে। তৃতীয় দিন শিষ্য ফিরিয়া আসিলে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ কি দেখ্‌লে বৎস?

শিষ্য—আজ আমাকে দুধ ও দই দিয়ে ফলার করতে দিয়েছিল।

গুরু—দুধ ও দই কিসের মত বল দেখি?

শিষ্য—লাঙ্গলের ঈষের মত।

গুরু ত অবাক্—ভাবিতে লাগিলেন—এ উপমান উহার মাথায় কেন আসিল? কোন সাদৃশ্য ত দেখিতেছি না। অনেক ভাবিয়া গুরু বুঝিলেন, দুধ আর দই সাদা—বকও সাদা, বর্ণের জন্য দুধ আর দই বকের মত। আর বক লাঙ্গলের ঈষের মত। তাই বোধ হয় শিষ্য দুধ আর দইকে লাঙ্গলের ঈষের মত ভাবিয়াছে।

চতুর্থ দিনে শিষ্য ফিরিয়া আসলে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ কি দেখেছ?

শিষ্য—আজ এক গৃহস্থের বাড়িতে গুড় ভক্ষণ খেয়েছি।

গুরু—আচ্ছা বল দেখি গুড় কিসের মত?

শিষ্য বিনা দ্বিধায় বলিয়া বসিল—লাঙ্গলের ঈষের মত।

গুরু আরও অবাক্ হইয়া গেলেন—গুড়ের সঙ্গে লাঙ্গলের ঈষের সাদৃশ্য কোথায়?

অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন—গুড়ের সঙ্গে মধুর সাদৃশ্য আছে—মধু থাকে মৌচাকে; মৌচাক অনেক সময় গাছে লাঙ্গলের ঈষের মত শুক্‌না ডালে ঝোলে, অন্ততঃ ঐরূপ একটা ডালে চতুষ্পাঠীর প্রাঙ্গণেই একটা মৌচাক ঝুলিতেছে।

গুরু দেখিলেন—শিষ্য ক্রমেই তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। তখন হতাশ হইয়া বলিলেন, "বাপু তোমার মত গুরু-ভক্ত শিষ্য আমার আর মিল্‌বে না; কিন্তু স্বার্থের জন্য তোমাকে এখানে ধরে' রাখা ঠিক নয়। তুমি লাঙ্গলের ঈষ ছাড়া কিছু জান না—তোমার মাথাটিও লাঙ্গলের ঈষের মত, অতএব লাঙ্গলের ঈষই তোমার অবলম্বন হওয়া উচিত। তুমি গ্রামে গিয়ে লাঙ্গলের ঈষের চর্চ্চা করগে—অর্থাৎ চাষবাস কর গিয়ে, এ ঠাঁই তোমার নয়।

শতবুদ্ধি ও সহস্রবুদ্ধি

[পঞ্চতন্ত্রের গল্প

মস্ত বড় এক দীঘি; সেই দীঘির মধ্যে থাকে দুটো মাছ—এক জনের নাম সহস্রবুদ্ধি, আর অপরটার নাম শতবুদ্ধি। দীঘির কিনারে গর্ত্তের ভিতর থাকে একটা বেঙ্। বেঙের নাম একবুদ্ধি। তিন জনে ভারী ভাব। মাছ দুটো জলের ধারে এসে বেঙের সাথে কত রকমের গল্প করে।

একদিন সূর্য্য ডোবে-ডোবে—তিনজন মিলে খুব হাসি-গল্প করছে। এমন সময় যমদূতের মত

তিনজনে মিলে খুব হাসি গল্প করছে

জনকতক জেলে এসে দীঘির চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখে বল্‌লে—পুকুরটায় খুব মাছ, জলও বেশী বলে মনে হচ্ছে না, কাল ভোরে এসেই জাল ফেলা যাবে।

জেলেরা তো তখনকার মত চলে গেল, কিন্তু তিন বন্ধুর প্রাণের ভিতর বড়ই ভয় হতে লাগ্‌ল। সেই ভয়ঙ্কর বিপদ হতে কি করে বাঁচা যায়, তাই তারা পরামর্শ কর্‌তে বসল।

বেঙ্ বল্‌লে—ভাই শতবুদ্ধি, সহস্রবুদ্ধি, সাম্‌নে ভয়ঙ্কর বিপদ, এখন কি করা যায় বলো?

বেঙের কথায় সহস্রবুদ্ধি হেসে বল্‌লে—বন্ধু, এত ভয় খাচ্ছ কেন? জেলেরা আস্‌বে বলেছে, এখনো তো সত্যি সত্যি আসে নি; যখন আসবে, তখন

দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চল্‌ল

দেখা যাবে; আর সত্যিই যদি তেমন কিছু বিপদ আসে তো তার ব্যবস্থা তখন আমি কর্‌বো; আমার নাম সহস্রবুদ্ধি, বুদ্ধির অভাব আমার কখনো হবে না, জেনো।

সহস্রবুদ্ধির কথায় সমর্থন করে শতবুদ্ধি তখন বল্‌লে—হাঁ সহস্রবুদ্ধির কথাই ঠিক। শুধু কতক-

গুলো কথা শুনে সাত পুরুষের বাস্তভিটা ছেড়ে যাওয়াটাও ঠিক নয়। দেখা যাক্ না, কতদূর কি হয়।

বেঙ্ বল্লে—দেখ ভাই, তোমাদের মত আমার শতবুদ্ধিও নাই, সহস্রবুদ্ধিও নাই, আমার একবুদ্ধি বল্‌ছে আজই রাত্রে ঘর বাড়ী ছেড়ে সস্ত্রীক অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে। অতএব আমি এখুনি অন্যত্র চল্লাম। এই বলে বেঙ্ সেই রাত্রেই অন্যত্র আশ্রয় খুঁজে নিল।

পরদিন ভোরবেলাতেই জেলেরা এসে দীঘিতে জাল ফেলে দীঘির যত মাছ, বেঙ্, কচ্ছপ, কাঁকড়া টেনে তুল্‌লে। সেই সঙ্গে শতবুদ্ধি, সহস্রবুদ্ধিও জালে ধরা পড়্‌ল। তারা পালাবার জন্য অনেক চেষ্টা কর্‌ল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। জেলেরা তাদের আছ্‌ড়ে মেরে ফেল্‌লে।

কিছুক্ষণ পরে যখন জেলেরা শতবুদ্ধি ও সহস্র-বুদ্ধিকে দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চল্‌ল তখন নিকটের আর একটা পুকুরে একবুদ্ধি নিঃশঙ্ক নির্ভয় মনে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছিল।

তাঁতীর বুদ্ধি

এক সহরের মধ্যে এক তাঁতীর বাস। সে নিতান্ত কুঁড়ে ছিল বলে সকলে তাকে কুঁড়ে তাঁতী বলে ডাক্‌ত।

তার একখানা তাঁতের সমস্ত কাঠের গজালগুলো ভেঙে গিয়েছিল বলে একদিন সকালে কুড়ুল নিয়ে এক বনের মধ্যে গেল কাঠ কেটে আন্‌তে। দেখে শুনে সে একটা শিশু গাছ বেছে নিয়ে তাই কাটবার জন্য কুড়ুল তুলেছে—

এখন সেই গাছেতে এক পরী বাস কর্‌ত। পরী তখন তাঁতীকে বল্‌লে—বাপু, এ গাছ তুমি কেট না, এ গাছে আমার অনেক দিনের বাস।

পরীর কথা শুনে তাঁতী বল্‌লে—কিন্তু এ গাছ না কেটে তো উপায় নাই। ঘরে আমার তাঁত অচল, কাঠ কেটে না নিয়ে গেলে গজাল তৈরী হবে না, ছেলে-মেয়েরা না খেয়ে শুকিয়ে মরবে। তাই বল্‌ছি দয়া করে আপনি অন্য গাছে গিয়ে বাস করুন।

পরী বল্‌লে—তুমি আমার কাছে যে কোন বর চাও আমি দেবো, কিন্তু এ গাছ তুমি কাটতে পারবে না।

বরের কথা শুনে তাঁতী বল্‌লে—বেশ, আপনি যদি আমাকে মনের মত বর দেন তো এ গাছ আমি কাটবো না।

পরী বল্‌লে—কি বর চাই বলো?

তাঁতী বল্‌লে—আজ আমি বাড়ী গিয়ে স্ত্রী ও বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করি, তারপর কাল এসে আমি বর চাইবো।

তাঁতীর কথায় পরী রাজী হল। তাঁতী তখন সহরে ফিরে এসে তার বন্ধু নাপিতকে সব কথা বলে পরামর্শ চাইলো। নাপিত বল্‌লে—বন্ধু, এমন সুযোগ ছেড়ো না পরীর কাছে গিয়ে তুমি একটা

বাপু, এ গাছ তুমি কেটো না

রাজ্য চাও; তুমি হবে রাজা, আর আমি হব মন্ত্রী; সুখের আর সীমা থাকবে না।

তাঁতী বল্লে—ঠিক বলেছ, তবে বাড়ী গিয়ে একবার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

নাপিত বল্লে—অমন কাজটি কোরো না, বন্ধু; স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! স্ত্রীকে খাওয়াও, দাওয়াও, ভালো ভালো কাপড় চোপড় দাও, গয়না-গাঁঠি দাও, কিন্তু স্ত্রীর কাছে কখনো পরামর্শের জন্য যেও না। যে-লোক স্ত্রীর কথা শুনে কাজ করে, তার সমূহ বিপদ জেনো।

তাঁতী বল্লে—তোমার কথা ঠিক, কিন্তু আমার স্ত্রী তেমন নয়, সে খুবই বুদ্ধিমতী।

তখন সে তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে বল্লে,—দেখো, একটা পরী আমাকে বর দেবে বলেছে; এখন কি চাই বলো; আমার বন্ধু নাপিত বল্ছে একটা রাজত্ব চেয়ে নিতে; এখন তুমি কি বলো?

স্বামীর কথা শুনে তাঁতী-গিন্নী বল্লে—বলিহারী যাই তোমার বুদ্ধির কথা শুনে, তুমি গেছো নাপিতের কাছে পরামর্শ চাইতে। অমন ধড়িবাজ সর্ব্বনেশে লোক আর আছে! তুমি জান না, রাজা হওয়ার কত জ্বালা—কত ভাবনা! কত দুশ্চিন্তা! আজ যুদ্ধ, কাল বিদ্রোহ! তার উপর রাজার পদে পদে বিপদ্! কখন কোথায় কে খুনখুন করে বসে, তার ঠিক নাই! নিজের ভাই, নিজের ছেলে, নিজের স্ত্রীকেও তখন বিশ্বাস নাই!

স্ত্রীর কথা শুনে তাঁতী মহা খুসী; তাঁতী বল্লে ঠিক্, তোমার কথাই ঠিক্; রাজা হওয়ার অনেক জ্বালা! কিন্তু এখন কি বর চেয়ে নেবো তা বলো।

স্ত্রী বল্লে—দেখো, এখন তুমি দিনে একখানা কাপড় বোনো, তাতে কোন রকমে আমাদের কায়-ক্লেশে দিন চলে; দুটো হাত নিয়ে তার বেশী হবার উপায় নাই! এখন যদি তুমি পরীর কাছে আর একজোড়া হাত চেয়ে নিতে পারো, তা হলে আর দেখতে হবে না। তখন দিনে একখানার জায়গায় দুখানা করে কাপড় বুনতে পারবে, সংসারের অভাবও ঘুচবে, আর আমাদেরও সুখের অন্ত থাক্‌বে না।

স্ত্রীর কথা শুনে তাঁতীর আর খুসী ধরে না; সে তখনই নাচ্‌তে নাচ্‌তে বনে চল্‌ল সেই পরীর কাছে বর চাইতে।

তাঁতীকে দেখে পরী বল্‌ল—কি বর চাই তা ঠিক্ করে এসেছ?

তাঁতী বল্লে হাঁ, আমার দু'টো হাত, আমায় আর একজোড়া হাত দিন্।

পরী বল্লে—তথাস্তু!

তখন চোখের নিমেষে তাঁতীর চারটে হাত হয়ে গেল। তাঁতী মহানন্দে সহরে ফিরে এলো—এখন তাকে পায় কে?

যত লোক লাঠি সোঁটা নিয়ে তেড়ে আস্‌ছে

কিন্তু সহরের ভিতর ঢুকতেই দেখে যত লোক তার পেছনে লাঠি সোঁটা নিয়ে তেড়ে আস্‌ছে। সহরবাসীরা সেই চারটে হাত-ওলা লোক দেখে ভাব্‌লে, এটা নিশ্চয়ই কোন দৈত্য বা রাক্ষস হবে। তাই ভেবে সকলে মিলে তার উপর পড়ে' কিল চড় ঘুঁসি মেরে তাকে মেরে ফেল্‌ল।

ভূ-তত্ত্ব—পৃথিবীর কথা

এবার তোমাদিগকে ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধে দুচার কথা বলব। ভূ মানে পৃথিবী, তা জান ত? এই পৃথিবী এল কোথা থেকে, যুগে যুগে এর চেহারা কি রকম বদলে বদলে এসেছে, এর ভেতর কি আছে, কি অবস্থায় আছে, এই সব কথা আমরা শিখি ভূ-তত্ত্ব বিদ্যা হতে।

প্রথম, তোমাদের একটা কথা বেশ করে বুঝতে হবে। এই পৃথিবী কিন্তু চিরদিন ছিল না। চিরদিন যে থাকবে, তাও কেউ বলতে পারে না। এর জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত এর মূর্ত্তির কত রকম আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে! পরিবর্ত্তন যে শেষ হয়েছে, তাও নয়। এখনও প্রতি মুহূর্ত্তে এর চেহারা বদলে চলেছে। তবে সে বদল এত আস্তে আস্তে ঘটছে, যে চোখে ধরা পড়ে না। চোখে ধরা পড়ে ছোট ছোট জিনিস। একটা বুড়ো বট গাছ শুকিয়ে ভেঙ্গে পড়ল—কি নদীর এক পাড় ভাঙ্গল, অন্য পাড়ে চড়া পড়ল—কি বান এসে নদীর মুখ ঘুরিয়ে দিলে—কি, বড় জোর, ভূমিকম্প হয়ে চারিদিক লণ্ডভণ্ড হল—এ সব চোখে দেখতে পাও। কিন্তু প্রতিদিন, প্রতি সেকেণ্ডে, ডাঙ্গায় জলে, রোদে বৃষ্টিতে ঝড়ে তুফানে যুদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে যে পরিবর্ত্তন ঘটছে, সে ত তোমাদের নজরে পড়ে না! ইতিহাসের ঘটনার হিসাব হয় শতাব্দী দিয়ে, কিন্তু বসুমতীর জীবনের মাপ-কাঠি কোটি বৎসর। এর এক একটা যুগ—যেমন জলের যুগ, জঙ্গলের যুগ, বরফের যুগ ইত্যাদি—লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলেছে। আমরা সামান্য মানুষ, বড় জোর একশো বছর আমাদের জীবন, আমাদের পক্ষে কোটি বছর মনে ধারণা করা ত সহজ নয়! তবে কি জান, ভূ-তত্ত্ব ত আর অঙ্ক কি বিজ্ঞানের মতন নয়। এতে সব জিনিস চোখে দেখে হিসেব করা চলে না। কল্পনা শক্তির সাহায্য না নিলে অনন্ত আকাশ, অনাদি কাল, এ সবের তোমরা ধারণা করবে কি করে!

একটা মজার গল্প বলি, শোন। গল্পটা ইরান দেশের। এক ছিল বাগান, আর সেই বাগানের ছিল এক বুড়ো মালী। একদিন ঐ বাগানে এক গোলাপ ফুল তার সখী রজনীগন্ধাকে বললে,—সই আমাদের ঐ যে মালী, ওর চেহারা কি কখনও বদলায় না?

রজনীগন্ধা উত্তর দিলে,—ভাই, আমি ত ওকে চিরদিন ঐ একই রকম দেখছি।

গোলাপ হেসে বললে,—আরে, তুই ত দেখবিই! তোর চেয়ে আমি বয়সে কত বড়, আমিই ওর চেহারার কোন পরিবর্ত্তন দেখি নাই। কিন্তু মজার কথা জানিস্, আমার বুড়ি দিদিমা, সেই যে যিনি কাল রোদের সময় শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেলেন, তিনিও চিরদিন ওকে ঐ রকমই দেখে এসেছেন চামড়া কোঁচকান, ঐ শণের মত শাদা দাড়ী, ঐ কুঁজো হয়ে চলা!

রজনীগন্ধা বললে,—আশ্চর্য্য কথা সই! আমরা এত রকমের ফুল আছি এই বাগানে, আমরা কুঁড়ি হয়ে জন্মাচ্ছি, তার পর ফুটছি, সব শেষ শুকিয়ে ঝরে পড়ছি, কিন্তু ও বুড়ো যেমনকার তেমনই রয়েছে চিরদিন!

তোমরা হয় ত এই গোলাপ-রজনীগন্ধার মতন ভাব যে, মানুষ যায় আসে, কিন্তু এই বৃদ্ধা বসুন্ধরা চিরদিনই এই রকম আছে—এই নাইল, গঙ্গা, মিসিসিপি নদী, এই হিমালয়, এণ্ডিজ, আল্পস্ পর্ব্বত, এই পেসিফিক, আটলাণ্টিক মহাসাগর, এই এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা মহাদেশ! তা যদিই বা ভাব আমি তাতে ত আশ্চর্য্য হব না।

কিন্তু কথাটা সত্য নয়। একদিন এশিয়া, ইউরোপ, হিমালয়, আল্পস্, এ-সব কিছুই ছিল না। পৃথিবীর জীবন বৃত্তান্ত আমি যত সরল করে পারি তোমাদিগকে বুঝিয়ে দেব। তবে সকল বিষয়ে ত আর পণ্ডিতদের এক মত নয়। কাজেই আপাততঃ মোটামুটি দুচারটে কথা শুনে তোমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

যখন সূর্য্যদেবের অঙ্গ হতে পৃথিবী প্রথম এলোমেলো এক রাশ জড়পিণ্ডরূপে ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়েছিল তখন তার অবস্থা সূর্য্যের অনুরূপ ছিল। অর্থাৎ তার দেহটা ভীষণ তাপে গনগন্ করছিল। তার মধ্যে এতটুকু কঠিন বা তরল পদার্থ ছিল না—সবটাই ছিল ধোঁয়াটে পদার্থ বা গ্যাস্। ছিট্‌কে কেন বেরিয়েছিল, তা ঠিক জানা যায় না। হতে পারে, সূর্য্যের অঙ্গের ভেতর যেসব অগ্নি-উৎপাত হয় তারই ঠেলায় খানিকটা জড় পদার্থ বাইরে এল। হতে পারে, একটা খুব বড় নক্ষত্র পাশ দিয়ে যাবার সময় সূর্য্যের দেহের খানিকটা টেনে ভেঙ্গে দিয়ে গেল।

যে তপ্ত জড়পিণ্ড সূর্য্যের ভেতর থেকে বেরোল, তার গড়ন ছিল একটা পটোলের মতন। (চিত্র—১)।
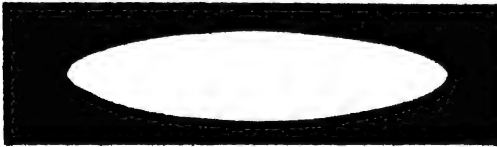
চিত্র - ১। তার গড়ন ছিল একটা পটোলের মতন

ধীরে ধীরে সেটা ভেঙ্গে চুরে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এই রকম করে। (চিত্র—২)। এক একটা টুকরো হল এক একটা গ্রহ। (চিত্র—৩)। কিন্তু তারা বেশী দূর পালাতে পারলে না। সূর্য্যের যে আকর্ষণী শক্তি আছে তার জোরে আলাদা আলাদা পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করতে লেগে গেল।

পাশের ছবিটা থেকে আন্দাজ করতে পারবে, কি রকম ভাবে পৃথিবী আর মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহগুলো ঘুরছে। (চিত্র—৪)।

এই যে আকর্ষণী শক্তি বা টান, এটা জড় জগতের সাধারণ নিয়ম। পাশ্চাত্য ঋষি নিউটন এই নিয়ম প্রথম বুঝিতে পারেন ও সাধারণে প্রচার করেন। হয় ত আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরাও এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না।

নিয়মটা এই যে, সৃষ্টিতে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রত্যেক জড় কণা অন্য জড়-কণাকে টানছে। যে দ্রব্য যত বড় অর্থাৎ যত ভারী, সে তত বেশী জোরে টানছে।

চিত্র—২। সেটা ভেঙ্গেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে গেল

চিত্র—৩। এক একটা টুকরা হল এক একটা গ্রহ
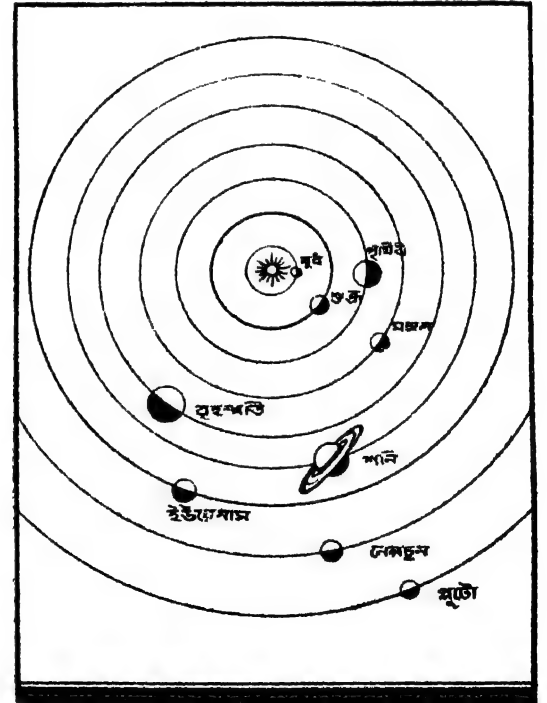
চিত্র — ৪। গ্রহগুলো সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে

পৃথিবী যে তার উপরের সব জিনিষকে আকর্ষণ করছে, তা ত তোমরা দেখতেই পাও। খুব জোরে

আকাশ পানে একটা ঢিল ছোড়, সে ঢিল খানিক বাদে ভুঁইয়ে এসে পড়বেই। ঢিল কেন, চাঁদের দিকে লক্ষ্য করে একটা রাইফেল বন্দুক ছোড় না! তার গুলি খানিক দূর উপরে উঠবে, কিন্তু শেষ পৃথিবী তাকে পেড়ে ফেলবেই। এই মাধ্যাকর্ষণের জোরেই ত গাছ থেকে ফল পড়ে, আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে,আবার সেই বৃষ্টির জল গড়াইতে গড়াইতে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে। পাখী আকাশে ওঠে বটে, উড়ো জাহাজ উর্দ্ধে ওঠে বটে, কিন্তু পাখীর ডানা কেটে দাও, উড়ো জাহাজের ইঞ্জিন ভেঙ্গে দাও, কেমন তারা আসমানে ভাসতে পারে দেখি! চাদ যে পৃথিবীর চেয়ে এত ছোট, কিন্তু সেও পৃথিবীকে টানতে ছাড়ে না। সেই টানের ফলেই ত সাগরে জোয়ার ভাটা হয়। এই মাধ্যাকর্ষণের কোন দিন এতটুকু ব্যতিক্রম হয় না।

আচ্ছা, সূর্য্য পৃথিবীকে টানে, কিন্তু তাই বলে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে কেন? এটা বুঝতে পার কি? বোঝা কঠিন নয়। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা সোজা হয়ে যাবে। হাতে একটা ঢিল নিয়ে জোরে সামনের দিকে ছোড়, সে সিধে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু যদি সেই ঢিলটা সুতো দিয়ে তোমার হাতের সাথে বাঁধা থাকে, তাহলে ছোড়ার ফলে সে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে আরম্ভ করবে। গ্রহ গুলোরও ঠিক তাই হয়েছে। তারা ঠেলা খেয়ে বাইরে বের হল বটে, কিন্তু সূর্য্যের দেহের সঙ্গে যে মাধ্যাকর্ষণের অদৃশ্য তার দিয়ে বাঁধা ছিল! তাই তোমার ঢিলটার মতন বোঁ বোঁ করে ঘোরা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না!

আর একটা সন্দেহ হয় ত তোমাদের মনে আসতে পারে। সত্যিই যদি পৃথিবীর উপরের সমস্ত দ্রব্য পরস্পরকে এই রকম টানছে, তা হলে তারা পরস্পরের দিকে ছুটে যাচ্ছে না কেন? সব ঘোট-মণ্ডল হয়ে যাচ্ছে না কেন? পারছে না! পারলে যেত। পৃথিবীর বিশাল দেহটা যে তাহাদের প্রত্যেককে ঢের বেশী জোরে টেনে ধরে রয়েছে! তেমনি আকাশের গ্রহগুলো যে একটা আর একটার ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে না, তার কারণ হচ্ছে এই যে, সূর্য্যের মতন একজন মহাবল সারথির হাতে লাগাম রয়েছে।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে আর একটা সাধারণ কথা তোমাদের জানা দরকার। আগেই বলেছি, পৃথিবী ছাড়া সূর্য্যের আরও কয়েকটি গ্রহ আছে, আর তাদের উৎপত্তিও সূর্য্যের অঙ্গ থেকে। এই গ্রহগুলোর আবার অনেকেরই উপগ্রহ আছে, যেমন আমাদের চাঁদ। তারা আপন আপন গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য্যদেব, তাঁর গ্রহ, উপগ্রহ, এই সব মিলে হল এক বৃহৎ পরিবার—তার নাম সূর্য্য-মণ্ডল বা সৌরজগৎ। এই সূর্য্যমণ্ডল রয়েছে অসীম মহাশূন্যের এক কোণে। তার চারিদিকে কাছাকাছি কোনও নক্ষত্র নেই। সেখানটায় আকাশে ঘুরছে কেবল ছোট ছোট জড়পিণ্ড, যে রকম জড়-পিণ্ডকে আমরা জানি উল্কা বলে। আর ভেসে বেড়াচ্ছে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘের মতন দেখতে ছোট বড় নীহারিকা।

পৃথিবী যে কত বড়, তা তোমরা ভূগোলে পড়েছ। তবু আর একবার মনে করিয়ে দিই। তার ব্যাস অর্থাৎ উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত অন্তর, আট হাজার (৮০০০) মাইল। আর পরিধি বা বেড় পঁচিশ হাজার (২৫০০০) মাইল। শুনতে মস্ত বড় লাগছে, না? কিন্তু আসলে তেমন কিছু নয়। উড়ো জাহাজে চক্কর দিয়ে আসতে কদিনই বা লাগবে!

আচ্ছা, পৃথিবীর তুলনায় সূর্য্য, চন্দ্র কত বড়, আর আমাদের কাছ থেকে কত দূর? সত্যি মাপ যদি বলতে চাই, ত তোমাদের শুনে মাথা ঘুরে যাবে। একটা আন্দাজ করিয়ে দিই। ধর, পৃথিবী যদি হয় একটা হকী বল এর সমান, তাহলে চাঁদ হবে মার্বেলের মতন, আর সূর্য্য হবে একটা পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হাত উঁচু গোল পাথরের চাঙ্গড়ার প্রমাণ। এই হিসেবে চাঁদ হবে পৃথিবী থেকে হাত আষ্টেক দূরে, সূর্য্য হবে এক মাইল দূরে। গ্রহগুলোর মধ্যে যেটা সব চেয়ে বাহিরে বাহিরে থেকে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তার নাম, প্লুটো। সেও আমাদের কাছ থেকে প্রায় চল্লিশ মাইলের বেশী দূরে হবে না (অর্থাৎ সূর্য্যের চল্লিশ গুণ দূরে)। এই প্লুটোর প্রদক্ষিণ পথ হচ্ছে, সৌরজগতের সীমা। তার বাইরে মহাশূন্য। সেই অনন্ত মহাশূন্যে কত যে নক্ষত্র আছে, তার ইয়ত্তা নেই। শুধু চোখে আমরা তার গোটা কয়েক মাত্র দেখতে পাই। দূরবীণ লাগালে আরও কতকগুলো নজরে পড়ে। আর বাকীগুলো আজ পর্য্যন্ত কেউ দেখতে পায় নাই। মহাশূন্যের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপারের খবর আমরা জানি না। যে নক্ষত্র আমাদের সব চেয়ে নিকটে, তারও পৃথিবী থেকে অন্তর সূর্য্যের দূরত্বের দুই লক্ষ গুণ। মাঝে

মাঝে মহাব্যোমের সুদূর প্রদেশ থেকে এক একটা ধূমকেতু এসে আমাদিগকে মনে করিয়ে দিয়ে যায় যে, আমাদের নজরের বাহিরে কত সহস্র সহস্র অজানা জগৎ আছে।

নক্ষত্রগুলোর দূরত্বের হিসেব আর এক রকমে হয়। আলোক চলতে সময় লাগে, এ কথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। তবে, কি জান, আলোর বেগ এত বেশী যে চোখে ধরা যায় না। এক সেকেণ্ডের মধ্যে সে সাত আট বার পৃথিবী চক্কর দিয়ে আসতে পারে। কিন্তু এই আলোই আবার অনন্ত মহাকাশে হার মেনে যায়। সূর্য্য থেকে পৃথিবী পৌঁছতে তার আট মিনিট সময় লাগে। কানোপস্ নক্ষত্র থেকে আসতে তিন চার বছর কেটে যায়। তোমরা শুধু চোখে যে সমস্ত নক্ষত্র কি নক্ষত্রপুঞ্জ দেখতে পাও, যেমন উত্তরাকাশের ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ, অগ্নিবর্ণ, লুব্ধক তাদের আলো তোমাদের চোখে পৌঁছতে আরও ঢের বেশী সময় লাগে। জ্যোতিষীরা তাদের দূরত্ব বর্ণনা করেন তিন বছর দূরে, দশ বছর দূরে, ষাট বছর দূরে ইত্যাদি বলে। তার মানে, সেখান থেকে আলো আসে পৃথিবীতে তিন বছরে, কি দশ বছরে, কি ষাট বছরে। ব্যাপারটা ঠিক ধারণা করতে পারছ কি? হঠাৎ যদি কানোপস্ নক্ষত্র ধ্বংস হয়ে যায়, ত পৃথিবীতে তোমরা তিন বছর তার খবর পাবে না। সেই তিন বছর কানোপস্ রোজ রাত্রে নিয়মিত আকাশে দেখা দেবে। তার পর হঠাৎ একদিন তাকে আর দেখতে পাবে না। তখন বুঝতে হবে যে, তিন বছর আগে কানোপস্ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এ সব কথা ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়।

আচ্ছা, এই যে কানোপসের কথা বলছি, এ কত বড় তা জান? আমাদের সূর্য্য এত বড় যে, সে তার গ্রহ-উপগ্রহগুলোকে সব এক গ্রাসে গিলে ফেলতে পারে। তেমনি কানোপস্ আবার অনেকগুলো সূর্য্যমণ্ডলকে অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারে। এই রকম কত কত বিশাল কানোপস্ মহাব্যোমে ভাসছে। তাহলে বুঝলে ত, যে বসুন্ধরা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হলেও এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিমানচারীদের দলের মধ্যে একটি অতি সামান্য জন! তবে একটা কথা আছে। বসুন্ধরার যেমন এক দিকে এই সমস্ত বড় লোক আত্মীয় কুটুম্ব রয়েছে, তেমনি অন্য দিকে রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ড, যার লাখ খানেক প্রতি বছর সে বুকে টেনে নিচ্ছে। তারাও জাতে বিমানচারী!

আগেকার কালে লোকে ভাবত যে, পৃথিবী দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তার চারিধারে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সব ঘুরছে। অশিক্ষিত জাতেরা আজও তাই মনে করে। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জান যে, পৃথিবী অনবরত লাট্টুর মত পাক খেতে খেতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এই লাট্টুর মতন পাক খায় বলে দিবারাত্রি হয়, আর সূর্য্যকে চক্কর দেয় বলে শীত-গ্রীষ্মাদি ছয় ঋতু হয়। এইটুকু তোমরা জান। কিন্তু শুধু এই নয়। পৃথিবীর এ ছাড়া আরও পাঁচ রকম গতি আছে। তার মধ্যে চার রকম তোমরা এখনই বুঝতে পারবে না। কিন্তু একটা গতির কথা এই খানেই বলি। সারা সূর্য্যমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে তেরো মাইল বেগে অবিরাম ধেয়ে চলেছে। কোথায় যাচ্ছে, কে জানে! শোনা যায় হরিকুলেশ (Hercules) বলে এক নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে ছুটছে। সেখানে পৌঁছলে হয়ত সব জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে। কে বলতে পারে!

ভূ-তত্ত্বের কথা বলতে বলতে কোথায় এসে পড়েছি! তবে কি জান, এই সমস্ত নানা রকমের বিদ্যা এমন জট পাকিয়ে রয়েছে যে, তাদিকে আলাদা করা সম্ভব নয়। বসুমতীর জন্মকথা তোমাদিগকে বললাম। তোমরা জানলে কোথায় তার জন্মস্থান, কে তার জনক, কে তার ভাই-ভগ্নী। এইবার দেখতে হবে যে, সূর্য্যের দেহ হতে নির্গত জ্বলন্ত জড়পিণ্ডের রাশি কি করে আমাদের এই ফল ফুলে শোভিত সুন্দর পৃথিবী হয়ে দাঁড়াল। এই পরিণতি ত আর এক আধ শতাব্দীতে হয় নেই! আগেই বলেছি যে, আমাদের জননী বসুন্ধরার বয়স কোটি কোটি বৎসর। কিন্তু আমরা মানুষের দল এঁর বুকে এসে আশ্রয় পেলাম কবে, কি করে? এও ত তোমরা জানতে চাইবে। এইখানে এল জীবতত্ত্ব। তাকেও বাদ দিলে চলবে না। যখন তোমাদিগকে বলব যে, অমুক যুগে পৃথিবীর চেহারা এই রকম ছিল, সেই সঙ্গে এটাও বলব যে, তখন তার উপর এই এই প্রাণী বাস করত।

ভূগোল পড়ে তোমরা শিখেছ যে, পৃথিবীর উপরটাকে মোটা মুটি দুই ভাগ করা যায়। মহাদেশ ও মহাসাগর—ডাঙ্গা ও জল। ডাঙ্গার চেয়ে জল অনেক বেশী—প্রায় তিন গুণ। এও তোমরা শিখেছ যে, ডাঙ্গাটা সব সমতল নয়। এতে হিমালয়ের মতন পর্ব্বত-শ্রেণী আছে, দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের মতন মালভূমি

আছে, সাঁওতাল পরগণার মতন উঁচু নীচু ঢেউ-খেলান জমি আছে, আবার সমতটও আছে। এই সমতট আরব দেশের মতন মরুভূমি হ'তে পারে, কিংবা বাঙ্গালার মতন পলিমাটির দেশও হতে পারে। পলিমাটির দেশগুলো সাধারণতঃ হয়ে থাকে বড় বড় নদীর মোহানায়,—যেমন নাইলের মুখে মিসর, গঙ্গার মুখে বঙ্গদেশ, সিন্ধুর মুখে সিন্ধু। বড় বড় নদী-গুলো, তাদের উপনদী, শাখা নদী, এরা পাহাড় থেকে রাশি রাশি বালি কাঁকর বয়ে এনে পলিমাটি তৈরী করে ঢেলে দেয় মোহানার কাছে। কতখানা করে বছরে ঢালছে তা জান। আমাদের গঙ্গা-সঙ্গমের কাছে মাপ নিয়ে হিসেব করে দেখা গেছে যে, প্রতি হাজার বছরে সাড়ে বারো ইঞ্চি পলিমাটি পড়ে। পঞ্চাশ হাজার বছরে তাহলে দক্ষিণ বঙ্গ আরও ছত্রিশ হাত উঁচু হয়ে যাবে আর সমুদ্র-গর্ভ হতে কত নূতন জমি জেগে উঠবে! সাধে কবে কি আর কবি গেয়েছেন—

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী, ভারতবর্ষ!" তবে সমুদ্র গর্ভ থেকে ডাঙ্গা যে এই একই রকমে ওঠে, তা মনে কোরো না। ভূগর্ভে যে আগুনের খেলা চলে তার আভাস ত আমরা আগ্নেয়গিরি থেকে, ভূমিকম্প থেকে সর্ব্বদা পাই। আগুনের তেজে পৃথিবীর চেহারার যে পরিবর্ত্তন হয়, সে আরও অতর্কিত, আরও অভাবনীয়। ক্রমশঃ তোমাদিগকে সে কথা বোঝাব।

আপাততঃ পদার্থ-বিদ্যা ও দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলতে হবে। মাধ্যাকর্ষণের নাম ত করেছি। এই আকর্ষণের ফলে প্রত্যেক জড়কণা প্রত্যেক জড়কণাকে টানছে। পদার্থ মাত্রই জড়কণার সমষ্টি। যখন কণাগুলি জমাট বেঁধে থাকে, কাছে কাছে থাকে, তখন সে কঠিন পদার্থ। যখন তারা দূরে দূরে দাঁড়ায়, পদার্থটার ঢলঢলে ভাব হয়, তখন সে তরল হয়ে যায়। যখন কণাগুলো ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে চায় তখন সে পদার্থ ধোঁয়া বা গ্যাস। এদের পরস্পরের একটা সম্বন্ধ আছে। বরফ কঠিন পদার্থ। তাকে তাতালে সে গলে জল হয়ে যায়। জল তরল পদার্থ। তাকে আরও গরম করলে, অর্থাৎ ফোটালে, সে ভাপ বা বাষ্প হয়ে উবে যায়। আগে তোমাদিগকে বলেছি যে, সূর্য্যের দেহ এত গরম যে, সেখানে কঠিন বা তরল দ্রব্য কিছু থাকতে পারে না, সবই গ্যাস। পৃথিবী যখন সূর্য্যের অঙ্গ হতে ছিটকে বেরিয়ে এল, তখন সেও একটা তপ্ত গ্যাসের গোলা। তার পর সেই গোলার বাহিরটা জুড়াতে লাগল। গরম জিনিস জুড়িয়ে যাওয়াই সাধারণ নিয়ম। জলের বাষ্প জুড়ালে জল হয়। আরও বেশী জুড়ালে বরফ হয়ে যায়। পৃথিবীর খোলটারও সেই রকম হয়েছে। ভেতরটার ঠিক কি অবস্থা, তা আজও কেউ জানে না। তবে এটা নিশ্চয় বলা যায় যে, বাহিরের চেয়ে ভেতরটা অনেক বেশী গরম।

দ্রব্য সম্বন্ধে আর একটা কথা বলি। পৃথিবীতে যত দ্রব্য আছে, তারা হয় মৌলিক, নয় যৌগিক। লোহা মৌলিক পদার্থ, কেন না তার মধ্যে এক লোহার কণা ছাড়া আর কিছু নেই। লোহার মরচে যৌগিক পদার্থ কারণ লোহাকে অক্সিজেন গ্যাস খাওয়ালে তবে মরচে পড়ে। মরচের প্রত্যেক কণার ভেতর লোহার পরমাণু আর অক্সিজেনের পরমাণু মিশে রয়েছে। চাখড়ি যৌগিক পদার্থ, কেননা তাকে পাজায় কি ভাটীতে পোড়ালে ধোঁয়া বেরিয়ে যায়, চূণ পড়ে থাকে। যে চূণ পড়ে থাকে সেও যৌগিক পদার্থ—কেলসিয়ম বলে এক মৌলিক ধাতুকে পোড়ালেই অর্থাৎ অক্সিজেন খাওয়ালেই তাকে পাওয়া যায়। হাইড্রোজেন বলে এক ধোঁয়া আছে তাকে অক্সিজেন খাওয়ালেই পাওয়া যায় বিশুদ্ধ জল। এর মানে এই যে, জলের প্রত্যেক কণার ভেতর হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু মিশে রয়েছে। আমাদের মাথার উপর যে আকাশ রয়েছে, তাতে কি আছে, জান? বাহিরে ত মহাশূন্য, বলেইছি! কিন্তু ভূমিতল হতে প্রায় পঁচিশ কোশ পর্য্যন্ত আকাশ জড় কণায় ভরা। এই পঁচিশ কোশ পুরু বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে চারিদিকে ঘিরে রয়েছে, যেমন নারিকেলকে ঘিরে থাকে নারিকেল ছোবড়া। এর প্রধান উপাদান অক্সিজেন। এই অক্সিজেন আমাদের প্রাণবায়ু। নাক দিয়ে এই বায়ু টেনে নিয়ে আমরা খাবার হজম করি, বেঁচে থাকি। তবে খাঁটি অক্সিজেনের দাহিকা শক্তি ভীষণ। সুস্থ শরীরে শুধু অক্সিজেন বুকে টেনে নিলে দেহের ভেতরটা সব জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে। তাই তাকে কতকটা সংযত কতকটা নরম করবার জন্য তার সঙ্গে মিশিয়ে রাখা হয়েছে নাইট্রোজেন নামে আর এক গ্যাস। এই নাইট্রোজেনও মৌলিক পদার্থ। এর প্রধান গুণ হচ্ছে যে, এ একটা রাশভারী পদার্থ, পোড়েও না,

পোড়ায়ও না ও বন্ধু অক্সিজেনকে বেশী লাফালাফি করতে দেয় না।

আমরা নিঃশ্বাস নিই অক্সিজেন। কিন্তু যেটা নাক দিয়ে ছাড়ি, সেটার প্রাচীন নাম অপান বায়ু। সত্যি সেটা কয়লা পোড়া ধোঁয়া মাত্র। কাঠ, কেরোসিন, কয়লা পোড়ালে যে ধোঁয়া বেরোয় এ সেই পদার্থ। বায়ুমণ্ডলের এও একটা প্রধান উপাদান। কিন্তু একে টেনে কোন প্রাণী বাঁচে না। ধোঁয়ার ভরা ঘরে কাউকে বেঁধে রাখলে সে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। আচ্ছা, তোমাদের ত এটা মনে হতে পারে যে, বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ক্রমাগত খরচ হতে হতে একদিন ফুরিয়ে যাবে, সব জীবজন্তু মরে যাবে! বহু পুরাকালে হয় ত এ রকম একটা ভয় ছিল। কিন্তু যেদিন প্রকৃতিদেবী তাঁর রাজ্যে সবুজ গাছপালা এনে উপস্থিত করলেন, সেদিন সব সুব্যবস্থা হয়ে গেল। গাছগুলো কয়লা-পোড়া গ্যাসের কয়লার ভাগটা নিজের দেহে টেনে নিয়ে অক্সিজেনের ভাগটা ছেড়ে দিতে লাগল। হাওয়ার অক্সিজেন যেমনকার তেমনি রইল। আবার যদি এমন দিন আসে যে, মানুষ সব গাছ-পালা কেটে ফেলবে আর আকাশে ক্রমাগত ধোঁয়া ছাড়বে, তখন এই ভূমণ্ডলে প্রাণীর যুগ শেষ হয়ে যাবে। পৃথিবী চাঁদের মতন একটা মরা গ্রহ হয়ে থাকবে।

হাওয়াতে আর এক পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে। সে হচ্ছে জলের ভাপ। আগে বলেছি যে, জল ফোটালে বাষ্প হয়। কিন্তু শুধু তাই নয়! জলের একটা গুণ এই যে, সে সর্ব্বদা শুকিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যত গরমই হোক, কি যত ঠাণ্ডাই হোক, অনবরত তার দেহের খানিকটা ভাপ হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। অথচ মজা দেখ, পৃথিবীর জল কমে যাচ্ছে না! কেন, তা তোমরা জান? বায়ুমণ্ডলের জলের বাষ্প যে ক্রমাগত শিশির, বৃষ্টি, শিল, তুষার হয়ে আবার পৃথিবীতে পড়ছে! পৃথিবীর সপ্তসিন্ধু আর আকাশের মন্দাকিনী, দুই বজায় রয়েছে। সেকালে কবি কালিদাস গেয়েছিলেন—সহস্র গুণ ফিরিয়ে দেবার জন্যই সূর্য্য পৃথিবী থেকে রস টেনে নিচ্ছেন! তা, সহস্রগুণ না দিলেও যা নিচ্ছেন তা ফিরিয়ে দিচ্ছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সপ্ত-সিন্ধু বলতে মনে হল, সমুদ্রের জলে কি আছে তা কি তোমরা জান? বিশুদ্ধ জল, অর্থাৎ হাইড্রোজেন অক্সিজেনের যোগফল, ত আছেই, কিন্তু আর কি আছে? মুখে দিয়ে দেখ, সমুদ্রের জল ভয়ানক নোনা লাগবে। আমাদের আবশ্যকীয় নুনের বেশীর ভাগ ত সমুদ্রের জল শুকিয়ে নিয়েই তৈরী হয়। কিন্তু এই নুন কি পদার্থ? এক চিমটি নুন গনগনে কয়লার আগুনে ফেলে দাও। এক রকম হলদে দুর্গন্ধ গ্যাস বেরোবে। সে গ্যাস তোমাদের চোখে গেলে চোখ জ্বালা করবে, গলায় গেলে কাশি আসবে এই গ্যাসের নাম ক্লোরিন। এটা একটা মৌলিক পদার্থ, সোডিয়ম ধাতুর সঙ্গে মিশে নুন হয়। তোমার চুলোর তাপে নুনের উপাদান দুটো আলাদা হয়ে গেল। ক্লোরিন গেল উড়ে, সোডিয়মটা অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশে চুলোর ছাইয়ের মাঝে রইল পড়ে। তাপের এই গুণ আছে। যৌগিক পদার্থকে প্রয়োজন মত তাতালে তার মৌলিক উপাদানগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যায়। সূর্য্যের দেহে সেই জন্য কোন যৌগিক পদার্থ নেই। মৌলিক পদার্থগুলো (আমাদের সবশুদ্ধ বিরানব্বইটা জানা আছে) সেই প্রচণ্ড তাপে গ্যাস হয়ে রয়েছে। যখন পৃথিবী সূর্য্যের দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁরও ঐ অবস্থা। অর্থাৎ, তাঁর দেহের মধ্যে বিরানব্বইটা মৌলিক পদার্থ তেতে বাষ্প হয়ে রয়েছে।

তার পর সেটা জুড়োতে আরম্ভ হল। জল, স্থল, আকাশের সূত্রপাত হল। কিন্তু ভেতরে কি আছে? আগেই বলেছি ঠিক জানা যায় না। নানা মুনির নানা মত। তবে কি করে ভূগর্ভের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা হয়েছে তা বলি। পৃথিবীর ওজন নিউটন স্থির করে গেছলেন। তার আয়তনও জানা জিনিস। ভূপৃষ্ঠের মাটি পাথরের ওজনও জানা আছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে ভেতরটাও যদি শুধু মাটি পাথর হত তাহলে পৃথিবীর ওজন ঢের হালকা হত। তাহলে, ভেতরে যা আছে সেটা খুব ভারী জিনিষ, পণ্ডিতরা বলেন, প্রধানতঃ লোহা ও নিকেল (যে ধাতু দিয়ে আনী, দুয়ানী, সিকি তৈরী হয়)। লোহা ও নিকেলটা কিন্তু প্রচণ্ড তাপে, আর উপরের মাটি পাথরের চাপে, তরল হয়ে রয়েছে। জ্বালামুখী পাহাড়ের গহ্বর দিয়ে গলা পাথরের সঙ্গে সেই তরল ধাতু যখন বের হয় তখন আমাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।

পৃথিবীকে তাহলে চার ভাগ করা যাক। বায়ুমণ্ডল ক্ষিতি-মণ্ডল, জল-মণ্ডল আর ভূগর্ভ। ভূগর্ভের কথা ত শুনলে, আমরা বিশেষ কিছু জানি না। বায়ু-মণ্ডলের

উপাদান কি কি, তা তোমাদিগকে উপরে জানিয়েছি বাকী রইল যে ক্ষিতি মণ্ডল আর জল-মণ্ডল, তাবাই হচ্ছে ভূ তত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

এই যে পৃথিবীর চার ভাগ, এটা হল কি করে? ভাগ হওয়া ত কেউ চোখে দেখে নাই। তবে এটা ধরে নেওয়া হয় যে প্রকৃতির যে সমস্ত নিয়ম আমরা আজ জানি, সে নিয়মগুলো চিরন্তন, আর সেই নিয়ম অনুসারেই ভূমণ্ডল জলে স্থলে আকাশে ভাগ হয়ে গেছে। আগেই তোমাদিগকে বলেছি যে, পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করার জন্য কল্পনা শক্তির যথেষ্ট প্রয়োজন। তবে ভুতুড়ে কাণ্ড ত আর কিছু ঘটে নেই! তাই কল্পনা শক্তিটা এলোমেলো হলে চলবে না, সংযত ও কারণ-সঙ্গত হওয়া চাই।

ভূমণ্ডলের জন্ম হল তপ্ত গনগনে বাষ্পের মূর্ত্তিতে। এই বাষ্পের মধ্যে বিরানব্বইটা মৌলিক পদার্থ সবাই ছিল, তবে আলাদা আলাদা হয়ে। তার পর ঘূর্ণি-পাক আরম্ভ হল। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে সেই উত্তপ্ত জড়পিণ্ডের রাশি ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যেতে লাগল। যখন তার তরল টলটলে অবস্থা হল, তখন ভারী পদার্থগুলো (লোহা, নিকেল ইত্যাদি ধাতু) নীচে পড়ল, গাদলা সব উপরে ভেসে উঠল। ক্রমশঃ সেই গাদলা জমে জমে পুরু আর শক্ত হতে থাকল। আর নানা রকম মৌলিক গ্যাস—যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ফোঁস ফাঁস করে বাইরে বেরোতে লাগল। হাইড্রোজেন অক্সিজেনে মিলে হল জল। নাইট্রোজেন অক্সিজেন উপরে উঠে গিয়ে তৈরী করলে বায়ু-মণ্ডল। জল থেকে কি আর তখনই সাত সমুদ্র তের নদী হল, তা নয়। প্রথম জল ত সেই তপ্ত গাদলার উপর পড়বা মাত্র বাষ্প হয়ে বায়ু-মণ্ডলে চলে গেল। সেখানে ঠাণ্ডা হয়ে আবার বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়ল। আবার বাষ্প হয়ে আকাশে উঠল। আবার পড়ল। এই রকম কত হাজার বছর জলে স্থলে খেলা চলল। তার ফলে পৃথিবীর উপরটা এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-নীচু চিত্র-বিচিত্র হয়ে যেতে লাগল।

এই আদিম যুগের বিষয় আসল ভূতত্ত্ব কিছু বলতে পারে না। এ সব ব্যাপার পণ্ডিতরা অন্য নানা বিদ্যার সাহায্যে, কল্পনার বলে, দেখতে পেয়েছেন। যে তপ্ত গাদলার কথা উপরে বলেছি, তারই উপর সব পড়ে পড়ে আজকের এই ক্ষিতি-মণ্ডল তৈরী হয়েছে। কিন্তু তাই বলে পৃথিবীটা যে আজ পেঁয়াজের মতন একটার উপর একটা পর্দ্দা দিয়ে গঠিত, তা নয়। কোথাও বা উপরের স্তরটা আদিম যুগের, কোথাও বা মধ্য যুগের কোথাও বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

পরের সংখ্যায় একটা চিত্র (Diagram) দিব। তোমরা সেটা খুব ভাল করে দেখো। বুঝতে চেষ্টা কোরো, কি ভাবে পরের স্তরগুলো আগের স্তর-গুলোকে ঢাকা দিয়েছে। নাম মুখস্থ করার কোন দরকার নেই। এই স্তরগুলো সম্বন্ধে অনেক কথা এর আগেই তোমরা শিশুভারতীতে পড়েছ। আমার যেটুকু বক্তব্য, আস্তে আস্তে পরে বলব।

তোমরা হয় ত জানতে চাইবে, ভূ-তত্ত্ব বিদ্যা প্রাচীন না আধুনিক। বিদ্যাটা অতি আধুনিক। প্রাচীনেরা ভূ-তত্ত্বের বিষয় বিশেষ কিছু জানিতেন না। পাশ্চাত্য এশিয়ার পৌরাণিক কাহিনীতে ত ক্রম-বিবর্ত্তনের কোন কথাই নেই! সৃষ্টিকর্ত্তার হুকুমে মানুষ জন্তু গাছ-পালা সুদ্ধ পৃথিবী একদিন অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হল!

প্রাচ্য এশিয়ার পুরাণে কিন্তু অন্য কথা আছে। এটা বেশ পরিষ্কার লেখা আছে যে, পৃথিবী সৃষ্ট হওয়ার অনেক পরে মানুষের আবির্ভাব হল। বিষ্ণু অবতারের কথা ভাব না! যখন যে রকম আবেষ্টন, বিষ্ণু সেই অনুযায়ী দেহ পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে এসেছিলেন —জলের যুগে মৎস্য, পাঁকের যুগে কূর্ম্ম, ডাঙ্গার যুগে বরাহ, জঙ্গলের যুগে নৃসিংহ, আদিম মানবের যুগে বামন। এ সব পৌরাণিক গল্প মাত্র, তোমাদিগকে বিশ্বাস করতে বলছি না। তবে এই গল্প থেকে মনে হয় যে, এদেশে অন্ততঃ প্রাচীনরা জানিতেন যে পৃথিবী অতীতকালে নানা মূর্ত্তি ধারণ করেছে এবং ধীরে ধীরে অনেক যুগের পর মানুষের বাসের উপযোগী হয়েছে!
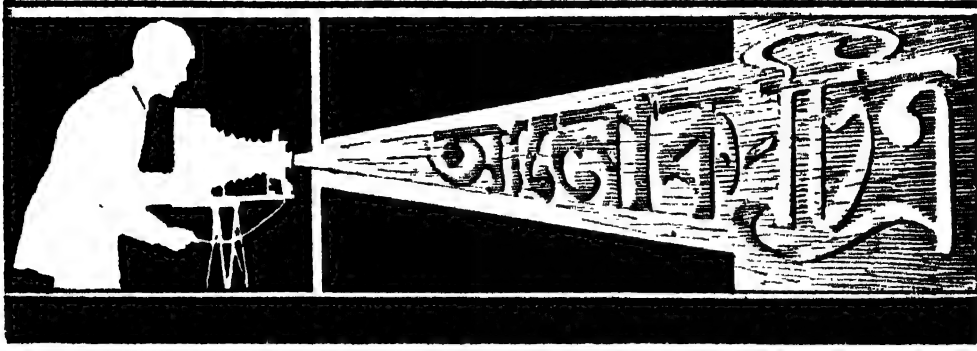
আলোকচিত্রের ইতিহাস ও তাহার বর্ত্তমান অবস্থা

৫০০ পৃষ্ঠার পর

তোমাদের কাছে পূর্ব্বে কেমেরার বিষয় বলিয়াছি। উহাদের রকমারি হইতেই বুঝিতে পারিতেছ যে, আধুনিক আলোক চিত্রন কেমন জটিল ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও হৃদয়ের আনন্দ-দায়ক যতপ্রকার ললিতকলা আছে, তাহাদের মধ্যে আলোকচিত্রন কারোর চেয়ে কোন অংশে কম নহে। এবার তোমাদিগকে এই আলোকচিত্রনের ইতিহাস ও তাহার বর্ত্তমার অবস্থার কথা কিছু বলিব।

অনেক কাল আগের কথা। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে একদিন নীপসে(Niepce) নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেপ্টিষ্টা পোর্টার আবিষ্কৃত ছিদ্র কেমেরা লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। বাহিরের উজ্জ্বল দিবালোক আলোকিত দৃশ্যাবলীর প্রতিচ্ছায়া ছিদ্র-পথে আসিয়া স্থিতি-তলের(Focussing screen) উপর পড়িতেছিল এবং আলো ও ছায়ার রং-বেরং-এর খেলা দেখাইতেছিল। এ-সব দেখিয়া নীপ্‌সে ভাবিতে লাগিলেন যে, কি করিয়া আলো ও ছায়ার এই প্রকার সুন্দর প্রতিচ্ছবিকে ধরিয়া রাখা যায়। অনেক প্রকার জিনিষ লইয়া পরীক্ষা করার পর তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বিটুমেন (Bitumen) বা শিলাধাতু নামক এক প্রকার পদার্থ আলোকসম্পাতে ধীরে ধীরে কঠিন ও অদ্রবণীয় (insoluble) হইয়া উঠে এবং উহার সাহায্যে মোটামুটি রকমের আলোকচিত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে। নীপ্‌সের একটা আলোকচিত্রের নমুনা তোমাদিগকে দিলাম।
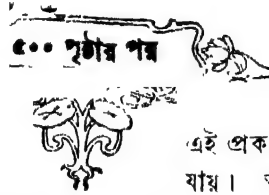
নীপ্‌সে
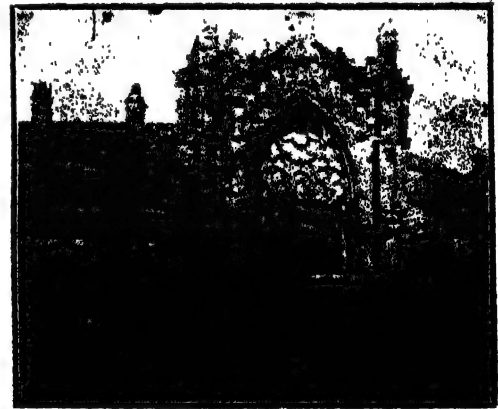
নীপ্‌সের চিত্র

এরপর ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডাগুয়ার (Daguerre) এর পালা। ইনি রূপার পাতের উপর আইওডিন্

(Iodine) নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের বাষ্প লাগাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, উহার সাহায্যে খুব চট্‌পট্‌ ফটো উঠান যায় এবং বেশ চমৎকার ফটো উঠে। আইওডিন্‌-মাখান রূপারপাত কেমেরার আস্তে প্রকাশিত হয়। তারপর উহাকে লবণ-জল, হাইপো কিংবা পটাসিয়াম্‌ সায়নাইড(Potassium-Cyanide)নামক রাসায়নিক পদার্থের দ্রব(Solution)

ডাগুয়ার স্কট আর্চার ফক্স্‌ টালবট

সাহায্যে আলোকন করিলে উহাতে তৎক্ষণাৎ ছবি দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা হইলেও ছবি উহাতে অদৃশ্য ভাবে (latent) থাকে। আলোকনের পর উহাতে পারদের বাষ্প লাগাইলে সেই ছবি আস্তে

ডাগুয়ারের তোলা ছবি

দ্বারা ধুইয়া লইলেই উহা স্থায়ী (fixed) হইয়া যায়। ডাগুয়ারের চিত্রের একটা নমুনা তোমাদিগকে দিলাম। কিন্তু কাগজের উপর বারবার পুনঃসম্পাত (reproduction) করিবার ফলে মৌলিক চিত্রের সৌন্দর্য্য ইহাতে অধিকাংশই লোপ পাইয়া গিয়াছে। তথাপি একশতাব্দী পূর্ব্বে তোলা এই আলোকচিত্র দেখিয়া তোমরা অবাক্‌ হইয়া যাইবে। আলোকচিত্রের জন্মদাতা ডাগুয়ারের এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের জন্য ফরাসী সরকার তাঁহাকে জীবনব্যাপী ৬০০০ ফ্রাঙ্ক করিয়া বাৎসরিক পেন্‌সন দিয়াছিলেন।

অতঃপর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফক্স্‌ টালবট(Fox Talbot)এবং স্কট আর্চার(Scott archer)নামক দুইজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক আলোকচিত্র বিষয়ে নানাপ্রকার গবেষণা করেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, রৌপ্যের নানা প্রকার রাসায়নিক যুক্ত পদার্থ (Compound) আলোকস্পর্শী (Light sensitive) এবং তাহাদের সাহায্যে বেশ আলোক চিত্র উঠান যাইতে পারে। সিলভার্‌ ক্লোরাইড(Silver chloride) নামক একটি পদার্থ কাগজে লাগাইয়া এবং উহা কেমেরাতে আলোকন করিয়া টাল্‌বট্‌ সর্ব্বপ্রথমে বিয়োগিক আলোকচিত্র (Negative-photograph)তৈয়ার করেন। উহার সাহায্যে পরে

তিনি অনেক বাস্তবচিত্র (Positive) মুদ্রণ (Print) করিতে সমর্থ হন। স্কট্ আর্চ্চার পরে টালবটের বিধি-ব্যবস্থার (Process) অনেক উন্নতি করিয়া

টালবটের তোলা ছবি

অনেক ভাল ভাল ছবি তুলিতে সমর্থ হন। তিনি কলোডিয়ন (Collodion) নামক এক প্রকার আঠার

স্কট্ আর্চ্চারের তোলা ছবি

মধ্যে সিলভার ব্রোমাইড্ নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিলাইয়া এবং তাহা কাচের পাতের উপর লাগাইয়া সর্ব্বপ্রকার ফটোগ্রাফের প্লেট (Photographic plate) তৈয়ার করেন। টালবট্ ও স্কট্ আর্চারের প্রস্তুত ছবির দুইটি নমুনা তোমাদিগকে দিলাম। আধুনিক ফটোর প্লেটে কলোডিয়নের পরিবর্ত্তে জেলেটিন (Gelatin) নামক এক প্রকার শিরিষ ব্যবহৃত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মেডক্স (Maddox) নামক একজন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক সর্ব্ব-

মেডক্স

প্রথমে তাহা ব্যবহার করেন। পূর্ব্বে যখন কলোডিয়ন এই কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, তখন ফটো প্লেট তৈয়ার করার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ ভিজা অবস্থাতেই উহাকে ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইত। একবার শুকাইয়া গেলে উহার আলোকস্পর্শিতা (Light-sensitiveness) চলিয়া যাইত। এ সমস্ত কারণে তখনকার দিনে ফটো তুলিতে হইলে ফটো-সংক্রান্ত যাবতীয় রাসায়নিক পদার্থ, প্রকাণ্ড ক্যেমেরা ও তাহার সাজ-সরঞ্জাম, আঁধার তাবু (Dark tent) প্রভৃতি, অর্থাৎ প্রায় দুই মুটের বোঝা সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতে হইত। যেখানে ফটো তোলা, সেখানেই প্লেট তৈয়ার ও সেখানেই প্রকাশন (development)। কাজে কাজেই, তখনকার দিনে আলোকচিত্রন খুব শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। কিন্তু মেডক্সের আবিষ্কারের পর হইতে উহা অনেক সহজ হইয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগের আলোকচিত্রনের জন্য বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র মানবজাতি মেডক্সের নিকট ঋণী। জিলেটিন প্লেট শুকাইয়া রাখা যায় এবং শুকাইলে উহার আলোক-

স্পর্শিতা মোটেই কমে না, বরং আরও বাড়িয়া যায়। কারখানায় তৈয়ারী শুষ্ক প্লেট লইয়া যেখানে ইচ্ছা চলা ফেরা করা যায় এবং আলোকনের পর উহাকে ঘরে লইয়া আসিয়া অবসর মত প্রকাশন করা চলে। মেডক্সের আবিষ্কার আলোকচিত্রন-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে।

আধুনিক ফটো প্লেট কেমেরাতে আলোকন করিয়া লালআলোতে উহাকে সম্যকভাবে পর্যবেক্ষণ করিলেও আলোকিত চিত্রের কিছুমাত্র চিহ্ন উহাতে দেখা যায় না। চিত্রটি উহাতে সম্পূর্ণ অদৃশ্য (latent) অবস্থায় থাকে কিন্তু নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ জলে গুলিয়া উহাতে প্লেটটি ডুবাইলে লুকানো ছবি আস্তে আস্তে ফুটিয়া উঠে অর্থাৎ প্রকাশিত (developed) হয়। কিন্তু এ যে বিয়োগিক চিত্র বা

নেগেটিভ ছবি

উল্টা ছবি (negative)। মূল দৃশ্যে যেখানে সাদা ছিল, এ ছবিতে উহা কাল উঠে এবং কাল জিনিষ সাদা উঠে, হাল্কা ধূসর রং-এর জিনিষ গাঢ় মেটে রং-এর উঠে। প্রকাশিত বিয়োগিক ছবিকে হাইপো (hypo) নামক রাসায়নিক পদার্থের দ্রবে ধুইয়া লইলেই উহা স্থায়ী হয় অর্থাৎ আলোকসম্পাতে উহার আর কোন পরিবর্তন হইতে পারে না। এই ত গেল নেগেটিভ্ তৈয়ার করিবার কথা। এখন বাস্তব ছবি (positive) কি করিয়া উহা হইতে তৈয়ার করিতে হয়, তাহা ত তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। নেগেটিভের পিছনে একখানা ফটোর কাগজ রাখিয়া উহাকে উপযুক্তভাবে আলোকিত করিলে এবং তৎপরে উহাকে পূর্ব্ববর্ণিত প্রথানুসারে
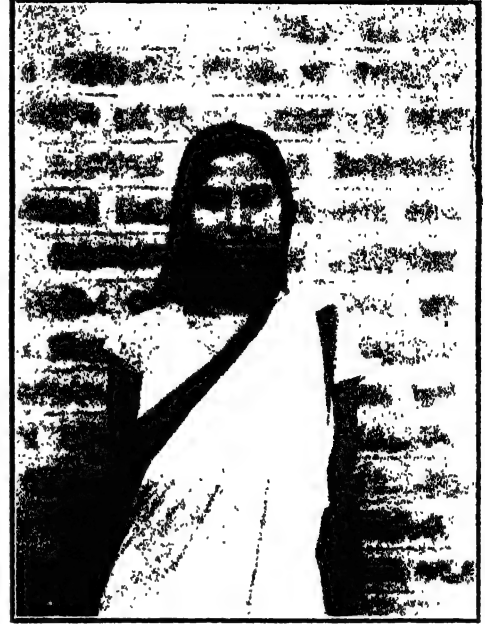
পজিটিভ ছবি

প্রকাশিত ও স্থায়ী করিয়া লইলেই বাস্তব ছবি তৈয়ার হইল। আজ প্রায় ৭০ বৎসর যাবৎ এই প্রণালীতেই আলোকচিত্রন চলিয়া আসিতেছে, এবং যদিও ইতিমধ্যে ইহার অনেক উন্নতি হইয়াছে, তবুও মোটামুটি ব্যাপারটা পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে এমন কোন জিনিষ প্রায় নাই বলিলেই চলে, যাহার ফটো তোলা সম্ভবপর নয়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সুদূর অনন্তে অবস্থিত নীহারিকা ও ধূমকেতু, মানব-চক্ষুর অগোচর অণুবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্ট পদার্থ, দ্রুতগতিশীল চলন্ত পদার্থ, রজনীর অন্ধকারে নৈশবিহারী হিংস্র জন্তু, লীলাময় শিশু, আকাশের মেঘ, সমুদ্রের ঢেউ, চঞ্চল পশু ও পক্ষী প্রভৃতি সকল জিনিষেরই ফটো উঠিয়াছে। ফটো-গ্রাফিটা আজকাল এত জনপ্রিয় হইয়াছে যে, এখন প্রায় সকলের হাতে হাতেই কেমেরা দেখিতে পাওয়া
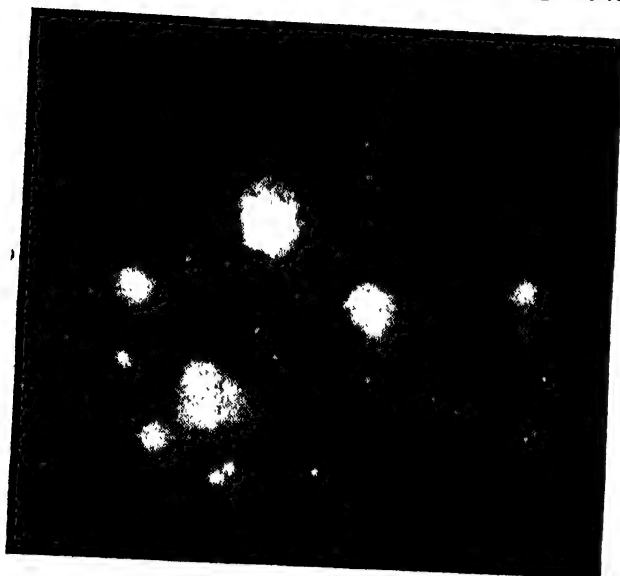
নীহারিকা
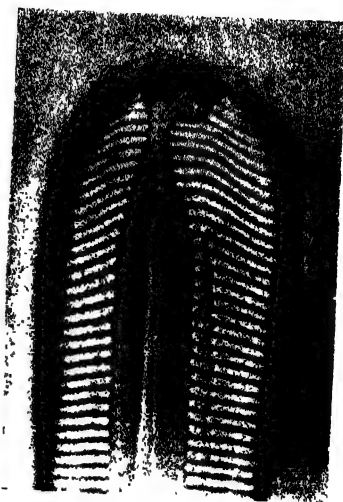
অনুবীক্ষণ চিত্র
ক্ষুদ্র পিপীলিকার জিহ্বা

সমুদ্রের ঢেউ

ধূমকেতু

রজনীর অন্ধকারে হিংস্র জন্তু

লীলাময় শিশু
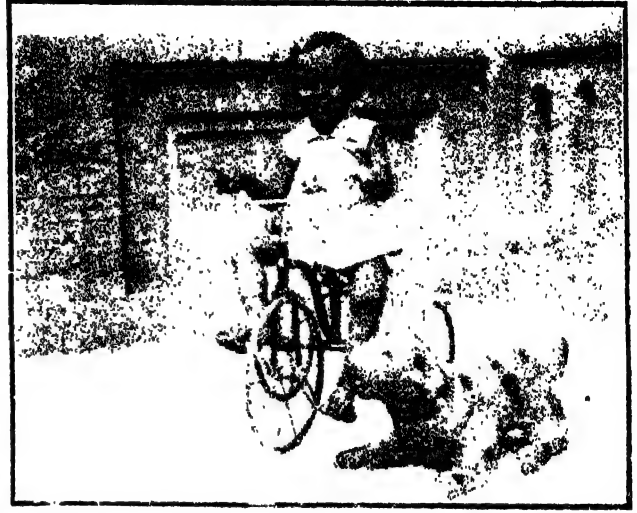
লীলাময় শিশু

আকাশের মেঘ
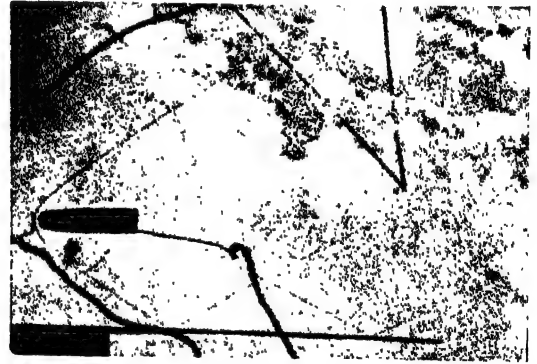
দ্রুতগতিশীল পদার্থ—চলন্ত রাইফেলের গুলি

যায়। কিন্তু সত্যিকার ভাল ফটো তোলা নিতান্তই সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে। ইহার জন্য অনেক চিন্তা ও অনেক কুশলতার প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, স্থির প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথাই ধরা যাউক না কেন। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে মনে হইবে যে, ইহার ফটো তোলা অতি সহজ ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য (assymetry) ব্যাপকতা (continuity) পর্য্যায় (contrast) ও

অসামঞ্জস্য কুপুপ হ্রদ—ভুটান

বৈচিত্র্য (detail) না থাকিলে সে ছবি প্রিয়দর্শন হয় না। খুব উচ্চ জিনিষ, যেমন পাহাড় পর্ব্বত, স্থপতি শিল্প (architecture) প্রভৃতির ছবি তুলিতে হইলে কেমেরা খুব সোজা থাকা দরকার। তাহা না হইলে ছবি হেলান উঠিবে। দ্বিতীয়তঃ, চলন্ত জিনিষের ছবি তুলিতে হইলে বৃহৎ অক্ষ সংযুক্ত
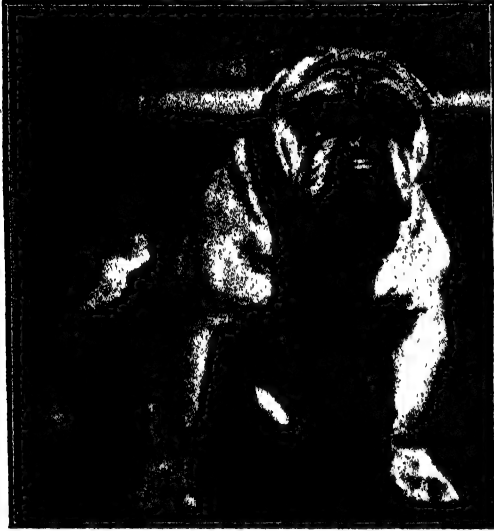
চঞ্চল পশু

চঞ্চল পক্ষী

সম্মুখের আলো

পাশের আলো

ব্যাপকতা। দার্জ্জিলিঙ ও হিমালয়
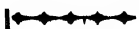
হইতে আসিলে উহা হয় "কর্কশ" (hard) এবং শুধু উপর হইতে আসিলে উহা হয় "ছায়াসঙ্কুল" (shady) ভাল ছবি তুলিতে হইলে চতুর্দ্দিক হইতেই অল্প-বিস্তর আলোকের প্রয়োজন। এই প্রকার সংযুক্ত আলো (combined light) না হইলে কোন প্রকার আলোক মূর্ত্তি (portrait) বা প্রতিকৃতিই ভাল হইতে পারে না।

পাশের আলো

হেলানো ছবি

লেন্স, দ্রুতগতিশীল বন্ধনী এবং উপযুক্ত স্থিতি নির্দ্দেশ (proper focussing) এর প্রয়োজন। তাহা না হইলে ছবি আবছা (blurred) হইয়া যাইবে।

পশুপক্ষী কিংবা মানুষের ফটো তুলিতে হইলে উপযুক্ত আলোক সম্পাত (proper lighting) এর প্রয়োজন। আলো শুধু সম্মুখ দিক হইতে আসিলে ছবি "অগভীর" (flat) হইয়া যায়, শুধু এক পাশ
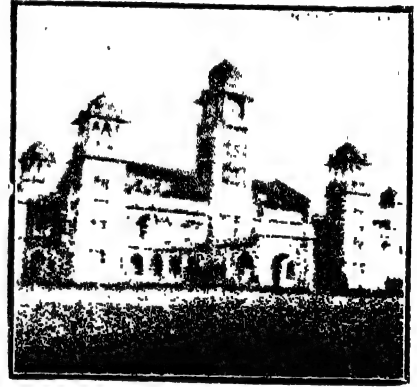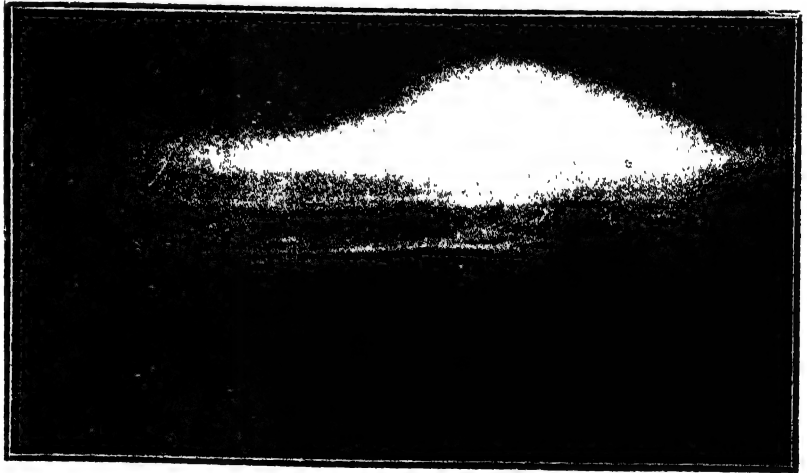
পর্য্যায়। মেঘের মধ্যে সূর্য্যোদয়—দার্জ্জিলিঙ

এই সমস্ত আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা শুধু আলোকনের পূর্ব্বাবস্থার জন্য। কিন্তু সবচেয়ে অধিক প্রয়োজন

বৈচিত্র্য

উপরের আলো

সংযুক্ত আলো

হইল উপযুক্ত আলোকন (proper exposure)। ইহা না হইলে সকল ব্যয় ও পরিশ্রমই পণ্ড হইয়া যাইবে।

যদিও, উপযুক্ত আলোকন করিবার সহায়তার জন্য নানাপ্রকার রশ্মিমাপক যন্ত্র (exposure meter) বাজারে বাহির হইয়াছে, তথাপি এ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান শুধু অভিজ্ঞতা হইতেই জন্মায়।

অত্যালোকন (over exposure) হইলে নেগেটিভ-এর মধ্যে যদিও বৈচিত্র্য (detail) অনেক থাকে, তবুও উহাতে পর্য্যায় (contrast) থাকে না।

উপরের ও পাশের আলো।

অধিক আলোকিত নেগেটিভ

ন্যূনালোকন (under exposure) হইলে ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা ঘটে। কম আলোকিত নেগেটিভ্-এর মধ্যে .পর্য্যায় অতিরিক্ত মাত্রায় থাকিলেও উহাতে বৈচিত্র্য থাকে না। আলোকনের এই দুই প্রকার দোষই খারাপ, তবে অধিক আলোকিত নেগেটিভ্ হইতে যদিও নানাপ্রকার চেষ্টা ও কৌশলের দ্বারা কোন প্রকারে চলন-সই মুদ্রিত ছবি তোলা যাইতে পারে, তথাপি কম আলোকিত নেগেটিভ্ হইতে কিছুই করা যায় না। উহা নিতান্তই বৃথা হয়। আজকালকার আলোক-চিত্রনের সৌখীনদের (amateurs) মধ্যে ন্যূনালোকন দোষটাই বেশী মাত্রায় দেখা যায়।

নেগেটিভ্ অতি সাবধানে করিতে হয়। প্রকাশন দ্রব্যের (developer solution) মধ্যে আলোকিত

রশ্মিমাপক যন্ত্র
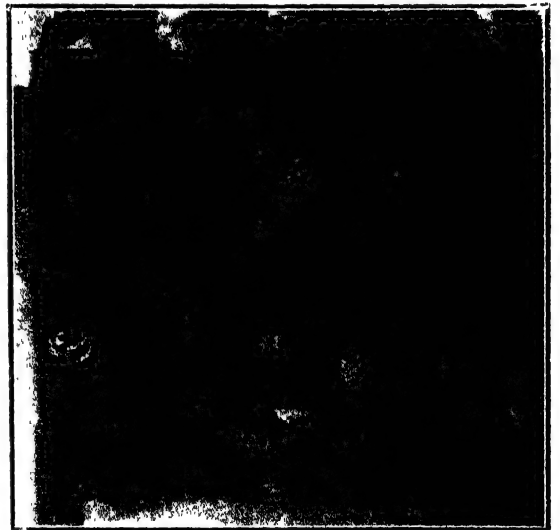
অত্যন্ত অধিক আলোকিত নেগেটিভ

প্লেটকে চট্ করিয়া ডুবাইতে না পারিলে "অসম-প্রকাশ" অর্থাৎ (uneven development) হইয়া

ছবি খারাপ হইয়া যায়। নেগেটিভ্ যখন কাঁচা থাকে তখন সামান্য নখের আঁচড় লাগিলে তৎক্ষণাৎ জিলেটিন উঠিয়া যায় এবং ফলে মুদ্রিত ছবিতে কাল

অত্যন্ত কম আলোকিত নেগেটিভ

কম আলোকিত নেগেটিভ

দাগ পড়ে। খুব গরম পড়িলে এবং সেজন্য উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন অর্থাৎ বরফ, ফিটকারী. ফর্ম্মেলীন প্রভৃতি ব্যবহার না করিলে নেগেটিভ্ হয় সম্পূর্ণ গলিয়া যায়, তাহা না হইলে জালিদার (reticulated) হইয়া উঠে। এ সমস্ত ছাড়া আরও

অসম প্রকাশ

যে কত প্রকার দোষ নেগেটিভে হইতে পারে, তাহার
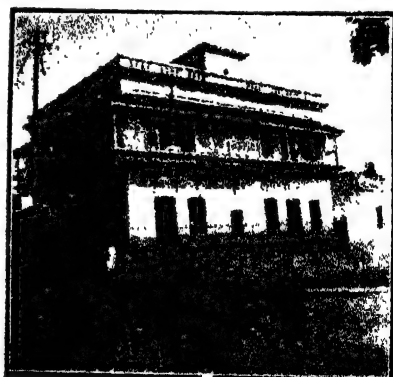
জালিদার ছবি

অন্ত নাই। সে সমস্ত লিখিতে হইলে একখানা মস্ত বড় পুঁথি লিখিতে হয়। সুতরাং বুঝিতেই

পারিতেছ যে, এই প্রকাশন ব্যাপারটা অতি সাবধানে করিতে হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নেগেটিভ্ সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাকে অতি সন্তর্পণে রাখিতে হয়।

ইহা ভাল রকম করিতে হইলে উপযুক্ত আলোকনের প্রয়োজন। আলোকন কম হইলেও চলে না, বেশী হইলেও চলে না। বহুদিনের অভিজ্ঞতা হইতেই আলোকন সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ হয়।

নখের আঁচড়

কম আলোকিত উপযুক্ত আলোকিত অধিক আলোকিত
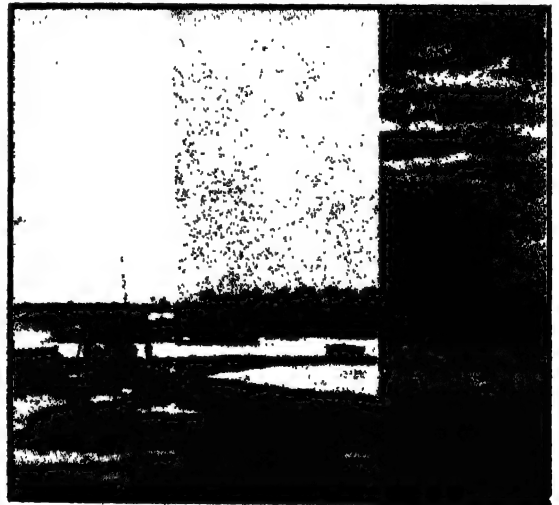
কম আলোকিত উপযুক্ত আলোকিত অধিক আলোকিত

ভাল নেগেটিভ্ তৈয়ার হইলে উহা হইতে মুদ্রিত ছবি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। তবে উপরের ছবি দুইটি হইতেই ব্যাপারটা সহজে বুঝিতে পারিবে।

'হবু' খাবে 'গবু' খাবে
আর খাবে 'মন্ত্র',
আর যত ছিল পাখী,
আর জীবজন্তু ;

কি ভুল খামালে যে
সনাতন কান্না ?
তবে ভাই, বালুসাই
কিনে তুই আন্ না।

—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয়

তক্ষশিলা

পূর্বানুবৃত্তি ১৩৮৬ পৃষ্ঠার পর

প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশিলা, বারাণসী, অজন্তা, জগদ্দল, ওদন্তপুরী, বল্লভি প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। প্রথমে তক্ষশিলার কথা বলিব। তক্ষশিলা ভারতের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত ছিল। গ্রীক্ ঐতিহাসিকদের লেখা হইতে আমরা তক্ষশিলা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ জয় করিতে আসেন, তখন তক্ষশিলা ছিল গান্ধার রাজ্যের রাজধানী। সে সময়ে তক্ষশিলা জনবহুল, সমৃদ্ধশালী ও সুশাসিত নগর ছিল। অনেক বৃহৎ অট্টালিকা, অনেক সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির ঐ স্থানের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত।

ভারতবর্ষের বিদ্যাপীঠ সকলের মধ্যে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। বুদ্ধদেবের জন্ম-সময়েও এই বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন হিন্দু-যুগ হইতেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধি। সেই প্রাচীনকালে তক্ষশিলার নাম ও যশঃ এশিয়া মহাদেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চীন-সাহিত্যেও তক্ষশিলার নাম আছে। এইখানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য চীনদেশ হইতে (গুপ্ত-রাজাদের সময়) দলে দলে ছাত্র আসিত। চীনদেশের এক রাজপুত্র এখানে আসিয়া চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। জাতকে তক্ষশিলার অনেক উল্লেখ আছে। 'সুশিম জাতকে' তক্ষশিলাকে গান্ধার রাজ্যের অন্তর্ভূত, এইরূপ বলা হইয়াছে। জাতকের প্রায় প্রত্যেক গল্পেই দেখা যায়—"গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে এক দেশবিখ্যাত আচার্য্য আছেন, তাঁহার নিকট গিয়া বিদ্যাভ্যাস কর; তাঁহাকে এই সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা দিও।" কিংবা "পুরাকালে গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে বোধিসত্ত্ব একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত।" সে সময়ে তক্ষশিলায় বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা শাস্ত্রেই ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হইত।

কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ বিম্বিসারের রাজ-চিকিৎসক জীবক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছিলেন। "মহাবর্গে" (বৌদ্ধগ্রন্থ) লিখিত আছে, সেই সময়ে তক্ষশিলায় আত্রেয় নামে একজন খুব বড় চিকিৎসক ছিলেন। দেশ-বিদেশ হইতে অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আসিত। আত্রেয়ের মত অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তি তখন ভারতবর্ষে আর কেহ ছিলেন না। কথিত আছে, তিনি অস্ত্র দ্বারা মাথার খুলি তুলিয়া, আবার তাহা জোড়া লাগাইয়া দিতে পারিতেন। জীবক এইরূপ অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ পরম পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। আত্রেয় জীবককে অত্যন্ত যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। জীবকের অধ্যাপক একদিন তাঁহার শিষ্যদের কে কিরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ, ঐ যে সম্মুখে পাহাড় দেখা যাইতেছে, ঐ পাহাড়ে যাইয়া তোমরা সেখানকার গাছ-গাছড়া পরীক্ষা কর। যে সকল গাছ-গাছড়া ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না বলিয়া মনে করিবে, সেইগুলি লইয়া আসিও।" সকল ছাত্রই গেলেন। বহুক্ষণ পরে সকলে ফিরিয়া আসিলেন। সকল ছাত্রের হাতেই কোন না কোন একটা গাছ-গাছড়া ছিল,—ছিল না কেবল জীবকের হাতে। জীবক কোন কিছু হাতে লইয়া না আসায় অধ্যাপক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কিছু আনিলে না কেন?" জীবক বলিলেন,—"গুরুদেব! জগতে এমন কোন জিনিস নাই, যাহা কোন ঔষধেই লাগে না।" আচার্য্য শিষ্যের এই উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

সেকালে ভারতবর্ষের বহু রাজ্যের যুবরাজগণ এখানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসিতেন। তক্ষশিলায় বিদ্যার্থীদিগকে বিবিধ ললিতকলা, বেদ, বেদান্ত, ব্যাকরণ, অর্থশাস্ত্র, গন্ধর্ববিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। কাশীরাজার এক পুত্র তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একজন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নিকট শিল্প-শিক্ষা করিয়া অধ্যাপককে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দিয়াছিলেন।

এখানে দুই প্রকারের ছাত্র ছিল:—এক শ্রেণীর ছাত্রেরা (ধনী ছাত্রগণ) অধ্যাপককে পাঁচশত, সহস্র এইরূপ সুবর্ণ-মুদ্রা দক্ষিণা দিয়া বিদ্যালাভ করিত। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা (দরিদ্র ছাত্র) দিনের বেলা অধ্যাপকের সেবা ও শুশ্রূষা করিত এবং রাত্রিকালে শিক্ষা লাভ করিত। যে সকল শিষ্য দক্ষিণা দিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত, তাহারা তাহাদের অধ্যাপকের গৃহে বাস করিত। সেকালে শিক্ষক, ছাত্রদের শারীরিক শাস্তি দিতেন না। বিদ্যাদান-সম্বন্ধেও তাঁহাদের যথেষ্ট সংকীর্ণতা ছিল। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্যতীত অন্য জাতিকে বিদ্যাদান করিতেন না। 'জাতক' পড়িলে দেখিবে, প্রায় সকল অধ্যাপকের কথা-প্রসঙ্গে "পঞ্চশত ব্রাহ্মণ কুমার তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত", এইরূপ লিখিত আছে।

শিষ্যেরা যদি নিজ নিজ বিদ্যায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা আবার অধ্যাপকদের নিকট হইতে নানাপ্রকার পারিতোষিক পাইত। এক যুবক বিবিধ ললিতকলায় জ্ঞান লাভ করিয়া অধ্যাপকের নিকট হইতে পারিতোষিক স্বরূপ একটি মূল্যবান অসি, একটি তীর-ধনুক, একটি উষ্ণীষ ও একটি তীর পাইয়াছিল।

তক্ষশিলার অধ্যাপকদের সম্বন্ধে নানারূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প আছে। কোন আচার্য্য

"মৃতকোত্থাপন" মন্ত্র জানিতেন (মৃতক+উত্থাপন=অর্থাৎ যে মন্ত্রের বলে মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হয়) ও শিক্ষা দিতেন। 'সঞ্জীব জাতকের' গল্পটি পড়িলে এ বিষয়ে জানিতে পারিবে। কোন অধ্যাপক জানিতেন, সর্পগণকে মুগ্ধ করিবার মন্ত্র, কেহ বা জানিতেন, গুপ্তধন উদ্ধার করিবার মন্ত্র, আবার কেহ বা জানিতেন, হস্তিসূত্র। এইরূপ নানা বিষয়ের বিদ্যার কথা তক্ষশিলার সম্বন্ধে জানা যায়। তবে বিশেষ করিয়া চিকিৎসা-বিদ্যা (Medical Science) শিখাইবার জন্যই তক্ষশিলা প্রসিদ্ধ ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতে তক্ষশিলার নাম দেখা যায়। মহাভারতে আছে, রাজা জন্মেজয়, তক্ষশিলায় 'সর্প-যজ্ঞ' করিয়াছিলেন। গ্রীক্ ও রোমক লেখকেরা তাঁহাদের লেখা বহিতে ইহার নাম লিখিয়া গিয়াছেন, টেক্‌শিলা (Taxila)। পালি বা প্রাকৃতে ইহার নাম তক্‌ক-শিলা ও সংস্কৃতে তক্ষশিলা, এইরূপ। চীনভ্রমণকারী ফা-হিয়ান্ তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে তক্ষশিলার নাম করিয়াছেন। ইউ-য়ান্-চাঙ দুইবার তক্ষশিলায় গিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতেআছে তক্ষশিলায় অনেক বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং সেখানে মহাযান সম্প্রদায়ের অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ থাকিতেন।

প্রাচীন তক্ষশিলা আর নাই। কিন্তু সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগ মাটি খুঁড়িয়া তক্ষশিলার অনেক কীর্ত্তি-চিহ্ন বাহির করিয়াছেন। প্রায় বার বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া ইহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। রাউলপিণ্ডি সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এবং হাসান্-আবদাল নামক স্থানের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে সরাইকোলা নামক ষ্টেশনের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্বদিকে তক্ষশিলার স্তূপাকার ধ্বংসচিহ্ন রহিয়াছে। দুই দিনের কমে এই সব ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া শেষ করা যায় না।

এখানকার 'ধর্ম্মরাজিক স্তূপ' 'কুণাল স্তূপ' ও বৌদ্ধবিহার দেখিলে সেকালে তক্ষশিলা যে কত বড় সহর ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ

নালন্দা

নালন্দা বিহার ছিল বৌদ্ধদের একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ। যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই নালন্দা মহাবিহার মগধের রাজধানী রাজগৃহের অতি নিকটে অবস্থিত ছিল। এই দূরত্ব সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। কাহারও কাহারও মতে রাজগৃহ হইতে নালন্দার দূরত্ব মাত্র অর্দ্ধযোজন ছিল। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ইউ-য়ান্-চাঙ নিজে এই বিহারে অনেক দিন থাকিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সে সময়ে ভারতে
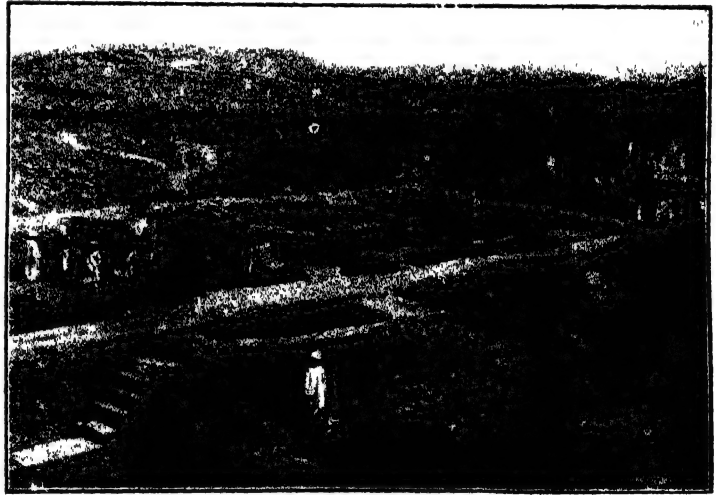
আরও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, তথাপি ইহার যশঃ ও প্রতিপত্তির অভাব ছিল না। ভারতবর্ষের ছাত্রেরা ত এখানে পড়িতই ; তা ছাড়া বিদেশী বহু ছাত্র এখানে আসিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে কথা ঠিক্ করিয়া বলা বড় কঠিন। এ বিষয়ে নানা মত প্রচলিত। আমরা খোদিত লিপি, প্রাচীন পুঁথি এবং ইউ-য়ান্-চাঙ, ই-ৎসিং প্রভৃতি চীনদেশের ভ্রমণকারীদের লিখিত বিবরণী হইতে এখানকার প্রাচীন ইতিহাস মোটামুটি ভাবে অনেকটা জানিতে পারি। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী কিংবা খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

ইউ-য়ান্-চাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—"বৌদ্ধদের ভিন্ন ভিন্ন দলে দশহাজার শ্রমণ (ভিক্ষু) এই স্থানে থাকিয়া বিবিধ বিদ্যার আলোচনা করিতেন। একটি বৃহৎ ও সুন্দর বাগানের মধ্যে ছয়টি চারিতল বৃহৎ অট্টালিকায় প্রায় দশহাজার ছাত্র এখানে বাস করিত। এখানকার ছাত্রেরা সকলেই প্রখর-বুদ্ধি, সুপণ্ডিত ও পবিত্র-চরিত্র। ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়ার রীতি বড় সুন্দর ছিল। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য একশতটি গৃহ ছিল। রাজা শিক্ষক ও ছাত্রদের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। এখানে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মালাপ চলিত। নানা দূরদেশ হইতে এখানে বড় বড় পণ্ডিতেরা তাঁহাদের ধর্ম্ম বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আসিতেন। ত্রিপিটক যাহাদের কণ্ঠস্থ নাই, তাহারা লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া থাকিত।"

নালন্দার প্রধান স্তূপ

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সুবৃহৎ পুঁথিশালা ছিল। রত্নোদধি, রত্নসাগর এবং রত্নরঞ্জক নামে তিনটি সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল। রত্নোদধি একটি নয়তলা উচ্চ-বাটী—এখানে পুঁথি সংরক্ষিত হইত। এখানকার ঘরগুলি ১২ ফুট × ১৮ ফুট পরিমাণ ছিল। এই বিরাট পুঁথিশালাটি কিরূপে যে নষ্ট হইল, তাহা জানা যায় না। তিব্বতীয়দের প্রবাদ বিশ্বাস করিতে গেলে উহা তৈর্থিক (হিন্দু) ভিক্ষু কর্ত্তৃক অগ্নিদগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল।

বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদের বাস করিবার যে সব বাটী ছিল, তাহাদের প্রত্যেকটি ছিল চারিতলা উচ্চ। পরিব্রাজক ই-ৎসিং (৬৭৫—৬৮৫ খৃষ্টাব্দে) প্রায় দশবৎসর কাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ই-ৎসিংএর বিবরণ হইতেও নালন্দা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। "নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় একটি চতুর্ভুজ আয়ত ক্ষেত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

নালন্দার সুবৃহৎ স্তূপের সম্মুখ ভাগের দৃশ্য

এখানকার বাড়ীঘর সমুদয় ইষ্টক এবং প্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল। এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা-গৃহ বা ছাত্রদের পড়াইবার ঘরই ছিল দশটি। প্রত্যেকটি গৃহ প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চ ছিল। আরও আটটি হলঘর ছিল—সে-গুলিতে তিনশটি ঘর ছিল। এখানেও পড়াশুনা চলিত। বিদ্যালয়ের চারিদিক বেড়িয়া বারান্দা ছিল। বিহারের ঘরে ঘরে নানা মূর্ত্তি থাকিত।"

ইতিহাসে দেখা যায় যে, নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য, নালন্দায় তিন শত ফুট উচ্চ একটি ইষ্টকনির্ম্মিত বিহার বা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং খুব সুন্দর ছিল। এই মন্দিরের মধ্যে স্বর্ণ ও মণি-মুক্তার কারুকার্য্য ছিল। লোকে এই বিহারের শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইত। এই বিহারের উত্তর দিকে বুদ্ধদেবের একটি তাম্রনির্ম্মিত মূর্ত্তি ছিল, তাহা ছিল প্রায় আশী ফিট উচ্চ। ৬০০ খৃষ্টাব্দে এই মূর্ত্তিটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নালন্দার প্রকৃতিক শোভা ছিল অতিশয় মনোরম। চারিদিকে মন্দির, বিহার, স্তূপ, পাঠাগার ও বড় বড় দীঘি ও সরোবর। সরোবরের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল জলে শত শত শতদল ফুটিয়া থাকিত। এই সময় ভারত বর্ষে সহস্র সহস্র সঙ্ঘারাম ছিল, কিন্তু নালন্দার বাড়ী-ঘরের সৌন্দর্য্য ও তাহাদের উচ্চতা সকলকে হার মানাইয়াছিল।

কাঞ্চিপুর-নিবাসী ধর্ম্মপাল বা ধর্ম্মপুত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং পরে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরবাসী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ শীলভদ্র ইঁহার নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি নিজের শিক্ষা ও চরিত্র গুণে পরে এখানকার: 'মহাস্থবির' : বা। অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মপুত্রের পূর্ব্বে ভর্ববিবেক নামে একজন পণ্ডিত নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখানে সময়ে সময়ে যে সকল আচার্য্য বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, শীঘ্র বুদ্ধ, প্রভামিত্র, পদ্মসংস্থ, বীরদেব, জিনমিত্র, দিবাকরমিত্র, জিনপ্রভ, জ্ঞানচন্দ্র, জয়সেন ও রত্নসিংহের নাম করা যাইতে পারে। আচার্য্য স্থিরমতি 'মহাযানাবতার শাস্ত্র' এবং 'মহাযানধর্ম্মধাত্ব-বিশেষাতাত্ত্ব' নামে দুইখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চীন ভাষায় তাঁহার এই গ্রন্থ দুইখানা অনূদিত হইয়াছিল। জিনমতি, গুণমতি এই আচার্য্য দুইজনও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

নালন্দার নামের ইতিহাস সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। এ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত। তিব্বতী ভাষায় পুস্তকে ইহার নাম পাওয়া যায় নালেন্দ্র। ইউ-য়ান্-চাঙের মতে "নালন্দা মঠটি যে আম্রকুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত ছিল, সেই বনের ভিতর ইন্দ্রপুকুর নামে একটি পুকুর ছিল,—সেই পুকুরে এক নাগ বাস করিত, তাহার নাম ছিল নালন্দা। এই নালন্দা নাগের নামে ঐ আম্রবনের নাম 'নালন্দাদেশ' হয়।" এই স্থানেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় বলিয়া উহার নাম নালন্দা বিহার হইয়া যায়। আবার কেহ কেহ বলেন, সিদ্ধার্থ বোধি-সত্ত্বরূপে এখানে তপস্যা করিতেন। সে সময়ে তিনি গরীব-দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য মুক্তহস্তে সব বিলাইয়া দিতেন। সেই জন্য তাহার নাম হয় 'না—অলম্—দা' অর্থাৎ 'নালন্দা'। 'না—অলম্—দা' মুক্ত-হস্তে সর্ব্বস্ব বিলাইয়াও যাঁহার তৃপ্তি হয় না, সেই রাজার দেশ', বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'নালন্দা'। ইউ-য়ান্-চাঙ তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে নালন্দাকে লিখিয়াছেন 'না-লন্-তো।'

নালন্দা যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেও দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে নাগার্জ্জুনের সময় হইতে ইহার উন্নতি হয় এবং ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-বিজয়ের সময় পর্য্যন্ত নালন্দার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ ছিল। তক্ষশিলার ন্যায় এখানেও বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া যে কেবল বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা নহে—হিন্দুদের যোগশাস্ত্র, উপনিষদ্ প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হইত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫০ খৃষ্টাব্দে রাজ-

ধ্যানী বুদ্ধ—বজ্রসত্ত্ব
[ব্রোঞ্জ ধাতুনির্ম্মিত]

সম্মান লাভ করিয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই নালন্দার খ্যাতি বিশেষ-ভাবে বিস্তার লাভ করে। মহারাজ হর্ষ-বর্দ্ধন তখন থানেশ্বরের রাজা। তিনি নালন্দার উন্নতির জন্য মুক্তহস্ত ছিলেন। তাহার সময়েই চৈনিক পরিব্রাজক ইউ-য়ান্-চাঙ ভারতবর্ষে আসেন। ইউ-য়ান্-চাঙ যখন নালন্দায় ছিলেন (৬৩৭-৪২-খৃষ্টাব্দ) তখন প্রায় দশহাজার ছাত্র নালন্দায় বাস করিত। ই-ৎসিংএর সময় (৬৭৫-৮৫ খৃঃ) নালন্দায় মাত্র তিন হাজার ছাত্র ছিল। তাহাদের মধ্যেও শতকরা ২০ হইতে ৩০ জন বিদেশী ছাত্র। ই-ৎসিংএর সময় রাহুল-মিশ্র নালন্দার মহাস্থবির ছিলেন। সে সময়ে অন্যান্য আচার্য্যদের মধ্যে জ্ঞানচন্দ্র, রত্নসিংহ, শাক্যকীর্ত্তি প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

অষ্টম খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে উ-কঙ্ Ou-

নালন্দায় প্রাপ্ত
বুদ্ধ-মূর্ত্তি

Kong) নামে একজন চীনদেশীয় পর্য্যটক নালন্দায় আসিয়া বিদ্যাচর্চ্চা করিয়াছিলেন। নালন্দায় তাঁহার নাম হইয়াছিল "ধর্ম্মধাতু"। উ-কঙও তাঁহার বিবরণীতে নালন্দার নাম লিখিয়াছেন—'না-লন্-তো'।

নালন্দা হইতেই তিব্বতে লিখন ও পঠন পদ্ধতি প্রচারিত হইয়াছিল। নালন্দা

হইতেই আচার্য্য পদ্মসম্ভব তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পুরোহিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এজন্য ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে বৌদ্ধ পুরোহিত বা লামাধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রেরা সহজে প্রবেশাধিকার লাভ করিত না। সেখানে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমেই ছাত্রদের দ্বারপালের নিকট পরীক্ষা দিতে হইত। সে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, নালন্দায় প্রবেশ করিতে পারিত

ত্রৈলোক্য বিজয়
[ব্রোঞ্জ ধাতুনির্ম্মিত]

না। এখানে শতকরা কুড়িজনের বেশী ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিত না। নালন্দার শিক্ষার অনেক বিশেষত্ব ছিল। এখানে ছাত্রদের নৈতিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত। কেমন করিয়া পুঁথিশালা রক্ষা করিতে হয়, কেমন করিয়া পুঁথির যত্ন করিতে হয়, ছাত্রেরা এখানে সে শিক্ষাও লাভ করিত। প্রতিদিন প্রত্যূষে ঘণ্টাধ্বনি হইত। ঘণ্টাধ্বনি হইবা মাত্র ভিক্ষু ও ছাত্রেরা স্নান করিতে যাইত। প্রত্যেকটি দলে একশত জন করিয়া ছাত্র থাকিত। স্নানের পর অধ্যাপনা-গৃহে যাইয়া ছাত্র ও অধ্যাপক মিলিত হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। সারাদিন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত হইত। নালন্দায় ছাত্রদের নিকট হইতে কোনও রূপ 'দক্ষিণা' লইবার রীতি ছিল না। রাজারা নানা ভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া এখানকার সকল ব্যয় নির্ব্বাহ

বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী
[ব্রোঞ্জ ধাতুনির্ম্মিত]

করিতেন। প্রতি ছাত্রের জন্য ছাত্রাবাসের এক একখানা ঘর নির্দ্দিষ্ট থাকিত; সেখানে তাহারা বাস করিত ও পড়াশুনা করিত। আহারের জন্য তাহারা সুগন্ধযুক্ত মগধের তণ্ডুল, জম্বীর ফল, সুপারি-কর্পূর এই সব পাইত। ইউ-য়ান্-চাঙ লিখিয়াছেন যে, তিনি প্রতিদিন ২২০টি জম্বীর, ২০টি জামফল, ২০টি খেজুর,

আড়াই তোলা কর্পূর, মাখন, একপোয়া তণ্ডুল এবং তিনরাশি তেল পাইতেন।

নালন্দার সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের অতি-ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বাঙ্গালার পালরাজারা যখন মগধ জয় করেন, তখন নালন্দাও তাঁহারা লাভ করেন। সে সময়ে মহারাজা দেবপালদেব মগধের সিংহাসনে ছিলেন। দেবপালদেব বীরদেবকে নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত করেন। বীরদেব নগরহারের (বর্ত্তমান জালালাবাদ) অধিবাসী ছিলেন। বীরদেব নালন্দার ইন্দ্রশিলা পাহাড়ে দুইটী চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়াও কথিত আছে। বীরদেবের পরে নরোতপ এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দার মহাস্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত নালন্দা পালবংশীয়দের করতলগত ছিল।
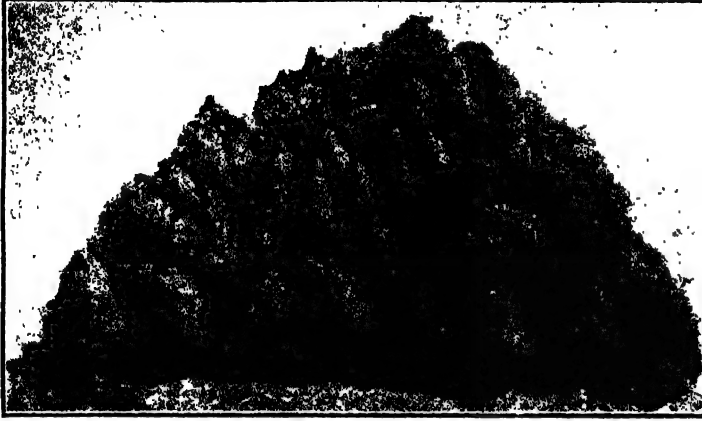
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ বা চৈত্য

১১৯৬ খৃষ্টাব্দে নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস হইয়া যায়। এখন পাটনা জেলার বরগাঁও গ্রামের দক্ষিণে নালন্দার সমুদয় ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। বরগাঁও, বিহার লাইট রেলওয়ের একটি ছোট ষ্টেসন। ষ্টেসন হইতে নালন্দার ধ্বংসাবশেষের দূরত্ব মাত্র এক মাইল। রাজগৃহ বা গয়া হইতেও ইহার দূরত্ব বেশী নয়। এখানকার ধ্বংসচিহ্ন দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, নালন্দা বিহার কত সুন্দর এবং কত বৃহৎ ছিল। কত স্তূপ, কত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ব্রোঞ্জ ধাতু ও প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তিও অনেক পাওয়া গিয়াছে:—যেমন বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী, ত্রৈলোক্য-বিজয় ধ্যানীবুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈত্য প্রভৃতি। হিন্দুমূর্ত্তিও অনেক পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিষ্ণু, সূর্য্য, চণ্ডী প্রভৃতি। সময়ে আরও হয় ত অনেক কিছু পাওয়া যাইবে। এ সকল মূর্ত্তির নীচে খোদিত লিপিও রহিয়াছে। নালন্দার যে যাদুঘর হইয়াছে, সেখানে এই সকল মূর্ত্তি শৃঙ্খলা সহকারে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। অনেকগুলি শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি পাওয়া গিয়াছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের। উহাতে লিখিত আছে—"শ্রীনালন্দামহাবিহারী আর্য্য ভিক্ষু সঙ্ঘস্য।" কোন কোন অভগ্ন মাটির হাঁড়ি পাওয়া গিয়াছে—তাহার ভিতর চাউল পর্য্যন্ত রহিয়াছে!

বিক্রমশিলা

বিক্রমশিলাও একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বাঙ্গালী রাজা পালবংশীয় ধর্ম্মপাল অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। নানা গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, রাজা ধর্ম্মপাল অষ্টম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ঐ সময়েই এই

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহাকে বিক্রমশিলা মহাবিহার বলা হইয়াছে। বিক্রমশিলা নামের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ প্রচলিত আছে এখানে একটির উল্লেখ করিলাম। বিক্রমশিলা নামে এক যক্ষ ইহার কাছাকাছি কোন এক পাহাড়ে বাস করিত। তাহার নাম হইতে এই বিহারের নাম হইয়াছে বিক্রমশিলা বিহার। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, রাজা ধর্ম্মপালের 'বিক্রম' আখ্যা হইতেই এই বিহারের নাম হইয়াছিল, বিক্রমশিলা।

বিক্রমশিলা বিহার কোথায়, কোন্ স্থানে ছিল, সে কথা লইয়াও নানা মত প্রচলিত। অনেকেই বলেন যে, মগধরাজ্যের মধ্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে বিক্রমশিলা বিহার অবস্থিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত পাথরঘাটা নামক স্থানের একটি পাহাড়ের উপর এই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। এই পাথরঘাটা ভাগলপুর হইতে চব্বিশ মাইল পূর্ব্বে ও কহলগাঁও হইতে ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত। পাথরঘাটার প্রাচীন নাম বিক্রমশিলা সঙ্ঘারাম। উহার সংস্কৃত নাম শিলা-সঙ্গম।
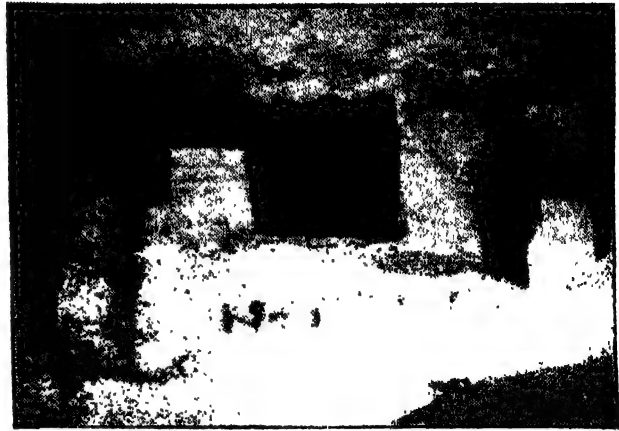
বিক্রমশিলার (পাথরঘাটার) একটি ছোট গুহা

বিষ্ণু সূর্য্য চণ্ডী

বৌদ্ধদের লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, এই বৌদ্ধ মহাবিহার গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। এই বিহারের কক্ষগুলি পর্ব্বত-গাত্র খোদিত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে, সে সময়কার প্রসিদ্ধ শিল্পী ধীমান্ ও বীতপাল এই বিহারের গঠন পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। বিক্রমশিলা বিহার এমন সুন্দরভাবে গঠিত ছিল যে, তিব্বতবাসীরা এই মহাবিহারের আদর্শে তাঁহাদের সঙ্ঘারাম (মঠ)গুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বিক্রমশিলা বিহারের ছয়টি দ্বার ছিল—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম—মধ্যের প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বার। ইহার সুবিস্তৃত প্রাঙ্গন

মধ্যে ১০৭টি মন্দির ছিল এবং ছয়টি উচ্চ শিক্ষালয় (কলেজ) ছিল। ছয়জন ভিক্ষুর উপর এই ছয়টি প্রতিষ্ঠানের কার্য্য তত্ত্বাবধানের

চৌরাশীমুনি গুহার নিম্নাংশ—পাথরঘাটা

ভার ছিল। এই মহাবিহারে ১০৮জন আচার্য্য বাস করিতেন। নরপতি ধর্ম্মপাল বিক্রমশিলা বিহারের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন এবং এই ভূমির আয় হইতে সমগ্র ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। পাহাড়ের উপর বিহারের নিকট অতি-বিস্তৃত সমতল ভূমি ছিল, সেখানে ৮,০০০ আট হাজার লোক একত্রে বসিতে পারিত। সেখানে আচার্য্যগণ উপদেশ দিতেন। পাহাড়ে উঠিবার জন্য সুগঠিত সুন্দর সিঁড়ি ছিল। সেই সিঁড়ি বাহিয়া সকলে নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারিত। রাত্রিকালে বিহারে প্রবেশ করিবার রীতি ছিল না। যাহারা এখানে বেড়াইতে আসিত, তাহাদের জন্য পর্ব্বতের নীচে পৃথক ধর্ম্মশালার ব্যবস্থা ছিল। বিহারের চারিদিক্ বেড়িয়া সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল। এই প্রাচীরের চারিদিক ঘিরিয়া ১০৮টি ছোট-বড় মন্দির ছিল। মধ্যস্থলে ছিল সুবৃহৎ মহাবোধি-মন্দির।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ভাষা লেখা হইয়াছিল। এখানে তন্ত্রশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, চিকিৎসা এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা হইত। এখানে অনেক সংস্কৃত পুস্তক তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এই মহাবিহারে তিব্বতী ভাষার চর্চ্চাও হইত। ধর্ম্মপালের সময় বুদ্ধ জ্ঞানপাদের তত্ত্বাবধানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কার্য্য পরিচালিত হইত। তখনকার সময়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ দ্বাররক্ষকের কাজ করিতেন। এখানে কয়েক জনের নাম করিলাম। আচার্য্য রত্নাকর শান্তি, প্রভাকরমতি, রত্নবজ্র (কাশ্মীরবাসী), জ্ঞানশ্রী মিত্র (গৌড়), আচার্য্য শ্রীধর, বুদ্ধ জ্ঞানপাদ, ভব্যকীর্ত্তি, নীলবজ্র, কৃষ্ণসমরবজ্র, তথাগত রক্ষিত, বোধভদ্র, কমল রক্ষিত, বাগীশ্বর কীর্ত্তি, মহাবজ্রাসন, দানরক্ষিত, অভয়াকর গুপ্ত, শুভাকর গুপ্ত, সুনায়কশ্রী, শাক্যশ্রী, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ) প্রভৃতি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহের প্রাচীর-গাত্রে সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণের আকৃতি অঙ্কিত থাকিত। আচার্য্যগণ রাজার নিকট হইতে "পণ্ডিত" উপাধি পাইতেন। যেমন বারেন্দ্র দেশের আচার্য্য 'জেতারি' এবং কাশ্মীর দেশের রত্নবজ্র 'পণ্ডিত' উপাধি পাইয়াছিলেন।

নালন্দার ন্যায় এখানেও বিদ্যার্থীদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমে দ্বাররক্ষক পণ্ডিতের নিকট পরিচয় দিতে হইত। যদি দ্বার-পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিত, তাহা হইলে বিদ্যার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের

অনুমতি পাইত না। লামা তারানা বলেন যে, অষ্টম শতাব্দীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যাপনার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ও দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজাদের সময় তন্ত্রশাস্ত্র যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। লামা তারানাথ তন্ত্রশাস্ত্রের তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ দেখিয়াছেন এবং কোন কোন টীকা নিজে সংশোধন করিয়াছেন। পালরাজাদের সময় শিক্ষার ভিতর দিয়া বাঙ্গালা ও তিব্বতের মধ্যে বেশ একটা ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। নালন্দা বিহার তন্ত্রশাস্ত্রের জন্মস্থান হইলেও তন্ত্রের ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিক্রমশিলা বিহার হইতেই বেশী প্রচারিত হইয়াছিল।

সে সময়ে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কদের সাধারণ উপাধি ছিল, মন্ত্রবজ্রাচার্য্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অধিনায়ক ছিলেন আচার্য্য বুদ্ধ জ্ঞানপাদ এবং শেষ অধিনায়ক ছিলেন শাক্যশ্রী।

সেকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভিক্ষুগণ দেশ-বিদেশে গমন করিতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহুসংখ্যক ভিক্ষু, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য চীন, জাপান, কোরিয়া ও মোঙ্গোলিয়া দেশে গমন করিয়াছিলেন। বিক্রমশিলা বিহার হইতে অনেক বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বত দেশে গমন করিয়াছিলেন। আচার্য্য শান্ত রক্ষিত তিব্বতীয় বিহারের প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ) তিব্বত রাজের অনুরোধে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতে গমন করেন।

ভটেশ্বর গুহা—পাথরঘাটা

বিক্রমশিলা বিহার তাহার কীর্ত্তি ও যশঃ প্রায় চারিশত বৎসর কাল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে, কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত শাক্যশ্রী যখন বিক্রমশিলার মঠের অধিনায়ক ছিলেন, তখন এই বিহার ধ্বংস হইয়া যায়।

বারাণসী

বারাণসী বা কাশী দুই হাজার বৎসরেরও উপর হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সেকালে বারাণসীতে কিভাবে শিক্ষার রীতি প্রচলিত ছিল, কিরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল এবং কোন্ কোন্ আচার্য্য সেখানে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন, তাহার সঠিক প্রমাণ আমরা খোদিত লিপি, পুরাণ ও বিদেশী ভ্রমণকারীদের লিখিত বিবরণী হইতে কিছুই জানিতে পারি না। পুরাণে বারাণসী যে খুব বড় সহর ছিল, বহুলোক এখানে বাস করিত, নানা দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রীরা

এখানে আসিত, সে-কথা জানিতে পারি, কিন্তু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই তাহাতে পাওয়া যায় না।

কাশী আর্য্য-শিক্ষা ও সভ্যতার দিক্ দিয়া তক্ষশিলার ন্যায় প্রাচীন নহে। আর্য্যেরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসেন, তখন তাঁহারা পঞ্জাব প্রদেশেই উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা তখন পঞ্চনদবিধৌত দেশের গুণ-গানেই নিরত ছিলেন। তখন তাঁহাদের শিক্ষা ও সভ্যতা সপ্তসিন্ধু (পঞ্জাব) এবং কুরু-পাঞ্চাল দেশেই বিস্তার লাভ করে। তাঁহারা বিদেহ, কাশী, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশকে ঘৃণার চক্ষে-দেখিতেন। অথর্ব্ববেদে আছে—"আমাদের দেশের এ জ্বরজ্বালা কাশী ও মগধে যাউক।" আর্য্যেরা অন্যদেশের লোকদের যে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না, তাহা বুঝিতে পারিতেছ।

ক্রমে ক্রমে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য-প্রভাব বারাণসীতে আসিয়া বিস্তৃত হয়; সে সময়ে ধৃতরাষ্ট্র নামে বারাণসীর একজন রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। কিন্তু তাঁহার এ যজ্ঞ নিরাপদে সম্পন্ন হইল না। ভরতবংশের রাজা শত্রুজিৎ ধৃতরাষ্ট্রের অশ্ব ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ভাবে যজ্ঞ বিফল হওয়ায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র বৈদিক-ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উত্তরাধিকারীরা একে একে বৈদিক-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কাশীতে আর্য্য-গণের শিক্ষা ও সভ্যতা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকে। কাশীর রাজা অজাতশত্রু, নিজে দার্শনিক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা আর্য্য শিক্ষা ও সভ্যতা কাশীরাজ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। সে যাহাই হউক না কেন, প্রথম খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত তক্ষশিলা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল।

জাতক পড়িয়া আমরা জানিতে পারি যে, সে সময়ে বারাণসীর রাজারা পুত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তক্ষশিলায় প্রেরণ করিতেন। যথা—"বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ষোল বৎসর বয়সেই তিনি তক্ষশিলা নগরে বিদ্যাভ্যাস শেষ করিয়া বেদে এবং অষ্টাদশ কলায় ব্যুৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে উপরাজ্যে নিযুক্ত করিলেন।" ইত্যাদি কথা বহু জাতকেই আছে। অনেক দরিদ্র ছাত্র সে-কালে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গান্ধার দেশের রাজধানী তক্ষশিলায় গমন করিত। সে সময়ে বিদ্যাকেন্দ্রহিসাবে বারাণসী তক্ষশিলার ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

বুদ্ধদেবের জীবিতকালেই বারাণসী প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে সময়ে সারনাথ বিহার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মকেন্দ্র ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। প্রায় ১,৫০০ শত ভিক্ষু ও বিদ্যার্থী এখানে বাস করিতেন। নালন্দার আদর্শে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। চীন পর্য্যটক ইউ-য়ান্-চাঙ বারাণসী অর্থাৎ সারনাথের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখেন নাই।

সে যাহাই হউক না কেন, বৌদ্ধযুগে বারাণসী অর্থাৎ সারনাথ যে একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র ছিল তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারি।

জগদ্দল বিহার

জগদ্দল বিহারেও একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল। জগদ্দল বিহার কোথায় ছিল, বলা কঠিন। অনেকের মতে রামপাল
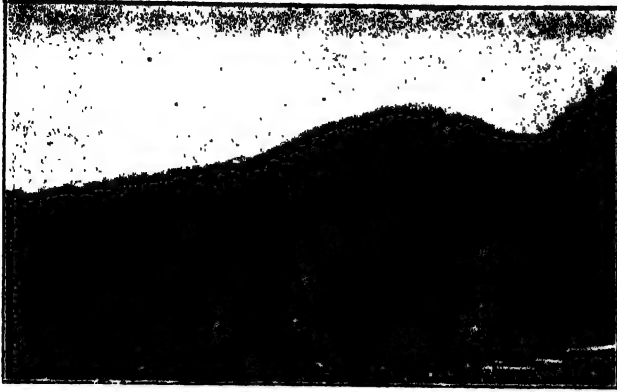
অজন্তা পর্ব্বত

অজন্তা গুহার একটি প্রবেশ পথ

অজন্তা—গুহাগৃহ দেখা যাইতেছে

অজন্তার একটি গুহা-সম্মুখ
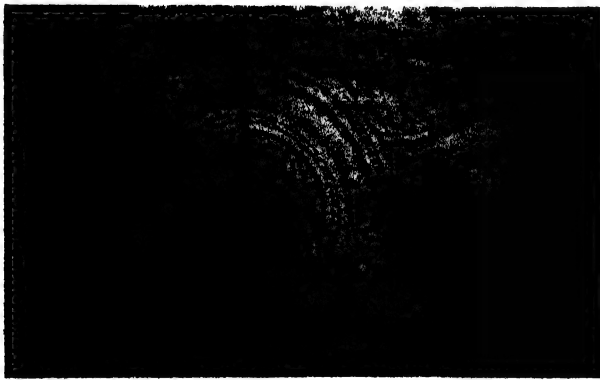
অজন্তার একটি গুহাগৃহের ছাদ

রামাবতী নামে যে নগর বসান, "জগদ্দল-বিহার" তাহারই কাছে ছিল। উহা গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমের উপরই ছিল। মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে "এখন করতোয়া গঙ্গায় পড়ে না—পড়ে যমুনায়; গঙ্গাও এক সময়ে বুড়ীগঙ্গা দিয়া যাইত—রামপাল নামে মুন্সীগঞ্জে যে এক পুরাতন গ্রাম আছে, হয়ত সেই রামাবতী ও জগদ্দল উহারই নিকটে কোথাও হইবে।" সে যাহাই হউক, মগধে যেমন নালন্দা, পেশোয়ারে যেমন কণিষ্ক বিহার, সেইরূপ বাঙ্গলায় জগদ্দল বিহার।

রাজা রামপাল জগদ্দল বিহারের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিহারে অনেক বড় বড় বৌদ্ধ পণ্ডিত থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বিভূতিচন্দ্রই ছিলেন প্রধান। বিভূতিচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাটিপ্পনী লিখিয়াছিলেন। তিব্বতের লেখকেরা এই বিহারের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিত।

বল্লভি

বল্লভি পশ্চিম ভারতের একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ই-ৎসিং-এর ভ্রমণ-কাহিনীতে বল্লভির কথা আছে। সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা এবং বল্লভি এ দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ই ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখানে ছাত্রেরা দুই তিন বৎসর কাল থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিত। বল্লভিতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ছাত্রগণ সমানভাবে শিক্ষালাভ করিতেন। 'কথাসরিৎসাগরে' বল্লভির কথা আছে। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে এবং ভারতের বাহির হইতে বিদ্যার্থীরা এখানে শিক্ষালাভ করিতে আসিত। ইউ-য়ান্-চাঙ লিখিয়াছেন যে, বল্লভিতে প্রায় একশত বৌদ্ধবিহার ছিল। রাজারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ-সাহায্য করিতেন। বল্লভি, কাথিয়াবারের কাছে অবস্থিত। অনেকের মতে বর্ত্তমান ওয়ালাই সেকালের বল্লভি।

অজন্তা

অজন্তার নাম সকলেই জানে। পাহাড়ের গায়ে অঙ্কিত বৌদ্ধ-যুগের চিত্র-সমূহের জন্যই অজন্তা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। অজন্তা বৌদ্ধ-যুগের একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-কেন্দ্র ছিল। এখানে সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণ ছাত্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। এখানকার চিত্র ও ভাস্কর্য্য সে যুগে অতুলনীয় ছিল। এক সময়ে অজন্তা শাস্ত্রের আলোচনার জন্যও যেমন বিখ্যাত ছিল, তেমনি ললিত-কলার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যের কিরণ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল। অজন্তায় সর্ব্বশুদ্ধ ২৯টি গুহা আছে। কোন কোন গুহার আয়তন দ্বারদেশ হইতে পর্ব্বতাভ্যন্তরের শেষ দেওয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃতি প্রায় একশত হাত। ইহার মধ্যে একটি দ্বিতল গুহাও আছে। গুহাগুলির দেওয়াল, স্তম্ভ, দ্বারদেশ, ছাদ, নানাবিধ খোদিত ও চিত্রিত মূর্ত্তি, লতাপাতা ও ফুলে সুশোভিত। অনেক গুহার গায়ে খোদিত লিপিও আছে। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে এই গুহাগুলি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এখানে একদিন যে একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেকথা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। এখন অজন্তার চিত্রাবলির জন্যই ইহার নাম ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

কৃষি-যন্ত্র

শস্য রোপণের পূর্ব্বে ও ক্ষেত্রে যখন শস্য থাকে তখন বিভিন্ন প্রকারের কৃষি-যন্ত্রের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভূমি কর্ষণ করিতে হয়। নিম্নে বিভিন্ন কার্য্যের উপযোগী প্রধান প্রধান কৃষি-যন্ত্রগুলির নাম, গঠন ও কার্য্যকারিতার বিষয় সংক্ষেপে বলা হইল।

(১) কোদাল :—তোমরা সকলেই কোদাল দেখিয়াছ। ইহার তিনটি অংশ; যথা—(ক) বাঁট, (খ) ফলা ও (গ) ঘাড়া। যে বংশ বা কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা ফলা আটকানো থাকে, তাহাকে বাঁট বলে। যে অংশ দ্বারা মাটী কাটিতে হয়, তাহার নাম ফলা। ফলার উপরের অংশে একটি ছিদ্র থাকে, এই ছিদ্রের মধ্য দিয়াই বাঁট আটকানো থাকে। এই ছিদ্রকে ঘাড়া বলে।

সচরাচর দুই প্রকারের কোদাল ব্যবহৃত হয়; দেশী ও বিলাতী। (১২নং ও ১১ নং চিত্র) দেশী কোদালের ফলা বেশী চওড়া নয় এবং উহার ঘাড়ার দিক বাঁকা। বিলাতী কোদালের ফলা বেশ চওড়া ও ঘাড়ার দিক বাঁকা নয়, সোজা। দেশী কোদালের ফলা বাঁকা হওয়ার জন্য উহা দ্বারা গভীর ভাবে মাটী কোপান যায় না। কিন্তু বিলাতী কোদালের ফলা সোজা বলিয়া উহাদ্বারা গভীরভাবে মাটী কোপান যায়।

দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা কোদালের সাহায্যে মাটী গভীরতর ভাবে কর্ষণ করা যায়। দেশী লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষিত মাটী উল্টাইয়া যায় না। কিন্তু কোদালের সাহায্যে মাটী ভাল ভাবে উল্টাইয়া দেওয়া যায়। ভূমি কর্ষণের পক্ষে মাটী ভাল ভাবে উল্টাইয়া দেওয়া বিশেষ দরকার। কারণ, ইহা দ্বারা নীচেকার উর্ব্বর মাটী উপরের স্তরে আসে, জঙ্গল আগাছা ইত্যাদির শিকড় উপরে আসিয়া পড়ে ও তজ্জন্য শীঘ্র বিনষ্ট হয় এবং পোকা-মাকড় প্রভৃতির বাসা, ডিম, বাচ্চা প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা কোদালের দ্বারা ভূমি কর্ষণ ফসলের পক্ষে অধিক উপযোগী। ইহা ছাড়া কোদালের সাহায্যে অসমতল জমি সমতল করা যায় এবং যে সকল জমিতে জঙ্গল, গাছের শিকড় ইত্যাদি আছে, সেই সকল জমি কোদালের সাহায্যেই শস্য রোপণের উপযোগী করা যায়।
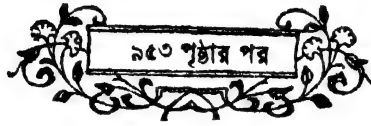
কিন্তু দেশী লাঙ্গলের পরিবর্ত্তে কোদাল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে খরচ ও পরিশ্রম বেশী হয়, সময়ও বেশী লাগে। এই জন্যই সাধারণতঃ ভূমি কর্ষণের জন্য লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। অল্প জমিতে শস্য রোপণ করিতে হইলে কিংবা যে সকল শস্যের জন্য গভীরভাবে ভূমি কর্ষণের দরকার, সেই সকল ক্ষেত্রে কোদাল দ্বারাই জমি প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়।

কোদালের দ্বারা আরও অনেক প্রকারের কাজ হয়। যথা :—ড্রেণ বা নালীকাটা, যে সকল শস্য সারিবন্দিভাবে রোপণ করা হয় ও যাহাদের গোড়ায় মাটী দিতে হয় সেই সকল শস্যের গোড়ায় মাটী দেওয়া, পুকুর কাটা, মাটী কাটা, গর্ত্ত করা ইত্যাদি।

(২) দেশী লাঙ্গল :—দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ কৃষকেরা আমাদের দেশী লাঙ্গলের ন্যায় লাঙ্গল ব্যবহার করিত। জমি সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে ভাঙ্গিবার বা আল্‌গা করিবার জন্য এই লাঙ্গলই

আমাদের প্রধান যন্ত্র। বাস্তবিক লাঙলই আমাদের কৃষিকার্য্যের প্রতীক্। এই লাঙল আমাদের দেশেই প্রস্তুত হয়। মোটামুটি ইহার তিনটি অংশ; যথা:— হাল, ঈষ ও জোয়াল। কিন্তু সুক্ষ্মরূপে ধরিতে গেলে ইহার ছয়টি অংশ; হাল, ফাল বা ফলা, ঈষ, গুটি বা হাতল, গোঁজ ও জোয়াল। ৪নং চিত্রে প্রত্যেক অংশগুলি পরিষ্কাররূপে দেখা যাইবে।

হাল লাঙ্গলের প্রধান অঙ্গ। ইহা কাষ্ঠনির্ম্মিত। হালের নীচের দিকে লৌহনির্ম্মিত ফাল থাকে। ইহা দ্বারাই মাটী কাটিয়া যায়। হালের উপরের দিক অর্থাৎ যে অংশ হাতে ধরিয়া চালাইতে হয়, তাহাকে গুটী বা হাতল বলে। ঈষও কাষ্ঠনির্ম্মিত। ইহা হালের গায়ের গর্ত্তের ভিতর সংযুক্ত থাকে। একটি কাঠের টুকরা দিয়া ইহাকে হালের সহিত দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখা হয়। এই টুকরোটিকে গোঁজ বলে। ঈষের মাথার দিকের অংশে কতকগুলি খাঁজ কাটা থাকে। দুইটি বলদের কাঁধের উপর যে কাষ্ঠখণ্ড থাকে তাহাকে জোয়াল বলে। জোয়ালের দুই প্রান্তে ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের মধ্যে একটি কাঠি থাকে। এই কাঠির সহিত দড়ি বাঁধিয়া, সেই দড়ি বলদের গলার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বলদকে জোয়ালের সহিত বাঁধিয়া রাখা হয়। জোয়ালের মাঝখানে দড়ি দিয়া ঈষ বাধিয়া দিতে হয়। ঈষের মাথার দিকে যে খাঁজ কাটা আছে, ইহাদের সাহায্যে ঈষ জোয়ালের সহিত ছোট-বড় করিয়া বাঁধা যায়।

দেশী লাঙ্গল হালকা ও আয়তনে ছোট, উহার ফলাও খাটো ও বেশী চওড়া নয়। সেই জন্য দেশী লাঙ্গলের দ্বারা তিনচারি ইঞ্চির বেশী গভীর চাষ করা যায় না। আমাদের দেশের বলদ আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট ও অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী। সুতরাং আমাদের দেশীয় বলদের আকার ও শক্তি অনুযায়ী দেশী লাঙ্গল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেশী লাঙ্গলের দ্বারা আমাদের দেশের মাটী কর্ষণ করা কঠিন নয়। গভীর ভাবে কর্ষণের প্রয়োজন হইলে একটি লাঙ্গলের পিছনে আর একটি লাঙ্গল চালাইয়া জমি চাষ করা যাইতে পারে এবং লম্বালম্বি ভাবে চাষ করিয়া আবার এড়ো-এড়ি ভাবে চাষ করিলে চাষের গভীরতা বাড়ে।

ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। ইহার সকল প্রদেশের মাটীর প্রকৃতি এবং বলদের আকার ও শক্তি সমান নহে। সেই জন্য বিভিন্ন প্রদেশের মাটী প্রকৃতি অনুযায়ী এবং বলদের আকার ও সামর্থ্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের লাঙ্গল ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহাদের প্রত্যেকের কার্য্যকারিতাও সমান নহে। বাংলা দেশের লাঙলে সাধারণতঃ তিন ইঞ্চি হইতে পাঁচ ইঞ্চি পর্য্যন্ত মাটী গভীর ভাবে কর্ষণ করা যায়। বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন আকারের ও ওজনের লাঙ্গলের ব্যবহার আছে। রংপুর ও জলপাই-গুড়ি জেলায় ব্যবহৃত লাঙল দ্বারা মোটে দুই ইঞ্চি পরিমাণ জমি গভীরভাবে চাষ করা যায়। বেহারের লাঙ্গল বাংলা দেশের লাঙ্গল অপেক্ষা ওজনে ভারী কিন্তু অধিক কার্য্যকরী এবং এই লাঙ্গলের জমি পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর চাষকরা যায়। কটকে যে লাঙ্গলের প্রচলন আছে, তাহাদের অঙ্গের দুই পাশ পাখার মত বাঁকানো। আবার বুন্দেলখণ্ডে ব্যবহৃত লাঙ্গল ওজনে প্রায় সাড়ে তিন মণ। ইহা দ্বারা জমি নয়ইঞ্চি পরিমাণ কর্ষিত হয়। ইহা তিন জোড়া বলদে টানে ও নয় জন ইহার চালক।

উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল:—এই শ্রেণীর লাঙ্গলের ফালের এক ধারে একটি পাখার মত জিনিষ থাকে; ইংরাজীতে ইহাকে (mould board) বলে। এই লাঙ্গলও বলদে টানিয়া থাকে। ১০ নং চিত্রে এই লাঙ্গলের সকল অংশ দেখানো হইয়াছে।

উন্নত শ্রেণীর ও দেশী লাঙ্গলের কার্য্যের প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলি এই:—

উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গলে পাখা থাকার জন্য উহা দ্বারা চাষের সময় কর্ষিত মাটী একেবারে উল্টাইয়া যায় অর্থাৎ উপরের মাটী নীচে চলিয়া যায় ও নীচের মাটী উপরে আসে। এই লাঙ্গলের দ্বারা চাষের পর অকর্ষিত জমি মোটেই থাকে না। মাটী উল্টাইয়া যাইবার ফলে জমির ঘাস, জঙ্গল, আগাছা ইত্যাদি মাটীর নীচে পড়িয়া যায় ও উহাদের শিকড় মাটীর উপরে আসিয়া পড়ে। ইহার ফলে ঘাস, জঙ্গল, আগাছা ইত্যাদি মরিয়া যায় ও ক্রমশঃ পচিয়া সারে পরিণত হয়।

দেশী লাঙ্গলের দ্বারা চাষের সময় মাটী উল্টাইয়া যায় না, কেবল মাত্র কাটিয়া যায় ও কর্ষিত মাটী ফালের দুই ধারে ঢলিয়া পড়ে। দেশী লাঙ্গলের দ্বারা চাস করিলে দুইটি V আকারের ন্যায় নালী হইয়া যায় এবং দুইটি নালীর মধ্যের জমি অকর্ষিত অবস্থায় থাকে। ফলে, দেশী লাঙলের দ্বারা একবার ভূমি কর্ষণ করিলে জমির সকল অংশ কর্ষিত হয় না। এই জন্য বার বার লম্বালম্বি ও এড়োএড়ি ভাবে চাষ
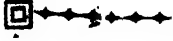
করিয়া এইরূপ অকর্ষিত অংশগুলি ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। দেশী লাঙ্গলের দ্বারা মাটী উল্টাইয়া যায় না বলিয়া ঘাস, জঙ্গল, আগাছা প্রভৃতি সহজে নষ্ট হয় না।

দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গলের দ্বারা চাষ করাই সুবিধাজনক ও বাঞ্ছনীয়।

উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গলগুলি ওজনে অপেক্ষাকৃত ভারী। প্রথমতঃ, আমাদের দেশীয় বলদ উহা টানিতে নারাজ হয়। কিন্তু কিছু দিন অভ্যাস হইয়া গেল উহা টানিতে আপত্তি করে না। উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গলের মূল্য দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা বেশী।

আমাদের দেশে রোওয়া ধানের জন্য জমি চাষ করিতে হইলে কাদায় চাষ করিতে হয়। সময়ে সময়ে জমিতে জল দাঁড়াইয়া থাকিলেও জমি চাষ করিতে হয়; ইহাকে পেঁকী চাষ বলে। এইরূপ পেঁকী চাষের পক্ষে উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল মোটেই উপযুক্ত নয়।

উপরি উক্ত কারণগুলির জন্য আমাদের কৃষকগণ সহজে উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল ব্যবহার করিতে চাহে না। কিন্তু সুখের বিষয়, কৃষকদিগের মধ্যে উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল ক্রমশঃ আদর লাভ করিতেছে।

কতকগুলি প্রধান প্রধান উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গলের নাম নিয়ে দেওয়া হইল।

(১) মেষ্টন লাঙ্গল (৫ নং চিত্র)—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কৃষিবিভাগ কর্তৃক এই লাঙ্গল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই লাঙ্গল দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী গভীর ও অগভীর চাষ হইতে পারে।

(২) ওয়াট সাহেবের লাঙ্গল—এই লাঙ্গলও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কৃষিবিভাগ আবিষ্কার করিয়াছেন।

(৩) হিন্দুস্থান লাঙ্গল—কলিকাতার জেসপ্ কোম্পানী এই লাঙ্গল আবিষ্কার করিয়াছেন।

(৪) জাঠ লাঙ্গল—এই লাঙ্গলও জেসপ্ কোম্পানীর নিকট পাওয়া যায়।

(৫) পাঞ্জাব লাঙ্গল।

১। বাখরা, ২। খুরপী, ৩। কাস্তে, ৪। দেশীয় লাঙ্গল, ৫। মেন লাঙ্গলষ্ট ৬। হো, ৭। সাব সয়েল প্লাউ বা নিম্নস্তর কর্ষণোপযোগী লাঙ্গল, ৮। বিলাতী কাস্তে, ৯। বিলাতী লাঙ্গল, ১০। উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল, ১১। বিলাতী কোদাল, ১২। দেশী কোদাল, ১৩। ডিস্ক হ্যারো, ১৪। সভেল, ১৫। ঘাসটানার কাঁটা (বিলাতী) (Hand rake), ১৬। স্পেড, ১৭। মুগুর, ১৮। স্ক্রেপার, ১৯। মই।

(৬) রাজেশ্বর লাঙ্গল—এই লাঙ্গল বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ডিরেক্টার রায় রাজেশ্বর দাসগুপ্ত বাহাদুর কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত।

(৭) ভাগলপুর লাঙ্গল—এই লাঙ্গলের আবিষ্কর্ত্তা মৌলভী সেখায়েৎ হোসেন।

(৮) সব কম লাঙ্গল—ইহা বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক আবিষ্কৃত।

বিলাতী লাঙ্গল

আমাদের দেশে বিলাতী লাঙ্গলের প্রচলন এখনও হয় নাই। উহারা ভারী ও আমাদের দেশীয় বলদ উহা টানিতে পারে না।

৯ নং চিত্রে বিলাতী লাঙ্গলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখা যাইবে। অংশ গুলির নাম ও কার্য্য নিম্নে বর্ণিত হইল।

হাতল—দুই হস্তে দুইটি হাতল ধরিয়া লাঙ্গল চালাইতে হয়।

ঈষ—দেশীয় লাঙ্গলের ঈষের ন্যায় ইহারও কার্য্য।

কাতারী—ইহা একখানা চেপ্টা লৌহ-ফলক। ইহার নিম্নভাগ খুব তীক্ষ্ণ। ইহা ফালের সম্মুখে থাকিয়া মাটীকে চিরিয়া দেয়। যে সকল জমিতে ঘন ঘন ঘাস আছে, সেই সকল জমি কর্ষন করিবার সময় ইহার বিশেষ প্রয়োজন হয়।

বল্গাবন্ধ—ইহা ঈষের অগ্রভাগে থাকে। ইহার সহিত অশ্ব বা বলদের রজ্জু বাঁধা থাকে।

ফাল—ইহার অগ্রভাগ খুব সূক্ষ্ম ও দুই পাশ ধারাল। কর্ষণের সময় ইহার অগ্রভাগ সহজেই মাটির ভিতর ঢুকিয়া যায় ও দুই পাশের ধারাল অংশ দ্বারা মাটী সহজে কাটিয়া যায়।

পাখা—ইহা মাটী উল্টাইয়া দেয়। ইহার সহিত হাতল, ঈষ, ফাল প্রভৃতি অংশগুলি আবদ্ধ থাকে।

চাকা—এই চাকার সাহায্যে লাঙ্গলের চলাচলের সুবিধা হয়; ইহা দ্বারা চাষের গভীরতাও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

তলা—লাঙ্গলের অঙ্গ ইহার সহিত সংযুক্ত থাকে। জুতার তলার মত ইহা মাটীর উপর দিয়া যায়।

নিম্নস্তর কর্ষণোপযোগী লাঙ্গল

একই গভীরতায় মাটী বার বার চাষ করিবার ফলে উহার নিম্নস্তর কঠিন হইয়া যায়। উৎপন্ন শস্যের শিকড় এই কঠিন স্তরে আসিয়া উপযুক্তভাবে বিস্তার লাভ করিতে পারে না ও উহা ভেদ করিয়া মাটীর আরও নিম্নে প্রবেশ করিতে পারে না। কাজে কাজেই শস্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এই কারণে ঐ কঠিন স্তর ভাঙ্গিয়া আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেশী লাঙ্গলের দ্বারাই এই কঠিন স্তর আল্‌গা করিয়া দেওয়া হয়। এই কার্য্যের জন্য বিলাতী এক প্রকার লাঙ্গল আছে ইহার ইংরাজী নাম সাব সয়েল প্লাউ। আমরা বাংলায় ইহাকে "নিম্নস্তর কর্ষণোপযোগী লাঙ্গল" বলিতে পারি। ৭ নং চিত্রে এই লাঙ্গল দেখানো হইয়াছে। এই লাঙ্গলের ফালে পাখা নাই। ইহা দেশী লাঙ্গলের ন্যায়ই মাটী কাটিয়া দুই ধারে ফেলিয়া দেয়। কর্ষণের পর এই লাঙ্গল চালাইয়া নিম্নস্তর ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। এই লাঙ্গলের দ্বারা জমি গভীরতর ভাবেও চাষ করা যায়।

এঞ্জিন-চালিত লাঙ্গল

ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই আজকাল কলের লাঙ্গল ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা ব্যবহার করিয়া অনেক পাশ্চাত্য জাতি কৃষির আশাতীত উন্নতি সাধনও করিয়াছেন। ইহার নাম মোটর ট্রাকটার বা কলের লাঙ্গল। এই লাঙ্গল ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধার বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

সুবিধা:—(১) কলের লাঙ্গল দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু পরিমাণ জমি চাষ করা যায়।

(২) কৃষকের পরিশ্রম খুবই কম হয়।

(৩) যেখানে চাষীদের মজুরীর হার অধিক, সেখানে কলের লাঙ্গল চালাইয়া খুব কম খরচে প্রচুর শস্য, উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

(৪) যেখানে সুস্থ, সবল ও পরিশ্রমী কৃষকের অভাব সেখানেও কলের লাঙ্গল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৫) যখন জমি চাষ করা শেষ হইয়া যায়, তখন এই লাঙ্গলের এঞ্জিনটি দ্বারা জল তোলা, আখ মাড়াই, ধান ভানা, তৈল নিষ্কাশন প্রভৃতি কার্য্য করা যাইতে পারে এবং তাহা করিলে যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

অসুবিধা:—(১) কলের লাঙ্গলের মূল্য খুব বেশী। সেই জন্য গরীব কৃষকদের পক্ষে ইহা ক্রয় করা সম্ভব নহে।

(২) যে দেশে কৃষকের সংখ্যা অধিক অথচ জমির পরিমাণ কম, সেখানে কলের লাঙ্গল চালাইলে বহু কৃষককে বেকার বসিয়া থাকিতে হইবে।

(৩) বাংলার কৃষকদের জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত; এইরূপ ছোট ছোট ক্ষেত্র সকল চাষ করিবার পক্ষে কলের লাঙ্গলের আকার অতি বৃহৎ, এরূপ ক্ষেত্রে ইহা অনাবশ্যক ও অসুবিধাজনকও বটে।

(৪) এই লাঙ্গল চালাইবার সময় ইহার এঞ্জিনটি উত্তপ্ত হইয়া থাকে; অধিক উত্তপ্ত হইলে উহাকে শীতল করিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে হয়। এই কারণে ভারতবর্ষের মত গরম দেশে ইহা ব্যবহার করা নিতান্ত অসুবিধাজনক। কারণ এখানে এঞ্জিন অল্প সময়েই অত্যধিক উত্তপ্ত হইবে এবং উহাকে শীতল করিতে অনেক সময় লাগিবে।

(৫) জমিগুলি বৃহৎ ও চৌকা আকারের হইলে কলের লাঙ্গল ব্যবহার করা সহজ ও সুবিধাজনক। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকের জমিই চৌকা আকারের নহে, আয়তনেও বৃহৎ নহে; এই জন্য এদেশে কলের লাঙ্গল চালান অসুবিধা-জনক।

(৬) ইহার কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে বা অকর্মণ্য হইয়া গেলে কলিকাতা প্রভৃতি বড় সহর ছাড়া উহা সারান বা বদলান সম্ভব নহে। সুতরাং গ্রামের বা ছোট সহরের কৃষকেরা ইহা চালাইতে গেলে বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা।

(৭) কাদা জমিতে কলের লাঙ্গল চালান যায় না। ধান প্রভৃতির চারা রোপণ করিতে হইলে রোপণের আগে ক্ষেত্রের মাটী কাদায় পরিণত করিতে হয়; তাহা না করিলে চারাগুলি মরিয়া যাইবার ভয় অধিক; এইরূপ কাদা জমির পক্ষে কলের লাঙ্গল মোটেই উপযুক্ত নহে। এই জন্যও বাংলা দেশে কলের লাঙ্গল চালান সহজ ও সুবিধাজনক নয়।

মই (১৯ নং চিত্র) ও চৌকী

লাঙ্গল দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণের পর জমিতে বড় বড় ঢেলা থাকে। এই ঢেলা ভাঙ্গিবার জন্য ও জমি সমতল করিবার জন্য মই ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সময় ঢেলা খুব বড় হইলে একটি কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন করিতে হয়, ইহার নাম চৌকী। মই বা চৌকীর উপর বলদের চালক দাঁড়াইয়া থাকে।

মুগুর
(১৭ নং চিত্র)

মুগুরের দ্বারা জমির বড় বড় ঢেলা ভাঙ্গা যায়। ইহা হাতে লইয়া পিটাইয়া ঢেলা ভাঙ্গিতে হয়।

বিঁদে

জোয়ালে গরু জুড়িয়া লাঙ্গলের ন্যায় হাতল ধরিয়া ইহা চালাইতে হয়। জোয়ালের দুই মাথা হইতে দুইটি দড়ি বিঁদের দুই পাশে বাঁধা থাকে। ইহা চালাইয়া মাটী আলোড়িত ও চূর্ণ করা যায়। বিঁদের দাঁতগুলির সাহায্যে মাটীর মধ্যে গাছ-পালার যে সকল শিকড় থাকে, তাহা আট্‌কাইয়া যায়।

বাখার
(১নং চিত্র)

ঘন ঘাসে আবৃত জমির উপর দিয়া লাঙ্গল চালাইতে খুবই অসুবিধা হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশে বাখার নামক এক যন্ত্র চালাইয়া এইরূপ ঘন জমির ঘাস কাটিয়া লওয়া হয়। ইহা দ্বারা ঘাসও কাটিয়া যায় ও মাটি ও ভাসা ভাসা ভাবে আল্‌গা করিয়া দেয়। জমি দুই তিনবার চাষ ও মই দেওয়ার পরে এই যন্ত্রের সাহায্যে জমির ঢেলা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া জমি উত্তমরূপে প্রস্তুত করা যায়।

ডল্‌না

ডল্‌না একটি কাষ্ঠখণ্ড; সাধারণতঃ ইহা ৫ হাত লম্বা, আধ হাত চওড়া ও ৮।১০ আঙ্গুল পুরু হয়। ডল্‌নার দ্বারা দুইটি কার্য্য করা যায়; (১) আল্‌গা জমি শক্ত করা, (২) জমির ঢেলাগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া ও জমি সমতল করা। ডল্‌নার দুই প্রান্তে দুইটি দড়ি দিয়া বলদ বাঁধিয়া দিতে হয়। চালক ডল্‌নার উপরে দাঁড়াইয়া বলদ চালায়

আচড়া
(১৫ নং চিত্র)

এই যন্ত্র বিঁদের মত। তবে উহা ওজনে বিঁদে অপেক্ষা হালকা ও ইহার দাঁতগুলি ঘন ঘন। বীজ

অঙ্কুরিত হইবার পর চারা গাছগুলি একটু বড় হইলে জমির মাটী আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। বৃষ্টির পর মাটী শক্ত হইয়া গেলেও ঐ শক্ত মাটী আলগা করিয়া দিবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই কার্য্যের জন্য আচড়া ব্যবহৃত হয়। আচড়াও বলদের সাহায্যে চালাইতে হয়। উহা চালাইবার সময় উহার দাঁতের সঙ্গে কতক কতক চারা গাছ উপড়াইয়া যায়। ইহাতে শস্য পাতলা করিয়া দেওয়ার কার্য্যও সাধিত হয়।

খুরপী, (২ নং চিত্র) নিড়ানী, কাস্তে, (৩ নং চিত্র) হাত-কোদাল প্রভৃতি

এই সকল কৃষি-যন্ত্র আকারে খুব ক্ষুদ্র। ইহারা সকলেই হস্ত-চালিত। ইহাদের সাহায্যে জমি আল্‌গা করিয়া দেওয়া হয় ও জমি হইতে আগাছা বাছিয়া দেওয়া যায়। কাস্তে দ্বারা শস্য কাটাও হয়।

এখন কতকগুলি উপযোগী বিলাতী যন্ত্রের কথা বলা হইতেছে।

স্ক্রেপার (Scraper)

(১৮ নং চিত্র)

মই চৌকী ও ডলনার দ্বারা জমি সমতল করা যায় বটে কিন্তু এই সকল যন্ত্র বেশী দূর হইতে মাটী টানিয়া আনিয়া জমির নিম্ন স্থান ভরাট করিবার পক্ষে তত উপযোগী নয়। স্ক্রেপার নামক এক প্রকার বিলাতী যন্ত্রের সাহায্যে এই কার্য্য উত্তমরূপে সাধিত হয়। এই যন্ত্র এক জনে এক জোড়া বলদের সাহায্যে চালাইতে পারে।

ইহা ছাড়া কোদাল জাতীয় বিলাতী সভেল ও স্পেড নামক দুই-প্রকার কৃষি যন্ত্র (১৪ নং ও ১৬ নং চিত্র) জমির মাটী সমান করিবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ডিস্ক হ্যারো (Disc harrow)

(১৩ নং চিত্র)

এই যন্ত্রের দ্বারা জমির ঢেলা মই, চৌকী ও ডলনা অপেক্ষা সুচারুরূপে ভাঙ্গা যায়।

গ্রাবার (Grubber)

এই যন্ত্রের সাহায্যে জমি উত্তমরূপে ভাঙ্গিয়া লওয়া যায় এবং সাব সয়েল লাঙ্গলের ন্যায় ইহা দ্বারা জমি গভীর ভাবে চাষ করা যায়।

বিদেশী বপন-যন্ত্র (Seed Drill)

এই যন্ত্রের সাহায্যে বীজগুলি সমান্তরাল ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একটি হইতে আর একটি সমান দূরে এবং সমান গভীরতায় পতিত হয়। সুতরাং এইরূপ ভাবে রোপিত বীজ হইতে উৎপন্ন শস্যের তদ্বির করা সহজসাধ্য হয়।

হো

(৬ নং চিত্র)

শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উৎপাদিত শস্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান উস্কাইবার ও নিড়াইবার জন্য এই যন্ত্র খুবই কার্য্যকরী।

ভারতীয় দর্শন ও দার্শনিক

বেদ ও উপনিষদের যুগ

১২৯৫ পৃষ্ঠার পর

আর এক দিন রাজা জনক বসিয়া আছেন, এমন সময় যাজ্ঞবল্ক্য গিয়া সেখানে উপস্থিত। পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারে যাজ্ঞবল্ক্যের যে জয়ের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা বোধ হয় তার পরে। কারণ, যাজ্ঞবল্ক্যকে দেখিয়াই রাজা জনক হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি ঋষি, এবার কি মনে করিয়া আসিয়াছেন, আরও কিছু গরু লইতে, না, আর কোন সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা করিতে ?" আগে যে তর্ক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তার ফলে যাজ্ঞবল্ক্যও এক হাজার গরু লইয়া গিয়াছেন। এখানে বোধ হয়, সে বিষয়েরই ইঙ্গিত করা হইতেছে। বুদ্ধিমান্ যাজ্ঞবল্ক্যও অত্যন্ত সপ্রতিভ-ভাবে জনকের প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন, "আমি ত দুই-ই চাই, সম্রাট !

তার পর উভয়ের মধ্যে অনেক শাস্ত্র-আলোচনা হইল। ব্রহ্ম কি, তাহা লইয়াই প্রধানতঃ বিচার হইল। যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ?' রাজা অন্যান্য ঋষিদের নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা কহিলেন। 'এক ঋষি আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, বাক্যই ব্রহ্ম।" যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "ইহা ঠিক; কিন্তু বাক্যের প্রতিষ্ঠা কোথায়, তাহা কি আপনি জানিয়াছেন ?" জনক কহিলেন, "না, তাহা ত আমাকে কেহ বলেন নাই।" তখন যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন. "তাহা হইলে ত আপনি সত্যের এক-চতুর্থাংশ মাত্র জানিয়াছেন।" যাজ্ঞবল্ক্য আরও কহিলেন, "বাক্যের প্রতিষ্ঠা আকাশ; আকাশেই শব্দ উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই উহা বিচরণ করে। আর বাক্যের দ্বারাই আমরা শত্রু-মিত্র বুঝিতে পারি, বাক্যের দ্বারাই বেদ জানিতে পারি এবং বাক্যের সাহায্যেই সমস্ত বিদ্যা অর্জ্জন করি।"

যাজ্ঞবল্ক্য এই বিষয়ে একটি ছোটখাটো বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বলিবার শক্তি অসাধারণ ছিল। জনক তাঁহার উক্তি শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, "ঋষি, আমি আপনাকে হাতীর মত বড় বড় ষাঁড় এবং এক হাজার গাভী দান করিব, আপনি আমায় উপদেশ করুন।" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "সম্রাট, আমার বাবা বলিতেন যে, শিষ্যকে উপদেশ দ্বারা তৃপ্ত না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করা উচিত নয়; আমি বাবার মত অগ্রাহ্য করিতে পারি না। সুতরাং আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আমি কিছুই গ্রহণ করিব না। আর কেহ কি আপনাকে কোন উপদেশ দিয়াছেন এবং আপনার আর কোন জিজ্ঞাস্য আছে কি ?"

রাজা জনক তখন একে একে অন্যান্য ঋষিদের নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সমস্তই কহিলেন। কেহ বলিয়াছেন, প্রাণই ব্রহ্ম; আবার, কাহারও

মতে, শ্রোত্র ব্রহ্ম ; কাহারও মতে, চক্ষু ; কাহারও মতে, মন ; আর কাহারও মতে হৃদয়। এই সমস্ত শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ইঁহারা সকলেই যথার্থ কথাই বলিয়াছেন ; কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে আরও জানিবার আছে।"

এই কথা শুনিয়া সম্রাট আসন হইতে উঠিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রণাম করিলেন এবং কহিলেন, "আমাকে আপনি শিষ্যের মত উপদেশ দান করুন।" যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "আপনি অনেক শিখিয়াছেন, কিন্তু আরও শিখিবার আছে। মৃত্যুর পর আপনি কোথায় যাইবেন, জানেন ?" রাজা কহিলেন, না ; আপনি আমায় উপদেশ দিন্।" যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ দিলেন, কিন্তু তাহা শিশুবোধ্য নহে। সুতরাং আমরা উহার আলোচনা এখানে করিব না।

আর এক দিন যাজ্ঞবল্ক্য জনকের সভায় যাওয়ার সময় মনে মনে স্থির করিয়া গিয়াছিলেন, আজ আর কোন তর্কে লিপ্ত হইব না, শুধু দেখা করিয়াই চলিয়া আসিব। কিন্তু তাঁহাকে পাইয়া জনক সহজে ছাড়িয়া দিলেন না ; নানারূপ দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনেক আগে একবার রাজা জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে 'অগ্নিহোত্র' লইয়া আলোচনা হয় ; তখন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সম্রাটের নিকট ঐ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য শিক্ষা করেন এবং তার জন্য সম্রাটকে বর দিতে চাহেন। সম্রাট্ জনক তখন এই বর প্রার্থনা করেন যে, যখনই যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে তাঁর দেখা হইবে, তখনই তিনি তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে পারিবেন। এই কারণে একবার যখন যাজ্ঞবল্ক্য জনকের সভায় গেলেন, তখন তিনি নিজে যদিও কিছুই বলিতে চাহেন নাই তথাপি রাজা জনকই আগে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন ; অতঃপর পূর্ব্বে প্রদত্ত বর অনুসারে ঋষির আর উত্তর না দিয়া উপায় ছিল না। বাধ্য হইয়া তিনি আলোচনায় লিপ্ত হইয়া পড়িলেন।

এবারকার আলোচনায় বিষয় হইল, পুরুষ অর্থাৎ মানুষ যে চলাফেরা ইত্যাদি করে, তাহা কোন্ জ্যোতির সাহায্যে। যাজ্ঞবল্ক্য সহজেই উত্তর দিলেন, সূর্য্যের সাহায্যে। সূর্য্যের আলোকের সাহায্যেই মানুষ নানাস্থানে গমনাগমন করে, নানাপ্রকার কাজকর্ম্ম করে, সুতরাং সূর্য্যালোকই তার গতি-বিধির নিয়ামক। জনক কহিলেন, "তা ঠিক, কিন্তু যখন সূর্য্য অস্ত যায়, তখন ?"

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "সূর্য্য অস্ত গেলে চন্দ্র মানুষকে চলাফেরার পথ দেখায়।"

জনক কহিলেন, "চন্দ্রও অস্ত যায়, কিংবা উদিত হয় না, তখন ?

ঋষি কহিলেন, "চন্দ্র কিংবা সূর্য্য কাহারও আলোক যখন মানুষ পায় না, তখন সে আগুনের সাহায্যে কাজ করে।"

রাজা কহিলেন, ঠিক ; কিন্তু এমনও ত হইতে পারে যে, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি—কোন আলোকেরই সাহায্য পাওয়া যায় না ; তখন মানুষের উপায় কি ?"

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "সে অবস্থায় মানুষ বাক্যের সাহায্যে পথ-ঘাট চিনিয়া লয় ; কে কোথায় আছে, কোন্ দিকে পথ, ইত্যাদি বিষয় অন্ধকারে আমরা ডাকাডাকি করিয়াই জানিয়া লই। সুতরাং সব আলোক যখন অন্তর্হিত হয়, বাক্য তখন মানুষের পথপ্রদর্শক।"

সম্রাট আবার কহিলেন, "সমস্ত আলোক যখন তিরোহিত হয়, বাক্য যখন শুব্ধ হইয়া যায়, তখন মানুষ চলে কি করিয়া ? কোন্ জ্যোতির সাহায্যে সে তখন কাজ করে ?"

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর হইল, "এ অবস্থায় আত্মাই মানুষের পথ-প্রদর্শক। আত্মা কি ? যে বিজ্ঞানময় অন্তর্জ্যোতি পুরুষ ইহলোক ও পরলোক বিচরণ করে, তাহাই আত্মা। এই আত্মার নিজের জ্যোতি আছে। যেখানে রথ নাই কিংবা পথ নাই, সেখানেও আত্মার গতি আছে। এই লোক হইতে পরলোকে এবং এক দেহ হইতে আর এক দেহে গমন করিবার শক্তি আত্মার আছে। এইরূপ গমনাগমনে আত্মা আর কোন জ্যোতির অপেক্ষা করে না।"

অতঃপর আত্মার গতি, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য অনেক সূক্ষ্ম উপদেশ দিলেন। সম্রাট ইহাতে অত্যন্ত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া বার বার তাঁহাকে হাজার হাজার টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুতি করিলেন। সে দিন ঋষি ও সম্রাটের আলাপন এই ভাবেই সমাপ্ত হইল।

সম্রাট জনকের উপদেষ্টা মহাজ্ঞানী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিলেন—কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। ইঁহাদের মধ্যে কাত্যায়নী সাধারণ স্ত্রীলোকের মত ছিলেন কিন্তু মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবিদ্যায় অনুরাগিণী ছিলেন। প্রাচীন-কালে বৃদ্ধ বয়সে ব্রাহ্মণেরা এবং অনেক সময়ে

ক্ষত্রিয়েরাও সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইতেন। এই নিয়ম অনুসারে ঋষি যাজ্ঞবাল্ক্যেরও যখন বনবাসী হওয়ার শাস্ত্র-সম্মত সময় উপস্থিত হইল, তখন তিনি তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি এখন বনে যাইব; কিন্তু যাওয়ার আগে কাত্যায়নীর সঙ্গে তোমার একটা ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া দিয়া যাইতে চাই।"

এইখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিত্তের অভাব ছিল না। এক জনক রাজার বাড়ী হইতেই তিনি হাজার হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তা ছাড়া অন্য রাজারাও তাঁকে কিছু না কিছু দিয়া থাকিবেন, ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। সুতরাং তিনি একজন ধনী গৃহস্থই ছিলেন। কিন্তু তথাপি শাস্ত্রমত তাঁহাকে বার্দ্ধক্যে বনে যাইতেই হইবে। তিনি চলিয়া গেলে পাছে দুই সপত্নী এই বিত্ত লইয়া কলহ করে, এই জন্য তিনি উহা উভয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র-কন্যা ছিল বলিয়া জানা যায় না। সেই জন্য তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর স্ত্রীরা।

সম্পত্তি বিভাগের কথা শুনিয়া ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পক্ষে এই সমস্ত পৃথিবী যদি ধনপূর্ণা হয়, তাহা হইলে তাহাতে কি আমি অ-মৃতা হইতে পারিব?"

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "না, না; ধনী লোকে যেরূপ জীবন যাপন করে, তোমারও তাহাই হইবে; বিত্ত দ্বারা অমরত্বের আশা নাই।"

তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন, "যাহা দ্বারা আমি মৃত্যুকে জয় করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? অমরত্ব লাভের যে বিদ্যা আপনি জানেন, তাহাই আমাকে দান করুন।"

এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "মৈত্রেয়ী, এই জন্যই ত তুমি আমার এত প্রিয়! তবে শোন, সেই বিদ্যাই আমি তোমাকে কহিতেছি, মন দিয়া শোন।

"পতি, পত্নী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি যে মানুষের প্রিয় হয়, তাহা সেই সেই দ্রব্যের জন্য নয়; আত্মার জন্যই মানুষ পতি, পত্নী ও পুত্রকে ভালবাসে। সুতরাং আত্মাকেই দর্শন করিতে চেষ্টা করা উচিত, আত্মার কথাই শ্রবণ করা উচিত, আত্মাকেই চিন্তা করা উচিত এবং আত্মাকেই ধ্যান করা উচিত। আত্মা হইতেই সমস্ত জিনিষের উদ্ভব হইয়াছে। দুন্দুভিতে আঘাত করিলে শব্দ হয়, কিন্তু বাহির হইতে সেই শব্দ ধরা যায় না, দুন্দুভি ধরিলেই শব্দও ধৃত হয়। শঙ্খ ফুঁকিলে যে শব্দ হয় তাহাও তেমনি বাহির হইতে বন্ধ করা যায় না, শঙ্খটি ধরিয়া ফেলিলেই শব্দও থামিয়া যায়। এই খানে দেখা যায়, মূল গ্রহণ করিলে মূল হইতে যাহা নির্গত হয়, তাহাও গৃহীত হয়; শব্দের মূল গ্রহণ করিলে শব্দও গৃহীত হয়। সেই প্রকার সকলের মূল আত্মাকে জানিলে সব কিছুই জানা হয়।

"আর্দ্র কাষ্ঠে আগুন দিলে যেমন ধূম নির্গত হয়, তেমনি এই মহান্ আত্মা হইতেই সমস্তই নির্গত হইয়াছে। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ' ইতিহাস, পুরাণ—সমস্তই সেই আত্মার নিঃশ্বাস মাত্র।

"এক দিকে এই সমস্ত জগৎ যেমন আত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অপর দিকে আবার সমস্তই আত্মাতেই বিলীন হয়। সমস্ত নদীর যেমন একমাত্র গন্তব্য স্থান সমুদ্র, সমস্ত স্পর্শের একমাত্র আশ্রয় যেমন ত্বক, তেমনিই আত্মাই সমস্তের একমাত্র আশ্রয়। একখণ্ড সৈন্ধব লবণের যেমন সর্ব্বত্রই লবণাস্বাদ, ভিতরে ও বাহিরে কোন প্রভেদ নাই, তেমনই এই আত্মাও সমস্ত বিশ্বের সর্ব্বত্রই রহিয়াছে, ভিতরে ও বাহিরে কোন প্রভেদ নাই। একই আত্মা আমাতে, তোমাতে ও অন্যেতে প্রকাশ পাইতেছে; মৃত্যুর পর আর আমি-তুমি প্রভেদ থাকিবে না।"

এই কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী কহিলেন, "অপানি যে উপদেশ করিতেছেন, তাহা ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "কথাটা শক্ত বটে, কিন্তু না বুঝিবার ত কিছু নাই। যত দিন মানুষের দ্বৈত-বোধ থাকে, তত দিনই আমি-তুমি ভেদ করে; এক জন দেখে আর এক জনকে, শোনে আর এক জনের কথা, ইত্যাদি। কিন্তু যখনই মানুষ বুঝিতে পারে যে, এই সমস্তই আত্মময়, তখন আবার কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে জানিবে,—তখন যে আর কোন প্রভেদই থাকিবে না! মৈত্রেয়ী! অ-মৃতত্ব লাভের এই জ্ঞানই পন্থা!"

অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য বনবাসে চলিয়া গেলেন।

স্বর্গজয়ের বিড়ম্বনা

[**স্বর্গজয়ের বিড়ম্বনা** (The Wicked Prince) গল্পটি হেন্‌স্ এণ্ডারসনের পরীর গল্পের অনুবাদ। এখানে এণ্ডারসনের পরিচয় দিতেছি। এণ্ডারসন্ ছিলেন মুচির ছেলে। মা ছিল তাঁর ধোপানী। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল ডেনমার্কের ওডেন্স (Odense) নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। হেনসের বয়স যখন মাত্র এগার বৎসর, সে সময়ে তাঁহার বাবার মৃত্যু হয়। বিধবা মাতা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সাহায্যে ছেলের ও নিজের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করেন। এণ্ডারসেনের মা লেখাপড়া জানিতেন না। তারপর সেকালের লোকের মত নানাপ্রকার আজগুবি গল্প-গুজব ও ভূত-প্রেত বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁর অনেক কুসংস্কারও ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর মনের জোর ছিল খুব বেশী। তিনি ছেলের কাছে দৈত্য-দানা, ডাকিনী ও ভূত-প্রেতের কাহিনী ও নানা ছড়া বলিয়া যাইতেন। হেন্‌স্ অসীম আগ্রহের সহিত তাহা শুনিতেন।

হেন্‌স্ এণ্ডারসেন্

এণ্ডারসেন্‌কে স্কুলে পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু স্কুলের পাঠ্য বইয়ের দিকে তাঁহার বড় একটা মন ছিল না। খেলা-ঘরের রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়া, কবিতা ও ছড়া রচনা করিয়া, গল্প বলিয়া তাঁহার দিন কাটিত। হেন্‌সের গল্প বলিবার ক্ষমতা এমন অসাধারণ ছিল যে, পথের ধারের একটি ফুল দেখিয়াও তিনি ছোটদের কাছে ফুলপরীর গল্প মুখে মুখে তৈয়ারী করিয়া বলিয়া যাইতেন। যত রাজ্যের রাজপুত্র ও রাজকন্যার কথা, যত ছিল ভূত প্রেত, দৈত্য-দানা, সকলের কাহিনীই তাঁহার মাথার ভিতর কে যেন আসিয়া যোগাইয়া দিত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হেনসের এই গল্প শুনিতে শুনিতে বিভোর হইয়া যাইত। তারপর—তারপর—রাজপুত্রের কি হইল? এমনি সব কৌতুকজনক প্রশ্নে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। ইহাতে হেন্‌সের খুব আনন্দ হইত। হেন্‌স্ বেচারার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ওডেন্সের লোকেরা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল। তাই ত, বিধবার ছেলেটা একেবারে বোকা হইল!

স্কুলে লেখাপড়া কিছুই হইল না। অভিনেতা হইবার-ইচ্ছা এবং আগ্রহও ছিল খুব, কিন্তু তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া নাটকের দলের লোকেরাও কেহ লইল না। স্কুলের সহপাঠীরা তাঁহাকে নেহাৎ বোকা মনে করিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, শিক্ষক মহাশয়েরা তাঁহার গল্প বলার জন্য ও ছড়া আওড়াইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাঁচ বছর স্কুলে যাওয়ার পর এণ্ডারসেন্ স্কুলের সীমা ছাড়িয়া সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

নানারূপ বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও তাঁহার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ হ্রাস পায় নাই। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হেনসের প্রথম কবিতার বই "The Ghost at Palnatoke's Grave, and other Poems" প্রকাশিত হইল। তারপর একে একে আরও অনেক কবিতার বই লিখিলেন, গল্পের বই লিখিলেন, উপন্যাস লিখিলেন, ভ্রমণ-কাহিনী ও নাটক লিখিলেন কিন্তু দেশের লোকের কাছে কোন কিছুরই আদর হইল না।

একদিন তাঁহার যশের সোণার দুয়ার খুলিয়া গেল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হেন্‌সের প্রথম বই পরীর গল্প (Andersen's First book of fairy Tales) যেমন বাহির হইল, অমনি চারিদিকে তাঁহার খ্যাতি প্রচারিত হইল। লোকে মুখে মুখে "The steadfast Tin Soldier." "The Storks" প্রভৃতি যে সকল ছোটদের গল্প শুনিয়াছে, আজ সেইগুলি ঠাকুরমা ও দিদিমার মুখের ভাষাটি কাড়িয়া লইয়া যখন ছাপার অক্ষরে বাহির হইল, তখন ছোটদের মনোরাজ্যে সত্যসত্যই অজানা দেশের পরীরা যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আসিয়া দেখা দিল। এণ্ডারসেনের নাম ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। শুধু কি তাই? একদিন এই 'মূর্খ' ও 'খেয়ালি' লোকটিকে যাঁহারা ঘৃণা করিতেন, তাঁহারাও তাঁহার প্রতিভার আদর করিলেন। এণ্ডারসেন্‌ও তাঁহার প্রতিভার ও শক্তির মূল সূত্রটুকু খুঁজিয়া পাইয়া তাহা ধরিয়াই চলিতে লাগিলেন। বুঝিতে পারিলেন, ছোটদের গল্প বলাই হইতেছে তাঁহার জন্মগত অধিকার।

পৃথিবীর সব দেশে তাঁহার নাম ও খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। এণ্ডারসেন্ নানা দেশে বেড়াইতে লাগিলেন, নানা দেশের রূপকথা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশিতে লাগিলেন, দিন দিনই তাঁহার পাঠকের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। একদিন যে সকল বড় লোক তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেও লজ্জা বোধ করিতেন, আজ তাঁহারাই যাচিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে লাগিলেন। মিসেস্ ব্রাউনিং (Mrs. Browuing) ইংরাজদের মধ্যে একজন বড় কবি; তিনি এণ্ডারসনের নামে কবিতা লিখিলেন; ইহাতে এণ্ডারসেন্ অত্যন্ত গৌরব মনে করিয়াছিলেন।

হেন্‌স্ যখন পথ দিয়া যাইতেন, তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিত, "ঐ দেখ হেন্‌স্ এণ্ডারসেন্ যাচ্ছেন! (There goes the great Hans Andersen")

একবার একটা খবরের কাগজ তাঁহার বইয়ের সম্বন্ধে খুব অপ্রিয় সমালোচনা করিয়াছিল। তাহাতে তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। তাঁহার এক বন্ধু বলিলেন "হেন্‌স্! সারা ইউরোপ-যোড়া তোমার নাম-যশঃ—দেশের একটা ছোট কাগজে তোমার বিরুদ্ধে কি লিখলো বা না লিখলো তাতে তোমার দুঃখিত হবার কি আছে?"

হেন্‌সের দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন, ভাই, বিদেশের লোকেরা আমার নিন্দা করিলে দোষের হয় না, কিন্তু আমার আপনার দেশের লোকেরা যে আমার অপযশ করিল, তাহাতেই আমার প্রাণে বেদনা লাগিয়াছে। তাঁহার মনে এই বলিয়া দুঃখ হইয়াছিল যে দেশের লোকেরা তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগেও যেমন আদর করে নাই, শেষ জীবনে যখন ইউরোপের সব দেশের লোকের কাছে তাঁহার প্রতিপত্তি হইল—তখনও কি না সেই পূর্ব্বেরই মত অনাদর!

হেন্‌সের মনটি ছিল শিশুর মত সরল, কোমল ও ভাবপ্রবণ। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে বলিয়াছিলেন, 'কি সুন্দর এ পৃথিবী! আর আমি কেমন সুখী! How beautiful the world is,—how happy I am.) ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট হেন্‌স্ এণ্ডারসেনের মৃত্যু হইয়াছে।

পৃথিবীর শিশুদের কাছে কোন দিন এণ্ডারসেনের নাম পুরাতন হইবে না। তিনি সারা জীবন গল্প বলিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া গিয়াছেন।]

স্বর্গজয়ের বিড়ম্বনা

প্রায় দুশো বছর আগে কোনও এক দেশের রাজা ছিলেন ভয়ানক লোভী। তাঁর বেশ বড় রাজ্যই ছিলো কিন্তু তাতে তাঁর মন উঠতো না। তিনি চাইতেন যে, তিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হবেন। সেই রাজা তাঁর সব সৈন্য ও যুদ্ধের জন্য তীর-ধনুক, রসদ প্রভৃতি নিয়ে প্রতি বছরই দেশ জয় করতে বেরোতেন। রাজা যেখানে যেতেন, সেইখানেই তাঁর সৈন্যেরা সব কিছু ধ্বংস করতো, তাদের নিষ্ঠুর হাত থেকে কিছুই রেহাই পেতো না। যে দেশ জয় করতে যেতেন, সেই দেশের শস্যশ্যামল মাঠের উপর দিয়ে সেই রাজা তাঁর সৈন্যদের চালিয়ে নিয়ে যেতেন, আর তাদের পায়ের চাপে সব শস্য নষ্ট হয়ে যেতো। তার ফলে দেশের লোকদের বহুদিন ধরে অনাহারে থাকতে

গরীব লোকদের কুঁড়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন

হতো। সেই রাজা যে দেশ জয় করতেন, সেই দেশের কেবল যে ফসল নষ্ট করতেন, তা নয়। দেশের উপর দিয়ে যাবার সময় সব গরীব লোকদের কুঁড়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন। এই সব কুঁড়ে ঘরের আগুন হু হু করে' আকাশ পর্য্যন্ত উঠতো আর আশ পাশের ফলগাছের ফলগুলি পর্য্যন্ত আগুনের তাতে নষ্ট হতো। ক্ষিদে পেলে কেউ যে শুধু ফল খেয়ে থাকবে, তারও কোনো উপায় থাকতো না। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কোলে ক'রে আগুন-লাগা বাড়ী থেকে সব মেয়েপুরুষ গাছতলায়,আশ্রয় নিতো। বর্ষার বৃষ্টির জলে ও শীতকালের কন্‌কনে ঠাণ্ডায়, অনাহারে তাদের যে কি কষ্ট, তা তোমরা না দেখলে কল্পনাও করতে পারবে না। যুদ্ধ-জয়ের উপাখ্যান আমরা খুব আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে পড়ে' থাকি, কিন্তু যে দেশ জয় করা হয়, সে দেশের উপর দিয়ে যে কি রকম বিপদ যায়, তা বলে' বোঝানো খুব কঠিন।

রাজামশাই তাঁর সৈন্যদের নিয়ে যাবার সময় অনেক বার ঐ সব কারুণ ও কষ্টদায়ক দৃশ্য দেখেছেন, কিন্তু অন্য সকলের কাছে সেই সব দৃশ্য ভীষণ হ'লেও রাজামশাইয়ের কাছে সে সব খুব আনন্দদায়ক ছিলো। রাজা দেখতেন যে, তাঁর চোখের সামনে দেশের সব লোক ঘরছাড়া হ'য়ে শীতে বা বর্ষায় না খেতে পেয়ে কষ্ট পাচ্ছে ও মারা যাচ্ছে, তবু তিনি মনে করতেন যে, তিনি ঠিকই করছেন। রাজার পরাক্রম ও সৈন্য-বল ছিলো অনেক, কিন্তু তাঁর যুদ্ধ-জয়ের ফল হতো এই রকম ধ্বংস ও দারুণ দুর্ভিক্ষ।

দিনের পর দিন যায়, রাজার ক্ষমতা বেড়েই চল্‌লো। কারণ, এক দেশের পর এক দেশ তাঁর অধীনে আসতে লাগলো। তাঁর নাম শুনলে দেশের সব লোকে ভয় পেতো, এমন কি, যে সব ডানপিটে ছেলেরা তাদের মা-বাবার কথা শুনতো না, তাদেরকে পর্য্যন্ত তাদের মা-বাবারা ঐ রাজার নাম বলে' ভয় দেখিয়ে শান্ত ক'রে রাখতেন।

রাজা যে-সব দেশ জয় করতেন সে-সব দেশ থেকে বহু ধন-সম্পত্তি সঙ্গে করে' নিয়ে আসতেন। এতে তাঁর রাজধানীর সম্পদ্‌ ক্রমশঃই বেড়ে উঠলো। পৃথিবীতে অতো সমৃদ্ধিশালী রাজধানী তখন আর কোথাও আর ছিল না। সেই রাজা তাঁর অধীন সব দেশ থেকে অজস্র টাকা-কড়ি পেতে লাগলেন, আর তাই দিয়ে রাজধানীতে অনেক ভালো ভালো মন্দির, রাস্তা, বাগান, প্রাসাদ প্রভৃতি তৈরী করাতে লাগলেন। সেই রাজধানীর লোকজন দেখতো যে, তাদের দেশের সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে আর তাই দেখে' তারা সবাই বলাবলি করতো,—ওঃ! খুব শক্তিশালী রাজা তো! তারা যখন ঐ ভাবে

রাজামশাইয়ের ক্ষমতার প্রশংসা করতো, তখন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো না যে, অন্য সব অধীন দেশের লোকদের কি রকম দুর্দ্দশার বিনিময়ে তাদের দেশ ঐ রকম সুন্দর করে' সাজানো হয়েছে।

সেই রাজাও, তাঁর প্রচুর অর্থ, সোণা, রূপা ও হীরে-মণি প্রভৃতি দেখে ভাবতেন,— ওঃ, আমার কি রকম পরাক্রম! কিন্তু আমার আরও চাই, আমার ঐশ্বর্য্য আরও বাড়াতে হবে; পৃথিবীর সকলের চেয়ে আমি ধনী হবো। এই ভেবে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সকল রাজাকে তিনি হারিয়ে দিলেন, আর তাদের সমস্ত ধনরত্ন নিজের রাজ্যে বয়ে আনালেন। অধীন দেশের রাজারা প্রতি বছরেই তাঁর কাছে উপহার, খাজনা প্রভৃতি নিয়ে আসতেন। রাজামশাই সোণার উঁচু সিংহাসনে বসে' থাকতেন, আর সেই সব পরাধীন রাজারা হাঁটু গেড়ে তাঁকে অভিনন্দন করতেন।

রাজামশাইয়ের একদিন খুব সখ হ'লো যে, দেশে দেশে, ঘরে ঘরে তাঁর নিজের পাথরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাবেন। তিনি যেই হুকুম দিলেন, আর অজস্র শিল্পী তাঁর মূর্ত্তি গড়তে আরম্ভ করলে। এক মাসের মধ্যেই সাদা পাথরের হাজার হাজার মূর্ত্তি তৈরী হ'য়ে গেলো। রাস্তার ধারে বাগানের মধ্যে, ও সব বড় বড় প্রাসাদের মধ্যে তাঁর মূর্ত্তি বসান হ'তে লাগলো একদিন সেই রাজা তাঁর কয়েকটি পাথরেরমূর্ত্তি একটি বড় গাড়ীতে বোঝাই করে নিয়ে বেরুলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো যে, তিনি ঐ মূর্ত্তিগুলি দেশের সব দেবমন্দিরের মধ্যে বসাবেন। মন্দিরে গিয়ে রাজামশাই পুরোহিতদের বললেন, আমি চাই যে, সব মন্দিরেই আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। আর আমি এও চাই যে, ঠাকুরের পূজার সঙ্গে সঙ্গে আমারও যেনো পূজা হয়।

পুরোহিতেরা সকলে জোড়হাত করে' বললেন,— মহারাজ! আমরা স্বীকার করি যে, আপনার ক্ষমতা অসীম। কিন্তু আপনার চেয়ে স্বর্গের দেবতারা অনেক বেশী বলশালী। আমরা আপনার আজ্ঞা পালন করতে ভয় পাচ্ছি, কারণ, তাহলে স্বর্গের দেবতারা আমাদের শাস্তি দেবেন।

পুরোহিতদের সেই উত্তর শুনে রাজামশাই বললেন —বেশ, আমি স্বর্গের দেবতাদেরও পরাস্ত করবো। দেবতাদের জয় করবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে আপনারা বেশ ভাল কাজ করেছেন।

স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রাজামশাইয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে খুব তোড়জোড় আরম্ভ হলো। খুব অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে রাজামশাই যুদ্ধের জন্যপ্রস্তুত হ'তে লাগলেন। এরোপ্লেন তখনো আবিষ্কার হয়নি তাই তাঁর হুকুমে বহু টাকা খরচ করে' একটি প্রকাণ্ড জাহাজ তৈরী হলো। সেই জাহাজের উপর হাজার হাজার তীর-ধনুক, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র সাজানো হলো। আর ঠিক হলো, রাজামশাই তাঁর সৈন্যদল নিয়ে সেই জাহাজের মধ্যে থাকবেন। তারপর প্রায় দশ হাজার ঈগল পাখী সেই জাহাজে যোতা হলো, কারণ জাহাজটার তো ওড়া চাই!

নির্দ্দিষ্ট দিনে সৈন্যসামন্ত, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি নিয়ে, ঈগল পাখীরা সেই জাহাজটিকে নিয়ে আকাশে উড়লো। জাহাজটা ক্রমশঃ পৃথিবী থেকে দূরে যেতে লাগলো, এবং খানিক পরেই পৃথিবীর সব জিনিষ ছোট দেখাতে লাগলো। কিন্তু উড়তে উড়তে সেই জাহাজটা এত উপরে উঠলো যে, সেখান থেকে পৃথিবীর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

জাহাজটা যখন নীল আকাশে অনেক উঁচুতে উঠলো, তখন সেই অহঙ্কারী রাজা চারিপাশে দেবদূতদের চলাফেরা করতে দেখলেন। তাদের দেখেই রাজামশাই হুকুম দিলেন তীর ছুঁড়তে। হাজার হাজার ধনুক থেকে অনর্গল রাশি রাশি তীর ছোঁড়া হ'তে লাগলো কিন্তু রাজা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন যে, একটিও দেবদূতদের গায়ে লাগছে না, বরঞ্চ সেই

সব তীর কেমন করে যেন ফিরে এসে তাঁর সৈন্যদের গায়ে লাগছে আর তারা পট্‌পট্‌ মরছে। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি নিজে একটি ধনুক তুলে নিয়ে এক দেবদূতের দিকে লক্ষ্য করে' তীর ছুঁড়লেন। তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে, তীরটা দেবদূতের গায়ে লাগলো কিন্তু তবু সে মরলো না। কেবল তার গা থেকে ফোঁটা দুয়েক রক্ত সেই জাহাজের উপর পড়লো। সেই এক ফোঁটা রক্ত পড়তেই মনে হলো যে, কে যেন সেই জাহাজটার উপরে সহস্র মণ বোঝা চাপিয়ে দিলে। তার ফলে ঈগল পাখীরা আর জাহাজের ভার বইতে পারলে না। তাদের ডানা ভারের চোটে ভেঙ্গে গেলো, আর হু হু করে' জাহাজটা শূন্য থেকে মাটিতে পড়তে লাগলো।

অত উঁচু থেকে পড়তেও তো সময় লাগে? সেই সময়টুকুর মধ্যে রাজামশাইয়ের দুর্দশা কিছু কম হলো না। তাঁর মাথার উপরে বাতাস বোঁ বোঁ করে' ডাকতে লাগলো, তাঁর অনেক সৈন্য ঝড়ে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেলো, তা কেউ বলতে পারে না। আর কতকগুলো বড় বড় সমুদ্রের কাঁকড়ার মতো কি সব এক রকমের জন্তু, হুস্ হুস করে' উড়ে এসে, রাজামশাইকে ও তাঁর সৈন্যদেরকে কাম্‌ড়ে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে' দিলে।

তারপর রাজামশাইয়ের বরাত জোরেই বল, বা দেবতাদের কাছে তাঁর আরও শাস্তি তোলা ছিলো বলেই বলো, জাহাজটা ভাগ্যক্রমে পড়লো জলে। জাহাজটা যদি মাটিতে বা পাহাড়ের উপরে পড়তো, তাহলে জাহাজটা তো গুঁড়ো হয়ে যেতই, রাজা-মশাইও তাহলে গুঁড়ো হয়ে যেতেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর পৃথিবী ও স্বর্গের রাজা হওয়া বেরিয়ে যেতো। যাহোক তবু ক্ষতবিক্ষত শরীরে রাজামশাই বাড়ী ফিরে গেলেন। রাজামশাই কিন্তু কিছুতে দম্‌লেন না। তিনি ঠিক করলেন যে, যেমন করেই হোক তাঁর স্বর্গ জয় করা চাই-ই চাই। ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়ে যখন তাঁর গায়ের কাটা ঘা সেরে গেলো, তখন তিনি আবার দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্যোগ করতে লাগলেন।

এবার একটা উড়ো জাহাজের জায়গায় তৈরী হলো একশো উড়ো জাহাজ। আর সেই সব জাহাজ আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য কোটি কোটি ঈগল পাখী পোষা হলো। যুদ্ধের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত হলো প্রচুর। পৃথিবীর সব দেশ থেকে রাজার জন্য সৈন্য-সামন্ত এলো। সেই রাজা যুদ্ধের জন্য এমন বিরাট্ আয়োজন করেছিলেন যে, পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত কোনো যুদ্ধ উপলক্ষে অত সৈন্য ও অত অস্ত্র-শস্ত্র কখনো জোগাড় হওয়া সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি।

সৈন্যেরা সব জাহাজে উঠছে,—তখনও জাহাজ ছাড়তে আর খানিক দেরী রয়েছে। চারিদিকে ব্যস্ততা। যুদ্ধের বাজনা ও শাঁখ প্রভৃতি বাজছে। ঠিক এমনই সময় স্বর্গের দেবতারা এক ঝাঁক বড় বড় বিষাক্ত মশা রাজামশাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। সেই মশাগুলির এমনি বিষ যে, তাদের কামড়ে সাপের কামড়ের মতো যন্ত্রণা হয়, আর মানুষ পাগলের মতো অস্থির হ'য়ে নাচতে থাকে। মহারাজ জাহাজে উঠতে যাবেন, এমন সময় সেই মশার ঝাঁক এসে ভীষণভাবে তাঁকে আক্রমণ করলো। রাজা খাপ থেকে তলোয়ার বার করে' মশাদের মারবার জন্য এদিক ওদিক চালাতে লাগলেন। কিন্তু একটি মশাও মরলো না। ওদিকে রাজামশাইয়ের গা-হাত-পা মশার কামড়ে ভীষণ জ্বালা করতে লাগলো। তিনি মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন, তবু মশা ছাড়ে না। তখন রাজামশাই হুকুম দিলেন, তাড়াতাড়ি আমাকে একটা মশারী দিয়ে ঢেকে দাও, আর মশাদের উপর তীর ছোঁড়। তাঁর হুকুম শুনে সব সৈন্যেরা হাসতে লাগলো। তারা ভাবলে মশা মারতে আবার তীর ছুঁড়বো; কি! রাজামশাই নিশ্চয়ই পাগল হ'য়ে গেছেন। কয়েকজন তখনই রাজামশাইকে একটা মশারী এনে ঢাকা দিলে, তবু কোথা দিয়ে একটা মশা মশারীর ভিতর ঢুকে তাঁকে এমনি কামড় কামড়ালে যে, জ্বলুনির চোটে মশারী ছেড়ে তিনি পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলেন। তাঁর সৈন্য-সামন্তেরা এই কাণ্ড দেখে ভাবতে লাগলো—যেমন কর্ম্ম, তার তেমনি ফল। যাও না স্বর্গের দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। সেই সব সৈন্যদেরও ভীষণ ভয় হলো যে, ঐ রকম দু-চার ঝাঁক বিষাক্ত মশা যদি দেবতারা তাদের দিকেও পাঠিয়ে দেন ত মহা মুস্কিল হবে। সেইজন্য সৈন্যেরা সবাই বলে' বসলো যে, তারা যুদ্ধে যাবে না। তবু যদি রাজামশাই বেশী পীড়াপীড়ি করেন তো রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে। রাজামশাইও তাঁর সব সৈন্য ও দেশের লোকদের সামনে সামান্য কয়েকটি মশার কাছে লাঞ্ছনায় এমনি লজ্জিত ও অপ্রতিভ হলেন যে, ভবিষ্যতে আর কোনো দিনও তিনি স্বর্গ জয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি।

সুদখোরের শাস্তি

['সুদখোরের শাস্তি' গল্পটি গ্রীমের (Grimm's Fairy Tales, The Jew in the Bush) অনুবাদ। গ্রীমের পরীর গল্পগুলি প্রচলিত রূপকথা হইতে সংকলিত হইয়াছে। জেকব গ্রীম্ ((Jacob Grimm) এবং তাঁহার ভাই উইলিয়ম গ্রীম্ (William Grimm) পশু-পক্ষীর গল্প, জনপ্রবাদমূলক কথা, সব দেশের প্রচলিত কথা ও কাহিনীগুলির সঙ্কলন করিয়া তাঁহাদের পরীর গল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জেকব গ্রীম্ ও উইলিয়ম গ্রীম্

জার্ম্মেনীর অন্তর্গত হানাউ(Hanau)নামকস্থানে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জানুয়ারী জেকব গ্রীম্ জন্মগ্রহণ করেন। হেন্‌স্ এণ্ডারসেনের মত গ্রীম্ ভাইয়েরাও গরীব পিতামাতার সন্তান। ছেলেবেলায় ইঁহাদের পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের এক পিসী তাঁহাদের দুই ভাইকে মানুষ করিয়া তোলেন। ছোটভাই উইলিয়ম জন্মিয়াছিলেন ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। দুই ভাই এক সঙ্গে মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে (Marburg University) শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

সেকালের বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সেবিগ্‌নি (Savigny) জেকব গ্রীম্‌কে দেশের পৌরাণিক গল্প ও উপকথা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। জেকব সেবিগনির প্যারিস্থিত পাঠাগারে পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত নানারূপ গ্রন্থ ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবারপর গ্রীম্ জার্ম্মেনীর যুদ্ধ অফিসে একটি কাজ পাইয়াছিলেন। একাজ তাঁহার ভাল লাগিলনা। ঐ কাজ ছাড়িয়া তিনি জেরোম বোনাপার্টের(Jerome Bonaparte) পারিবারিক পাঠাগারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। একাজ তাঁহার খুব ভাল লাগিল। এখানে তাঁহার পড়াশুনা করিবার প্রচুর সুযোগ মিলিল। বিজয়ী নেপোলিয়ান যে সকল দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্র জার্ম্মেনী হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, সেগুলি ফিরাইয়া আনিবার জন্য রাজা তাঁহাকে প্যারিতে পাঠাইয়াছিলেন।

জেকব, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে দেশের রূপকথা ও পৌরাণিকগল্প সম্পর্কিতEddaic Songsনামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ রচনায় তাঁহার ভাই উইলিয়মও তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই পরীর গল্প বা রূপকথা-সঙ্কলিয়তা হিসাবে গ্রীম্ ভ্রাতাদের নাম প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে গ্রীম্ ভ্রাতৃদ্বয় লাইব্রেরীর কাজ ছাড়িয়া দিয়া প্রাসিয়ার (Prussia) রাজার আহ্বানে হেনোভর (Hanover) ছাড়িয়া বার্লিনে (Berlin) গেলেন এবং দুইভাই সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ লাভ করিলেন এবং বিজ্ঞান-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ইঁহাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে অত্যন্ত গভীর ভালবাসা ছিল। ইহারা দুইজনে এক বাড়ীতে এক সঙ্গে বাস করিতেন। কোথাও কাজ করিবার সময় যদি কর্ত্তৃপক্ষ এক ভাইয়ের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিত, তাহা হইলে অন্য ভাইও কাজ ছাড়িয়া দিতেন। গ্রীম্ ভ্রাতৃদ্বয় এক সঙ্গে থাকিতেন, এক সঙ্গে কাজ করিতেন, এবং এক সঙ্গেই দেশের ছেলেমেয়েদিগকে কি ভাবে কেমন করিয়া নূতন নূতন গল্প ও কাহিনী বলিয়া আনন্দ দিতে পারেন, তাহাই ভাবিতেন।

জার্ম্মেনীর দরিদ্র-কুটীরে যে সকল বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বাস করিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ইহারা সব রূপকথা সংগ্রহ করিতেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে যেসকল রূপকথা মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, গ্রীম্ ভ্রাতারা তাহাই সংগ্রহ করিতেন। এইভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লোকের কাছে কাছে যাইয়া তাঁহাদের গল্প

সংগৃহীত হইত। কোন্ গল্পটির বয়স কত, কে কবে কাহার নিকট কোন্ কাহিনীটি শুনিয়াছে, কোন্ দেশ হইতে গল্পটি আসিয়াছে, বিদেশী কোন্ গল্পের সঙ্গে তাহার মিল আছে, এইসব আলোচনা ও গবেষণা করিয়া অতি সহজ সরল ভাষায় ছেলেমেয়েদের বুঝিবার মত করিয়া তাঁহারা 'পরীর গল্পের' বই বাহির করিলেন। যেমন বই বাহির হইল, অমনি দেশের ছেলেমেয়েরা আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িল। তাহারা এক নূতন জিনিষ লাভ করিল। সমালোচকেরা বলেন, গ্রীম্ ভ্রাতারা যদি অতগুলি রূপকথা সংগ্রহ না করিয়া কেবলমাত্র "Cinderella", "Little Snow-white" এবং "Hansel and Gretel" এই গল্প কয়টিও প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের নাম অমর হইয়া থাকিত।

জেকব গ্রীম্ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তার চারিবৎসর পরে উইলিয়ম গ্রীমের মৃত্যু হয়।

আমাদের দেশের 'পঞ্চতন্ত্র', 'কথাসরিৎ-সাগরের' গল্প যেমন পৃথিবীর সব দেশে অনূদিত হইয়া নানা আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি গ্রীম ভাইদের "পরীর গল্প" এবং হেন্‌স্ এণ্ডারসেনের "পরীর গল্প"ও পৃথিবীর নানাদেশের নানাভাষায় অনূদিত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।]

সুদখোরের শাস্তি

ধর্ম্মদাস নামে কোনো এক বিশ্বাসী চাকর অনেক বছর ধরে' তার মনিবের জন্যে খুব কঠোর পরিশ্রম করে' কাজ করলো। তার মনিবটি বেজায় কৃপণ ছিলো, তাই সে তার চাকরকে কোন দিনও মাইনে দিতো না। তিন বছর কেটে গেলো, এক মাসেরও মাইনে না পাওয়াতে সেই চাকরটি ভাবলে, "আমি আর এ রকম করে' বিনা মাইনেতে কাজ করবো না।" মনে মনে এই ঠিক করে' সে তার মনিবের কাছে গিয়ে বল্‌লে,—আমি এতদিন ধ'রে আপনার সব কাজ কর্‌ছি, কিন্তু আমি আজ পর্য্যন্ত এক পয়সাও মাইনে পেলাম না। আমি আপনার উপরই বিশ্বাস করে' ভার দিচ্ছি, আপনিই ঠিক করে' আমায় আমার পাওনা মাইনের টাকা ক'টি দিয়ে দিন্। আমি এখন দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে বাড়ী যেতে চাই।

আগেই বলেছি যে, এই মনিবটি বেজায় কৃপণ। তার উপর সে বেশ জানতো যে, তার চাকরের মন খুব সরল। তাই মাত্র তিনটি টাকা বাক্স থেকে বার করে' তার চাকরের প্রতি বছরের কাজ করার মজুরি স্বরূপ এক টাকা হিসাবে, মাত্র তিন টাকা দিলে। সেই চাকরটি কখনও হাতে টাকা পায়নি, তাই মাত্র তিনটি টাকা পেয়ে সে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ভাবলে,—আমি অন্য কোথাও কাজ করলে নিশ্চয়ই আরও বেশী উপার্জ্জন করতে পারবো। যাই হোক, আমি এখন তো বেশ বড়লোক, দিনকতক এই টাকা দিয়ে পৃথিবীর নানাদেশ ঘুরে আমোদ করে' নিই, তারপর আবার কাজ করবো। এই ঠিক করে' সে একটি ছোট থলিতে টাকা ক'টি ভরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে' কথনো বা পাহাড়ের ধার দিয়ে, কখনো বা খোলা মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে চললো।

মাঠের উপর দিয়ে যেতে যেতে সে খেয়াল-মতো অনেক সব গান গাইছিলো। এমন সময় একটি দাড়িওয়ালা ছোট্ট বামন তার সামনে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—কি হে ভায়া, তুমি এতো খুসী কেনো? ধর্ম্মদাস উত্তর দিলে,—কেনোই বা আমি দুঃখিত ও বিষন্ন হ'য়ে থাকব? আমার স্বাস্থ্য ভাল, আমি অর্থের দিক দিয়ে ধনী, আমার আবার দুঃখ কিসের। সেই দাড়িওয়ালা বামনটি জিজ্ঞাসা করলে,—কত টাকা তোমার কাছে আছে?. ধর্ম্মদাস উত্তর দিলে, তিনটি টাকা। সেই বামনটি মনে মনে একটু হাসলো,—কিন্তু মুখে খুব দুঃখের ভাব ফুটিয়ে বল্‌লে—আমায় তুমি তোমার টাকা ক'টি দাও না! আমিত অতি গরীব, আজ দু-তিন দিন হ'ল আমার পেটে ভাত পড়েনি। সেই বামনের কথা শুনে ধর্ম্মদাস খুব কাতর হলো এবং সেই টাকা তিনটি তাকে দিয়ে দিলে। তখন সেই বামনটি বললে,—গরীবের প্রতি তোমার দয়া দেখে আমি খুব প্রীত হয়েছি। আমিও তোমায় কিছু প্রতিদান দেবো। তোমার তিনটি ইচ্ছা আমি পূর্ণ করবো এবং ঐ এক একটি ইচ্ছা পূর্ণ করবার দাম হবে এক টাকা। সুতরাং ভেবে বেছে নাও কি কি তুমি নেবে। ধর্ম্মদাস তার শুভ অদৃষ্টের কথা ভেবে খুব খুসী হ'য়ে উঠে বললে,—পৃথিবীতে টাকার চেয়ে এমন অনেক জিনিষ আছে—যা আমি খুব ভালবাসি। আমাকে আপনি এমন একটি তীর-ধনুক দিন্—যা দিয়ে আমি যা কিছু শিকার করবো তা

যেন মাটীতে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, আমাকে এমন একটি বেহালা দিন্—যার বাজনা শুনে সকল শ্রোতাই যেন বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নাচতে থাকে ; আর তৃতীয়তঃ, সবাইকে যেন আমি আমার মতে মত দিইয়ে রাজী করাতে পারি। সেই বামনটি বললে যে, সে সেই তিনটি প্রার্থিত জিনিষই পাবে। এই বলে' সেই বামনটি মাটিতে ছুটো টোকা দিতেই সেখানে একটা তীর-ধনুক ও বেহালা এসে হাজির হলো। বামন সেই ছুটি জিনিষ ধর্ম্মদাসকে দিয়ে সেখান থেকে চলে' গেলো।

ধর্ম্মদাস খুব আনন্দিত মনে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলো। কিছুদূর গিয়েই সে এক সুদখোর মহাজনকে

সে এক সুদখোর মহাজনকে দেখতে পেলে

দেখতে পেলে। সেই মহাজনটি হাঁ করে' মুগ্ধ হয়ে' কাছেরই একটি গাছের উপরের একটি বউ-কথা-কও পাখীর ডাক শুনছিলো। ধনুক-হাতে ধর্ম্মদাসকে আসতে দেখে সেই মহাজন তাকে অনুরোধ করলো,—তুমি যদি না মেরে শুধু আহত করে' ঐ পাখীটা আমাকে গাছ থেকে নামিয়ে দিতে পারো. তো তোমাকে আমি প্রচুর অর্থ দেবো। আমি অনেক ভালো ভালো ওষুধ জানি, সুতরাং পরে শুশ্রূষা করে' পাখীটাকে আমি সারিয়ে নেবো। ধর্ম্মদাস তার প্রস্তাবে রাজী হ'য়ে তীর দিয়ে পাখীটাকে যেই মারলে, অমনি সেটা ধুপ্ করে' গাছতলার একটি ঝোপের ভিতর পড়লো। সেই মহাজন দৌড়ে ঝোপের ভিতর ঢুকে পাখীটা কুড়িয়ে নিয়ে ভাবলে,—পাখী তো পেয়েছি ; ও লোকটাকে এখন ঠকিয়ে টাকা না দিয়ে পালাবো। এই ভেবে সেই সুদখোর মহাজন, ঝোপের যে দিকে ধর্ম্মদাস দাঁড়িয়েছিল, সেদিকে ফিরে না গিয়ে উল্টো দিক দিয়ে পালাবার পথ খুঁজে খুঁজে অল্প অল্প করে' এগোচ্ছিলো। কিন্তু মহাজন পালাবে কোথা। বামনের কাছ থেকে ধর্ম্মদাস যে সব ক্ষমতা পেয়েছিলো সে সব তো আর বড় কম নয় সে যেই দেখলে যে, সুদখোর তাকে ফাঁকি দিতে চায় অমনি সে মাটি থেকে বেহালাটা তুলে নিয়ে বাজাতে লাগলো! আর যাবে কোথায়! বাজনা শুনে সেই সুদখোরের ভয়ানক নাচ পেয়ে গেল। সে সেই কাঁটাবনের ভিতরেই তাণ্ডব নৃত্য করতে আরম্ভ করে দিলে। কাঁটাবনের ভিতর তার সে কি নাচ! নাচতে নাচতে তার সর্ব্বাঙ্গ ছড়ে' একেবারে রক্ত পড়তে লাগলো। আর তার কাপড়-জামা ফালা ফালা হ'য়ে ছিঁড়ে গেলে। সেই সুদখোরের সারা গা জ্বালা করছিলে তবু সে নাচ থামাতে পারছিলো না। সে কাকুতি মিনতি করে বললে,—ও মশাই, দয়া করে' বাজনা থামান, আমার অবস্থা দেখে' দয়া করুন। আমি আপনার কি করেছি যে, আপনি আমায় এত শাস্তি দিচ্ছেন। ধর্ম্মদাস উত্তর দিলে—তুমি সুদখোর কত লোকের ত সর্ব্বনাশ করেছো, আবার আজ আমাকে দিব্যি ফাঁকি দেবার মতলবে ছিলে, এই তোমার দোষ, আর কিছু নয়। এই বলে সে তার বাজনার জোর ক্রমশঃ বাড়াতে লাগলো, আর সেই সুদখোরও ধেই ধেই করে' লাফিয়ে লাফিয়ে, ধপ্ ধপ্ করে' মাটিতে পড়তে লাগলো। সেই সুদখোরের থলিতে ছিল একশো টাকা। কোনো এক গরীব বেচারীকে ঠকিয়ে সে ঐ টাকা চুরি করেছিলো। ধর্ম্মদাস সেই সব টাকা চেয়ে বললে,—তোমার থলির সব টাকা দেও, তবে আমি আমার বেহালা থামাচ্ছি। সুদখোর নাচতে নাচতেই কথা বলতে লাগলো। সে প্রথমে পঞ্চাশ টাকা দিতে চাইলে, তারপর ক্রমশঃ বাড়াতে লাগলো। কিন্তু যখন সুদখোর দেখলে যে, একশো টাকার কমে রফা হওয়া অসম্ভব, তখন সে প্রাণের দায়ে সব টাকা দিতে রাজী হলো। সেই টাকার থলি, বেহালা, ধনুক সব নিয়ে ধর্ম্মদাস সেখান থেকে বাড়ীর দিকে রওনা হলো।

সেই সুদখোর ছেঁড়া কাপড়ে ও রক্তমাখা দেহে কোনো রকমে ঝোপ থেকে বেরিয়ে বাড়ীর পথে যেতে

যেতে ভাবলে যে, সে যেমন করেই হোক প্রতিশোধ নেবে। তাকে নিয়ে যে তামাসা করা হয়েছে তার শোধ তুলবে। সে হায় হায় করতে করতে বললে,—আমার অত অত গুলো টাকা নিয়ে গেল। তার উপর আমার কি কঠিন শাস্তিই না হলো! এই সব নানান রকম কথা ভেবে, ও টাকার শোক সামলাতে না পেরে সে বিচারপ্রার্থী হয়ে শহরের বিচারকের কাছে গেলো। সে বিচারককে গিয়ে বললে,—এক শঠ আমাকে মেরে' ধরে' আমার বহু টাকা ডাকাতি করে' নিয়ে গেছে। এই দেখুন আমার গায়ে সব অস্ত্রের দাগ আর এখনও আমার রক্ত পড়ছে। হুজুর আমি বিচার চাই। তার কথা শুনে বিচারক দোষীকে ধরে' আনবার জন্যে পাহারাওয়ালাদের হুকুম দিলেন পাহারাওয়ালারা খানিক পরে ধর্ম্মদাসকে ধরে' নিয়ে এলো। বিচারপতির সাম্‌নে সেই সুদখোর তখন ধর্ম্মদাসকে দেখিয়ে বললে যে, সেই লোকটি মেরে ধরে' তার সব টাকা কেড়ে নিয়েছে। বিচারপতি তখন ধর্ম্মদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি বলবার আছে? ধর্ম্মদাস রেগে বলে উঠ্‌লো—কি, আমি চুরি করেছি, না ডাকাতি করেছি? ঐ লোকটাই তো আমার বেহালা বাজানো শুনে আমাকে একশো টাকা খুসী হ'য়ে দিলে। কিন্তু বিচারপতি ধর্ম্মদাসের সেই কথায় বিশ্বাস করলেন না। তিনি বললেন যে, বেহালা শোনার জন্য কখনো কেউ সখ করে' অত টাকা দিতে পারে না। বিশেষ করে' সে হচ্ছে সুদখোর, টাকা জমানোই তার ধর্ম্ম, অমনি করে' সে যে টাকা খরচ করবে, তা তিনি বিশ্বাস করেন না। তার উপর সুদখোরের গা-হাত-পা কেটে রক্ত পড়ার মানেই ত তাকে মারা হয়েছে। বিচারক ধর্ম্মদাসের ফাঁসীর হুকুম দিলেন।

বিচারালয় থেকে বেরোবার আগে বেচারী ধর্ম্মদাস বললে,—হুজুর, আমার একটি প্রার্থনা আছে। তিনি বললেন—তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া তোমার সব প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারি। ধর্ম্মদাস তখন উত্তর দিলে—না হুজুর, আমি আমার প্রাণ ফিরে চাই না। আমি কেবল একবার বেহালাটি বাজাতে চাই। এই কথা শুনেই সেই সুদখোর ভয়ানক ভয় পেয়ে বলে' উঠলো,—না না না হুজুর, অমন কাজও করবেন না, ওর বেহালা বাজানো শুনবেন না। কিন্তু বামনের তৃতীয় বরের ফলে ধর্ম্মদাস ইচ্ছা করবামাত্রই সেই বিচারক ধর্ম্মদাসের প্রার্থনায় রাজী হ'য়ে বললেন,—নাঃ বাজাক্ না, ওহে ধর্ম্মদাস, তুমি বাজাও।

ধর্ম্মদাস যেই বাজনা আরম্ভ করলে অমনি বিচারালয়ের বিচারপতি, কেরাণীরা ও পুলিশেরা পর্য্যন্ত চেয়ার ছেড়ে ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে ধেই ধেই করে' নাচতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লো, হাঁপিয়ে সবার প্রাণ যায় আর কি! বিচারপতি বেহালা থামাবার জন্য বার বার তাকে অনুরোধ করতে লাগলেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে, সে বাজিয়েই চললো। ধর্ম্মদাস বললে যে, সে কিছুতেই বাজনা থামাবে না, যতক্ষণ না তার ফাঁসীর হুকুম ফিরিয়ে না নেওয়া হচ্ছে। বিচারপতি প্রাণের দায়ে অগত্যা তার প্রাণবধের আজ্ঞা ফিরিয়ে নিয়ে তাকে মাপ করলেন। কিন্তু সে তখনও বাজনা থামালে না, সে বাজাতে বাজাতে তখনই আবার সেই দুষ্ট সুদখোরকে জিজ্ঞাসা করলে,—ভায়া বল তো, তুমি এই সব টাকা কোথায় কেমন করে' পেয়েছো? না বললে আমি এ বাজনা থামাচ্ছি না। সেই সুদখোর বিচারপতি প্রভৃতির সাম্‌নেই স্বীকার করলে যে, বহুদিন আগে সে সেই টাকা ঠকিয়ে চুরি করেছে। সে আরও বললে যে. সে টাকা ধর্ম্মদাসেরই প্রাপ্য, কারণ ধর্ম্মদাস তার কাজ করে দিয়েছিলো। এইবার ধর্ম্মদাসের বেহালা থামলো বিচারপতি তখনই তাঁর আসনে ব'সে, চুরি ও ঠকানোর অপরাধের জন্য সেই সুদখোরকে কারাবাসের হুকুম দিলেন। ধর্ম্মদাস মনের সুখে টাকার থলি কাঁধে ফেলে গুণ গুণ করে' গান করতে করতে বাড়ী চলে গেল।

ভূ-বিজ্ঞান

ক্ষিতিমণ্ডলের মাটি-পাথর

১৪২৮ পৃষ্ঠার পর

পর পৃষ্ঠায় যে চিত্রটি দিলাম, তা বেশ করে দেখে নিও; বড় বড় নামগুলো পড়ে ঘেবড়ে যেও না। ওগুলো নাম মাত্র। নামের বদলে এক দুই তিন নম্বর দিলেও চলত। তবে তোমরা অনেকে হয় ত বড় হয়ে ভূতত্ত্ব ভাল করে শিখতে চাইবে। তাই, নামগুলোর সঙ্গে এখন থেকে পরিচয় করে দিতে চাই।

পৃথিবী কি করে ধীরে ধীরে জমাট বেঁধেছে, তার কতকটা ধারণা তোমাদিকে করে দিয়েছি পূর্ব্ব বারে। এই জমাট বাঁধার সময় কি কি ঘটেছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ পাওয়া যায় না। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরাও সে বিষয় নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। যতটা জমেছে, তারই নাম ক্ষিতিমণ্ডল।

জমাট বাঁধার পর যুগে যুগে এই ভূতলের রূপ কি রকম বদলে বদলে গেছে, এর উপর কখন্ কোন্ জন্তু বা কোন্ উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়েছে, তার খবর আমরা পাই ক্ষিতিমণ্ডলের স্তর বা থাকগুলো পরীক্ষা করে।

চিত্রটির বাঁ দিক দেখলে বুঝতে পারবে যে, ভূমণ্ডলের জীবনটাকে মোটামুটি চার ভাগ করা হয়েছে—আদি, প্রথম, মধ্য ও নব যুগ। আদি যুগের শেষের দিকটার কথাই আমরা কিছু কিছু জানি। গোড়ার দিকে কি ছিল না ছিল, তার কোন চিহ্নই আজ পাওয়া
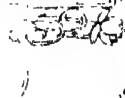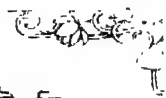
কিন্তু প্রথম যুগ হতে আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, তার স্পষ্ট আভাস আমরা পাই ক্ষিতিমণ্ডলের Cambrian-প্রমুখ স্তরগুলো পরীক্ষা করে। শামুক-গুগ্‌লীর খোসা, মাছের কাঁটা, জানোয়ার ও পাখীর পঞ্জর, গাছের ডাল-পালা, সব পাওয়া যায় পাথরের, মাটির থাকে থাকে, ভাঁজে ভাঁজে। শুধু তাই নয়, জন্তু ও পাখীর পদচিহ্ন, জোয়ার-ভাটার স্রোতের টান, বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে ছোট ছোট ছিদ্র, সবই সযত্নে রাখা আছে মাটি-পাথরের স্তরে স্তরে।

তবে, একটা বিষয়ে তোমাদিকে সাবধান করে দিতে চাই। তোমরা যেন মনে কোরো না যে, এই স্তরগুলো একেবারে পেঁয়াজের খোসার মতন সাজান রয়েছে, যেন সর্ব্বত্র উপরেই আধুনিক যুগের, তার নীচে নবযুগের, তার নীচে মধ্যযুগের, তার নীচে প্রথম যুগের আর ভেতরে আদি-যুগের স্তর পাবে। মোটেই তা নয়। পেঁয়াজটাকে পাথরে ঘষে নিলে যে রকম নানাজায়গায় ভেতরের স্তর বাহিরে এসে পড়ে, পৃথিবীরও সেই অবস্থা। হয়ত এমন হতে পারে যে, একটা গাঁয়ে মাঠে বেড়াতে গিয়ে আধুনিক পলিমাটির উপর বেড়াচ্ছ, কিন্তু তার পাশের গাঁয়ে চলছ কাম্ব্রীয় স্তরের ট্রাইলোবাইট কাঁকড়ার পঞ্জরের উপর। কি কারণে স্তরগুলো এ রকম ওলট-পালট হয়ে যায়, বা দুমড়ে যায়, বা ভেঙ্গে যায়, তা তোমরা ক্রমশঃ বুঝবে। এ সবই ভূগর্ভের আগুনের খেলা। কিন্তু কোথাও

আধুনিক

RECENT

PLEISTOCENE —মানব

PLIOCENE —মর্কট

(TERTIARY)
NEOZOIC

MIOCENE

RISE OF MAMMALS
—স্তন্যপায়ী

চল্লিশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ। নবযুগ

OLIGOCENE

EOCENE

CRETACEOUS

ফুলের গাছ

FIRST BIRD FOSSILS
—পক্ষী

(SECONDARY)
MESOZOIC
মধ্য যুগ

JURASSIC

GOLDEN AGE OF REPTILES—অতিকায় গোধা

TRIASSIC

FIRST TRACES OF MAMMALS—স্তন্যপায়ীর সূচনা

এক কোটি বিশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মধ্য যুগের আরম্ভ।

FIRST AMPHIBIAN SKELETONS—উভচর কীট
ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদ

DEVONIAN

স্থলজ উদ্ভিদ

(PRIMARY)
PALAEOZOIC
প্রাচীন যুগ

SILURIAN
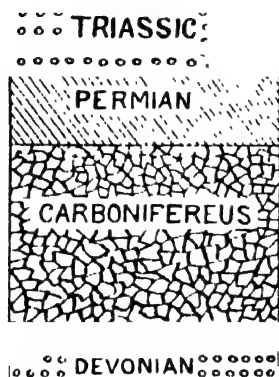
FIRST FISHES—মেরুদণ্ডীর আবিভাব—মৎস্য

ORDOVICIAN

MORE INVERTEBRATES
মেরুদণ্ডহীন জীব—শামুক, কাঁকড়া প্রভৃতি

CAMBRIAN

MANY INVERTEBRATES
ট্রাইলোবাইট কর্কট প্রভৃতির আবির্ভাব। জেলী মাছ ইত্যাদি

তিন কোটি বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন যুগ আরম্ভ হয়।

আদি যুগ

ARCHAEAN

কীটাণুর আবির্ভাব। কিন্তু পঞ্জরাদি পাওয়া যায় না। জলজ উদ্ভিদের জন্ম বোধ হয় হইয়াছিল।
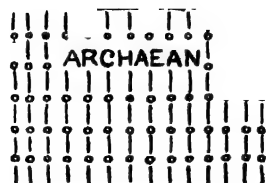
কোথায় এমন হয়েছে যে, ভেতরের স্তর উপরে আসার পরে ঝড়-বৃষ্টিতে আবার ভেঙ্গে চুরে গেছে, আবার তার নুড়ি কাঁকর নদীর স্রোতের সঙ্গে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

কখন কখন দেখবে যে, ভূমিকম্পের দরুন অনেক-খানা জমিতে স্তরগুলো একেবারে ঘোট-মণ্ডল হয়ে গেছে. অর্থাৎ নীচেরটা ওপরে এসেছে, ওপরেরটা

স্তরের পাহাড়

নীচে গেছে। আবার দেখ, যে সব জন্তুর হাড় বা আঁস বা খোসা ছিল না, তাদের কোন চিহ্নই পাথরের স্তরে পাওয়া যায় না। কিন্তু পণ্ডিতেরা আজ এই পাথর পরীক্ষাতে এমন হুঁশিয়ার হয়েছেন যে,জেলী মাছের চলার দাগও তাঁরা দেখে চিনতে পারেন। জেলী মাছ তোমরা দেখিয়াছ কি ? পুরীর সমুদ্রের বালীর উপর সাদা থলথলে তাল শাঁসের মতন যে পদার্থ পড়ে থাকে, তারই নাম জেলী মাছ। পৃথিবীর আদিম প্রাণী যারা আজও বেঁচে আছে, এই জেলী মাছ তারই একটি। এর হাড়-গোড় নেই। জলে এর উৎপত্তি, তাই দেহখানার টাকায় সাড়ে পনের আনারও বেশী ভাগ জল। একটা মজার গল্প-বলি শোন:—একবার এক চাষা সমুদ্র-তীরে গাদা গাদা জেলী মাছ পড়ে আছে দেখে ভাবলে, এগুলো মিছেমিছি নষ্ট হয় কেন, গাঁয়ে নিয়ে গেলে ত উৎকৃষ্ট ক্ষেতের সার হতে পারে। এই না ভেবে সে এক গাড়ীতে জেলী মাছ ভরে রওয়ানা করে দিলে নিজের গ্রামের দিকে। নিজে বাজার হাট করে সন্ধ্যা বেলায় যখন বাড়ী পৌছল, তখন তার স্ত্রী এক কুলো আমসীর মতন শুকনো একটা কি পদার্থ তার সামনে রেখে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ গা, এ আবার কি পাঠিয়ে দিয়েছিলে গরুর গাড়ী করে ? চাষা জবাব দিলে—আমি যে এক গাড়ী জেলী মাছ পাঠিয়েছিলাম সে গুলো গেল কোথায় ? চাষানী বললে—মাছ! মাছ ত পাই নেই। শেষ খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল যে, সেই এক গাড়ী জেলী মাছ রোদে শুকিয়ে এক মুঠো আমসী হয়েছে। প্রাচীন কালের জলচর প্রাণীদের মজা দেখলে ত ? তোমরা 'শিশু-ভারতী'তে আগেই জীব-তত্ত্বের কথা অনেক পড়েছ। কেমন করে কীটাণু থেকে জেলী মাছের মত প্রাণীগুলো হল, জেলী মাছ থেকে শামুক গুগলী ঝিনুক হল, তার থেকে কাঁকড়া বিছে চিংড়ি মাছ হল, তার থেকে মাছ হল, গোসাপ হল, তারপর স্তন্য-পায়ী জীব হল, সব শেষে মানুষ হল, এ সব তোমরা জান। কিন্তু মজার কথা এই যে, আদিম প্রাণীর কেউ কেউ (জেলী মাছের মতন) আজও বেঁচে আছে। কলকাতার রাস্তায় যেমন অতি আধুনিক মোটরকার আর আদ্য কালের গরুর গাড়ী পাশাপাশি চলেছে দেখতে পাও, সেই রকম প্রাণিজগতেও দেখতে পাবে এক দিকে মানুষের মতন দেবোপম প্রাণী. আর অন্য দিকে আদি যুগের এমিবা। এই এমিবার কথা তোমাদিগকে আমি একটু বলবো। যথার্থ রাক্ষুসে জানোয়ারগুলো প্রায় সব লোপ পেয়ে গেছে। বেঁচে আছে এক তিমি। তা, ডাঙ্গায় থাকলে সেও অতিকায় গোধাগুলোর মত কোন্‌কালে লোপ পেয়ে যেত, কোন রকমে জলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। তোমরা জান ত, যে, তিমি স্তন্যপায়ী জীব, মাছ নয়। বহু যুগ জলে বাস করার দরুণ তার হাত-পায়ের গড়ন বদলে গেছে। হাত-পায়ের গড়ন যে বদলে যায়, তা তোমরা নিশ্চয় জান। আমাদের মেয়েদের পা, আর মেম সাহেবের ঠুঁটো পা তুলনা করলেই বুঝতে পারবে। বংশপরম্পরায় জুতো পরে ওদের পায়ের আঙুলগুলোর কি দশাই হয়েছে। আমরা যে মানুষ, এক কালে আমাদের পায়ের ও হাতের আঙুলের মাপ একই ছিল যেমন পশুদের

আজও আছে। পেছনের পা দুটোর ভর দিয়ে চলে চলে আর সামনের পা দুটো নানা রকম কাজে লাগিয়ে লাগিয়ে আঙুলের গড়ন বদলে গেছে। যে সব মাছ জগতে প্রথম দেখা দিয়াছিল, তাদের দেহ কাঁকড়ার মতন বর্মে চর্মে ঢাকা ছিল। যে সব খেচর পাখী প্রথম আকাশে উড়েছিল, তাদের মুখে দাঁত ছিল। আজ নেই, তোমরা জান। সব প্রাণীর দেহই এই রকম বদলে বদলে এসেছে। যাক্ গে, প্রাণিতত্ত্বের আর বেশী কথা বলে তোমাদের মাথা গুলিয়ে দেব না।

শুধু এমিবার কথাটা শুনতে হবে। এমিবা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী; কীটাণু। অণুবীক্ষণ যন্ত্র না হলে একে দেখা যায় না। কাদা জলে এর বাস। তবে মজার কথা, তোমাদের দেহের রক্তেও এমিবা আছে। এ যে আদিম জানোয়ার, তাতে সন্দেহই নাই, কেন না, এর চোখ নেই, মুখ নেই, পা নেই, হাত নেই, অথচ প্রাণ আছে। ডিম পাড়ে না, বাচ্চা দেয় না, অথচ এর বংশ বৃদ্ধি হয়। এই এমিবা যে সৃষ্টির প্রথম প্রাণী, তা নয়। এর চেয়েও অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র জীব হতে প্রাণিজগতের আরম্ভ হয়েছে। তবে তাদের আজ আর কোন চিহ্নই বর্তমান নেই। অণুবীক্ষণ দিয়ে এই কীটাণুকে দেখলে মনে হয়, যেন একটা থলথলে জেলী মাছের টুকরো পড়ে আছে। গোল-গাল, তার কোন অঙ্গই নজরে পড়ে না। কিন্তু এর কাছে একটু জোরাল এসিডের ফোঁটা ফেললে সমস্ত শরীরটা এ কুঁচকে নেয় ঠিক মানুষ কি অন্য জন্তুর মতন। এর কাছে এক টুকরো খাবার দ্রব্য রেখে দিলে এ ধীরে ধীরে দেহখানাকে ঘসটে ঘসটে খাবারের কাছে নিয়ে যায়। তারপর নিজের শরীর দিয়ে খাবারের কণাটাকে ঢেকে ফেলে। একটু পরেই দেখা যায়, খাবার নেই, এমিবা তাকে খেয়ে ফেলেছে। তোমরা বলবে খেলে কি করে, মুখ নেই, পেট নেই! কেন খাবে না? তার সমস্ত দেহটাই যে মুখ-পেট। এইবার এমিবার বংশ বৃদ্ধির কথা শোন। সে তোমাদের গাইটির মতন বাচ্চা বিয়োয় না, হাঁসটির মতন ডিমও দেয় না, তবে এক থেকে অনেক হয় কি করে। অণুবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে বসে থাক—অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখবে যে, সেই গোল-গাল জীব-কণাটার চারিদিকে আঙুলের মতন কি সব বার হচ্ছে। তার পর, দেখতে দেখতে সেটা দুভাগ হয়ে গেল। যেখানে একটা এমিবা ছিল সেখানে দুটো এল। বংশ বৃদ্ধি আর কাকে বলে! ক্রমশঃ এই এমিবার একটা পরিবর্তন হল। দুই এক দিনে হল তা নয়, অনেক হাজার হাজার বছর লাগল। করলে কি, সে আস্তে আস্তে সমুদ্রের জল থেকে একটা গায়ের খোসা সংগ্রহ করলে। তখন তার নাম হল

গ্লবিজেরিনা

গ্লবিজেরিনা (Globigerina)। ভূতত্ত্বের দিক থেকে এই গ্লবিজেরিনার একটা কীর্তি তোমাদের জানা উচিত। কেন না, এরই দেহ থেকে ইংলণ্ডের বিখ্যাত চা-খড়ির পাহাড়গুলো গড়ে উঠেছে।

প্রাচীন জন্তুগুলোর নাম করতে গিয়ে এক রকমের প্রাণীর কথা বলতে ভুলে গেছি। তাদের নাম উভচর। তোমাদের পরিচিত উভচর হচ্ছে বেঙ। পৃথিবীর অঙ্গার যুগে এই ভেকজাতীয় প্রাণীরা হয়েছিল মহিষের মতন প্রকাণ্ড। এরা আজকাল-কার বেঙ ও কুমীরের মতন কখনও জলে, কখনও ডাঙ্গায় থাকত। যখন তাদের পায়ের ছাপ পড়ত। সময়ে সময়ে এই ছাপাগুলো জোয়ার আসবার আগে গরম রোদে শুকিয়ে বেশ শক্ত হয়ে যেত। তার পর জলের তোড়ে সেই শক্ত দাগের উপর পলিমাটি ঢাকা পড়ত। ভাটা হলে আবার রোদে শুকোত। জোয়ার এলে আবার মাটি চাপা পড়ত। ক্রমশঃ হল কি, শোন। বহু যুগ ধরে মাটি পড়ল সেই পায়ের ছাপ-গুলোর উপর। কোটি কোটি বৎসর পরে যথা-নিয়মে নীচের স্তরগুলো উপরের চাপে, গরমে, জমে পাথর হয়ে গেল। কিন্তু পাথরের ভেতর রয়ে গেল সেই অতিকায় ভেকের পায়ের ছাপ। কালের গতিতে সেই পুরানো জলাভূমি ভূগর্ভের আগুনের ঠেলায় উঠে পড়ল পাহাড় হয়ে। তখন সেই পাহাড় থেকে লোকে কেটে কেটে নিয়ে যেতে লাগল বেলে পাথর, বাড়ী তৈরী করবার জন্য। একদিন হল কি, এক প্রকাণ্ড পাথরের চাঙড়ার উপর দেখা গেল দুটো ছাপ মানুষের হাতের মতন, পাঁচ পাঁচটা আঙুল সুদ্ধ। মজুরেরা ভেঙ্গে পড়ল সেই দিকে, এই ভূতুরে ছাপ দেখবার জন্য। তারা সবাই বলাবলি করতে

লাগল—এ খনির ভেতর, ভাই, নিশ্চয় ভূত আছে। সে বেচারা মুর্খ মানুষ, তারা জানবে কোথা থেকে আদিম কালের প্রাণীর গল্প। তোমরা বুদ্ধিমান্ ছেলে তোমরা থাকলে নিশ্চয় ভয় পেতে না। যাক্ কিছু দিন পরে সেই খনিতে আসতে লাগল দলে দলে নানা দেশ থেকে পণ্ডিতমণ্ডলী। তাঁদের চোখের সামনে আরও পাথর খুঁড়ে তোলা হতে লাগল। দেখা গেল যে সেই খনির ভেতর একটা কাচা মেটে পাথরের স্তর আছে, আর সেই স্তরে অনেক জায়গায় ও রকম মানুষের হাতের ছাপের মতন দাগ আছে। শুধু তাই নয়, আরও এক এক জোড়া করে ছোট হাতের ছাপ বড় গুলোর সামনে সামনে পাওয়া গেল। আরও দেখা গেল, সেই মেটে পাথরের স্থানে স্থানে লেজ ঘস্টাবার দাগ। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই পাথরের দাগ কোন চতুষ্পদ লেজ-ওয়ালা গরু-মহিষের মতন বড় উভচর প্রাণীর।

কিছু দিন পরে ঐ রকম আর এক পাথরের খনিতে পাওয়া গেল পায়ের দাগের সঙ্গে একটা অদ্ভুত গঠনেরট দাত। তার উপর কত চিত্র-বিচিত্র দাগ! তখন সেই লুপ্ত অতিকায় উভচরের নামকরণ হল, Labyrinth-দন্ত। আর সেই মেটে পাথরের স্তর দেখে হিসেব হল যে এই জানোয়ার বেঁচে ছি পৃথিবীর অঙ্গার যুগে। এই রকম করে ধীরে ধীরে পণ্ডিতেরা পাথরের ভেতর থেকে ভূমণ্ডলের ইতিহাস উদ্ধার করেছেন।

এইবার তোমাদিগকে ক্ষিতি-মণ্ডলের গঠন সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে চাই। হয় ত তোমাদের জানতে ইচ্ছা হবে যে, পৃথিবীর এই মাটি-পাথরের খোসাটা কত পুরু। সমস্ত ভূমণ্ডলের তুলনায় অতি সামান্য—আন্দাজ চল্লিশ মাইল। ভূমণ্ডের ব্যাস মেরু থেকে মেরু পর্য্যন্ত প্রায় আট হাজার মাইল, (ঠিক ৭৯১৮ মাইল) মনে আছে ত? তাহলে আমাদের ভূমিতল হতে পৃথিবীর ঠিক মধ্যখানটা (কেন্দ্র) চার হাজার মাইল। এই চার হাজার মাইলের মধ্যে মাত্র চল্লিশ মাইল ক্ষিতিমণ্ডল—তার ভেতরে ভূগর্ভ। এই ভূগর্ভের কথা আমরা বেশী কিছু জানি না, তবে এটা স্থির জানি যে, এর চুম্বক শক্তি আছে। কেন না, পৃথিবীর উপরে কম্পাসের চুম্বক-শলা ঠিক উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে দাঁড়ায়। আর এক কথা জানি ভূগর্ভের বিষয়ে। হিসেব করে দেখা গেছে যে, সারা ভূমণ্ডলের ওজন জলের সাড়ে পাঁচ গুণ, কিন্তু তার মাটিপাথরের খোসাটার ওজন জলের আড়াই গুণ মাত্র। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর গর্ভ নিশ্চয়ই খুব একটা ভারী ওজনদার পদার্থে ভরা। পণ্ডিতেরা চুম্বক-শক্তি ও ওজন, এই দুই কারণ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভূগর্ভস্থ ভারী পদার্থ হচ্ছে লোহা ও নিকেল। আমরা জানি যে, এই দুই ধাতু পৃথিবীর আত্মীয়কুটম্ব উল্কাপিণ্ডের (খসা-তারার) প্রধান উপাদান। তাই, পৃথিবীতেও এরা খুব বেশী পরিমাণে, আছে, এটা মেনে নেওয়া অসঙ্গত নয়। আচ্ছা তাহলে তোমরা মেনে নিলে যে, ভূগর্ভ লোহা ও নিকেলে ভরা! কিন্তু এই দুই ধাতু সেখানে কি অবস্থায় আছে? ঠিক ত জানা যায় না, তবে এ পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে যে, এক রকম তরল অবস্থায় আছে। একেবারে ভেতরের আধখানার জলীয় এমন কি বাষ্পীয় অবস্থা পর্য্যন্ত হতে পারে। কিন্তু তার বাইরেটা কাদা কি পাঁকের মতন নরম পদার্থ। এইটুকু আপাততঃ জেনে রাখ। আসল ভূতত্ত্বের সঙ্গে এই ভূগর্ভের লোহার বেশী সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক শুধু এইটুকু যে, ক্ষিতিমণ্ডলকে এই ভেতরটা থেকে নানা রকম ধাকা-ধুকি খেতে হয়। সে সব কথা তোমাদিকে পরে বলছি।
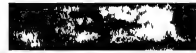
মাটি ও কাদা ও স্লেট পাথরের পাহাড়

এখন ভেবে দেখতে হবে যে, পৃথিবীর এই চল্লিশ মাইল পুরু মাটি-পাথরের খোসা তৈরী কি দিয়ে? মনে আছে ত বিরানব্বইটি মূল পদার্থের কথা, যারা বাষ্প অবস্থায় সূর্য্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এই মূল পদার্থগুলোরই নানা রকম যোগাযোগ হয়ে ক্ষিতি-মণ্ডলের পাথরের দেহ তৈরী। ভূতত্ত্বে পাথর বা শিলা শব্দের একটা বিশেষ অর্থ আছে। শালগ্রাম শিলাও পাথর, তোমাদের লেখবার শ্লেট পেন্সিলও পাথর, তাজমহল যে মর্ম্মর দিয়ে তৈরী সেও পাথর, কাঁকর বালিও পাথর, মাটি কাদাও পাথর, রাণীগঞ্জের খনি থেকে যে কয়লা তোলা হয়, সেও পাথর। নরম কি শক্ত, তাতে কিছু এসে যায় না। একই পাথর কোথাও শক্ত, কোথাও বা নরম। বিজ্ঞানের চোখে মার্বেল পাথর ও চা-খড়ি একই পদার্থ, হীরা ও কয়লা একই পদার্থ। এরা সবাই পাথর। এই পাথর হচ্ছে আমাদের ক্ষিতিমণ্ডলের উপাদান। আর পাথরের উপাদান হচ্ছে রসায়ন-বিদ্যার সেই নিরানব্বইটা মৌলিক পদার্থ যাদের কথা তোমাদিগকে বার বার বলেছি। এর সবগুলোর নাম তোমাদের এখনই জানার দরকার নেই। তবে যে এগারটা সব চেয়ে ব্যাপক, অর্থাৎ ক্ষিতিমণ্ডলের সাড়ে পনের আনা ভাগ যেগুলো দিয়ে তৈরী, তাদের নাম শিখে রাখ। তারা হচ্ছে—Oxygen, Silicon, Carbon Sulphur, Chlorine, Sodium, Potassium, Calcium, Aluminium, Iron, Magnesium। এদের সঙ্গে তোমাদের ভাল করে পরিচয় করে দিই। অক্সিজেন ও সিলিকন মিলে বালি হয়, আর হয় Quartz পাথর, যার নাম একটু পরে আবার করব। কার্বন (কয়লা) ও সলফর (গন্ধক) তোমরা ত চেনই। ক্লোরিন ও সোডিয়ম মিলে হয় খাবার নুন। এ-কথা আগে বলেছি। পোটাসিয়াম সোডিয়মেরই মতন আর এক ধাতু। এই দুই ধাতুকে প্রকৃতিতে মৌলিক অবস্থায় দেখা যায় না। কেন না, হাওয়াতে বার করলেই এরা অক্সিজেন খেয়ে পটাশ ক্ষার ও সোডা ক্ষার হয়ে যায়। ক্যালসিয়মের ক্ষার তোমাদের নিত্য পরিচিত পানে খাবার চূণ। লোহার সঙ্গে আর নূতন করে তোমাদের কি পরিচয় করে দেব! লোহা নইলে ত সংসার অচল হয়ে যাবে। এলুমিনিয়মও তোমাদের চেনা জিনিষ। এই ধাতুর তৈরী বাসন ত আজকাল ঘরে ঘরে ব্যবহার হচ্ছে। বাকী রইল ম্যাগনিসিয়ম। সেও তোমাদের অচেনা জিনিস নয়। দেওয়ালীর সময় যে তার জ্বালিয়ে সাদা বিজলীর আলো কর, সে তার এই ম্যাগনিসিয়মের।

মোটের উপর এই এগারটা আদিম পদার্থের যোগাযোগে ক্ষিতিমণ্ডল তৈরী হয়েছে। তবে এর কোন কোনটা—বিশেষতঃ অঙ্গার—প্রকৃতিতে মৌলিক অবস্থাতেই পাওয়া যায়।

আগে তোমাদিকে পাথর কথাটার মানে বলেছি। এখন আর একটি কথা তোমাদের শিখতে হবে—খনিজ। পাথরে ও খনিজে তফাৎ হচ্ছে এই যে, একই পাথরে নানা রকম খনিজ মেশান থাকতে পারে। ফটকিরি, তুঁতে, নুন, চা-খড়ি এই রকম যে সব যৌগিক পদার্থ মাটিতে আছে তাদিকে বলা হয় খনিজ। যে কোন জায়গা থেকে একটা পাথরের চাঙড়া তুলে এনে অণুবীক্ষণ দিয়ে সযত্নে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে, তার ভেতর নানা রকম আলাদা আলাদা খনিজ পদার্থ রয়েছে। প্রত্যেক খনিজ পদার্থের উপাদান কিন্তু একেবারে স্থির অর্থাৎ এক সের তুঁতের ভিতর তামা কতটা, গন্ধক কতটা, অক্সিজেন কতটা, তা এক মিনিটে কাগজে কলমে হিসেব হতে পারে। তেমনি, এক সের নুনে কতখানি সোডিয়ম আছে, কতখানি ক্লোরিন আছে, তারও হিসেব একেবারে স্থির। কিন্তু এক সের বেলে পাথর, এক মুঠো কাঁকর বললে তার ভেতরটার সম্বন্ধে এ রকম কিছুই স্থির জানা নেই। সেই কাঁকরে কি বেলে পাথরে কি কি খনিজ আছে, আগে দেখতে হবে। তারপর জানা যাবে যে, কোন্ কোন্ ও কত কত মৌলিক পদার্থ দিয়ে সেই পাথরটা তৈরী হয়েছে। আশা করি, তোমরা তফাৎটা বুঝলে।

এই যে খনিজ পদার্থের নাম তোমাদের কাছে করলাম, এর অধিকাংশেরই আবার ভেতরটা দানাদার অর্থাৎ পল-কাটা—যেমন মিছরি, ফটকিরি, তুঁতে। প্রত্যেক খনিজের দানার গড়ন আলাদা। রঙও নানা রকম। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে তৎক্ষণাৎ গড়নটা বোঝা যায়, আর অমনি চেনা যায় যে, পদার্থটা কি। হীরা, নীলা, চুনী, পান্না ইত্যাদি জহরৎ, যা মেয়েরা গহনাতে পরে, তারাও খনিজ পদার্থ। রঙ ও পল কাটা গড়নের জন্যই ত তাদের এত কদর! বে-দানা খনিজ পদার্থ প্রকৃতিতে বেশী নেই। যা আছে তার মধ্যে কাচই তোমাদের পরিচিত। কাচ প্রকৃতিতে কোথায় কি ভাবে পাওয়া যায়, তা পরে যথাস্থানে বলব। খনিজ পদার্থ প্রায় দু হাজার
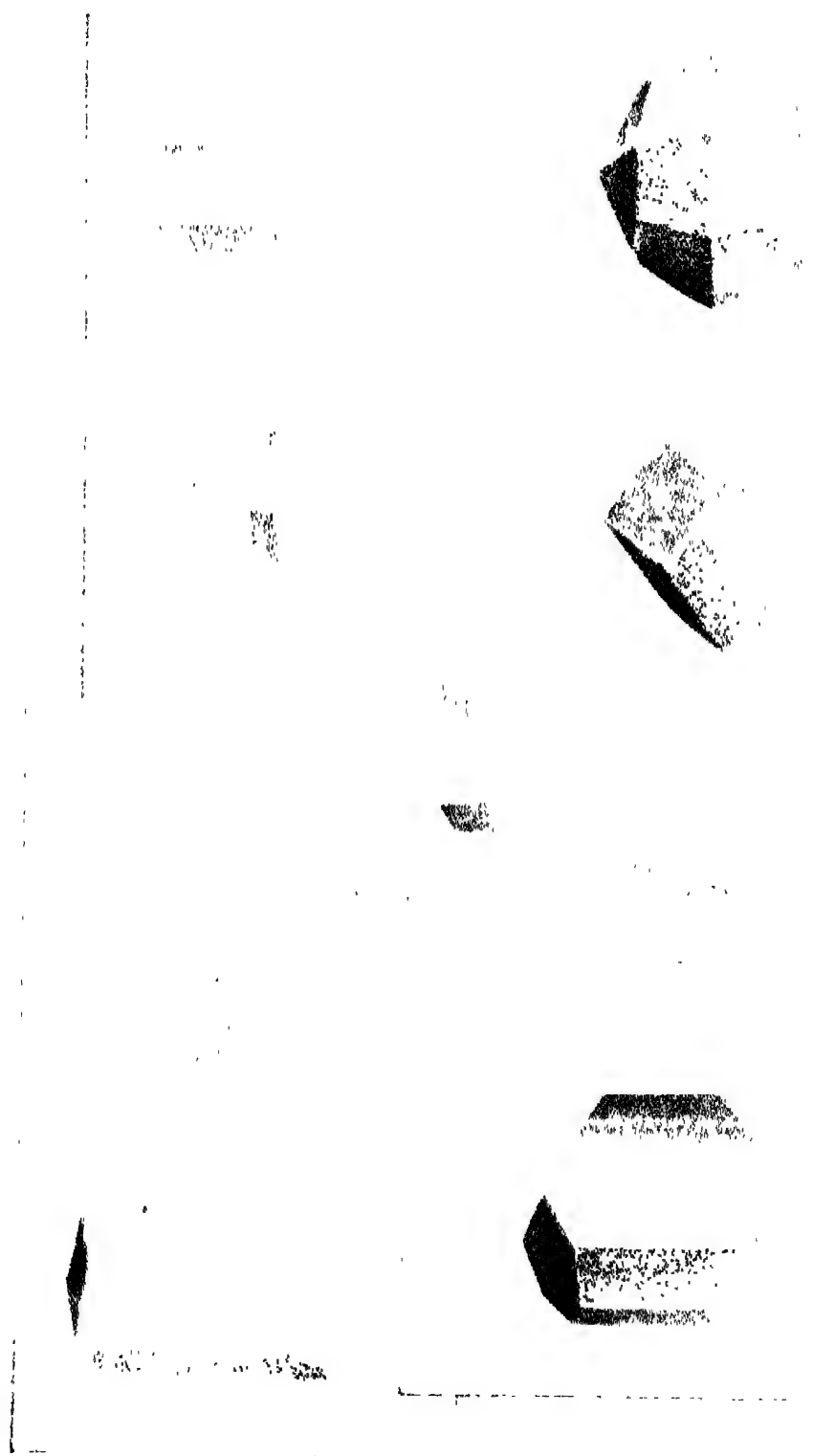
জানা আছে। তার মধ্যে গোটা চৌদ্দর নাম তোমাদিকে বলছি। মনে রাখতে চেষ্টা কোরো। এই কটাই ক্ষিতিমণ্ডলের পাষাণে খুব বেশী পরিমাণে আছে। Quartz, Felspar, Mica, Hornblende, Augite, Chlorite, Epidote Garnet, Kaolin, Olivine

এদের বাঙ্গলা নাম তোমাদিকে দিতে পারলাম না। আমাদের এই পলিমাটির দেশে ত পাথর বড় একটা দেখা যায় না। এক Mica বা অভ্রকে তোমরা সবাই যেন। Kaolin এক রকম কাদা, চিনে মাটির বাসন তৈরী করবার কাজে লাগে। এই খনিজ-গুলোর প্রত্যেকটার মধ্যে সিলিকন আর অক্সিজেন আছে। আর যে কটা ধাতুর নাম উপরে করেছি, তার একটা বা দুটো। তিনটে করে আছে।

এই দশটা খনিজ ছাড়া আরও চারটে তোমাদের মনে রাখতে হবে Calcite, মর্ম্মর জাতীয় পাথর—Magnetite, এবং Hæmatite, লোহার মরচে জাতীয় পদার্থ-Pyrite লোহা,গন্ধকের যৌগিক পদার্থ।

এই শেষ তিনটে খনিজ আমাদের বর্দ্ধমান মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলার মাটিতে অনেক পরিমাণে আছে। তোমাদিকে নিয়ে যদি একবার

প্রবাল কীট

সাঁওতাল পরগণা কি ছোট নাগপুরের পাহাড়ে ঘুরতে পারতাম, এমন কি, যদি একবার তোমাদিকে সঙ্গে করে চৌরঙ্গীর যাদুঘরে যেতে পারতাম, ত এই খনিজগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করে দেওয়া যেত। তা ত আর হবার নয়! এখানে গোটা পাঁচেক খনিজের দানার ছবি দিলাম, ভাল করে দেখো। তা

চা-খড়ির পাহাড়

হলে বিষয়টা তত নীরস লাগবে না।

পাথর সব সুদ্ধ প্রায় হাজার রকমের জানা আছে। তার ভেতর গোটা তের তোমাদের মোটামুটা জানা উচিত। ক্রমশঃ তাদের নাম বলব। এদের প্রধানতঃ দুই জাতি—জলজ কি আগ্নেয়। কিন্তু কখন কখন এমন হয় যে, কোন জলজ কি আগ্নেয় শিলা জন্মস্থানে কি অন্যত্র, নূতন করে দানা বাঁধে, তখন তার এক বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে—Metamorphic বা পুনর্গঠিত পাষাণ।

বৃষ্টির জল ডাঙ্গা থেকে যে মাটি, কাঁকর ধুয়ে এনে সমুদ্রের কি কোন জলাশয়ের তলায় ফেলে, সেইটে জমে জমে জলজ পাথর গড়ে উঠে। এই থিতিয়ে-পড়া মাটির সঙ্গে অনেক শামুক, গুগলি, ঝিনুক ইত্যাদি জল জন্তুর খোসাও মিশে যায়। তা ছাড়া জলের কিনারার কাছাকাছি স্থল-জন্তুর হাড়গোড়ও ধুয়ে এসে সেই মাটির ভেতর পড়ে। যেখানে জলের সঙ্গে বেশী পরিমাণে পলিমাটি না ধুয়ে আসে, সেখানটায় এই

রকম প্রাণীর পঞ্জর জমে জমে বেশ শক্ত চূণ-পাথরের(Lime Stone) বা ঘুটিম্ জাতীয় পাথরের পাহাড় গড়ে উঠতে পারে। আগেই বলেছি, মনে আছে ত, যে, ইংলণ্ডের চাখড়ির পাহাড়গুলো এক রকম অতি ক্ষুদ্র আদিম জল-জন্তুর দেহ স্তূপাকার হয়ে হয়ে গড়ে উঠেছে। Coral বা প্রবাল কীট কি রকম করে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের মাঝে দ্বীপ তৈরী আজও করছে, তা তোমরা নিশ্চয়ই ভূগোলে পড়েছ।

কাদা জমে জমে যে পাথর হয়, তাকে বলে শেল। এই শেল আর একটু শক্ত হলে, হয় তোমাদের পরিচিত শ্লেট। বালি জমে জমে হয় বেলে পাথর। কাঁকড় নুড়ি জমে যে পাথর হয়, তার ইংরেজি নাম Conglomerate। তোমরা যদি কখনও পুরানো বাড়ী ভাঙ্গা দেখে থাক, ত নিশ্চয়ই চূণ,সুরকী, বালি, কাকড়ের জমাট বড় বড় চাঙ্গড়া তোমাদের নজরে পড়েছে। Conglomerate কতকটা সেই রকম দেখতে। আগেই বলেছি, শামুক ইত্যাদির খোসা জমে হয় Lime Stone বা চূণ-পাথর। এই পাথর ঘুটিম, চা-খড়ি ও মর্ম্মরের নিকট আত্মীয়। উদ্ভিদ-দেহ জমে জমে হয়—পাথুরে কয়লা। কয়লার খনি মানেই ত মাটি-চাপা বহুকালের পুরানো বন-জঙ্গল।

জলের ভেতর কাদা বালি কি করে পড়ে, তা এই ছবিতে দেখান হয়েছে।

এই যে নরম ঢিলে জিনিস থেকে কঠিন শিলা গড়ে ওঠে, এর দুই কারণ। প্রথম কারণ, চাপ। যেমন স্তরের পর স্তর এসে জলে পড়তে থাকে তেমনি নীচের স্তরগুলো উপরের স্তরের ওজনে জমাট বাঁধতে আরম্ভ করে। তার পর, উপর পাহাড় থেকে যে সব পদার্থ জলে গলে নীচে আসে তার মধ্যে এমন সব দ্রব্য আছে যা সিমেণ্টের কাজ করে—অর্থাৎ বালি, কাঁকর, নুড়ির চাঙ্গড়া বাঁধে।

তা হলে একটা কথা তোমরা বুঝছ ত। প্রকৃতিতে অহরহ এই ভাঙ্গা-গড়ার কাজ চলেছে। উপরের পাহাড়ের পাথর ভাঙ্গছে,তবে ত নীচে জলের ভেতর নূতন পাথর তৈরী হচ্ছে। এই পাথর ভাঙ্গার কাজ নানাস্থানে নানারকমে হচ্ছে। ঠাণ্ডা দেশে পাহাড়ের ফাটলের ভিতর জল ঢুকে যখন সেই জল জমে,তখন বরফের ঠেলায় ফাটল আরও বড় হয়ে যায়। সময়ে ফাটল বড় হতে হতে তার খানিকটা পাথর ভেঙ্গে পড়ে। গরম দেশে, যেখানে জল জমে বরফ হয় না, সেখানে বৃষ্টির জলই পাথর চূর্ণ করে। এটা কি করে হয়, বুঝতে চেষ্টা কর। বৃষ্টির জল আকাশ দিয়ে আসবার সময় বাতাসের খানিকটা কার্বনিক-এসিড গোলা জল ক্রমাগত পাহাড়ের ফাটলে ঢুকে পাথরকে ভাঙ্গছে। এ একটা বিজ্ঞানের নিয়ম। পাহাড়ে দেশে পাথরের বড় বড় চাঙ্গড়া নজর করে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, তার দেহ ঝড়-বৃষ্টিতে কি রকম খেয়ে যাচ্ছে। দেখবে যে, পাথরের চাঙ্গড়ার বাহিরে কেমন একটা মরচে পড়ার মত হয়েছে। সেই মরচেটা স্বচ্ছন্দে ছুরী দিয়ে চেঁচে নিতে পার। এই যে নরম পদার্থ, যা তুমি চেঁচে নিলে, এটা পচা পাথর বই কিছু না। আকাশের গ্যাস আর জল লেগে লেগে পাথরটা পচে গেছে। পাথর পচলে আস্তে আস্তে সেটা মাটি হয়ে যায়। এই ব্যাপার ক্রমাগত ঘটচে সংসারে।

আর এক জিনিস তোমাদের লক্ষ্য করা উচিত। পুরানো পাকা বাড়ীর গাথুনির ফাটলে অশ্বত্থ গাছ হয়, দেখেছ ত। সেই গাছকে বাড়তে দিলে ফাটল বড় হয়ে সে দেওয়ালটা ভেঙ্গে পড়ে যায়। পাহাড়েও এই ব্যাপার নিত্য ঘটছে। তার ফাটলের ভেতর বৃষ্টির জল পড়ে পাথর পচে মাটি তৈরী হচ্ছে। আর সেই মাটিতে গাছ জন্মে, ক্রমেই পাথরটাকে চৌচির করছে। এ ছাড়া পাহাড়ে নদীর জলের তোড়ে অনেক সময় পাথর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। লোকে হরিদ্বার থেকে কত রকমের নুড়ি কুড়িয়ে আনে, দেখেছ ত! ঠাণ্ডা দেশে বা হিমালয়ের উপরে বরফের নদী আছে, এ তোমরা ভূগোলে পড়েছ। সেই নদীর বরফের ঠেলাতেও অনেক পাথর গুঁড়ো হয়ে যায়। মোটামুটি এই হল পাথর ভাঙ্গার ব্যাপার। গড়ার কাজ কি রকমে হয়, তা উপরে লিখেছি।

কিন্তু ভাঙ্গা-গড়ার কথা এই খানেই শেষ হল না। এ ত হল ক্ষিতিমণ্ডলের বাহিরের ঝড়-বৃষ্টির খেলা। এর চেয়ে আরও ঢের বেশী দারুণ খেলা চলেছে পৃথিবীর গর্ভে। তার কথাও তোমাদের বলতে হবে, কেন না, সেই খেলার থেকেই আগ্নেয়

শিলার জন্ম। বৃষ্টির খেলার মত এ খেলাও অহরহ প্রকৃতিতে চলছে। মনে আছে ত, একদিন পৃথিবী ছিল গনগনে গরম বাষ্পের গোলা। ধীরে ধীরে জুড়িয়ে এখনকার অবস্থা হয়েছে। কিন্তু এখনও জুড়ান শেষ হয় নাই। তোমাদিগকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, ভেতরটা এখনও কাঁচা. আর ঠিক মধ্যখানটা তরল, হয় ত এখনও বাষ্প। ভেতরে কত ডিগ্রী তাপ তা বললেও তোমরা ধারণা করতে পারবে না। মোটামুটি মনে রাখ যে, সে তাপ অতি ভীষণ। আমাদের ক্ষিতিমণ্ডল চল্লিশ মাইল গভীর, মনে আছে ত? এখন এই চল্লিশ মাইলের ভেতর-বাহির ত জুড়িয়ে ঠিক এক রকম কুঁচকে যাচ্ছে না। বাহিরের কুঞ্চন বেশী, ভেতরের কম। এই তফাতের দরুন পৃথিবীর খোসাটা মাঝে মাঝে গা ভাঙ্গছে। যখন গা ভাঙ্গে, তখন কোন জায়গায় ঠেলে উঠে পড়ে, কোন জায়গায় বা নেমে যায়। আবার কিছু দিনের মতন শান্ত হয়। আমাদের সে কালের লোক বলত যে, বাসুকি ফণা নাড়ে বলে পৃথিবী কাঁপে। গ্রীকরা বলত যে, Atlas (এটলাস) কাঁধ বদলায় বলে পৃথিবী কাঁপে। এ সব গল্প কথা। কিন্তু পৃথিবীতে ছোট ছোট কম্প কত যে হচ্ছে তার গুণতি নেই। তবে, না কেঁপেও থাকতে পারে না, এটা ঠিক। বড় বড় কম্পগুলোর একটা বড় কারণ আছে সেটা তোমরা শিখে রাখ। এই যে সেদিন বেহারে প্রলয় কাণ্ড হয়ে গেল, এর কি কারণ, তোমরা জান? Atlas দেব কাঁধ বদলান নেই বটে কিন্তু গিরিরাজ পাশ মোড়া দিয়েছিলেন। পণ্ডিতেরা বলেন যে এক শো বছরে একবার হিমালয় এই রকম পাশ মোড়া দেন। ঝড়-বৃষ্টিতে হিমালয়ের দেহটা ক্রমাগত ক্ষয়ে যাচ্ছে, তা তোমরা বুঝেছ ত। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ক্রমাগত হিমালয়ের অঙ্গের পাথর নুড়ি সমুদ্রে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এর দরুন পাহাড়ের ওজনের অনেক কম বেশী হচ্ছে। যখন এই রকমে ওজনটার বেশী তফাৎ হয়, তখন হিমালয় একবার ভাল করে পাশ মোড়া দিয়ে ওজনটা ঠিক করে নেয়। হিমালয় কিছু পৃথিবীতে চিরদিন ছিল না। নব যুগের প্রথমে আলপস্ এণ্ডীজের অনেক পরে অন্য কতকগুলো পর্ব্বতশ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে হিমালয় ভূগর্ভের আগুনের ঠেলায় উঠে পড়েছিল। পর্ব্বতকে তোমরা অচলই বল, বা যাই বল, এরা ভাসছে ভূগর্ভের পাঁকের উপর। পাশ মোড়া দেওয়া এদের পক্ষে খুব সহজ। একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদিগকে বুঝিয়ে দিতে পারি, পর্ব্বত কি রকম করে গা ভাঙ্গে। চৌবাচ্চার জলে একটা বরফের বড় চাঙ্গড় ভাসিয়ে দিয়ে নজর করতে থাক। খানিক্ষণ সে বেশ সোজা ভেসে ভেসে বেড়াবে। তার পর বাহিরটা গরম হাওয়া লেগে যত গলবে, তত তার নানা ভাগের ওজন কমবেশী হবে। তখন দেখবে যে, সে মাঝে মাঝে পাশ মোড়া দিয়ে ওজনের (balance) ঠিক করে নেবে। আমাদের হিমালয় পর্ব্বতও এই রকম করছে।

কাণ্ববংশ ও আন্ধ্রবংশ

১১৯৬ পৃষ্ঠার পর
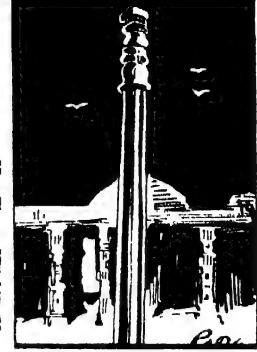
শুঙ্গবংশের শেষ রাজা দেবভূতি স্বীয় প্রধান অমাত্য বাসুদেবের প্ররোচনায় নিহত হইয়াছিলেন। বাসুদেব কাণ্ব গোত্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই হত্যার কথা আমরা বাণভট্ট-রচিত হর্ষ-চরিত হইতে অবগত হই। হর্ষ-চরিতকার শুঙ্গরাজ দেবভূতিকে অতিশয় বিলাসী ও চরিত্রহীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দেবভূতির এক দাসীকন্যা, বাসুদেব কাণ্বর ইঙ্গিতে মহিষীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাজাকে হত্যা করিয়াছিল। এই :হত্যার ফলে কাণ্ব অথবা কাণ্বায়ন বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে, এই সময়টা রাজনৈতিক বিপ্লবের যুগ। উত্তর ভারতে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও পতন হইতে ইহাই অনুমান হয়, রাজারা প্রজাপালন-বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন ও নিজেদের ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকিতেন। অশোক অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "প্রজারা আমরা সন্তান"। মনে হয়, এই মহান্ আদর্শ ভারতের রাজাদিগকে আর অনুপ্রাণিত করিত না। কাণ্ববংশও অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দীকাল রাজত্ব করিবার পর এই বংশের পতন হয়। আমরা এই বংশের রাজাদের বিষয় প্রায় কিছুই জানি না। পুরাণকারের বর্ণনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। তাহারও আবার শিলালিপির প্রমাণের সহিত সামঞ্জস্য নাই। এই বংশে মাত্র চারি জন রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অতিশয় সংক্ষিপ্ত রাজত্বকাল ইহাই সূচনা করে যে, তখন দেশে শান্তি বিরাজ করিত না।

এই বংশের শেষ রাজার নাম সুশর্ম্মা। পুরাণের মতে ইনি নিজের ভৃত্য সিমুকের দ্বারা নিহত হন। এই সিমুক আন্ধ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পুরাণকারের এই উক্তি সমীচিন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, কাণ্ববংশের পতন ২৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের কাছাকাছি হইয়াছিল কিন্তু আন্ধ্রবংশের উত্থান ইহার বহুপূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব সুশর্ম্মার হত্যাকারক আন্ধ্রবংশের প্রথম রাজা হইতে পারেন না। তিনি কোনও পরবর্ত্তী রাজা হইবেন। এ বিষয়ে কিছুই স্থির করিয়া বলা যায় না।

আন্ধ্রবংশ

তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অশোকের মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যেই বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পৃথক্ পৃথক্ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মহারাষ্ট্র ও অপরান্ত প্রদেশও এই প্রকারে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছিল। এই স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম সিমুক শাতবাহন। সিমুকের কাল নির্ণয়ের জন্য আমাদের প্রমাণ দুইটি শিলালিপি। ইহার মধ্যে একটি কলিঙ্গ-রাজ খারবেলের হাথীগুম্ফালিপি, অপরটি তৃতীয় আন্ধ্ররাজ শাতকর্ণীর মহিষী নয়নিকার নানাঘাট-লিপি। শাতকর্ণী আন্ধ্র-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সিমুকের পুত্র। হাথী-গুম্ফালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কলিঙ্গরাজ খারবেল রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে দক্ষিণাপথেশ্বর শাতকর্ণীর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। ইহা মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে যে, হাথীগুম্ফালিপির শাতকর্ণী ও নানাঘাট-লিপির শাতকর্ণী একই ব্যক্তি। অতএব তৃতীয় আন্ধ্ররাজ শাত-কর্ণী খারবেলের সমসাময়িক। খারবেলের সময় খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৭৫-এর কাছাকাছি; সুতরাং আন্ধ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুকের কাল খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগের কাছা-কাছি দাঁড়াইতেছে। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে পুরাকালের মতই গ্রাহ্য বলিয়া মনে করেন ও কাণ্ববংশের পতনের পর আন্ধ্রবংশের অভ্যুদয়ের কাল নিরূপণ করেন। অর্থাৎ তাঁহারা সিমুকের সময় খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (২৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের কাছাকাছি) বলিয়া মনে করেন।

তোমাদিগকে এখন আন্ধ্রবংশের উৎপত্তির বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। আন্ধ্রবংশ নামটি একটু ভ্রমোৎপাদক। আন্ধ্র নামক একটি প্রবল পরাক্রান্ত অনার্য্য জাতি অশোকের বহু পূর্ব্বে কলিঙ্গ দেশের দক্ষিণে অবস্থান করিত। কয়েকটি প্রাচীনগ্রন্থে ও গ্রীকদূত মেগেস্থিনিসের ভারত-বিবরণে তাহাদের উল্লেখ আছে। কিন্তু যে বংশের রাজাদের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি, তাঁহারা যে, জাতিতে আন্ধ্র ছিলেন, এ-কথা মনে করিবার কোনও হেতু নাই। তাঁহারা অন্ধ্র দেশ হইতে আসেন নাই। তাঁহাদের শিলালিপি অধিকাংশ নাসিকে ও তাঁহাদের প্রাচীনতম লিপি নানাঘাটে পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপিতে কুত্রাপি তাঁহা-দিগকে আন্ধ্র বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। তাঁহাদিগকে শাতবাহন বলা হইয়াছে। জৈন গ্রন্থে তাঁহাদের রাজধানী পৈঠান (নিজামের রাজ্যে অবস্থিত) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের লিপির ভাষাও তেলেগু নহে। তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের একজন পরবর্ত্তী রাজা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণীকে একটি শিলা-লিপিতে 'এক ব্রাহ্মণ' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি ব্রাহ্মণ -শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবে পুরাণকার তাঁহাদিগকে আন্ধ্র কেন বলিয়াছেন ? বোধ হয়, পুরাণের সঙ্কলনের সময় তাঁহারা অন্ধ্র-দেশে রাজত্ব করিতেন। পুরাণকারেরা তাঁহাদিগকে অন্ধ্ররাজ বলিয়াই জানিতেন।

শাতবাহন নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে পরে ইহা বংশীয় নাম বা উপাধিতে পরিণত হইয়াছিল। ইহাদের আর একটি বংশীয় নাম শাতকর্ণী ছিল।

তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই বংশের প্রথম রাজার নাম সিমুক; তিনিই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তবে তিনি যে কাণ্ববংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া নূতন রাজ্যের স্থাপনা করিয়াছিলেন, একথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। সিমুকের কাল অন্যূন ২২০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ।

সিমুকের পরে তাঁহারই ভ্রাতা কৃষ্ণ ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। হয়ত তিনি রাজ্যাপহারক ছিলেন। তাঁহার নাম, মহিষী নয়নিকার নানাঘাট-লিপিতে পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণের পরবর্ত্তী রাজা সিমুকের পুত্র শাতকর্ণী ছিলেন। এই শাতকর্ণী মগধরাজ পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ও কলিঙ্গরাজ খারবেলের সমসাময়িক। এই সময় শুঙ্গদের সহিত শাতবাহনদের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল ও তাহারই ফলে বোধ হয় উজ্জয়িনী নগরী শাতবাহনদের অধিকারভুক্ত হয়। শাতকর্ণী পুষ্যমিত্র শুঙ্গের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান রাজ-চক্রবর্ত্তীরাই করিতে পারিতেন। অতএব শাতকর্ণী যে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণদিগকে তিনি দক্ষিণা-স্বরূপে প্রভূত বিত্ত দান করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সহিত বিরোধে তিনি অবশেষে জয়ী হইয়াছিলেন কিন্তু কলিঙ্গেশ্বর খারবেলের সহিত সংঘর্ষে তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। এই শাতকর্ণীর বিধবা মহিষী নয়নিকা নানাঘাট-লিপি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন।

শাতকর্ণীর পরবর্ত্তী অনেক রাজার বিষয় আমরা প্রায় কিছুই জানি না। এইটুকু মাত্র বলিতে পারা যায়, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর অপরার্দ্ধে শুঙ্গ-রাজশক্তি অস্তমিত হইলে পর শাতবাহনেরা পূর্ব্ব-মালব পর্য্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুদ্রা ও শিলালিপির প্রমাণ হইতে আমরা ইহা অবগত হইতে পারি। ভিল্‌সার নিকটবর্ত্তী সাঁচীস্তূপের তোরণ-দ্বারে উৎকীর্ণ একটা লিপিতে 'সিরি শাতকর্ণী' এই নাম পাওয়া গিয়াছে। এই শাতকর্ণী খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সময় শাতবাহন সাম্রাজ্য উত্তরে মালবদেশ হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরেই কাণ্ববংশের পতন হইয়াছিল। হয়ত শাতবাহনেরা কিছুকাল মগধ দেশেও শাসন করিয়াছিলেন—তামিল সাহিত্যে ইহার প্রমাণ আছে।

ইহার কিছুকাল পরেই শাতবাহন-সৌভাগ্য-রবি অস্তপ্রায় হইয়াছিল। বিদেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা পশ্চিম ভারত হইতে ও দাক্ষিণাত্যের কোনও কোনও অংশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এই সকল প্রদেশে এক বৈদেশিক রাজবংশ নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তোমরা জান যে, সিন্ধু, পাঞ্জাব ইত্যাদি জনপদে অনেক দিন যাবৎ বিদেশীয় রাজাদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল প্রথমে বাহ্লীক প্রদেশের গ্রীকেরা ও তাহার পর শক, পহ্লব ও কুশান জাতিরা সিন্ধু ও পাঞ্জাব অধিকার করিয়াছিল। প্রথমে শকেরা গ্রীকদিগকে পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। তাহার পর পহ্লবজাতি পাঞ্জাব অধিকার করিয়াছিল। এই সকল জাতিদের কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। এখন কেবল এইটুকু জানিয়া রাখ যে, ইহাদের প্রধান শাসনকর্ত্তা একজন রাজাধিরাজ হইতেন (King of Kings)। তাঁহার অধীনে অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা প্রতিনিধিস্বরূপ থাকিতেন। এই সকল প্রতিনিধি 'ক্ষত্রপ' নামে অভিহিত হইতেন। 'ক্ষত্রপ' কথাটি সংস্কৃত নহে—ইহা প্রাচীন পারস্য ভাষার 'ক্ষথ্‌পাবন' শব্দ হইতে উৎপন্ন। ক্ষত্রপ-শাসন প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল। পরবর্ত্তী শক ও পহ্লব সাম্রাজ্যেও এইরূপ শাসন স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও এই সকল বিদেশীয় জাতিরা স্বদেশে প্রচলিত ক্ষত্রপ-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। মনে হয়, 'রাজাধিরাজের, (King of Kings)

সাম্রাজ্য অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হইত। এই সকল অংশের শাসক এক-জন 'মহাক্ষত্রপ' হইতেন। মহাক্ষত্রপের অধীনে একাধিক 'ক্ষত্রপ' হইতেন। পরবর্ত্তী কালে এই সকল উপাধির প্রকৃত অর্থ লোকেরা বিস্মৃত হইয়াছিল। ক্ষত্রপেরা মহাক্ষত্রপের অধীনে থাকিতেন কিন্তু মহা-ক্ষত্রপেরা স্বাধীন হইয়াছিলেন।

ক্ষত্রপ-শাসন কপিশা (Kafristan), তক্ষশিলা (Taxila), মথুরা, উজ্জয়িনী ও দক্ষিণে জুনার নামক স্থানে প্রবর্ত্তিত ছিল। জুনারের ক্ষত্রপ বংশের নাম ছিল 'ক্ষহরাত' ; ইঁহারা সম্ভবতঃ জাতিতে শক ছিলেন। এই বংশের প্রথম শাসক ছিলেন 'ভূমক'। তিনি কাহার অধীনে ছিলেন, কিছুই স্থির করিয়া বলা যায় না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, এই বংশের নহপান নামক ক্ষত্রপ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে স্বাধীন রাজা হইয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষমিত্রা নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। দক্ষমিত্রার পতি শক উষবদাত শ্বশুরের প্রতিনিধি রূপে আজমীর(Ajmere), কাঠিয়াবাড়(Kathia-war), গুজরাট, পশ্চিম মালব, উত্তর কোঙ্কন ও নাসিক প্রদেশ শাসন করিতেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশ নহপান নিজেই সাক্ষাৎ ভাবে শাসন করিতেন। উষবদাত দানবীর ছিলেন। তাঁহার প্রভূত দানের কথা নাসিকে প্রাপ্ত কতকগুলি শিলালিপিতে বর্ণিত আছে।

ক্ষহরাত বংশ দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ

নাসিক গুহা

কার্লে গুহা

অংশ নিজেদের অধিকারে লইয়া আসিয়া-ছিলেন। শাতবাহন রাজশক্তি এইরূপে হীন-প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। শাতবাহনেরা বহু-কাল শক্তিহীন ও অধিকারভ্রষ্ট থাকিলে পর, নিজেদের লুপ্ত গৌরব ও ভ্রষ্ট রাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। এই পুনরভ্যুত্থান তাঁহাদের ত্রয়োবিংশ নৃপতি গৌতমীপুত্র শাতকর্ণীর

সাহস, বাহুবল, প্রতিভা ও স্বদেশানুরাগের ফলে সম্ভব হইয়াছিল। ৭৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি গৌতমীপুত্র ক্ষহরাত বংশ ধ্বংস করিয়া ভ্রষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। এইরূপে মহারাষ্ট্র বিদেশীয় বৈরীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এই স্বাধীনতা-সমরের বিজয়ী বীর গৌতমীপুত্রের শাসনে মহারাষ্ট্র দেশ সমৃদ্ধ ও অজেয় হইয়াছিল।

গৌতমীপুত্র শাতকর্ণীর দুইটি লিপি নাসিকে পাওয়া গিয়াছে। এই দুইটি লিপিই একটি গুফার বারাণ্ডার পূর্ব্বদিকের ভিত্তিগাত্রে খোদিত আছে। গুফাটি গৌতমীপুত্র ভদ্রযানীয় সম্প্রদায়ের বৌদ্ধভিক্ষুদের বাসের জন্য নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথম লিপিটি তাঁহার রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে খোদিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়টি চতুর্বিংশ বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। গুফাটির নির্ম্মাণকার্য্য গৌতমীপুত্র শাতকর্ণীর পুত্র বাশিষ্ঠী পুত্র পুলোমায়ীর রাজত্বের ঊনবিংশ বৎসরে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। সমাপ্ত হইবার পর, গৌতমীপুত্রের জননী আর্য্যা গৌতমী-বলশ্রী গুফাটিকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই ঘটনাটি আর একটি লিপিতে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এই লিপিটি হইতেই গৌতমীপুত্রের বিজয়কাহিনী অবগত হই।

গৌতমীপুত্র অশিক, অশ্মক, মূলক (দক্ষিণাপথের দেশবিশেষ), সুরাষ্ট্র (দক্ষিণ-কাঠিয়াবাড়), কুকুর (রাজপুতানার অংশবিশেষ), অপরান্ত (কোঙ্কনের উত্তর ভাগ), অনুপ (নর্ম্মদার নিকটবর্ত্তী দেশবিশেষ), আকরাবন্তী (পূর্ব্ব-মালব), বিদর্ভ (আধুনিক বেরার) প্রভৃতি দেশের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি যে কেবল বীর ছিলেন, তাহাই নহে। তিনি অশেষ গুণের আকর ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত, আচারবান্‌, সুদক্ষ, প্রজাপালক ছিলেন ও বিদেশীয় রাজাদের প্রভাবে প্রাদুর্ভূত বর্ণসঙ্কর প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল প্রায় ৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র।

গৌতমী পুত্র শাতকর্ণীর পুত্র বাশিষ্ঠী পুত্র পুলোমায়ী পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। শাতবাহন সাম্রাজ্য পুনরায় বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল; আর একটি ক্ষত্রপবংশ উজ্জয়িনীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ক্ষত্রপবংশের প্রতিষ্ঠাতা চষ্টন। ইতিহাসে চষ্টন-প্রমুখ ক্ষত্রপদিগকে পাশ্চাত্য ক্ষত্রপ (Western Satraps) বলা হইয়া থাকে। চষ্টন বোধ হয় প্রথমে কুশান সম্রাটের অধীনে থাকিয়া জয়যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু শীঘ্রই স্বাধীন হইয়া মালব, গুজরাট ও কাঠিয়াবাড় প্রদেশে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন ও "মহাক্ষত্রপ' এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। চষ্টনের কাল ৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে ইনি পুলোমায়ীর সমসাময়িক ছিলেন—একথা কেবল অনুমানের উপরই নির্ভর নহে। টলেমি নামক একজন গ্রীক জাতির ভৌগোলিক একখানি ভূগোলের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের বিষয়ে অনেক ভৌগোলিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। টলেমি ১৬৩ খৃষ্টাব্দে মারা গিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৩ খৃষ্টাব্দ। তিনিই বলিয়াছেন যে, যখন সিরোপোলিমিওস্‌ পৈঠান নামক স্থানে শাসন করিতেছিলেন, তখন টায়াষ্টিনিস্‌ ওজীন নামক স্থান শাসন করিতেন; অর্থাৎ শ্রীপুলোমায়ী যখন পৈঠানে রাজত্ব করিতেন, তখন চষ্টন উজ্জয়িনীতে শাসন করিতেন। এই চষ্টন পুলোমায়ীর নিকট হইতে অনেকগুলি প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। পুলোমায়ী অন্ততঃ ২২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি পৈঠান

নামক নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম অন্ধ্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। পুলোমায়ীর পরবর্ত্তী রাজার নাম বাশিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণী। এই শাতকর্ণী সম্ভবতঃ পুলোমায়ীর ভ্রাতা। ইনি বোধ হয় চষ্টনের পুত্র জয়দামনের সমসাময়িক। জয়দামন (আনুমানিক ১১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৫ খৃষ্টাব্দ) মনে হয়, এই শাতকর্ণীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি মুদ্রা ও লিপিতে কেবলমাত্র ক্ষত্রপ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, ইহাই সূচিত হয় যে, তিনি কাহারও না কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাশিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণীর সাম্রাজ্যে গুজরাট ও কাঠিয়াবাড় অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরাণের মতে বাশিষ্ঠীপুত্র পুলোমায়ীর পরবর্ত্তী শাতবাহন সম্রাট্‌দের নাম শিবশ্রী ও শিবস্কন্দ। কিন্তু ইহারা বোধ হয় বাশিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণীর প্রতিনিধিস্বরূপ অন্ধ্রদেশ শাসন করিতেন।

বাশিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণীর পরে যজ্ঞশ্রী-শাতকর্ণী রাজা হইয়াছিলেন। ইনিই এক রকম শাতবাহনদের প্রসিদ্ধ রাজাদের মধ্যে শেষ রাজা। যজ্ঞশ্রী শাতবাহনদের বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি নিজের পৈতৃক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন প্রকৃতই প্রতাপে রুদ্রসদৃশ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী ও বলবান রাজার নিকট শাতবাহন সম্রাট্ পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রুদ্রদামনের একটি লিপি কাঠিয়াবাড় প্রদেশের জুনাগড় নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই লিপি হইতে রুদ্রদামনের বিষয় অনেক কথা জানা যায়। তাঁহাকে লিপিতে 'স্বয়মধিগতমহাক্ষত্রপনামা' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি নিজের বাহুবলের দ্বারা মহাক্ষত্রপ নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি নিজের পুরুষকারের উপর নির্ভর করিতেন, কাহারও করুণার উপর নহে। তিনি দক্ষিণাপথেশ্বর শাতকর্ণীকে দুইবার পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্বন্ধের 'অবিদূরতা'-হেতু তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন নাই। অর্থাৎ রুদ্রদামন শাতকর্ণীর নিকট-আত্মীয় ছিলেন। এই শাতকর্ণী কে, এবং তাঁহার সহিত রুদ্রদামনের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এ বিষয়ে বড়ই মতভেদ আছে। কিন্তু কনহেরিতে প্রাপ্ত একটি লিপি হইতে অনুমান হয় যে, বাশিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণী রুদ্রদামনের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রুদ্রদামন প্রথমে গুজরাট ও কাঠিয়াবাড় প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন (১৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি)। পরে তিনি মহারাষ্ট্র দেশ ও অপরান্ত জয় করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় বিজয় ১৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই সমাধা হইয়াছিল, জুনাগড়ের লেখের দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয়। এই লিপিটি ১৫০ খৃষ্টাব্দে গিরনার পর্ব্বতগাত্রে খোদিত হইয়াছিল। রুদ্রদামনকর্ত্তৃক দ্বিতীয় বিজয়ের পর শাতবাহনেরা মহারাষ্ট্র দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধ্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

রুদ্রদামনকর্ত্তৃক পরাজিত শাতকর্ণী মনে হয় যজ্ঞশ্রী ছিলেন। যদিও ইহার অধিকারে প্রথমে গুজরাট ইত্যাদি দেশ ছিল, কিন্তু পরে ইনি পরাজিত হইয়া এই সমস্ত দেশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তিনি অবশ্য শাতবাহন সাম্রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে অর্থাৎ অন্ধ্রদেশে অনেক কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রায় অষ্টাদশ বৎসর তিনি সম্পূর্ণ শাতবাহন-সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন ও অবশিষ্ট দ্বাদশ বৎসর কেবলমাত্র অন্ধ্রদেশেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। যজ্ঞশ্রীর কোন কোন মুদ্রায় একটি জাহাজ অঙ্কিত আছে। ইহাতে মনে হয় যে, তাঁহার শক্তি স্থলেই সীমাবদ্ধ

ছিল না—তাঁহার নৌশক্তি নিশ্চয়ই প্রবল ছিল।

যজ্ঞশ্রীর পরবর্ত্তী তিন জন শাতবাহন রাজার নাম পাওয়া যায়—বিজয়, চন্দ্রশ্রী ও পুলেমায়ী চতুর্থ। তাঁহারা অন্ধ্রদেশে রাজত্ব করিতেন। পুলোমায়ী চতুর্থের একটি লিপিও পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে প্রায় ৪৫০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর শাতবাহন রাজশক্তির অবসান হইয়াছিল। পুরাণ অনুসারে এই বংশে প্রায় ত্রিশ জন রাজা হইয়াছিলেন। শাতবাহনদের সুশাসনের ফলে দাক্ষিণাত্য সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হইয়াছিল, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতি হইযাছিল। শাতবাহন নৃপতিগণ বৌদ্ধভিক্ষুদের বাসের নিমিত্ত অনেক গুহা খোদিত করাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরও প্রভাব অটুট ছিল। রাজারা অশ্বমেধ প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত দক্ষিণা দিতেন। পৌরাণিক দেবতাদের পূজা প্রচলিত ছিল। শিবের পূজা সাধারণে প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মেরও উপাসক অনেক ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামি বেশী ছিল না। শক, আভীর ইত্যাদি বিদেশীয় লোকেরা হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হিন্দু নাম গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতেন না।

মহারাষ্ট্র-সমাজ বেশ উন্নতিশীল ছিল। অসিজীবী, মসীজীবী, কৃষিজীবী ও বণিক্-সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। নৈগম (বণিক্), সার্থবাহ, শ্রেষ্ঠি (শেঠজী), লেখক, বৈদ্য হাললকীয় (কৃষক), সুবর্ণকার, বর্দ্ধকী (সূত্রধর), মালাকার, লৌহবণিক (কামার), দাসক (কৈবর্ত্ত) ইত্যাদি নামগুলি এসময়কার লিপিতে পাওয়া যায়। এই নামগুলির দ্বারা আমরা সমাজের শ্রেণী-বিভাগের বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারি।

মহারাষ্ট্রে প্রচলিত মুদ্রার নাম ছিল কার্ষাপণ। দেশে ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য গণসংস্থার (Trade Guilds) বহুল প্রচার ছিল। এক একটী ব্যবসায়ের সমুদায় লোকেরা মিলিত হইয়া একটি 'সঙ্ঘ' বা 'গণ' বা শ্রেণী নির্ম্মাণ করিত। এই সমস্ত শ্রেণীর কাজ ছিল জিনিষ উৎপন্ন করা ও তাহাদের বিক্রয়ের সুচারুরূপে ব্যবস্থা করা। নাসিক ও জুনারের শিলালিপিতে ছয়টি শ্রেণীর কথা জানিতে পারা যায়। যথা—তিলপিষক (তেলি) ইত্যাদি। এই সকল শ্রেণী ব্যাঙ্কের কার্য্যও করিত অর্থাৎ তাহারা টাকা জমা রাখিযা সুদ দিত ও তা ছাড়া টাকা ধারও দিত।

টলেমির 'ভূগোল' হইতে দেশের বাণিজ্য বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। সুদূর পাশ্চাত্য হইতে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া অর্ণবপোতগুলি পণ্যদ্রব্য লইয়া ভৃগুকচ্ছ ও মালাবার উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইত ও তথা হইতে বাণিজ্যের দ্রব্যসম্ভার দেশের ভিতরের নগরসমূহে নীত হইত। দেশ এই বাণিজ্যের ফলে ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

বিজ্ঞানের প্রধানতম আবিষ্কার

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে আলোকেরও সময়ের প্রয়োজন হয়

১৩১০ পৃষ্ঠার পর

জগতের যা-কিছু আমাদের উপলব্ধির মধ্যে আসে, তাদের সকলকে আমরা তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া থাকি। প্রথমটিতে সকল প্রকার বস্তু বা দ্রব্যজাতীয় (Meterial) জিনিসকে ফেলা হয়। মাটি, গাছ, জল, বাতাস, লোহা, তামা, কয়লা হীরা ইত্যাদি সব কিছুই এর মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয়টি হইল, বিদ্যুৎজাতীয় জিনিষ। আকাশের বিদ্যুৎ, তোমার বাড়ীর তামার তারের মধ্যকার বিদ্যুৎ, এমন কি, লোহা, নিকেল, আলুমিনিয়াম ইত্যাদির চুম্বকত্ব পর্যন্ত এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অবশেষে তৃতীয় শ্রেণী—জগতের যত-কিছু আলো, তাদের সবই এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। জড়জগৎ এই তিনটি স্তরে বিভক্ত হইয়া আমাদের কাছে প্রতিভাসিত হয়।

এই বিভাগের প্রথম দুইটির বিষয়ে একটা কথা বোধ হয় আদিম অবস্থা হইতেই মানুষের জানা ছিল। একখণ্ড পাথর কোনও একটা জন্তুকে ছুঁড়িয়া মারিতে হইলে অন্ধ বর্ব্বর যুগের মানুষও নিশ্চয় জানিত যে, পাথরটা ছুঁড়িয়া দিবার পর জন্তুর শরীরে গিয়া লাগিতে হইলে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়। সে জানিত, তাহার তীর ধনুক হইতে বাহির হইয়া শিকারের গায়ে গিয়া বিদ্ধ হইতে কিছু সময় লইয়া থাকে। তাই সেই আদিম অবস্থা হইতেই আমরা শিখিয়া আসিয়াছি যে, জড় বস্তু মাত্র স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে কিছু সময় লইয়া থাকে। জড় বস্তুর গতি যতই ক্ষিপ্র হউক না কেন, তাহার বেগ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত শরের মত, বন্দুকের গুলির মত, উল্কার মত বা ইহাদের চেয়েও অধিক হউক না কেন, তবুও এক স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে হইলে তাহার সময় লাগিবেই লাগিবে। জড় বস্তুর বেলায় যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যুতের বেলাতেও তাহাই ঘটে। ঘন কালো মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতে কখনও দেখিয়াছ কি? স্পষ্ট দেখিবে, মেঘের উপর বিদ্যুতের রেখা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে এবং এই চলিয়া যাইতে তাহারও সময় লাগিতেছে। তোমরা তর্ক করিয়া বলিতে পার যে, ঘরের বিজলীবাতির সুইচ টিপিয়া দিতেই ঘরে আলো জলিয়া উঠে, এবং এই দুই এর মধ্যে কোন সময়ের ব্যবধান আছে বলিয়া ত মনে হয় না। তাহার কারণ, বিদ্যুতের গতি অসাধারণ ক্ষিপ্র এজন্য সামান্য ব্যবধান চলিয়া যাইতে তাহার যতটুকু সময় লাগে, তাহা আমরা সাধারণতঃ ধরিতে পারি না। এই ব্যবধান বাড়াইয়া দাও, স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, সুইচ টিপিবার পর আলো জলিতে সামান্য একটু সময় লাগিতেছে। জড়বস্তু ও বিদ্যুৎ তাহার চলিবার ক্ষেত্রে সময়ের অধীন। তাই বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া

থাকেন যে, জড় ও বিদ্যুৎ এক বিষয়ে পরস্পরের সমধর্ম্মী—তাহাদের গতির সীমা আছে।

কিন্তু আলোর বেলা এ-কথা তেমন সহজ নহে। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে আলোরও যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তাহা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার অন্তর্গত নহে। বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে দশ দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিদ্যুৎ চম্‌কান ও দশ দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠার মধ্যে সময়ের ব্যবধান আমরা ধরিতে পারি কি? আমাদের চোখ অন্ততঃ এই দুইটি ব্যাপারকে একই সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। আমাদের এইরূপ অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দুই রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি। প্রথমতঃ, আলোর গতির কোন সীমা নাই। যে মুহূর্ত্তে আলো আমরা জ্বালি, সেই মুহূর্ত্তেই চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া উঠে—ইহার জন্য সময়ের কোনও প্রয়োজন হয় না। জড় বা বিদ্যুতের মত সে সময়ের অধীন হইয়া এ সংসারে জন্ম লয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, আলো জড় বস্তু বা বিদ্যুতের মতই সময়ের অধীন, তবে তাহার গতিবেগ এত ক্ষিপ্র যে, এই পৃথিবীতে স্থানের যে পরিমাণ ব্যবধান আমাদের আছে, তাহা আলোর নিকট ব্যবধানই নহে। এই ব্যবধান অতিক্রম করিতে তাহার সময় এত অল্প লাগে যে, আমরা সাধারণতঃ তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। অতএব এই সমস্যার সমাধানের উপায় কি! গ্যালিলিওর নাম তোমরা শুনিয়াছ। ইনিই প্রথমে দূরবীণ আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীকে উপহার দিয়াছিলেন। ইনি বহু চেষ্টা করিয়াও আলোকের গতি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাই সে যুগের শীর্ষস্থানীয় গণিতবিৎ ও বৈজ্ঞানিক দে কার্ত্তে (Descartes) আলোর গতি অসীম বলিয়াই স্থির করিয়া লইয়া পদার্থ-বিজ্ঞানের একটা অপরূপ দর্শনই গড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার মত অদ্ভুতকর্ম্মা গণিতবিদের মতের সমর্থনকারীদের সংখ্যার কখনও অভাব হয় না, তাই ক্রমে ক্রমে তাঁহার সিদ্ধান্তই শেষ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক-মহলে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে তেমন আর আপত্তি দেখা গেল না।

এমন সময়ে এক অভাবনীয় ভাবে এবং সম্পূর্ণ অচিন্তিত-পূর্ব্ব উপায়ে প্রমাণ হইয়া গেল যে, আলোকেরও গতি আছে এবং তাহা জড়বস্তু এবং বিদ্যুতের গতির মতই সময়ের অধীন। পৃথিবীর দূরত্বকে আলো অবজ্ঞা করিয়া নিমেষ না ফেলিতে ফেলিতে ছাড়াইয়া যায়, কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী ছাড়া কি আর কিছুই নাই? গ্রহগণ, সূর্য্য, নক্ষত্র এদের পরস্পরের ব্যবধানকেও কি আলোক তেমনিভাবে অবজ্ঞা করিতে পারে? গ্যালিলিও এক পাহাড়ের শিখর হইতে আলো ফেলিয়া পাঁচ মাইল দূরের অন্য এক পাহাড়ের শিখরে চলিয়া যাইতে তাহার কত সময় লাগে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া কোনও ফল পান নাই। কিন্তু যে দূরত্বের ব্যবধান শুধু দশ মাইল নহে, কোটী কোটী মাইল, তাহাকে অতিক্রম করিতেও কি আলো ক্লান্ত হইবে না? আকাশে বিদ্যুৎ চম্‌কাইলে পৃথিবী আলোকিত হইয়া উঠে। এই দুইটি ব্যাপার একই সময়ে ঘটিয়া থাকে, এইরূপই আমরা দেখিতে পাই। বিদ্যুৎ আকাশে না চম্‌কাইয়া যদি সূর্য্যে চম্‌কাইত এবং সেই সূর্য্য-পিঠের বিদ্যুতের আলোতে মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে আমরা দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে হয়ত আলোকের গতির পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু সূর্য্য নিজেই এত তীব্রভাবে উজ্জ্বল যে, তাহার পিঠে বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া উঠিতে দেখিতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এই চমকে গ্রহদের উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে দেখিয়া, এই দুইটি ব্যাপারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান আছে কি না, তাহার পরিমাপ করা ত ঢের দূরের কথা। ঠিক এই উপায়ে সব না হইলেও ঐ সূর্য্য, ঐ গ্রহ এবং তাহাদের উপগ্রহরাই আলোর গতির এই চিরন্তন রহস্যের চাবিটি মানুষকে সর্ব্বপ্রথমে উপহার দেয়। কিরূপে ইহা সম্ভব হইল, তাহারই গল্প তোমাদের এইবার বলিতেছি।

গ্যালিলিও ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে প্রথমে দূরবীণ আবিষ্কার করেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাহা ইয়োরোপের বড় বড় মানমন্দিরগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে। জ্যোতির্বিদগণের তখন দূরবীণ দিয়া নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহাদি পর্য্যবেক্ষণ করাই প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইল। ফ্রান্স দেশের রাজধানী প্যারী নগরে প্রাচীন সময় হইতেই একটি মানমন্দির বর্ত্তমান ছিল। এই মানমন্দিরটিও আকাশের সব ব্যাপার নিরীক্ষণ করিবার জন্য একটা দূরবীণ সংগ্রহ করিল।

এখানে সে সময়ে একজন খুব ভাল জ্যোতির্ব্বিদ্ গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল ওলাফ রোয়েমার (Olaf Romer)। তাঁহার কাজ ছিল গ্রহগুলি ও তাদের চাঁদকে তাঁর দূরবীণ দিয়া খুব ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা। এই ভাবে দুই তিনটি গ্রহকে দেখা শেষ করিয়া প্রায় ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃহস্পতি

গ্রহকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। গ্যালিলিও তাঁহার দূরবীণ দিয়া বৃহস্পতির চারিটি চাঁদ আছে, তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন। রোয়েমারও এই

বৃহস্পতির ছায়ার দ্বারা গ্রাসোন্মুখ উপগ্রহ

চারিটি চাঁদের কথাই জানিতেন। এখন অবশ্য খুব বড় বড় দূরবীণ দিয়া দেখিয়া বৃহস্পতির নয়টি চাঁদের কথা আমরা জানি এবং অল্প কয়েক দিন হইল তাহাতে আবার আরও একটি যোগ হইয়াছে। সে যাহাই হউক, বৃহস্পতির এই চাঁদগুলিতে কি ভাবে গ্রহণ লাগে, রোয়েমার তাহারই তখন গবেষণা করিতেছিলেন। বৃহস্পতির সকলের চেয়ে নিকটস্থ চাঁদটির নাম গ্যালিলিও ইয়ো (Io) দিয়াছেন। এই ইয়ো বৃহস্পতিকে খুবই তাড়াতাড়ি প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। পৃথিবীর চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় ত্রিশ দিন সময় লইয়া থাকে। ইয়ো অর্থাৎ বৃহস্পতির নিকটতম চাঁদটি (গ্যালিলিওর সময়ে ইয়োই অবশ্য নিকটতম বলিয়া জানা ছিল। ইয়ো অপেক্ষা নিকটতর চাঁদ বৃহস্পতির আরও আছে, তাহা পরবর্ত্তিকালে জ্যোতির্বিদ্ বার্ণাড সাহেব লিক্‌মানমন্দিরের দূরবীণ দিয়া দেখিতে পান) বৃহস্পতিকে ৪½ দিনে প্রদক্ষিণ করে। বৃহস্পতির একদিন আমাদের প্রায় দশ ঘণ্টার সমান। এই জন্য পৃথিবীর সময় লইয়া হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ইয়ো প্রায় ৪২ ঘণ্টায় বৃহস্পতিকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। যে উপগ্রহ যত বেশী বার তাহার মূল গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে, তাহাতে তত বেশী বার গ্রহণ লাগিবার সম্ভাবনা। তাই ইয়োতে অনবরত গ্রহণ লাগিয়াই আছে। রোয়েমারের তাহাতে সুবিধাই ছিল, কারণ তখন তিনি গ্রহণই পর্য্যবেক্ষণ করিতে চাহিতেছিলেন।

জ্যোতির্বিদ্ রোয়েমার এই চাঁদটিকে তাঁর দূরবীণটি দিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চাঁদটি বৃহস্পতি পৃষ্ঠ হইতে সরিয়া সরিয়া এক পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সে এই প্রকাণ্ড গ্রহটির ছায়ার মধ্যে ডুবিয়া গেল। জ্যোতির্বিদের মনে হইল, আকাশের ছোট্ট একটি দীপ যেন হঠাৎ নিবিয়া গেল। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর চাঁদটি গ্রহটির অপর পাশ দিয়া আবার ফুটিয়া উঠিল। পর্য্যবেক্ষণকারীর মনে হইল, দীপটি যেমন হঠাৎ নিভিয়াছিল তেমনিই অকস্মাৎ আবার জ্বলিয়া উঠিল।

রোয়েমার সর্ব্বপ্রথমে বৃহস্পতির এই উপগ্রহটির পর পর দুইবার জ্বলিয়া ওঠা হইতে বৃহস্পতিকে তাহার একবার প্রদক্ষিণ করিবার সময় অনায়াসে বাহির করিয়া ফেলিলেন। তিনি দেখিলেন যে, এই উপগ্রহটি এই ভাবে প্রদক্ষিণ করিতে ৪২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ড সময় লইয়া থাকে। এই প্রদক্ষিণ করিবার সময় তিনি এত সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন যে, এক শত বার প্রদক্ষিণ করিতে তাহার কত সময় লাগিবে, তাহাও তিনি নির্ভুলরূপে বলিয়া দিতে সমর্থ হইবেন এইরূপ বিশ্বাস তাঁহার মনে

বদ্ধমূল হইয়াছিল। প্রদক্ষিণ করিবার সময়ের পরিমাপ করিতে যদি কোনও গোলযোগ না হইয়া থাকে, তবে ১০০ বার প্রদক্ষিণ করিতে কত সময় লাগিবে, তাহা বাহির করিতে হইলে একবার প্রদক্ষিণ করিবার সময়কে ১০০ দিয়া পূরণ করিলেই ফল পাওয়া যাইবে।

রোয়েমার প্রথম যখন পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন বৃহস্পতি ও পৃথিবী উভয়ের পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল। ছয় মাস পরে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী নিজের চলিবার পথের অপর প্রান্তে বৃহস্পতি হইতে অনেক দূরে সরিয়া গেল। এই সময়ে হয়োর বৃহস্পতিকে এক শত পাক দেওয়া উচিত। কিন্তু যে সময়ে এই এক শত বার পাক দেওয়া হিসাব করিয়া পাওয়া গিয়াছিল, পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গেল যে, ইয়ো নেমন ঘড়ি ধরিয়া চলিতেছে না। সে প্রায় ১৫ মিনিট বিলম্ব করিয়া দেখা দিতেছে। এই ১৫ মিনিটের বিলম্ব সে অবশ্য হঠাৎ করিয়া বসে নাই। প্রতিদিন একটু একটু করিয়া সে বিলম্ব করিতেছিল। রোয়েমার দেখিলেন যে, এই সময়ের মধ্যে পৃথিবী অল্পে অল্পে বৃহস্পতি হইতে দূরে সরিয়া আসিতেছে। তিনি ভাবিলেন যে, এই দূরত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সময় বেশী হওয়ার কোনও সম্পর্ক নাই ত! ইহার উত্তর ত তাঁহার হাতেই ছিল। তিনি আরও ছয় মাস, যে ছয় মাসে পৃথিবী উত্তরোত্তর বৃহস্পতির নিকটস্থ হইতেছে, সে ছয় মাস আবার ঐ চাঁদটির গতিবিধি দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে, এ ছয় মাসে অল্প অল্প করিয়া যে ১৫ মিনিট সময় বেশী লাগিয়াছিল তাহাই আবার ঠিক হইয়া গেল। দেখা গেল, পৃথিবী আবার যখন বৃহস্পতির নিকটস্থ হইল, তখন বৃহস্পতি চাঁদের গ্রহণ লাগিবার সময় হিসাব করিয়া পাওয়া সময়ের সহিত আর পার্থক্য রহিল না। তখন অকস্মাৎ তাহার মনে এই কথা উদয় হইল যে সময়ের বিলম্ব হওয়া ইহা আলোর পৃথিবীর কক্ষের এক দিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত বেশী চলিয়া যাইবার জন্য নহে ত। যদি এই কল্পনা সত্য হয়, তবে পৃথিবীর কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে আলোকের ১৫ মিনিট সময় লাগে। তিনি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন, ইহা ছাড়া আর কোনরূপ ব্যাখ্যা এই ব্যাপারের সম্ভব নহে। পৃথিবীর কক্ষের ব্যাস তাঁহার জানা ছিল। তিনি তাহা হইতে সামান্য হিসাব লাগাইয়া বলিলেন যে, আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২৫০০ মাইল পথ দৌড়াইয়া যায়। জড়বস্তু বা বিদ্যুতের মত আলোও যে চলিবার কালে কিছু সময় লইয়া থাকে, রোয়েমার শুধু ইহাই প্রমাণ করিলেন তাহা নহে, কি পরিমাণে আলোক দূরত্ব অতিক্রম করিতে পারে, তাহাও তিনি বিজ্ঞান-জগতে প্রথম প্রচার করেন।

রোয়েমারের এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের কথা তখনকার বৈজ্ঞানিকেরা প্রথমে একেবারেই স্বীকার করেন নাই। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পরে একজন ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদ্ সম্পূর্ণ অন্যভাবে আবার রোয়েমারের কথাই জগৎ সমক্ষে প্রচার করিলেন। ব্রাড্‌লি অর্থাৎ এই জ্যোতির্ব্বিদটি ইংলণ্ডের কিউ (Kew) মানমন্দিরে নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণের কাজে বহুদিন হইতেই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, যাহাদের আমরা স্থির নক্ষত্র বলিয়া থাকি, তাহারা সত্য সত্যই স্থির নহে। পৃথিবী যেমন প্রতি বৎসরে একবার ঘুরপাক খাইয়া থাকে, আকাশের নক্ষত্রগণও সেইরূপই এক বৎসরে একবার ঘুরপাক খাইয়া লয়। কেন যে সব নক্ষত্রই এইভাবে আকাশে প্রতি বৎসর একবার করিয়া বৃত্ত রচনা করিয়া থাকে, তাহা তাঁহার নিকট অতিশয় দুর্ব্বোধ্য ঠেকিল। ইহার কোন ব্যাখ্যা তাঁহার মনে একেবারেই জোগাইল না। তিনি মনে-প্রাণে বৈজ্ঞানিক-ভাবাপন্ন ছিলেন, তাই ব্যাপারটা উড়াইয়া দিতে পারিলেন না এবং মন ও দৃষ্টি বহিঃ প্রকৃতির প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম ব্যাপারের প্রতিও উন্মুখ রাখিলেন। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি হইল সেই দৃষ্টি—যাহার নিকট ক্ষুদ্রতম বিষয়ও মহত্তমের ছবি ফুটাইয়া থাকে।

একদিন তিনি টেম্‌স্ নদীর উপর নৌকা করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। নৌকায় বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার চলিবার দিক একভাবেই রহিতেছে, তাঁহার নৌকার বায়ুবেগের দিক্-নির্ণয় যন্ত্রের মুখও এক ভাবেই থাকিতেছে। যেমন যেমন তাঁহার নৌকার মুখ দিক পরিবর্ত্তন করিতেছে, বায়ুর দিক্-নির্ণয় যন্ত্রটিও সেই ভাবেই মুখ ফিরাইয়া লইতেছে। যে সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া তিনি নক্ষত্রের পর নক্ষত্র দেখিতে দেখিতে কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছেন, কতদিন, চিন্তা করিতে করিতে আহার-নিদ্রার কথা ভুলিয়াছেন অথচ কোন ফল হয় নাই, এই সামান্য ঘটনায় তাহা এক মুহূর্ত্তে তাঁহার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল। স্নান করিতে নামিয়া নিজের শরীরের ওজন হ্রাস হইয়া যাওয়ার ব্যাপারে এইভাবেই গ্রীক্ দার্শনিক আর্কি-

মিডিসকে কত বড় একটি তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছিল, তাহার গল্প তোমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। বিজ্ঞানের জন্মকথার ইতিহাসে এইরূপ বহু সুন্দর সুন্দর গল্প যেখানে সেখানে জমা আছে। যাহা হউক, ব্রাড্‌লি আকাশের মাঝে যে সমস্যা দেখিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহারই প্রতিচ্ছবি এই বায়ু-চলাচল-মাপক যন্ত্রটির ব্যবহারের মধ্যে দেখিতে পাইলেন। তিনি যে নৌকায় বসিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর রূপ ধরিয়াছিল, বাতাস রূপ ধরিয়াছিল নক্ষত্র হইতে আগত আলোক-রশ্মির এবং নৌকার নিজের চলিবার দিক্ পরিবর্ত্তন পৃথিবীর নিজের চলিবার কক্ষে ঘুরপাক খাইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ব্রাড্‌লির আবিষ্কারের সত্যকারের অর্থ বুঝিতে হইলে একটা বিষয়ের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই জন্য একটি উদাহরণ দিয়া তোমাদের নিকট ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি। কল্পনা কর, তুমি একটি রেলের গাড়ীর কামরায় বসিয়া আছ। তখনও গাড়ী চলিতে আরম্ভ করে নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে। বাতাস একেবারেই না থাকার জন্য বৃষ্টির ফোঁটাগুলি সব সোজা নামিয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় যেমুহূর্ত্তে গাড়ীটি গতিশীল হয়, বৃষ্টির ফোটা-গুলি তখন আর সোজা নামিতে দেখাযায় না, তেরছা হইয়া নামিতে থাকে। ট্রেনের গতি যেমন যেমন দ্রুততর হয়, বৃষ্টির এই তেরছা হইয়া পড়িবার ভাবও সেই রূপেই বাড়িতে থাকে। ঠিক এই ভাবেই এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে যে, নক্ষত্র হইতে যে আলো পৃথিবীতে আসিয়া লাগে, তাহাও পৃথিবীর নিজের গতির জন্য সোজা হইয়া আসিতে পায় না, তেরছা হইয়া আসিয়া লাগে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি যে কোণে (Angle) রচনা করিয়া তেরছা দেখাইতেছে, তাহা এবং ট্রেনের চলিবার গতি এইদুইটি বিষয় লইয়া বৃষ্টির ফোঁটাগুলি কিরূপ গতিতে পৃথিবীর গায়ে আসিয়া লাগিতেছে, তাহা গননা করিয়া বলিতে পারা সম্ভব। অতএব ঠিক সেই উপায়েই পৃথিবী তাহার নিজের কক্ষে যে গতিতে ঘুরিতেছে তাহা এবং যে কোণে (Angle) নক্ষত্রের আলোটি পৃথিবীর গতির দ্বারা তেরছা হইয়া যাইতেছে, সেই কোণটি লইয়া গননা করিলে আলো কি গতিতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাও গণনা করিয়া বলা যাইতে পারে। ব্রাড্‌লি এইভাবেই আলোকের গতি কত, তাহা গণনা যখন করিলেন, তখন দেখা গেল যে, রোয়েমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যেকথা বলিয়াছিলেন, এক্ষেত্রেও ঠিক সেই কথাই প্রমাণিত হইয়া গেল। তিনিও আলোকের গতি রোয়েমারের মতই প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২৫০০ মাইল বলিয়া প্রচার করিলেন। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব রোয়েমার ও ব্রাড্‌লি উভয়েরই যাহা জানা ছিল তাহাতে সামান্য ভুল বর্ত্তমান। এই ভুলটা সংশোধন করিলে আলোকের গতি দাঁড়ায় প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে মাপ দিয়া সকল প্রকার গতির পরিমাণ হইয়া থাকে তাহা দিয়া বলিতে গেলে বায়ু-শূন্য স্থানে আলোকের গতি হয় প্রতি সেকেণ্ডে ২.৯৯৭৯৬ × ১০^{১০} সেন্টিমিটার। এই সংখ্যাই আজ-কাল সব থেকে নির্ভুল বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।

মানুষের জ্ঞানের রাজ্যের একটি বিচিত্র রহস্য আছে। তাহার নিকট যদি কোনও সত্য প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সে আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। যাহা প্রকাশ পাইল তাহাকে সব দিক দিয়া ভাল করিয়া শেষ পর্য্যন্ত জানিবার ইচ্ছা তাহাকে পাইয়া বসে। তাই আলোও যে চলিতে হইলে সময়ের অধীন হইয়া পড়ে, এই তত্ত্ব যখন প্রথমে রোয়েমার ও পরে ব্রাড্‌লি প্রচার করিলেন, তখন এদিক দিয়া মানুষের চেষ্টাও আবার সজাগ হইয়া উঠিল। গ্যালিলিওর মত অতি কৌশলী বৈজ্ঞানিক পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়াও যেরূপ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, পরবর্ত্তীকালে প্রায়, সেই উপায়েই প্যারী নগরের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত আলোক-রশ্মি প্রেরণ করিয়া কর্ণু (Cornu) পৃথিবীর আলো দিয়াই আলোকের গতি ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার পর আরও একজন অদ্ভুতকর্ম্মা ফরাসী বৈজ্ঞানিক ফিজো (Fizeau) নিজের পরীক্ষাগারের মধ্যে বসিয়াই শুধু ১০।১২ ফুট লম্বা একটি যন্ত্র দ্বারা আলোকের গতি মাপিয়া ফেলিলেন। আজকাল এই গতি মাপিতে হইলে এক হাত পরিমাণ লম্বা যন্ত্র হইলেই চলে। শুধু কি তাহাই; মানুষের বুদ্ধি ও কৌশল কত অদ্ভুত, তাহা তোমরা এই ব্যাপার হইতেই অনুমান করিতে পারিবে যে, আজকাল এমন সব উপায় আবিষ্কার হইয়াছে, যাহার সাহায্যে আলোকের গতি মাপিতে গেলে আলোক-রশ্মিরই প্রয়োজন হয় না। প্রায় অবিশ্বাস-যোগ্য কথা নহে কি? বিজ্ঞানের এই সব তত্ত্ব ও তথ্য জটিল।

মানুষ কিসে বাঁচে ?

১২৬৯ পৃষ্ঠার পর

'স্বাস্থ্য অমূল্যধন' একথা আমরা সকলেই জানি। লোকে কথায় কথায় বলে—'স্বাস্থ্য যার নাই তার সুখ কোথায়' ? বাস্তবিকই যার শরীর ভাল নয়, সে কখনও সুখী হইতে পারে না। এজন্যই যদি তোমরা তোমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিতে চাও, তাহা হইলে সকলের আগে মন দিবে শরীর যাহাতে ভাল থাকে। শরীর ও মন এ দুইটি যাহার তুল্যভাবে সুস্থ আমরা তাহাকেই সুখী বলিতে পারি।

তোমার শরীর ভাল না থাকিলে মন কখনও ভাল থাকিবে না। এ দুটিকে সমানভাবে সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে সাধনার আবশ্যক। কেবল ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি করিতে পারিলে, কিংবা চার পাঁচ মন বোঝা তুলিতে পারিলে বা কুড়ি পাঁচশ ঘণ্টা জলে সাঁতড়াইতে পারিলেই যে তোমাকে সুস্থ সবল বলিব এবং সুখী বলিব, তাহা নহে।

মানুষের জীবনের দুইটি ধারা আছে—একটি ধারা বাহিরের, আর একটি ভিতরের। এদুটির সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারিলে তবে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা হয় এবং আমরা সুখীও হইতে পারি।

আমরা কেমন করিয়া বাঁচিতেছি, সেদিকে একবার লক্ষ্য কর! বনের ভিতর বাঘ, সিংহ, ভল্লুক যেমন শিকার ধরে এবং তাহাদের আক্রমণের ভয়ে যেমন অন্যান্য নিরীহ জানোয়ারদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া চলিতে হয়, আমাদেরও সেইরূপ প্রতিদিন বাঁচিবার জন্য যে দিনরাত কত যুদ্ধ করিতে হইতেছে, সে সংবাদ কি রাখ? আমরা মৃত্যুর মধ্যেই বাঁচিয়া আছি। কথাটা তোমাদের কাছে আশ্চর্য্য মনে হইলেও কিন্তু অতি সত্য কথা।
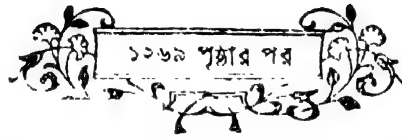
একদিন স্কুলে গিয়া শুনিলে, তোমাদের একজন সহপাঠী কলেরায় মারা গিয়াছে! কথাটা শুনিয়া তোমাদের প্রাণে ব্যথা লাগিল, এ কেমন করিয়া হইল? কাল যাহার সহিত খেলা করিয়াছি, কত কথা বলিয়াছি, হাসি ঠাট্টা ও দুষ্টুমি করিয়াছি, আজ কি না সে আর বাঁচিয়া নাই! সে ত অসুস্থ ছিল না। কিন্তু ঘটনাটা যে সত্যই ঘটিয়া গিয়াছে। অবিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া? কেন এমন হয়? সেকথাই শোন।

তোমরা সাধারণতঃ খালি চোখে মশা, মাছি, ছারপোকা, এঁটোলি, পিপীলিকা এই সব অনেক ছোট ছোট প্রাণী দেখিতে পাও। কিন্তু এই সকল প্রাণী অপেক্ষাও অতি ক্ষুদ্র প্রাণী আছে—তাহাদের খালি চোখে মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ ক্ষুদ্র প্রাণী অসংখ্য। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া এইক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের নাম Microbe—কিনা জীবাণু। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে হাজার হাজার গুণ বড় করিয়া দেখিলে তবে ইহাদের দেখা যায়। এই জীবাণুর কতকগুলি এত ক্ষুদ্র যে, তাহাদের লক্ষ লক্ষটি যদি সমসূত্রে সাজাও, তবে আধ ইঞ্চিরও বেশী হয় কি না সন্দেহ। কলেরার জীবাণু যদি পাঁচিশ হাজারটা দিয়া লম্বালম্বি সারগাঁথা যায়, তবে একইঞ্চি মাত্র লম্বা হয়! তোমরা একটি সরু ছুঁচের আগায় ইহাদের অনেক হাজার রাখিতে পার। এই জীবাণু শরীরে ঢুকিলে আর রক্ষা নাই। এক

একটি জীবাণু হইতে এক এক দিনে দেড় হাজার জীবাণু জন্মাইতে দেখা গিয়াছে। কলেরার জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে অমনি কলেরা রোগ দেখা দেয় এবং দেখিতে দেখিতে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। কলেরার জীবাণুকে Cholera vibrios বা Comma bacillus বলে। কারণ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে (comma) ',' চিহ্নের মতন বাঁকা বাঁকা দেখায়।

পারিলেই আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং ভীষণ অসুখের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের জীবন নিঃশেষ করিয়া দেয়।

আমাদের দেশে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাণত্যাগ করে। কিভাবে কেমন করিয়া ম্যালেরিয়া জ্বর বিস্তারলাভ করে, পূর্ব্বে লোকে তাহা জানিত না, এজন্য কোন চিকিৎসাতেই কেহ তেমন
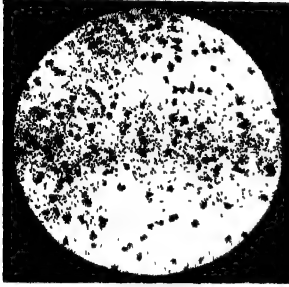
কলেরার জীবাণু
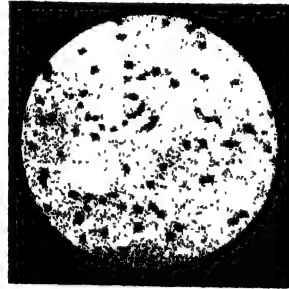
প্লেগের জীবাণু

টাইফয়েডের জীবাণু

ওলাউঠার জীবাণু ময়লা জলের মধ্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু খুব পরিষ্কার জলে একদিনের বেশীও বাঁচে না। বেশী গরমজলে জীবাণু মরিয়া যায়। সুতরাং কাঁচা জিনিষ ঠাণ্ডা না খাইয়া রান্নাকরা জিনিষ গরম খাওয়াই হইতেছে ভাল, ওলাউঠা রোগ সাধারণতঃ জল, দুধ ইত্যাদির মধ্যদিয়া আসিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। এইজন্য জল ও দুধ কোন সময়েই উষ্ণ

ফল লাভ করিত না। ফলে ঘরে ঘরে লোক মরিত। কিন্তু এখন ম্যালেরিয়া জ্বর দিন দিনই হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। এই ম্যালেরিয়া জ্বর বিস্তারের মূলেও জীবাণু রহিয়াছে। পূর্ব্বে অনেক বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছিলেন যে, ম্যালেরিয়া জীবাণু মশার দ্বারাই মানুষের দেহে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু কি ভাবে কেমন করিয়া তাহা হয়, পূর্ব্বে কোন বৈজ্ঞানিক স্থির
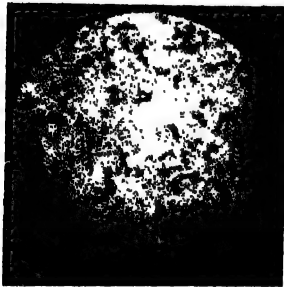
পীতজ্বরের জীবাণু
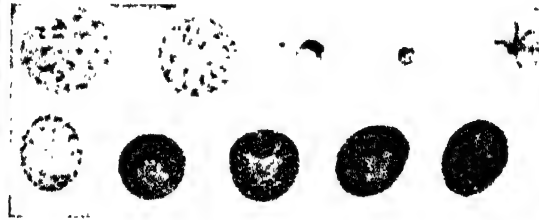
ম্যালেরিয়ার জীবাণু

যক্ষ্মার জীবাণু

না করিয়া পান করিতে নাই। এমন কি পরিশোধিত কলের জলও উষ্ণ করিয়া পান করা ভাল।

কলেরার জীবাণুর ন্যায় যক্ষ্মা রোগের জীবাণুও শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমাদের জীবনীশক্তি নাশ করে। এইরূপ ভাবে টাইফয়েড রোগের জীবাণু, প্লেগের জীবাণু প্রভৃতি একবার শরীরে প্রবেশ করিতে

করিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বর্গীয় ডাক্তার রস (Ronald Ross) ভারতবর্ষে আসিয়া শত শত মশা পরীক্ষা করিতে করিতে অবশেষে কৃতকার্য্য হইলেন, এবং এনোফেলিস্ (Anopheles) নামক মশার শরীরে ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণুর সন্ধান পাইলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, এই মশা

ম্যালেরিয়া জ্বরগ্রস্ত রোগীর শরীর হইতে যখন রক্ত শোষণ করে, সেইসময় রোগের জীবাণুও শোষণকরিয়া থাকে। এনোফেলিস্ মশার ক্ষুদ্রদেহের মধ্যে এই জীবাণুগুলি অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া শিরা উপশিরায় ছড়াইয়া পরে। পরে

রোণাল্ড রস

বেঞ্জামিন রস

ষ্টিগোমিয়া মশা

এনোফেলিস্ মশা (বর্দ্ধিতায়তন(
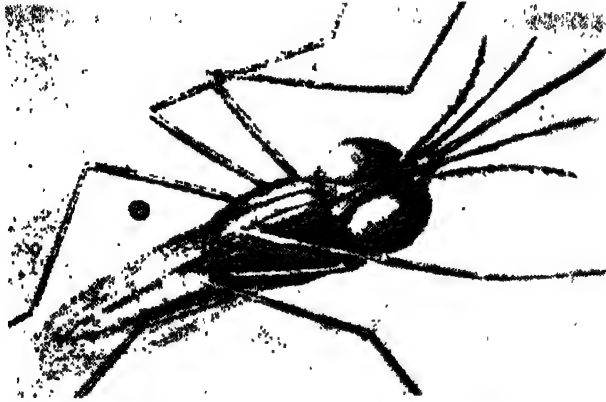
এই মশা অন্য কাহাকেও কামড়াইলে ম্যালেরিয়া-জীবাণু তাহার শরীরের ভিতর প্রবেশ করে। তাহার ফলে সেই লোকটি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়। এই ভাবে এনোফেলিস্ মশার দ্বারা ম্যালেরিয়া-জীবাণু হাজার হাজার লোকের মধ্যে প্রসার লাভ করে। ডাঃ রসের এই আবিষ্কারের দ্বারা আজ পৃথিবীর মহদুপকার হইয়াছে। কি করিয়া এই মশা ধ্বংস করা যায়, কেমন করিয়া ম্যালেরিয়া জরের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, সে বিষয়ে এখন চিকিৎসকেরা অনেক কিছু ঔষধ ও উপায়ের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এখানে আর একটা কথাও তোমাদের বলিতেছি। সকল জাতীয় মশাই যে ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু বহন করে, তাহা নহে। কেবলমাত্র স্ত্রী-জাতীয় এনোফেলিস্ মশারাই ম্যালেরিয়ার বাহন। আমরা সচরাচর যে জাতীয় অসংখ্য মশা দেখিতে পাই এবং যাহারা উড়িবার সময়ে একপ্রকার শব্দ করে, তাহাদের নাম কিউলেক্স (Culex) মশা। এই মশাগুলি এনোফেলিস্ মশা হইতে দেখিতে একটু বড় ইহাদের গায়ে কোনরূপ চিহ্ন নাই। কিউলেক্স মশা অপকারী নহে—ইহারা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে না। এনোফেলিস্ ও কিউলেক্স মশা চিনিবার উপায়ও অতি সহজ। এনোফেলিস্ মশা কোনজিনিষের উপর বসিবার সময় মাথার উপর ভর দেয় এবং পিঠ ও লেজ উল্টা করিয়া বসে। আর কিউলেক্স জাতীয় মশা পিঠ বাঁকাইয়া ধনুকের মত হইয়া বসে

ষ্টিগোমিয়া মশা (বর্দ্ধিতায়তন)
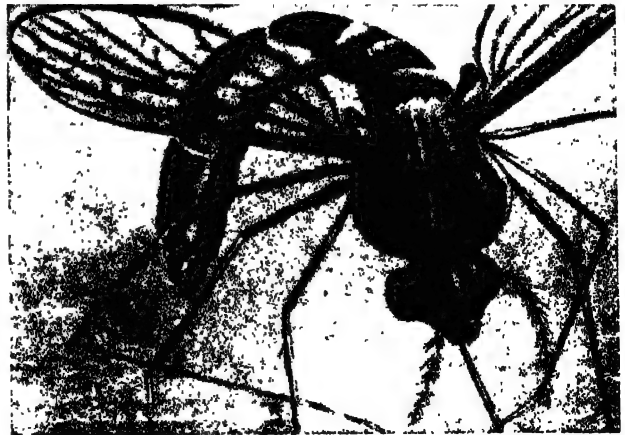
ডাক্তার রসের ন্যায় আর একজন মহাপুরুষ মেজর রিড্ (Major Walter C. Reed) এবং তাঁহার সহযোগী কয়েকজন চিকিৎসক কিউবাতে পীত-জ্বরের জীবাণুর সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ষ্টিগো-মিয়া (Stigomya) নামক মশকের দংশনের ফলেই

এনোফেলিস মশা ষ্টিগোমিয়া মশা

পীত-জ্বর বিস্তৃত হইয়া পড়ে—ষ্টিগোমিয়া মশাই পীত-জ্বরের বাহন। কিন্তু এই ষ্টিগোমিয়া মশার দংশনে পীত-জ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ষ্টিগোমিয়া মশা আবার গোদের(Elephantiasis) বীজাণু(Micro-filaria) মাক্রোফাইলেরিয়া বহন করিয়া থাকে। মানুষের জীবন রক্ষার জন্য এই যে জীবন দান তার কি কোনও তুলনা আছে?

এনোফেলিস ও ষ্টিগোমিয়া মশা যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর এবং পীত জ্বরের বাহন, তেমনি এই যে তোমরা তোমাদের কাছে প্রতিনিয়ত মাছি মহাশয়কে দেখিতে

এনোফেলিস মশার মাথা ও হুল
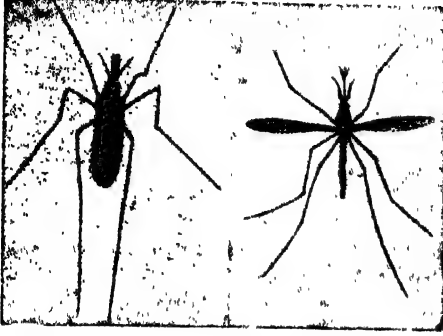
পাও, ইনিও আমাদের কম শত্রু নন। ইহারা কলেরা রোগের জীবাণু এবং অন্যান্য রোগের জীবাণু, রোগীর দেহ হইতে, মল-মূত্র হইতে, নিষ্ঠীবন ও আবর্জ্জনা হইতে বহিয়া আনিয়া আমাদের খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া দেয়। আমরা অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ সে সকল খাদ্য গ্রহণ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লই। মশার নিকট হইতেও যেমন সাবধান থাকিতে হয়, তেমনি মাছির নিকট হইতেও সর্ব্বদা সাবধানে থাকা একান্ত আবশ্যক। কোনও খাবার জিনিষে মাছি বসিলে বা পড়িলে তাহা কখনও খাইতে

ষ্টিগোমিয়া মশার শৈশবাবস্থা

মাছির পা (বর্দ্ধিতায়তন)

নাই। ঐ দেখ সাধারণ মাছির পা, এই পা দিয়াই সে রোগের জীবাণু খাদ্যে ও জলে ছড়াইয়া দেয়।

বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে, প্লেগ জীবাণুও এক জাতীয় মাছিই বহন করিয়া থাকে। এই মাছির নাম

১নং প্লেগের বাহন মাছি

র‍্যাট-ফ্লি (Rat-flea)। ইহারা প্লেগাক্রান্ত রোগীর দেহ হইতে কিংবা প্লেগে মৃত ইন্দুরের শরীর হইতে রোগ

বিস্তার করে। এখানে প্লেগ বিস্তারকারী মাছির বিভিন্ন আকারের ছবি দেখ। ১নং ছবি অপেক্ষা ২নং ছবিটি প্রকৃত আকার হইতেও খানিকটা বাড়াইয়া
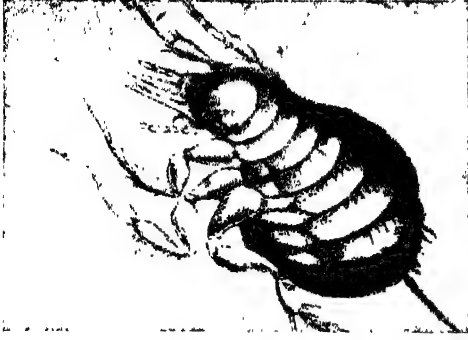
২নং মৃত্যুর বাহন—মহামারী (প্লেগ) মাছি

আঁকা হইয়াছে। দেখ, কি তার ভীষণ আকার! দেখিলেই ভয় হয়। এই মহামারী মাছির আক্রমণে দেশের পর দেশ শ্মশান হইয়া গিয়াছে। আমাদের

সেট্‌সী মাছি এঁটোলি

দেশেও ইহার প্রতাপ এক সময়ে বড় একটা কম ছিল না। এখনও একেবারে সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইয়াছে কি?

পশ্চিম আফ্রিকায় এক প্রকার পীড়া আছে তাহার নাম ঘুম রোগ (Sleeping Sickness)। এই রোগে আক্রান্ত লোকেরা ঘুমাইতে ঘুমাইতে মরিয়া যায়। এই ঘুম-রোগ বিস্তারের মূলেও কিন্তু ঐ মাছি। ঘুম-রোগের বাহন এই মাছির নাম সেট্‌সী মাছি (Setse-fly)। পশ্চিম আফ্রিকার হাজার হাজার লোক এই মাছির দ্বারা ঘুম রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেট্‌সী মাছির মাথাটি দেখ। ইহার মাথাটি যে দেখিতে কিরূপ অদ্ভুত প্রকারের, তাহা দেখাইবার জন্য এখানে উহার মাথার ছবিটি দেওয়া হইল।

মশা, মাছি ছাড়াও টিক্‌স্ বা এঁটোলির দ্বারা

ঘুম রোগের বাহন সেট্‌সী মাছি

টাইফাস প্রভৃতি সংঘাতিক রোগ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। ছবিতে রক্তশোষক এঁটোলির আকৃতি দেখ।

আমরা পূর্ব্বে তোমাদের কাছে যে সব জীবাণুর কথা বলিয়াছি, তাহাদের কেহই

ঘুম রোগের বাহন সেট্‌সী মাছির মাথা

যে আমাদের উপকারী নয়—ভীষণ শত্রু, সে কথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছ, কিন্তু সকল জীবাণুই যে আমাদের শত্রু, তাহা নয়। কতকগুলি জীবাণু আমাদের সত্য সত্যই কল্যাণ করিয়া থাকে। তাহারা না থাকিলে আমরা বাঁচিতে পারিতাম কিনা, তাহাই সন্দেহ স্থল। আমাদের শরীরের ভিতর উপকারী এবং অপকারী এই দুই রকমের জীবাণুই অনবরত প্রবেশ করিতে থাকে। উপকারী জীবাণু-গুলি আমাদের দেহের মধ্যে যে সকল অনিষ্টকারী জীবাণু থাকে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। মারিয়া

শাদা কণিকাগুলি কাল টাইফয়েড্ রোগের জীবাণুগুলিকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। এই শাদা কণিকার সহিত যুদ্ধে যদি কাল টাইফয়েড্ জীবাণুগুলি হার মানে, তাহা হইলে রোগী রোগমুক্ত হইবে। আর যদি টাইফয়েডের জীবাণু শাদা কণিকাগুলিকে হার মানাইতে পারে রোগীর মৃত্যু অবধারিত। কি বিচিত্র এই জীবন-সংগ্রাম!

ফেলে বলিয়াই আমরা বাঁচিতে পারি। যদি কোনও রকমে অপকারী জীবাণুর সংখ্যা বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে আমরা পীড়িত হই। দেহের ভিতর উপকারী ও অপকারী এই দুই জীবাণুর মধ্যে অনবরত সংগ্রাম চলিয়াছে। এই ব্যাপারটা অতি সহজেই পরীক্ষা করা যায়। অণুবীক্ষণ দিয়া যদি এক ফোঁটা রক্ত পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে বর্ণবিহীন জলীয় পদার্থের মধ্যে অসংখ্য লোহিত বর্ণের রক্ত-কণিকার সঙ্গে কয়েকটি শাদা কণিকাও ভাসিতেছে। এই শাদা কণিকাগুলি আমাদের দেহের মধ্যস্থ উপকারী জীবাণু। ইহারা শরীরের ভিতরকার অপকারী বিষাক্ত জীবাণুর ধ্বংস করিতে থাকে। আমাদের শরীরের ভিতরকার এই সব শাদা কণিকার হ্রাস হইলেই শরীর অসুস্থ হয়। বড় ছবি খানিতে দেখ। একফোঁটা রক্তের মধ্যে কি ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে। একদিকে জীবন—অন্যদিকে মরণ!

আবার এক শ্রেণীর জীবাণু আছে—তাহারা দেখিতে লম্বা, গোল এইরূপ নানা আকারের হয়। ইহারা এক একটি জীবাণু খণ্ড খণ্ড হইয়া বহু নূতন জীবাণুর সৃষ্টি করে। এই জীবাণুর সাহায্যেই দুধ হইতে দধি, মাখন, পনীর এবং তাল ও খেজুরের রস হইতে সোরা বা মদ জন্মিয়া থাকে। দধির এই জীবাণু আমাদের শরীরের ভিতরকার অপকারী জীবাণুদিগকে নাশ করিতে পারে। এই জন্যই আজকাল চিকিৎসকেরা দই খাইতে উপদেশ দেন।

এখন দেখিলে ত, মানুষ আমরা কেমন করিয়া বাঁচি। কেবল যুদ্ধই চলিতেছে। সকলেরই আহার চাই; গাছপালা বল, জীবজন্তু বল, কেহই না খাইয়া বাঁচিতে পারে না। জীবাণুরা বাঁচে—আমাদের খাদ্যের সারটুকু শুষিয়া লইয়া। সেই সার যদি মাংসের হয়, তবেই হয় খুব ভাল, কেননা নিরামিষ জিনিষটাকে তাহারা তেমন পছন্দ করে না। এই জন্যই যাহারা মাছ-মাংস খান, তাহাদের অপেক্ষা নিরামিষভোজীর শরীরে জীবাণু তেমন বেশী অত্যাচার করিতে পারে না। কাজেই, আমাদের 'অমূল্য ধন' স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিতে হইলে চাই, নির্ম্মল বাতাস, নির্ম্মল জল, দীপ্ত সূর্য্যালোক, আর খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা প্রত্যেক বিষয়েই সংযম। সংযম স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রধান শিক্ষা।

এখন বুঝিতে পারিলে যে মানুষের শিখিবার কত কি পড়িয়া আছে। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার দেহে ও মনে, ভিতরে ও বাহিরে যুদ্ধের পর যুদ্ধই চলিতেছে। ক্ষুদ্র মশা, মাছি, তাহার শত্রু, অতি ক্ষুদ্র জীবাণু তাহাকে মৃত্যুর পথে টানিয়া লয়। অতএব জীবন পথে কোনদিন খাওয়া-দাওয়া চলা ফেরা, দেখা-শুনা, একটি বিষয়েও অসাবধান হইবে না। বড় বড় যুদ্ধের সেনাপতিরা যেমন সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেকটি বিষয় জানিয়া তদনুরূপ চালনা করেন, তেমনি তোমাকেও সেনাপতিরূপে প্রতিমুহূর্ত্ত সংগ্রাম করিতে হইতেছে। এই সংগ্রামের মধ্যেই ঈশ্বর আমাদের কাছে জীবন ও মরণের মত সমস্যা লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ংরাজী-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

স্পেন্সার

৯৫৩ পৃষ্ঠার পর

চশারের পর যে ইংরাজ কবির নাম ও যশঃ ইংরাজী-সাহিত্যে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার নাম স্পেন্সার (Spenser)। স্পেন্সারের সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন কবির কথা বলিব। ইঁহাদের কথা বলিতে হইলে প্রথমেই একদল স্কটল্যাণ্ডের কবির কথা বলা আবশ্যক। প্রথম জেম্‌স্ ইঁহাদের একজন। King's Quair তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। জেম্‌স্ রাজপুত্র হইলেও নানা চক্রান্তে পড়িয়া অদৃষ্টের দোষে জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই বন্দী অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন। জেম্‌স্ যখন বন্দী, সে সময়েই সেই তরুণ বয়সে তিনি জোয়ান বফোর্ট (Joan Beaufort) নামে এক সুন্দরী নারীকে ভালবাসেন। এই কবিতাটি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা হইয়াছিল। এই কবিতার ভিতর তাঁহার মনের ভাব অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরাধীনতার জীবন যে কত দুঃখের, সে কথা ইহার প্রত্যেটি ছত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। স্বাধীন জীবন লাভের জন্য তাঁর প্রাণের মধ্যে যে কত বড় ব্যাকুলতা, তাহা এই কবিতায় অতি সুন্দর ভাবে বিদ্যমান্। আমাদের চোখের সম্মুখে যেন কবির বন্দীজীবনের করুণ চিত্রটি ফুটিয়া উঠে। আমরা যেন দেখিতে পাই, তিনি বিদেশে বন্দী, পরের অনুগ্রহে তাঁহার জীবন বাঁচিতেছে। কিসের এ জীবন? কোথায় তাঁহার দেশ? আর কে জানে তাঁর অদৃষ্টে কি আছে। এই কবিতাটি ছাড়া জেম্‌স্ সাধারণ লোকের জীবনের কথা লইয়াও অনেক গীতিকা (Ballad) রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বেশ একটি হাস্যরসের সমাবেশ আছে।
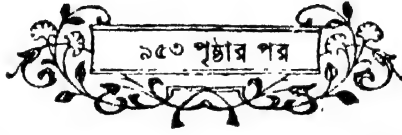
জেম্‌স্ ব্যতীত উইলিয়ম ডানবার (Willam Dunbar) এবং গেভিন ডগলাস্ (Gavin Douglas) নামে আরও দুইজন স্কটল্যাণ্ডের কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। ডান্‌বারের কতকগুলি কবিতা এত সুন্দর যে, তাঁহাকে চশার ও স্পেন্সারের মধ্যযুগের সকলের চেয়ে বড় কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার রচিত "The Dance of the Seven Deadly Sins" পড়িলে মনে হয় যে, 'রূপক' কবিতা লিখিবার দিকে তাঁহার

বেশ ঝোঁক ছিল। সেকালের কবিদের প্রায় সকলেই রূপক কবিতা লিখিবার দিকে খুব খেয়াল ছিল। "The Lament of the Makers" কবিতাটিকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলা যাইতে পারে।

ডগলাস্ ছিলেন প্রকৃতির একনিষ্ঠ ভক্ত—সৌন্দর্য্যের উপাসক। ডানবারের মত ডগলাসেরও রূপক কবিতা লিখিবার দিকে ঝোঁক ছিল, তাহা তাঁহার "His Palace of Honour" এবং King Hart পড়িলেই বুঝা যায়।

অন্ধ হেন্‌রি বা হ্যারী এ সময়ের আর একজন কবি। ইনিও স্কটল্যাণ্ডবাসী। তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থের নাম উইলিয়াম ওয়ালেস্ (William Walace), ইহা পয়ার ছন্দে (Rhyming Couplet) লিখিত গীতিকা।

এইবার সেকালের ইংরাজ কবিদের কথা বলিতেছি। এ সময়ে ওয়াট্ (Wyatt) এবং সারে (Surrey) নামক দুইজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। দুইজনেই প্রেমের কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তোমরা ইংরাজীতে ও বাঙ্গলাতে যে সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হও, ওয়াট্ ও সারেই প্রথমে তার প্রচলন করেন।

এই দুইজন কবি ছাড়া সে সময় বহু গীতিকা-লেখক জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত সে সমুদয় 'গীতিকা' এখন আমরা Percy-র Reliques of Ancient English poetry-তে দেখিতে পাই। এই কবিতাগুলির মধ্যে সেকালের বীরপুরুষদের বীরত্ব, সাহস, তেজ ও শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনীই বেশী। তাহাতে বীরপুরুষদের আত্মত্যাগের কাহিনী পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইতে হয়।

ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মাঝখানে যে দেশটি, তাহা সীমান্ত প্রদেশ নামে পরিচিত। এই দেশে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। কত রক্তের ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে! এই দেশের পাহাড়-পর্ব্বত, ঝরণা ও নদী, গাছপালা সকলেই শত শত বীরপুরুষের আত্মত্যাগ দেখিয়াছে। কিন্তু সীমান্ত দেশের দক্ষিণে, ইংল্যাণ্ডের উত্তর ভাগে যে সব গীতিকা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কিন্তু বীরত্বের সুর নাই—ইহাদের প্রায় সবই রবিন-হুড্ (Robin Hood)-এর মনোরম কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। রবিন-হুড্ ছিল একজন দস্যু—সে ধনীর ধন হরণ করিয়া গরীবের দুঃখ দূর করিত। সমস্ত ইংরাজী কাব্যে রবিন-হুডের মনোরম কাহিনী লিখিত আছে।

এইবার আমরা রাণা এলিজাবেথের যুগে আসিয়া পড়িলাম। ইংরাজী কবিতাকে যে কয়টি যুগের মধ্যে ভাগ করা যায়, তার মধ্যে এলিজাবেথের যুগ অন্যতম। এলিজাবেথের যুগ নানা কারণে বিখ্যাত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই যে বর্ত্তমান গৌরব ও প্রতিষ্ঠা, তাহার প্রথম সূত্রপাত সে সময়েই আরম্ভ হইয়াছিল। এখানে সে কথা বলিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। ঐ সময়ে সাহিত্যের দিক্ দিয়া যে অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল, সে কথাই আমরা বলিব।

এ সময়ে দুইজন খুব বড় লোকের আবির্ভাব হয়। একজন এডমণ্ড্ স্পেন্সার (Edmund Spenser), অপর উইলিয়ম সেক্সপীয়র (William Shakespeare)। আজও তাঁহাদের প্রতিভার জ্যোতিঃ সমস্ত পৃথিবীতে আলোক দান করিতেছে। ইহারা দুইজনেই এলিজাবেথের যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। ১,৩০০ খৃষ্টাব্দে চশারের মৃত্যু হয়। তার পর হইতে এডমণ্ড্ স্পেন্সারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর কোন প্রসিদ্ধ কবি ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

১৫৫২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে এডমণ্ড্ স্পেন্সারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন গরীব, কিন্তু কোন একজন সদাশয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করিয়া, এডমণ্ড্ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যান। গরীবের ছেলে ছিলেন বলিয়া কেম্ব্রিজে তাঁহাকে অনেক হীন কাজ করিতে হইত। তার পর তিনি কেম্ব্রিজ ছাড়িয়া ইংল্যাণ্ডের উত্তর-ভাগে কোথাও চলিয়া যান। খুব সম্ভব, সেখানে কোনও ধনী পরিবারের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি রোজালিণ্ড (Rosalind) নামে একটি সুন্দরী মেয়েকে ভালবাসেন। রোজালিণ্ড তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন। তাহা হইলেও তিনি স্পেন্সারকে কবিতা লিখিবার জন্য খুব উৎসাহ দিতে থাকেন। এ সময়ে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বৎসর। ইহার পর বহু বৎসর তিনি বিবাহ করেন নাই।

এডমণ্ড্ স্পেন্সার

স্পেন্সারের বয়স যখন বিয়াল্লিশ বৎসর, সে সময়ে তিনি এলিজাবেথ (Elizabeth) নামে একটি আয়র্ল্যাণ্ড দেশের মেয়েকে বিবাহ করেন এবং "Epithalmion" নামে একটি কবিতা রচনা করেন। বিবাহের বিষয় লইয়া পৃথিবীর নানা ভাষায় যে সকল কবিতা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই কবিতাটিও অত্যুৎকৃষ্ট কবিতাগুলির সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে।

সেক্সপীয়র

স্পেন্সার লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সহিত সার ফিলিপ সিড্নি (Sir Philip Sidney) এবং ওয়ালটার র‍্যালে (Walter Raleigh)র সাক্ষাৎ হয়। তখন সিড্নির বীরত্ব-কাহিনী ও র‍্যালের দুঃসাহসিকতা তাঁহার প্রাণে নবীন প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছিল। এই দুইজন প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রভাবেই তিনি Fairie Queen লিখিয়াছিলেন। এই কাব্যখানিই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে স্পেন্সার Shepherd's

Calendar" নামে একটি কবিতা লেখেন। গ্রাম্য জীবনের উপর এত সুন্দর কবিতা ইংরাজী সাহিত্যে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি আয়র্লাণ্ডের গভর্ণার লর্ড গ্রের (Lord Gray) সেক্রেটারি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাহার জীবন আয়র্লাণ্ডেই কাটিয়াছিল। এই সময়ে তিনি একজন আইরিস্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রায় তিন হাজার একর জমি লাভ করেন। তাঁহার Fairie Queen-এর বেশীর ভাগ এখানেই রচনা করেন। এ সময়ে আয়লাণ্ডের লোকেরা ইংরাজদের উপর বিরূপ হইয়া উঠে, এমন কি, বিদ্রোহ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। বিদ্রোহী আইরিস্‌রা স্পেন্সার যে দুর্গে বাস করিতেন, সেখানেও আগুন লাগাইয়া দেয়; তিনি কোন প্রকারে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন। লণ্ডনে ফিরিয়া আসিবার পরের বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জীবনের শেষ এক বৎসর দারিদ্রের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। ওয়েস্টমিনিষ্টার এবিতে (West Minister Abbey) চশারের পাশে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। লর্ড এসেক্স (Lord Essex) উহার সমুদয় ব্যয়-ভার বহন করিয়াছিলেন। স্পেন্সার বহু কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু Fairie Queen হইতেছে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজন-বিদিত কবিতা। উহা ছন্দে গাঁথা গল্পের সমষ্টি। এই কবিতার শব্দ-সম্পদ ও ছন্দ অপূর্ব্ব। প্রত্যেকটি গল্পই রূপক এবং ধর্ম্মতত্ত্ব শিখাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু গল্পের জন্যই এর আদর—রূপকের জন্য নয়। ইহার বর্ণনা এমন মধুর যে, পড়িতে পড়িতে চিত্ত সে কোন কল্পলোকে চলিয়া যায়। প্রত্যেক গল্প যেন সজীব হইয়া আসিয়া আমাদের কাছে দেখা দেয়। আমরা এখানে Fairie Queen-এর একটি গল্প বলিব।

কোন এক সময়ে গ্লোরিয়ানা (Gloriana) নামে এক পরীদের রাণী রাজত্ব করিতেন। একদিন ইউনা (Una) নামে এক অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী রমণী তাঁহার সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইউনা —সত্যের প্রতীক্। সে রাণীর কাছে তাহার দুঃখের কাহিনী বলিল। রাজকুমারী হইয়াও তাঁহার সুখ নাই—কোথা হইতে

এক বিরাটকায় অজানা দৈত্য আসিয়া তাহার পিতার রাজধানী ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে; ঐ দৈত্যের ভয়ে তাহার পিতামাতা কেহই দুর্গের বাহিরে আসিতে পারেন না। ইউনা বলিল, দয়াময়ী দেবি! আপনি একজন বীরপুরুষ (Knight) পাঠাইয়া আমার পিতার রাজ্য রক্ষা করুন— যিনি অনায়াসে দৈত্যকে বধ করিয়া আমার পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে পারেন।

এ সময়ে জর্জ্জ (George) নামে এক যুবক আপনাকে বীর (Knight) বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য গ্লোরিয়ানার কাছে আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সে উজ্জ্বল বর্ম্ম পরিয়া ইউনার সঙ্গে চলিল,—তার হাতে ছিল ঢাল এবং সেই ঢালে একটি লাল ক্রুশ আঁকা ছিল। এইজন্য তাহার নাম হইল লাল ক্রুশের বীর (Red Cross Knight)। সে ধর্ম্মের প্রতীক্। ইউনা এবং জর্জ্জ দুই জনে বাহির হইল দৈত্যকে বধ করিবার মত দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে। প্রথমে ভুল (Error) নামে দৈত্যের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। বীরপুরুষ তাহাকে হত্যা করিয়া নানা নূতন নূতন বিপদের মধ্য দিয়া দুর্জ্জয় জয়-যাত্রার পথে অগ্রসর হইয়াছিল। বন-পথের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে ইউনা ও জর্জ্জ পথ হারাইয়া তাঁহারা একটা বড় গুহার মুখে আসিল। এই গুহার মধ্যে থাকিত সেই দৈত্য; যাহার নাম ভুল। একথা ইউনা জানিত! তাই বীরপুরুষকে গুহার মধ্যে ঢুকিতে বারণ করিল। কিন্তু জর্জ্জ তাহার কথা শুনিল না; সে ইউনাকেও নানা কথায় উৎসাহিত করিয়া বাহিরে রাখিয়া সেই ভীষণ গহ্বরে প্রবেশ করিল। গুহার মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র 'ভুল' ভীষণাকার ড্রাগনের আকারে তাহাকে আক্রমণ করিল, এবং বীরপুরুষকে জড়াইয়া ধরিল। ইউনা এই সময়ে তাহাকে খুব উৎসাহিত করিল। জর্জ্জ এক হাতে নাগপাশের বন্ধন মুক্ত করিতে লাগিল এবং অপর হাত দিয়া ভীষণ জোরে তরওয়ালের আঘাত করিয়া ড্রাগনটার মাথা কাটিয়া ফেলিল। এই ভাবে সেই গুহা

ইউনা

পথে এক বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল

হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়িল এবং পুনরায় পথ খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাদের সঙ্গে এক জন বৃদ্ধের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার পরিধানে সন্ন্যাসীর বেশ! সন্ন্যাসীর বেশ হইলে কি হইবে? লোকটি আদৌ ধার্ম্মিক পুরুষ নয়, সে ছিল এক সয়তান!

জর্জ্জ ও ড্রাগন

তার নাম আর্কিমাগো (Archimago)। সে সয়তান ও যাদুকর। ইউনা ও লাল ক্রুশের বীর একথা জানিত না, সুতরাং তাহারা এইরূপ একজন লোকের আশ্রয় পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহার সহিত গেল এবং তাহার দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করিয়া সেইখানেই আশ্রয় লইল। আর্কিমাগোর মনোগত অভিলাষ ছিল, তাহাদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া। সে জানিত, ইহারা দুইজনে যদি এক সঙ্গে থাকে, তাহা হইলে তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে না, বরং বিপদের সম্ভাবনাই বেশী। সে কৌশল করিয়া দুইজনের বিচ্ছিন্নতার কারণ ঘটাইল।

আর্কিমাগো লাল ক্রুশের বীরকে স্বপ্নে দেখাইলেন যে, তাহার সঙ্গিনী ইউনা অতি দুষ্টা স্ত্রীলোক। জর্জ্জ এইরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভয়ানক ভয় পাইল এবং ইউনাকে না জাগাইয়া পলাইয়া গেল। জর্জ্জ বনে একা একা ঘুরিতে ঘুরিতে অজানা পথে চলিতে লাগিল। সেই পথে তাহার সহিত আর একজন বীরের সাক্ষাৎ হইল.—ইহার নাম অবিশ্বাসী (Faithless)।

তাহার সঙ্গে এক অতি সুন্দরী স্ত্রীলোক ছিল। তাহার পরিধানে লাল কাপড, পায়ে নূপুর; যখন সে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিতে থাকিত তখন তার নূপুরের রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু শব্দে চারিদিক ধ্বনিত হইয়া উঠিত। অবিশ্বাসীর সহিত লাল ক্রুশের বীরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই যুদ্ধে

স্ত্রীলোকটি ঘোড়ায় চড়িয়া পলায়ন করিল

অবিশ্বাসীর পরাজয় ও মৃত্যু হইল। সুযোগ পাইয়া অবিশ্বাসের সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটি পলায়ন করিল। লাল ক্রুশের বীর ছুটিলেন

তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পেছনে। অবশেষে বীরপুরুষ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ঐ রমণী বলিল, তাহার নাম বিশ্বাস (Faith)। অবিশ্বাসী তাহার সঙ্গীয় অপর বীরপুরুষকে হত্যা করিয়া তাহাকে লইয়া আসিয়াছে। কথাটা একেবারেই সত্য নয়। এই নারীর যথার্থ নাম বিশ্বাস নয়, তাহার প্রকৃত নাম মিথ্যা (Falsehood)।
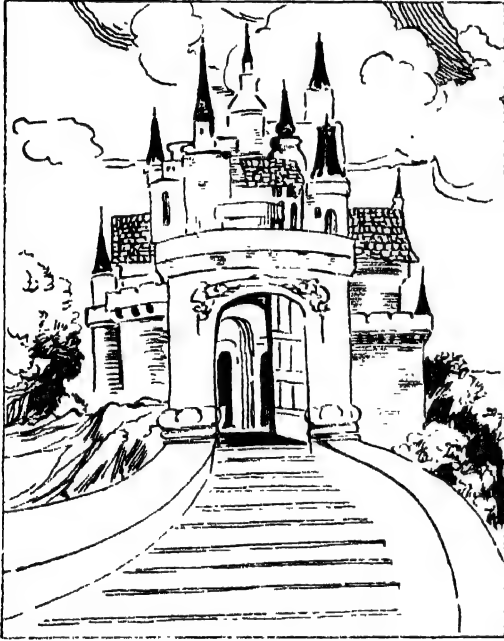
অহঙ্কারের রাণীর প্রাসাদ

লাল ক্রুশের বীর ইহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সে তাহাকে লইয়া চলিল অহঙ্কারের রাণীর (Queen of Pride) প্রাসাদে। এই রাণীর মত গর্ব্বিতা রমণী পৃথিবীর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে সর্ব্বদা দর্পণের নিকট দাঁড়াইয়া তাহার রূপের প্রতিচ্ছবি দেখিত, নিজের রূপ দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হইত। এইখানে আসিয়া বীরের সহিত দেখা হইল অবিশ্বাসীর ভাই নিরানন্দের (Joyless) সহিত। পরের দিন লাল ক্রুশের বীরের সঙ্গে নিরানন্দ বীরের মল্লযুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে নিরানন্দ হারিয়া গেল। যে সময় বীরপুরুষ যুদ্ধ করিতে করিতে নিরানন্দকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, মিথ্যা সে সময় ঘন কালো মেঘে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলে। শুধু মিথ্যার সহায্যেই নিরানন্দ এবার মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়। রাত্রিকালে জর্জ্জ তাহার বিশ্বাসী ভৃত্য বামনের নিকট হইতে জানিতে পারিল, কি ভীষণ বিপজ্জনক স্থানে তাহারা আশ্রয় লইয়াছে। বীরপুরুষ তখন অহঙ্কারের রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করিল। মিথ্যার কুহেলি মায়া এখন তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়াছে, সে এবার প্রাসাদের যথার্থ রূপ দেখিতে পাইল। প্রাসাদ অতি তুচ্ছ ও সুলভ ধাতু দিয়া নির্ম্মিত মিথ্যার মোহে কি ভুলই না হইয়াছে।

মিথ্যা যখন বুঝিতে পারিল, তাহার শিকার হাত-ছাড়া হইয়াছে, তখন সে তাহার সন্ধানে বাহির হইল এবং খুঁজিতে খুঁজিতে এক ছোট নদীর ধারে আসিল। এখানে লাল ক্রুশের বীর বিশ্রাম করিতে-ছিল। তাহাকে দেখিয়া মিথ্যা মায়াবলে একটি সুন্দর প্রস্রবণের রূপ ধারণ করিল এবং সুমধুর কুলু কুলু রব করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্ত বীরপুরুষ অঞ্জলি ভরিয়া ঐ প্রস্রবণের শীতল বারি পান করিল, কিন্তু এই জল পান করিয়া সে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, তার দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ পাইল। লাল ক্রুশের বীর তাহার বর্ম্ম খুলিয়া ফেলিল এবং তাহার ঢাল পার্শ্বে রাখিয়া দিল। এমন সময় একজন কদাকার দৈত্য তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দৈত্যের নাম পাপ (Sin)। লাল ক্রুশের বীর এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া-ছিল যে, পাপের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহার ছিল না। মিথ্যার

প্ররোচনায় পাপ বীরপুরুষকে বন্দী করিল এবং তাহার দুর্গের অন্ধকার কারাকক্ষে তাহাকে রাখিয়া দিল।

এ দিকে ইউনার কি অবস্থা হইল, বলিতেছি। বীরপুরুষ তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেলে ইউনার খুবই দুঃখ হইল,

বামন শাদা ঘোড়াটি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে

কিন্তু সেই দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন লইয়াই সে তাহার সঙ্গী বীরের সন্ধানে বাহির হইল। পথের শেষ নাই—পথ চলার বিরাম নাই, কিন্তু বীরপুরুষের সন্ধান মিলিল না। অবশেষে রাত্রির কালো অন্ধকার আসিয়া পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলিল। হতাশ হইয়া সে এক গাছের তলায় শুইয়া রহিল। এমন সময় এক প্রকাণ্ড সিংহ তাহার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইল, কিন্তু তাহার রূপের দীপ্তি সিংহকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিল -সে নিশ্চল হইয়া গেল। সিংহ ভুলিয়া গেল তাহার হিংস্র স্বভাব,—সে হইল ইউনার অনুচর এবং রাত্রিকালে ইউনা যখন গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িত, তখন এই ভয়ঙ্কর সিংহ তাহার আগুনের মত দীপ্ত দুইটি চোখের আলোতে সারা রাত্রি তাহাকে পাহারা দিত।

পরের দিন ভোরের আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার দৈনন্দিন কাজ—বীর পুরুষের সন্ধানে বাহির হইল। তখন তাহার মনে হইল, লাল ক্রুশের বীরের সহিত তাহার দেখা হইয়াছে। এক অজানা পুলকে

সিংহ সারারাত্রি পাহারা দিত

তাহার সমস্ত হৃদয় ও মন পূর্ণ হইয়া উঠিল, যেন তাহাদের দুজনের মিলন হইয়াছে! পথে আইনদ্রোহী (Lawless) নামক একজন বীরপুরুষের সঙ্গে তাহার সংঘর্ষ হইল। আইনদ্রোহী হইতেছে অবিশ্বাসী (Faithless) ও নিরানন্দের (Joyless) ভাই। আইনদ্রোহী লাল ক্রুশের বীরকে দেখিয়াই তাহাকে আক্রমণ করিল। বীর পুরুষ ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, পড়িবার সময়ে তাহার উষ্ণীষ খসিয়া পড়িল; তখন ইউনা বুঝিতে পারিল যে, তাহার সঙ্গী বীরপুরুষটি—লাল ক্রুশের বীর নহে! সে

সেই সয়তান যাদুকর আকিমাগো। আইনদ্রোহীর হাতে আকমাগো প্রাণ হারাইল। ইউনা পলায়ন করিল কিন্তু আইনদ্রোহীর হাত হইতে রক্ষা পাইল না। গভীর বনের মধ্য দিয়া তাহাকে লইয়া যাইতেই সে উচৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিল। বনবাসী বামনগণ তাহার করুণ-ধ্বনি শুনিতে পাইয়া তাহার সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিল। আইনদ্রোহী ভয়ে ভয়ে ছুটিয়া পলাইল। ইউনা কিছুদিন

ইউনা বামনদের সঙ্গে বাস করিল

বামনদের সঙ্গে বাস করিল। তাহারা তাহাকে নিজেদের বাড়ীতে পরম সমাদরের সহিত স্থান দান করিল, তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই বামনরা তাহাকে ছাড়িতে চাহিল না।

এদিকে শীঘ্রই তাহার সেই বিশ্বাসী বামনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বামন লাল ক্রুশের বীরের পরিত্যক্ত বর্ম্ম ও ঢাল এবং শাদা ঘোড়াটিকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইউনার মনে হইল, বীরপুরুষ আর বাঁচিয়া নাই। সে শোকে অধীর হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তাহার যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন বামন ইউনাকে বলিল যে, বীরপুরুষের মৃত্যু হয় নাই, সে বাঁচিয়া আছে, কিন্তু পাপ (Sin) তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। সে যে বাঁচিয়া আছে একথা জানিতে পারিয়া ইউনার (Una) আনন্দের আর সীমা রহিল

ইউনা শোকে অধীর হইয়া পড়িল

না। তাহা হইলে সে চেষ্টা করিয়া তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবে, তাহাকে আবার ফিরিয়া পাইবে, তাহার পিতৃরাজ্য আবার ধন-ধান্যে ভরিয়া উঠিবে!

এখন সে মহা দুর্ভাবনায় পড়িল, কি করিয়া, কেমন করিয়া, সে লাল ক্রুশের বীরকে মুক্ত করিতে পারিবে! কি করিয়া পাপের বজ্রমুষ্টি হইতে তার বীর পুরুষকে

রক্ষা করিবে। ইহাই হইল তাহার একমাত্র চিন্তা, ধ্যান ও জ্ঞান। কিন্তু কোন পথই ত সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। যেদিকে তাকায়, সেই দিকেই যে নিরাশার ঘন অন্ধকার—আশার ক্ষীণ রশ্মিও ত তাহার মনের অন্ধকার কোণে প্রবেশ করিতে পারে না।

পাপ দৈত্য লাঠি লইয়া আসিল

সম্ভব ও অসম্ভব কত কথাই না তাহার মনে আসিতেছিল! এমন সময় রাজকুমার আর্থার যেন দেবদূতের মতই তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর্থার ছিলেন সেকালে সব চেয়ে সাহসী, পরাক্রান্ত ও শৌর্য্যবীর্য্যশালী বীর পুরুষ। ইউনা তাঁহার কাছে নিজের দুঃখের কথা খুলিয়া বলিল। রাজকুমার আর্থার লাল ক্রুশের বীরকে মুক্ত করিবার প্রতিজ্ঞা করিল এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া পাপের দুর্গের নিকট উপস্থিত হইল। আর্থারকে দেখা মাত্রেই পাপ দৈত্য হাতে লাঠি লইয়া হা-হা করিতে করিতে আসিতে লাগিল। আর একটা ভীষণ দৈত্যের উপর উপবিষ্ট মিথ্যা (Falsehood) তাহাদের আক্রমণ করিতে আসিল, আর্থার অমনি একটু সরিয়া গেল। কাজেই, পাপের লাঠিখানি ভীষণবেগে মাটিতে আহত হইয়া অনেকখানি মাটির ভিতরেই প্রোথিত হইয়া গেল। কাজেই পাপ দৈত্য পড়িয়া গেল একটা আকস্মিক বিপদের হাতে, সে যে কি ভাবে আপনাকে বাঁচাইবে তাহাই স্থির করিতে পারিতেছিল না। এই সুযোগে আর্থার তাহার বাহু কাটিয়া
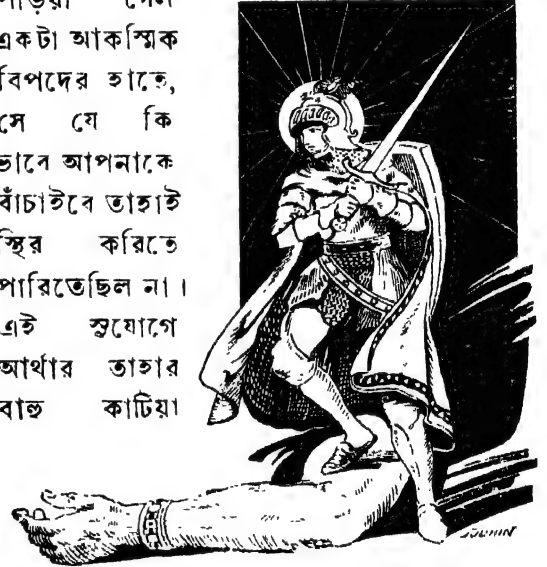
আর্থার তাহার বাহু কাটিয়া ফেলিল

ফেলিল। যে ভীষণাকার দৈত্যের উপর মিথ্যা বসিয়াছিল, সে আর্থারকে আক্রমণ করিতে আসিল কিন্তু আর্থারের অনুচর (Squire) তাহার গতি রোধ করিল। মিথ্যা কতকগুলি বিষ তাহার উপর নিক্ষেপ করিল এবং সে হতচেতন হইয়া মাটিতে

সেণ্ট জর্জ ও ড্রাগন

পড়িয়া গেল। এদিকে পাপ আবার গা ঝাড়িয়া উঠিয়া আর্থারকে আক্রমণ

পাপের দ্বার-রক্ষক

করিল। আর্থার তাহার আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোড়া হইতে নামিতে বাধ্য হইল। আর্থার ঘোড়া হইতে নামিবার সময় তাহার ঢালের ভিতর যে মণিটি অনাবৃত হইয়া পড়িল, এই মণিটি সব সময়ই আবৃত থাকিত। কারণ, এই মণিটির দিকে যে দৃষ্টিপাত করিত, সে-ই অন্ধ হইয়া যাইত। পাপ ও তাহার অন্য যে দৈত্যটি ছিল, সে অন্ধ হইয়া গেল! এইবার অতি সহজেই আর্থার তাহাদের পরাজিত ও বন্দী করিল। মিথ্যার ছদ্মবেশ এইবার খসিয়া পড়িল, তাহার পরচুলা, মূল্যবান্ পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, সবই—তাহার মুখসও কাড়িয়া লওয়া হইল—আর কিছুই গোপন রহিল না, তাহার যথার্থরূপ বাহির হইয়া পড়িল—সে অতি কুৎসিত—রুগ্ন ও জীর্ণা-শীর্ণা, মায়াবিনী! লাল ক্রুশের বীরের মোহ দূর হইল! সে তাহার ভুল বুঝিতে পারিল! কি মোহে সে কিসের পশ্চাতে ছুটিয়াছে? এইবার সে ইউনার সহিত তাহার পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইল এবং সেখানকার দৈত্যকে হত্যা করিয়া ইউনার পিতামাতাকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের রাজ্যের সুখ ও শান্তি ফিরাইয়া আনিল।

এইরূপ—রূপক গল্প লইয়াই Fairie Queen রচিত হইয়াছে।

বিড়াল

১৩৫১ পৃষ্ঠার পর

তোমরা বাড়ীর 'পুসি' বা 'মেনি' বিড়ালকে বড় ভালবাস। ছোট ছোট খোকা-খুকী রাত-দিন বিড়ালকে কোলে করিয়া, বিড়ালকে কাছে বসাইয়া বা বিড়ালের গায়ে হাত বুলাইয়া আদর না করিয়া থাকিতে পারে না। বিড়ালকে শুধু কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই ভালবাসে, তা নয়; বড়রাও বিড়ালকে আদর করেন। সাধারণ কথায় লোকে বিড়ালকে বলে—'বাঘের মাসী।' মাসী না হইলেও দুই জনের সম্বন্ধ অতি নিকট। জাতি এক, কারণ দুই জনেই 'কার্ণিভোরা' (Carnivora) বা মাংসাশী জন্তু। বংশও এক; কারণ, দুই জনেই ফেলিডি Felidae বা মার্জ্জারবংশীয়। বিড়াল ও বাঘের মধ্যে আকারগত ঐক্যও আছে। তবে ছোট আর বড়, এই যা তফাৎ! কিন্তু ইহার অতি অতি অতিবৃদ্ধ পূর্ব্বপুরুষেরা একেবারেই ক্ষুদ্র জীবটী ছিল না। সম্প্রতি এককোটী পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের বিড়ালের

বিড়ালের পূর্ব্বপুরুষ

পূর্ব্বপুরুষের যে কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, বিড়ালের পূর্ব্ব পুরুষ ছিল গো-সাপের মত একটা বিকটাকার অথচ লম্বা লম্বা পা ওয়ালা এক মাংসাশী হিংস্র জন্তু। পঁচিশ ফুট লম্বা আর বার ফুট উঁচু! তার বৈজ্ঞানিক নাম—কেরাটোসরাস্। এই অদ্ভুত হিংস্র জন্তুই কিন্তু কালের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আমাদের 'পুসি' বা 'মিনির' আকারে আসিয়া পৌছিয়াছে।

বিড়ালের শরীরটী আমরা চারিভাগে ভাগ করিতে পারি—মুণ্ড, ধড়, পুচ্ছ ও পা। মুণ্ডটি ত দেখিয়াই বুঝিতে পার যে, আর কিছুই নয়, কেবল একটি গোলাকার হাড়ের বাক্স। এই বাক্সের ভিতর মস্তিষ্ক থাকে। বাক্সের পশ্চাতে হাড়ের গায়ে একটি ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রটি মাংস ও চর্ম্ম দ্বারা আবৃত, তাই আমরা দেখিতে পাই না। এই ছিদ্রের মধ্যে একটি হাড়ের নল যোড়া আছে। এই নলটি পিঠের উপর দিয়া বরাবর পুচ্ছ পর্য্যন্ত গিয়াছে। মস্তিষ্কও যে পদার্থ, এই নলের ভিতরও সেই পদার্থ থাকে। অনেকগুলি আংটির মত হাড় গায়ে-গায়ে সংযুক্ত হইয়া এই নলটিকে প্রস্তুত করিয়াছে। এই আংটির মত

বিড়ালের আকার ও গঠন

হাড়গুলিই পিঠের শির দাঁড়া। সুতরাং পিঠের শির-দাঁড়া একখানি হাড় নয়। পিঠ পার হইয়া যখন এই হাড়ের আংটিগুলি পুচ্ছ গড়িতে থাকে, তখন ইহারা ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হয়, আর নিরেট হইয়া আসে। পুচ্ছের শেষভাগে একেবারেই হাড় থাকে না। মুণ্ডের সম্মুখে, হাড়ের বাক্সের তলভাগে, বাহিরের দিকে যে ছিদ্রটি আছে তাহাই বিড়ালের মুখ। মুখ হইতে একটি 'নলী' বক্ষঃস্থল দিয়া পেট দিয়া একেবারে পুচ্ছের মূল পর্য্যন্ত গিয়াছে। নলীর যে ভাগ গলার কাছে থাকে, তাহাকে 'ফেরিংস্' বলে। বুকের ভিতর যে ভাগটি থাকে, তাহাকে 'ইসোফেগাস্' বা অন্নবহা নলী বলে। পেটের উপরকার নলটি যখন প্রসারিত হয়, তখন তাহাকে 'ষ্টম্যাক' বা পাকস্থলী বলে। তাহার পর নলটি সরু হইয়া ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুচ্ছের তলভাগে গিয়া শেষ হয়। এই ভাগকে অন্ত্র বা নাড়ী-ভুঁড়ী বলে। উহার ইংরাজী নাম ইণ্টেষ্টাইন্।

যে সকল প্রাণী উদ্ভিজ্জ খাইয়া জীবনধারণ করে, তাহাদের পাকস্থলী খুব-বড় হয়। ইহার গঠনও অনুরূপ কারণ, উদ্ভিদ্ পরিপাক হইতে বিলম্ব হয়। মাংস সহজে পরিপাক হয়, এজন্য যেসকল প্রাণী মাংস খাইয়া জীবনধারণ করে, তাহাদের পাকস্থলী অপেক্ষা কৃত ক্ষুদ্র ও ইহাদের অন্ত্র তত দীর্ঘ হয় না। বিড়াল যখন বনে থাকে তখন কেবল মাংস খাইয়া জীবন-ধারণ করে বলিয়া বনবিড়ালের পাকস্থলী ও অন্ত্র অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীর ন্যায় কিন্তু পোষাবিড়াল ভাত ও রুটি খায় বলিয়া ইহাদের পাকস্থলীর গঠনের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অন্ত্রও দৈর্ঘ্যে কিছু বড় হইয়াছে মাংসজীবী জন্তুদের দাঁতের গঠন উদ্ভিজ্জভোজী জন্তুদের মত নয়। যে জন্তু যেরূপ আহার করে তাহার দাঁতের গঠনও সেইরূপ হয়। বিড়াল ও বাঘের দন্তের গঠন এইরূপ যে, তাহারা দাঁতের সাহায্যে শিকার করিতে পারে, দাঁতের সাহায্যে শিকারকে ধরিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে পারে এবং মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে পারে।

বিড়ালের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ গল্পও আছে। এখানে তাহার মধ্যে একটি বলিতেছি। আরব দেশে গল্প আছে যে, সেই অতি আদি যুগে পৃথিবী যখন জলে প্লাবিত হইয়াছিল, তখন নোহ তাঁহার সুবৃহৎ জাহাজে সমুদয় প্রাণীর এক এক দম্পতী লইয়া সেই জলরাশির উপর ভাসিতেছিলেন। ক্রমে সেই জাহাজে ইঁদুরের উপদ্রব এত বৃদ্ধি পাইল যে তিষ্ঠান ভার হইল। তখন নোহ যাহাতে ইঁদুরের এইবংশ আর বৃদ্ধি না পায়, সেজন্য ঈশ্বরে নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি সিংহ নৌকার পাটাতনের উপর পড়িয়া হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিড়ালের রূপ ধরিয়া ইঁদুর মারিয়া ফেলিল। তোমরা বিশ্বাস কর বা না কর, একখানি আরবী পুস্তকে কিন্তু বিড়ালের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই গল্পটি লিখিত আছে।

বিড়ালের নানা জাতি আছে। এক এক দেশের বিড়াল দেখিতে এক একরূপ হয়। (১) বন বিড়াল

বিড়ালের জাতি

(২) আঙ্গোরা, পারস্য দেশের বিড়াল (৩) চীনদেশের বিড়াল, (৪) দক্ষিণ আফ্রিকার বিড়াল (Serval cat) (৫) মিশর দেশের বিড়াল, (৬) তিব্বতীয় ও মঙ্গোলিয়ার বিড়াল, (৭) ভারতবর্ষের মরুভূমির বিড়াল, (৮) ইউরোপীয় বন বিড়াল (The pampas cat), (৯) দক্ষিণ আমেরিকার মার্গে (The Margay cat) (১০) ওসিলট্ (Ocelot) বিড়াল, মাছ-শিকারী বিড়াল (The Fishing cat) এবং পোষা বিড়াল। বিড়ালের শ্রেণীবিভাগ বড় কম নয়—পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নানা দেশে নানা রকমের বিড়াল হয়। সকলের কথা না বলিলেও চলে। এখানে কয়েক জাতীয় বিড়ালের কথা বলিলাম।

আজকাল আমরা পৃথিবীর নানা স্থানে যেসকল বনবিড়াল দেখিতে পাই, তাহাদের শরীরের গঠন ঠিক ঘরের বিড়ালের মত নয়। কাজেই কোন্ জাতীয় বন বিড়াল যে আমাদের পোষাবিড়ালের পূর্ব্বপুরুষ তাহা ঠিক করা কঠিন। ভারতবর্ষের চারি জাতীয় বন-বিড়াল দেখিতে পাওয়া যায়। কুমারিকা অন্তরীপ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে, এমন কি আট হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গে পর্য্যন্ত বনবিড়াল বিচরণ করিতে থাকে। ইহাদের গায়ের রঙ নানারকমের হয় ইউরোপ ও আমেরিকার বনবিড়ালও অনেকটা এইরূপ। কিন্তু কোন দেশের বনবিড়ালই ঘরের বিড়ালের মত নয়। কথায় বলে, 'ঘরের বিড়াল বনে গিয়া বনবিড়াল হয়' সত্য কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহুদিন বনেবাস করিলেও ঘরের বিড়ালের পাকস্থলী ও অন্ত্র প্রভৃতি প্রকৃত বন বিড়ালের মত হয় না।

বন বিড়াল

এক সময়ে গ্রেটব্রিটেনের বন-জঙ্গলে অনেক বন-বিড়াল দেখা যাইত; এখন ক্রমশঃ তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে। ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, সুইট্জারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারি, দক্ষিণ রাশিয়া, স্পেন, ডালমেশিয়া, গ্রীস, তুরস্কের কতকাংশেও বনবিড়াল দেখা যাইত। ইটালি, নরওয়ে, সুইডেন এবং উত্তর রাশিয়াতে কোনদিনই বনবিড়াল দেখা যায় নাই।

আঙ্গোরা বিড়াল

ইংলণ্ডে বনবিড়ালের বাস ছিল, সে অতি অতীতকাল হইতে। এখনও ইহারা ইংলণ্ডের বন-জঙ্গল এবং পাহাড়ে বাস করে এবং খরগোস ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী প্রভৃতি জন্তু ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

এশিয়ার বিড়ালদের মধ্যে অ্যাঙ্গোরা বা পারস্যদেশীয় বিড়াল দেখতে অতি সুন্দর। এশিয়া মাইনরের আঙ্গোরা সহরের নাম হইতে ইহাদের নাম হইয়াছে আঙ্গোরা বিড়াল। এই বিড়াল আকারে বেশ বড় হয়, গায়ের লোমও খুব লম্বা হয়, গলার দিকটা এবং শরীরের নীচের অংশটা বেশ পুষ্ট হয়। ল্যাজটা খুব মোটা ও লোমযুক্ত হইয়া থাকে। গায়ের রঙ সাধারণতঃ দুই রকমের হয়, একেবারে শাদা, নতুবা পীত বা ধূসর রঙের চক্ষু দুইটি নীল রঙের হয়।

শ্যাম, ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি দেশের বিড়ালের আকারের মধ্যে নানারূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যামদেশের বিড়ালের কপালে চাকা চাকা দাগ থাকে। মালয়দেশের বিড়ালের লেজ আকারে ছোট হয়, ঐ দেশের কোন কোন জাতীয় বিড়ালের লেজ একেবারে গুটানো থাকে।

চীনদেশের বিড়াল বা মঙ্গোলিয়ার বিড়াল এবং তিব্বতীয় বিড়ালের আকার অনেকটা একপ্রকারের।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাংসাশী বিড়াল (Serval cat) আফ্রিকার এই জাতীয় বিড়াল আকারে বেশ বড় হয়। এই বিড়ালের পা লম্বা, লেজ ছোট, গায়ে কালো কালো গোল গোল দাগ—ইহারা খুব শিকারী হইয়া থাকে।

মিশর দেশের বিড়াল--মিশরদেশে বিড়ালের বড় সম্মান। প্রাচীন মিশরে বিড়াল দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেখানে বিড়ালের মমিপর্যান্ত প্রস্তুত হইত। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের বিড়ালের মমিও মিশরদেশে পাওয়া গিয়াছে। মিশরবাসীদের দেবী পাষ্টারের প্রতিমূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মাথা ও মুখ বিড়ালের মত। এবার কিন্তু মিশরীয়দের বিড়ালের প্রতি সম্মান দেখাইবার ফলে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। সেকালে এশিয়া মহাদেশ হইতে মিশরে প্রবেশ করিবার পথ পেলিউসিয়াম্ নামেএকটি নগর ছিল। এইনগরে উহাদের একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিড়াল

পারস্যের সম্রাট্ অনেক দিন হইতেই মিশর আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তিনি এক আশ্চর্য্য চতুরতার দ্বারা পেলিউসিয়াম্ নগর জয় করিলেন। মিশরবাসিগণ যে বিড়াল পূজা করে, তাহা তিনি জানিতেন। কাজেই, তিনি কতকগুলি বিড়াল সংগ্রহ করিলেন এবং তাহাদিগকে আপন সৈন্যদলের পুরোভাগে স্থাপন করিয়া পেলিউসিয়াম্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পবিত্র বিড়াল আহত হইবে, এই ভয়ে পেলিউসিয়ামের অধিবাসীরা আর পারসিকদের সহিত যুদ্ধ করিল না। পারস্য-সম্রাট অপূর্ব্ব চতুরতার সহিত নগর অধিকার করিলেন।

মাছ-শিকারী বিড়াল—এই জাতীয় বিড়াল ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ-চীন দেশ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে মালাবার অঞ্চলেই এই বিড়ালের বাস বেশী। সিংহল দ্বীপ, হিমালয় পর্ব্বতের নেপাল অঞ্চলের ভূ-ভাগ, ব্রহ্ম দেশ, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও ফরমোসা প্রভৃতি দ্বীপেও এই বিড়াল পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের নির্জ্জন নদীর ধারে, ঝিল বা বিলের কিনারায়ও এই জাতীয় বিড়াল বাস করে। মৎস্য-শিকারী বিড়ালীরা যে কেবল মাছ ধরিয়া খায়, তাহা নহে। ইহারা সাপ, ভেড়া, এমন কি, ছোট ছোট বাছুর পর্য্যন্ত শিকার করে; ছোট ছোট শিশুদিগকে পর্য্যন্ত ধরিয়া লইয়া

যায়। একবার একটা মাছ শিকারী বিড়ালকে ধরিয়া খাঁচায় পুরিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই খাঁচার মাঝখানে একটা বেড়া ছিল। একদিকে বিড়ালটাকে রাখা হইয়াছিল, আর অন্যদিকে ছিল একটা চিতা-বাঘের বাচ্চা। চিতাবাঘের বাচ্চাটা আকারে বিড়ালের অপেক্ষা দ্বিগুণ বড় হইলে কি হইবে, বিড়াল বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া চিতাবাঘের বাচ্চাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল—কিন্তু তাহার মাংস খায় নাই। ইহারা পূর্ণ যৌবনকালে সাধারণ বিড়ালের দ্বিগুণ হইয়া থাকে। কৃষ্ণমিশ্রিত ধূসরবর্ণ বলিয়া ইহাদিগকে দেখিতেও ভয়ঙ্কর দেখায়। দিনের বেলা ইহারা নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান করে, রাত্রি হইলে চরা করিতে বাহির হয়।

মাছ শিকারী বিড়াল

চিতা বিড়াল The Leopard cat—এই জাতীয় বিড়াল বনে জঙ্গলে বাস করে। ভারতের নানা স্থানে—হিমালয় পর্ব্বতে, শিমলা পাহাড়ে, নিম্ন বঙ্গে, বোম্বাই অঞ্চলের পশ্চিম ঘাট প্রদেশে এবং ত্রিবাঙ্কুর ও মাদ্রাজ বিভাগেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, আসাম, ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, চীনের দক্ষিণ ভূ-ভাগ এবং বোর্ণিও সুমাত্রা যবদ্বীপ এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও চিতা বিড়াল বাস করে।

চিতা বিড়াল

ওসিলট্ বিড়াল (The Ocelot)—দক্ষিণ আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকায় এই বিড়াল দেখা যায়। এই বিড়াল বেশীর ভাগ বনে বাস করে। ইহারা গাছে

চড়িতে পারে এবং ছোট ছোট পাখী, বন্যজন্তু ও সরীসৃপ শিকার করিয়া খায় এবং বিড়ালকে আমেরিকার লোকেরা সাধারণ কথায় বলে—বাঘ-বিড়াল (Tiger-cat)। এই বিড়ালেরা যখন বনে থাকে, তখন অতি হিংস্র স্বভাবের থাকে। পোষ মানিলে কিন্তু বেশ নিরীহ স্বভাবের হয়।

ওসিলট্ বিড়াল

মার্গে বিড়াল (The Margay)—ইহাদের বাসও আমেরিকায়। গায়ে কালো কালো দাগ, চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল এবং লেজের শেষ দিকটা মোটা হইয়া থাকে।

জাগুয়ারোন্দি (The Jaguarondi) জাতীয় বিড়াল, গায়েনা, পারাগোয়েরউত্তর-পূর্ব্ব,মেক্সিকো প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করে। ইহাদের গায়ের রঙ কালো বা ধূসর হইয়া থাকে। চক্ষুর তারা গোলাকার ও উজ্জ্বল। এই বিড়ালের আকার বেশ বড়—দৈর্ঘ্যে ৪ ফিট ৭ ইঞ্চি হইয়া থাকে; তাহার মধ্যে লেজের আকারই প্রায় ২ ফিট এক

মার্গে বিড়াল

দক্ষিণ আমেরিকার আয়রা (Eyra) জাতীয় বিড়াল—ইহাদের আকার অদ্ভুত রকমের। আকারে ইহারা দেখিতে ঠিক্ গৃহপালিত বিড়ালের মত। এই জাতীয় বিড়াল অত্যন্ত হিংস্র ও রক্তপিপাসু। গ্রামের লোকের মুর্গী ও অন্যান্য গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রতি ইহাদের আক্রোশ অত্যন্ত বেশী।

পাম্পাস্ বিড়াল The Pampas cat—ইহারাও এক জাতীয় বন-বিড়াল। দক্ষিণ আমেরিকায় ইহাদের বাস। মধ্য এশিয়ার 'ষ্টেপ্' ভূমিতেও এই জাতীয় বিড়াল দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় বন্য-বিড়ালের মত ইহাদের আকারও বেশ বড়। গায়ের রঙ কৃষ্ণমিশ্রিত ধূসর—চোখের নীচের দিক্‌টা শাদা। এই বিড়ালের আকার দৈর্ঘ্যে ৩ ফিট ১ ইঞ্চি, ইহার মধ্যে লেজই লম্বায় হইবে প্রায় ১২ ইঞ্চি। এই বিড়াল দেখিতে অতি ভীষণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরীসৃপ ও জন্তু শিকার করিয়া খায়।

এতদ্ব্যতীত **সোণা বিড়াল** (The Golden cat) নামে এক জাতীয় বিড়াল—হিমালয়ের দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চলে পাওয়া যায়। সোণালি গায়ের রঙের জন্যই ইহার নাম হইয়াছে সোণা বিড়াল। তিব্বত ও মালয় উপদ্বীপ এই বিড়ালের জন্মভূমি।

পূর্ব্ব হিমালয়, আসাম, ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপে এক শ্রেণীর বিড়াল বাস করিয়া থাকে। তাহাদের গায়ে কালো কালো ডোরা ডোরা ও চাকা চাকা দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকটা চিতাবাঘের

চিতা বিড়াল, বাঘ বিড়াল, পোষা বিড়াল

আফ্রিকার বিড়াল, বন বিড়াল, হিমালয় পর্ব্বতের বিড়াল

মত। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর। আকারে গৃহপালিত বিড়ালের অপেক্ষা সামান্য বড়। মাথা হইতে লেজের গোড়া পর্য্যন্ত ১৮½ হইতে ২৩ ইঞ্চি এবং লেজ ১৪ হইতে ১৫½ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। গায়ের লোম ঘন, মসৃণ ও সুন্দর। ইহাদিগকেও এক শ্রেণীর বন-বিড়াল বলা যাইতে পারে। তিব্বতেও এই শ্রেণীর এক প্রকার ছোট বিড়াল দেখা যায়।

মার্জ্জার শ্রেণীর মধ্যে বিড়ালই কেবল গ্রাম্য জন্তু। ইহারা অন্যান্য জন্তুর ন্যায় বনে থাকিতে ভালবাসে না। বিড়াল যে দেখিতে অতি সুন্দর, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, বেশ আরামে থাকিতে ভালবাসে এবং তোমাদের কোমল বিছানায় যাইয়া শয়ন করে, তাহা তোমরা জান। ইহাদের চক্ষুর তারা দিবাভাগে লম্বা হইয়া পড়ে, রাত্রিকালে গোল এবং বিস্তৃত হয়। এজন্য দিবাভাগে অপেক্ষা রাত্রিকালে উত্তম দেখিতে পায়। অন্ধকারে ইহাদের চক্ষু হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতে থাকে। বিড়ালের গায়ে জল লাগিলে ইহারা অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করে। বিড়াল কখনও ঠাণ্ডা জায়গায় থাকিতে ভালবাসে না। সুগন্ধ দ্রব্য ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়। বিড়ালীর এক-কালে চারি পাঁচটি হইতে ছয়টি পর্য্যন্ত ছানা হইয়া থাকে। বিড়ালের গায়ের রঙ্ নানা রকমের হয়—কাল, শাদা, পিঙ্গল ও পীতবর্ণের বিড়াল দেখিতে পাওয়া যায়।
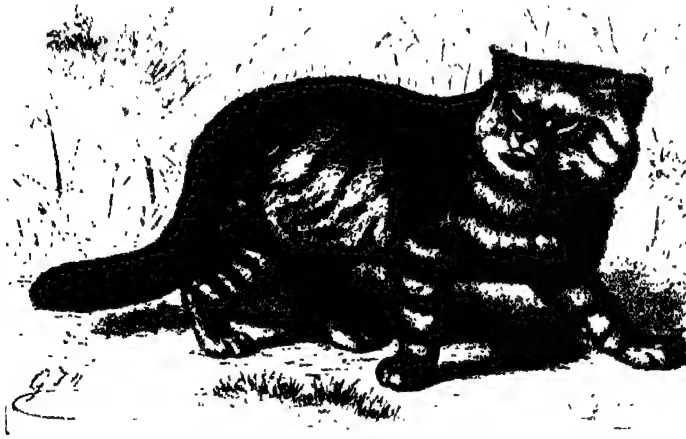
আয়রা বিড়াল

পাম্পাস বিড়াল

বিড়াল যে মাংসপেশী জন্তু, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই জন্য ইহাদের দাঁতের গঠনও অনুরূপ। তোমরা একটি বিড়ালের দাঁত পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে ইহাদের চারিটি বড় তীক্ষ্ণ দাঁত, ইহাদিগকে শ্বদন্ত কহে। এই শ্বদন্ত দ্বারা শিকার ধরে এবং উহা মাংসে প্রবেশ করাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। দুই মাড়ির সম্মুখে প্রত্যেক-টিতে ছয়টি করিয়া ছোট দাঁত আছে, ইহাদিগকে ছেদনদন্ত বলে। শ্বদন্তের পশ্চাতে চর্ব্বণ দন্ত আছে, উপরের মাড়িতে প্রত্যেক পাশে চারিটি করিয়া চর্ব্বণ দন্ত আছে; প্রথমটি ছোট, দ্বিতীয়টি একটু বড়, তৃতীয়টি সবচেয়ে বড় এবং চতুর্থটি আবার ছোট। নীচের মাড়িতে প্রত্যেক পাশে তিনটি করিয়া চর্ব্বণ দন্ত আছে। সর্ব্বশুদ্ধ একটি পূর্ণ বয়স্ক বিড়ালের আটাইশ হইতে ত্রিশটি দাঁত আছে। আমাদের কসের দাঁত দিয়া যেমন আমরা খাদ্যকে পিষিয়া ফেলি, ইহাদের কসের দাঁত সেরূপ পিষিবার উপযোগী নয়। কসের দাঁত দিয়া ইহারা কেবল খাদ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে পারে। তাহার পর চিবাইয়া গিলিয়া ফেলে।

হাড়ের গায়ে মাংস ও রক্ত লাগিয়া থাকিলে, চাটিয়া খাইতে পারিবে বলিয়া বিড়ালের জিহ্বা অতিশয়

কর্কশ। বিড়ালের থাবাটি শিকার ধরিবার বিশেষ উপযোগী। নখগুলি অতিশয় কঠিন, তীক্ষ্ণ ও বক্র। নিঃশব্দে চলিতে পারিবে বলিয়া থাবাগুলি মখমলের মত নরম। চলিবার সময় নখগুলি এই মখমলের ভিতরই থাকে। শিকার ধরিবার সময় বাহির করে। বিড়ালকে যদি উপর হইতে ফেলিয়া দেও, তাহা হইলে সে এই নখর বাহির করিয়া মাটিতে গিয়া পড়ে। সেইজন্য ইহাদের শরীরে বড় আঘাত লাগিতে পারে না। এই নখগুলি এরূপ তীক্ষ্ণ যে বিড়ালের থাবা দেখিয়া বড় বড় জন্তুকেও ভয় করিতে হয়।

এই শ্রেণীর জীবেরা অত্যন্ত বলশালী হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা মাংসাশী প্রাণি সমূহকে উহাদের পায়ের গঠন অনুযায়ী তিনটি উপশ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম, পদতলগামী (Plantigrade) অর্থাৎ যে সকল মাংসাশী জন্তু চলিবার সময় পদতলের উপর ভর দিয়া চলে। ভল্লুক, ব্যাজর, র‍্যাটল প্রভৃতিকে পদতলগামী বলা যায়। দ্বিতীয় অঙ্গুলিগ (Digitigrade) বা যে সকল প্রাণী পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া চলে, যেমন—সিংহ, ব্যাঘ্র, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি। তৃতীয়, লিপ্তপাদশ্রেণী (Pinnigrade), ইহাদের পায়ের আঙ্গুল সমূহ হাঁসের পায়ের অঙ্গুলির ন্যায় ঝিল্লিদ্বারা সংযুক্ত। সিল, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি চর্ম্মলিপ্ত পদদ্বারা সাঁতার দিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়, এইজন্য ইহাদিগকে লিপ্তপাদ বলা হয়। এখন বুঝিতে পারিলে যে, বিড়াল, অঙ্গুলিগগণের অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিড়ালের বাস। বিড়াল ষষ্ঠীদেবীর বাহন। বিলাতে কিন্তু বিড়াল ছিল না। অনেকে অনুমান করেন যে ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ হইতেই বিলাতে প্রথম বিড়াল গিয়াছিল। তামিল ভাষায় বিড়ালের নাম—'পুসে'। পস্তু ভাষায় 'পুষা' পারস্য ভাষায় 'পুষা'। ইংরাজ বালকবালিকারা বিড়ালকে বলে 'পুস্'—বিড়াল রাগিলে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে, তাহা হইতেও পুস্ হইতে পারে।

বিড়ালের দোষও অনেক, আবার গুণও যে নেহাৎ কম তাহা নহে। একদিকে সে যেমন গৃহস্থের ঘরের ইন্দুর মারিয়া প্রতিপালকের উপকার করে, আবার ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য চুরি করিতেও ইতস্ততঃ করে না।

একবার কেমন করিয়া একটি বিড়াল চোর তাড়াইয়াছিল, সেই গল্পটি বলিতেছি। এক বাড়ীতে রাত্রিকালে ঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। গৃহস্থেরা সকলে ঘুমে অচেতন ছিল। চোর, গৃহে একবার প্রবেশ করিতে পারিলেই গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু চোর যেমন জানালার মধ্য দিয়া প্রথম মাথা ঢুকাইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, সেই বাড়ীর একটি পালিত বিড়াল গিয়া তাহার তীক্ষ্ণ নখ দিয়া চোরের মুখে এমন থাবা মারিল যে, সেই আঘাতের বিষম যন্ত্রণায় চোরের আর ঘরে ঢুকিবার ক্ষমতা রহিল না। এদিকে বিড়ালের চীৎকারে গৃহস্থদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং চোরকেও প্রাণ লইয়া পলাইতে হইল। সেই রাত্রিতে চোর অন্য যায়গায় যাইয়া ধরা পড়িল। তাহার মুখের আঁচড়ের দাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন হওয়াতে সে পুলিসের কাছে বিড়ালের সেই আক্রমণের কথা স্বীকার করিয়াছিল।

[৭]

পৃথিবীর জ্যোৎস্না হয় কি ?

১১১০ পৃষ্ঠার পর

সূর্য্যের যে আলো চাঁদ থেকে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আসে জ্যোৎস্না বলতে আমরা সেই আলোকেই বুঝি। জ্যোৎস্না কথাটার অন্তরালে তাই চাঁদ থেকে আসা আলো এই ভাবটা লুকিয়ে আছে ব'লে "পৃথিবীর জ্যোৎস্না" কথাটার কোনও অর্থ থাকে না। কিন্তু যদি ঐ শব্দটা শুধুমাত্র চাঁদ দিয়ে নয়—সাধারণভাবে গ্রহ বা উপগ্রহ দিয়ে প্রতিফলিত আলোকেই বোঝায়, এমন অর্থ ক'রে নেওয়া যায়, তবে পৃথিবীর জ্যোৎস্না মোটেই নিরর্থক হয় না। আমরা জানি যে, পৃথিবীও সূর্য্যের আলোকে প্রতিফলিত ক'রে অন্য দিকে পাঠিয়ে থাকে।

তোমরা এইবার বলতে পার যে, তা'র প্রমাণ কি ? পৃথিবীর বাইরে গিয়ে কেউ কি তার আলোতে বসে বই পড়ে এ-কথা জানিয়ে গেছে ? এ অবশ্য সত্যি নয় যে, পৃথিবীর বাহিরে গিয়ে কেউ পৃথিবীর আলোর পরিচয় নিয়েছে, আর তার পর আবার ফিরে এসে পৃথিবীর লোককে তার বিবরণ শুনিয়ে গিয়েছে। এমন অসম্ভব কথা শুধু গল্পের বইতেই পড়িতে পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবী যে সূর্য্যের আলো পরাবর্ত্তিত (Reflect) ক'রে ফিরে পাঠায়, তার প্রমাণ আছে।

এ প্রমাণ দুইভাবে দেওয়া যায়। দেখাযাক্ পৃথিবীর মত অন্য যে সব গ্রহ সূর্য্যে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, তারা কি করে। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ইত্যাদি যত গ্রহ আছে, সকলেই সূর্য্যের আলো চাঁদের মত ফিরিয়ে দিতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠে। পৃথিবীর থেকে তাদের দেখা সেই জন্যেই সম্ভব হয়েছে। শুক্র গ্রহ পৃথিবীর যথেষ্ট নিকটে বর্ত্তমান। তাই সে ততটা আলো আমাদের কাছে পাঠাতে পারে যে, তার আলোতে দাঁড়ালে আমাদের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাবেলায়, বিশেষতঃ শীতকালে, যে খুব জ্বলজ্বলে তারাটা সূর্য্যাস্তের পর অনেকক্ষণ পশ্চিম আকাশে দেখতে পাওয়া যায়, সেইটারই নাম শুক্র-গ্রহ। কৃষ্ণপক্ষ থাকলে আরএকটু অন্ধকার গাঢ় হলেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে, ঐ তারাটা থেকে খুব আলো আসছে। ওটা যদি চাঁদের মত অত কাছে থাকত, তাহ'লে ওথেকে আসা আলো চাঁদের আলো থেকেও তীব্র হ'ত। অতএব যখন সমস্ত গ্রহই সূর্য্যের আলোকে পরাবর্ত্তিত (Reflect) করতে পারে আর যখন পৃথিবীও তাদেরই মত একটা গ্রহ, তবে সেও তা পারবে না কেন ? বিশেষ ক'রে তার তিনভাগ জল এত বড় একটা আরশির কাজ করছে। এই থেকে গৌণভাবে আমরা স্থির করিতে পারি যে, "পৃথিবীর জ্যোৎস্না" হওয়া খুবই সম্ভব।

দ্বিতীয় প্রমাণটি এমন গৌণ (Indirect) নয়। তা থেকে প্রায় সোজাসুজিই বলা যায় যে, "পৃথিবীর জ্যোৎস্না" আছে। পৃথিবী থেকে আলো গিয়ে চাঁদকে আলো করেছে, এ দৃশ্য পৃথিবীর লোক দেখতে পেয়েছে। খুব বড় দূরবীণ দিয়ে যদি চাঁদের অন্ধকার ভাগকে লক্ষ্য করা যায়, তবে সেখানকার পাহাড় পর্ব্বত ইত্যাদির এক পাশের তুলনায় অন্য পাশ বেশী

আঁধারময় মনে হয়। মনে হয়, সে পাশে পাহাড়ের ছায়া পড়েছে বলে তা অন্ধকার দেখাচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঐরূপ ছায়া হবার জন্য চাঁদে যে আলোটা পড়েছে, তা গিয়েছে পৃথিবী থেকে। দূরবীণ দিয়ে দেখা ত হ'ল অনেক বৃহৎ ব্যাপার। এসব না নিয়ে শুধু খালি চোখেও চাঁদে যে পৃথিবীর 'আলো পড়ে' তার গায়ে আলো করেছে, তা দেখতে পাওয়া যায়। শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া, তৃতীয়া বা চতুর্থীর চাঁদ কখনও লক্ষ্য করেছ কি ? সরু কালির মত একটুকরা

পৃথিবীর জ্যোৎস্না

চাঁদ দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের অবশিষ্ট অংশটিও অস্পষ্টভাবে একটি আলোর রেখা দিয়ে বেষ্টিত হয়ে দেখতে পাওয়া যায় না কি ? কোথা থেকে এ আলো আসতে পারে ? তোমরা ত শিখেছ যে চাঁদে বায়ুমণ্ডল বলে কিছু নেই। অতএব সূর্য্যের আলো যে ঘুরে গিয়ে তার অন্ধকার পিঠটাও সামান্য আলোকিত করবে, তার উপায় নেই। তা ছাড়া দেখতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর আলোকিত ভাগটা যখন চাঁদের দিকে ফেরান থাকে তখনই ঐ ব্যাপারটা খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। কাজে কাজেই এসব থেকে এই সিদ্ধান্তই সব থেকে নির্ভুল যে, পৃথিবী থেকেই আলো গিয়ে চাঁদের অন্ধকার পিঠকে একটু আলো ক'রে দেয়। অতএব তোমরা জ্যোৎস্না বল চাই না বল, পৃথিবীরও আলো আছে।

আমাদের চোখ কতদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পায় ?

আমরা খালি চোখে কোটি কোটি যোজন দূরের জিনিষও দেখিতে পারি। আলো যতদূর হইতে আসে—আমাদের দৃষ্টিও ততদূর যায়। রাত্রিকালে যখন আমরা আকাশের দিকে তাকাই তখন লক্ষ কোটি যোজন দূরের তারাও আমাদের চোখে পড়ে। যে সকল তারার জ্যোতিঃ পৃথিবীর গায় আসিয়া পৌছাইতে শত শত বৎসর সময় লাগে এমন দূরবর্ত্তী তারাকেও আমরা দেখিতে পাই। আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে বেড়ায়। কাজেই ভাবিয়া দেখ আমাদের চোখের দৃষ্টি কত লক্ষ লক্ষ যোজন দূরের জিনিষকেও দেখিতে পারে।

আমরা পৃথিবীর বুকের উপর দাঁড়াইয়া কতটা দূরের জিনিষ দেখিতে পাই ? এ বিষয়টা অনেক অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ আব হাওয়া, সূর্য্যের আলোর পরিমাণ এবং কতটা উঁচুতে দাড়াইয়া আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহাও দেখিতে হইবে।

আমরা সমুদ্রের তীরে পাঁচ ফিট উঁচুতে দাঁড়াইয়া যদি চক্রবাল রেখার প্রতি দৃষ্টি পাত করি তাহা হইতে তিন মাইল পর্য্যন্ত দেখিতে পাই।

একটা নয় ফিট উঁচু বালুর স্তূপের উপর দাড়াইয়া তাকাইলে চারি মাইল পর্য্যন্ত দেখি। ১৪ ফিট উঁচুতে দাঁড়াইলে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত, ২০ ফিট উঁচুতে দাঁড়াইলে ছয় মাইল, পঁয়ত্রিশ ফিট উঁচুতে দাড়াইলে আট মাইল, ৪৩ ফিট উঁচুতে নয় মাইল এবং ৫৫ ফিট উঁচুতে দাড়াইলে দশ মাইল এবং ৭০ ফিট উঁচুতে ১১ মাইল এবং যখন আরও উপরে দাঁড়াই তখন ৯৬ মাইল পর্য্যন্ত দেখিতে পারি। আমরা দূরবীণ দিয়াও এর বেশী দূরের জিনিষ দেখিতে পাই না, যন্ত্রের সাহায্যে শুধু দূরবর্ত্তী জিনিষগুলিকে স্পষ্টতরভাবে দেখিতে পাই, এই মাত্র।

চিত্রশিল্প—আদিযুগ

১২১৫ পৃষ্ঠার পর

ভারতবর্ষে চিত্রকলার ইতিহাস অতি প্রাচীন। পৃথিবীর ইতিহাসে যেমন আমরা ইউরোপের অন্তর্ভূক্ত দক্ষিণ ফ্রান্স এবং স্পেনের পার্বত্য গুহাগুলির মধ্যে আদি-মানবের অঙ্কিত চিত্র দেখিতে পাই, (শিশু-ভারতী ২৬—৩০ পৃষ্ঠা) তেমনি ভারতবর্ষের আদি-মানব চিত্রকরগণের অঙ্কিত ও খোদিত চিত্রসমূহ ভারতের নানাস্থানের নানা গিরিগুহার মধ্যে শোভা পাইতেছে। কোথায় কোন্ কোন্ স্থানে ঐরূপ ছবি আঁকা আছে, তাহাদের সম্বন্ধে বিবিধ পরিচয় এখানে দিতেছি। তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে, ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সভ্যতা সব দিক্ দিয়াই কত প্রাচীন।

আমরা (১) চক্রধরপুর (বিহার ও উড়িষ্যা), (২) ঘাটশিলা (বিহার ও উড়িষ্যা), (৩) রায়গড় রাজ্যের সিঙ্গনপুর, (৪) যুক্তপ্রদেশের মির্জ্জাপুর জেলা, (৫) হোসেঙ্গাবাদ, (৬) সিরগুজা রাজ্যের রামগিরি পাহাড়ের যোগীমারা গুহা, (৭) বিন্ধ্যাগিরি শ্রেণী প্রভৃতি স্থানে ভারতের আদি-মানব চিত্রকরগণের অঙ্কিত ও খোদিত চিত্র দেখিতে পাই। এই সকল স্থানের গুহাগুলির গায়ে আঁকা চিত্রাবলির মধ্যে সেই আদিযুগের মানবেরা যে সমুদয় জীবজন্তু ও হিংস্র প্রাণীর মধ্যে বাস করিত, তাহাদের প্রতিমূর্ত্তিই বেশী।

এ সমুদয় ছবি পণ্ডিতদের মতে ইতিহাসের পূর্ব্বযুগের, অর্থাৎ কি না প্রাগৈতিহাসিক যুগের (Prehistoric age) অঙ্কিত। কাজেই, সেই কোন্ অতীত যুগে যে ভারতের এই চিত্রকরেরা ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহার হিসাব করিয়া দেখ। বনে-জঙ্গলের অন্তরালে, পাহাড়-পর্ব্বতের গুহাগৃহে আঁকা এসব ছবির কথা অনেকদিন পর্য্যন্ত অজানা ছিল, কিন্তু দিন দিন নানারূপ অনুসন্ধানের ফলে এ সকলের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। এখন এই সব স্থানের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চিত্র-পরিচয়ের কথা বলিতেছি।

(১) চক্রধরপুর—বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্ভূক্ত, ছোটনাগপুর বিভাগের পোরহাত রাজ্যের সিংহভূম জেলায় চক্রধরপুর

অবস্থিত। চক্রধরপুর বর্ত্তমান সময়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের একটি প্রধান ষ্টেশন। সিংহভূম জেলার প্রধান সহর

চক্রধরপুরের নিকট সঞ্জয় নদীর দৃশ্য

চাঁইবাসা হইতে চক্রধরপুরের দূরত্ব মাত্র ষোল মাইল। সঞ্জয় নামে একটি পাহাড়িয়া নদীর বাম তীরে চক্রধরপুর সহরের অবস্থান। স্থানটি দেখিতে অতি সুন্দর। চারিদিক বেড়িয়া নীল পাহাড়ের সারি সহরটিকে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। বর্ষার সময় সঞ্জয় নদীর বুকে পাহাড়-ধোওয়া পাথর, মাটি, বালী এই সব বহিয়া আসে। ওখানকার মাটি কোথাও কালো, কোথাও লাল এইরূপ। সঞ্জয় নদী একটি উপত্যকার মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া চলিয়াছে। চক্রধরপুরের আশেপাশে প্রস্তর-যুগের অনেক কিছু দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে। সে সকলের বয়স ৩০,০০০ বৎসরের কম বা বেশী হইতে পারে। ঐ সকল প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শনের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম প্রাচীন, তাহার বয়সও দুই বা তিন হাজার বৎসরের ন্যূন নহে।

(২) ঘাটশিলা—ঘাটশিলার নাম তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। ঘাটশিলা সহরটি সুবর্ণরেখা নদীর তীরে; অতি অল্প দিনের মধ্যেই সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। ঘাটশিলা হইতে কয়েক মাইল দূরে মৌভাণ্ডার নামে একটা গ্রাম আছে। কিংবদন্তী আছে যে, মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব নাকি বনবাস কালে মৌভাণ্ডারে আসিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক না কেন, এখানে একটি প্রকাণ্ড কালো পাথরের গায়ে এক

মৌভাণ্ডারের খোদিত মানুষের মূর্ত্তি

বিরাটাকার মানুষের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। এইরূপ যে শুধু একটি মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহা নহে, কোথাও কোথাও অনেকগুলি মানুষের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়,

এই যে, এই সকল খোদিত মূর্ত্তির সহিত অষ্ট্রেলিয়ার আদি-মানবের অঙ্কিত বা খোদিত মূর্ত্তির অনেকটা ঐক্য রহিয়াছে। কে, বা কবে কোন্ জাতীয় মানুষেরা এখানে এই সব চিত্র খোদিত করিল, তাহার ইতিহাস কে বলিবে! মৌভাণ্ডারের আশে পাশে এক সময়ে মানুষের বাসস্থান ছিল, সেইরূপ অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়।

ঘাটশিলার খোদিত মানুষের চিত্র

(৩) সিঙ্গনপুর—চণ্ডয়ারধল পাহাড়ের নীচে সিঙ্গনপুর গ্রাম। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথে, নাহরপালি নামে একটি ছোট ষ্টেশন আছে। নাহরপালি রায়গড় হইতে এগার মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। মধ্য প্রদেশের ছত্তিশগড় বিভাগের মধ্যে রায়গড় একটি করদ রাজ্য। রায়গড় নামে সহরটি এই রাজ্যের রাজধানী

সিঙ্গনপুরের পাহড়ের উপর হইতে মান্দ নদীর দৃশ্য

সিঙ্গনপুর রায়গড় রাজ্যের অন্তর্গত। সিঙ্গনপুরের গুহাগুলির সম্মুখ ভাগ ভীষণ জঙ্গলে ঢাকা—শাল জঙ্গলই বেশী। এই গুহাগৃহগুলি যে পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত, সেখান হইতে নিম্নের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। মহানদীর একটি শাখা মান্দ নদী, সুন্দর শ্যামল উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। পাহাড়ের কাছে যাইতে একটি ছোট নদী পার হইতে হয়। সমতল ভূমি হইতে গুহাগৃহগুলির উচ্চতা প্রায় ৬০০ ফিট হইবে। এখানকার কোন কোন গুহার আকার বেশ বড়। এক নম্বর গুহার পরিমাণ ২০ × ৩০ ফিট, অন্য একটি গুহা ভিতরের দিকে লম্বালম্বিভাবে চলিয়া গিয়াছে, উহার প্রশস্ততা হইবে প্রায় ১৫ ফিট। প্রবেশ-পথের উচ্চতাও প্রায় ১৫ ফিট হইবে। গুহার মুখের দিক হইতে কতকটা দূর পর্য্যন্ত একটি গ্যালারির মত আছে। গুহার ভিতরে ভয়ানক অন্ধকার, খুব জোরালো আলো ছাড়া ভিতরকার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই নম্বর গুহাটিও এক

নম্বর গুহাটির মত বড় হইবে। এখানকার গুহার গায়ে ও পাহাড়ের গায়ে অঙ্কিত ও খোদিত চিত্রের বিষয় সকলের আগে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এণ্ডারসন্ সাহেব (Mr. C.W. Anderson) লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সে ১৯১০ সালের কথা। মিষ্টার এণ্ডারসন্ তাঁহার এই আবিষ্কারের বিষয় কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল মিঃ পার্শি

এক নম্বর গুহার সম্মুখভাগ

ব্রাউনকে (Mr.Percy Brown) জানাইয়াছিলেন। তদবধি মিঃ পার্শি ব্রাউন তাঁহার লিখিত 'ভারতের চিত্র-শিল্প' (Indian Painting) নামক গ্রন্থে সিঙ্গনপুরের উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন। মিঃ কগিন ব্রাউন (Mr. Coggin Brown) তাঁহার লিখিত ভারতীয় যাদুঘরের প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিবরণী গ্রন্থে (Catalogue of Prehistoric Antiquities in the Indian Museum) এই গুহা-চিত্রাবলির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যে পর্ব্বত-গৃহের গায়ে এই সকল গুহাগৃহগুলি অবস্থিত, সেই পাহাড়টি দেখিতে ত্রিকোণাকার। সম্মুখ ভাগের প্রবেশ-পথ ৩৪ ফিট। পশ্চিম দিক বা বাম দিকের আয়তন ৩৫ ফিট এবং দক্ষিণ বা পূর্ব্বদিকের পরিমাণ ৩৪ ফিট। প্রবেশ-পথের উচ্চতা প্রায় যাট ফিট হইবে। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে এই বৃহৎ গুহাটি দুই ভাগে

দুই নম্বর গুহার সম্মুখভাগ

বিভক্ত ছিল,—কালক্রমে উহার সম্মুখের দিকটা ভাঙ্গিয়া পড়ায় এখন একটি বৃহদাকার পার্ব্বত্য গুহাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখন ইহাকে গুহা না বলিয়া পর্ব্বত-গৃহ বলিলেই সঙ্গত ও শোভন হয়। এই পর্ব্বত গৃহের ভিতরে পশ্চাতের দিকে একটি ছোট গুহা দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ গুহাটির পরিমাণ ১০×৮ ফিট। এই গুহার একদিকে দুইটি গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়,

বোধ হয়, বর্ষার জলধারার গতিতেই ক্ষয় পাইয়া এইরূপ গর্ত্ত হইয়া থাকিবে।

সিঙ্গনপুর— পর্ব্বত গৃহ

এই পর্ব্বত-গৃহের পূর্ব্বে ও পশ্চিম দুই দিকের প্রাচীরের গায়েই অনেক ছবি আঁকা আছে। কোন কোন ছবি এত উঁচুতে আঁকা যে, মই কিংবা মাচার সাহায্য ভিন্ন অত উঁচুতে কখনও ছবি আঁকা যাইতে পারে না। এই সব ছবি বেশীর

সরীসৃপের চিত্র

ভাগই গেরুয়ামাটির রঙে আঁকা। ছবিগুলির মধ্যে কত রকম জন্তু-জানোয়ারের যে ছবি আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সব জানোয়ার দেখিয়া তোমরা চিনিতে পার কি? বল দেখি পাশের জন্তুটি কি? এইরূপ কত জানোয়ারের ছবি যে আছে, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। কিন্তু উপরে যে ছবিটি দেখিতেছ—সেটি যে সরীসৃপের চিত্র তাহাতে কোনও সন্দেহের কারণ নাই, তবে টিক্‌টিকি, কি গিরগিটি, কি গো-সাপ, তাহা ঠিক বুঝিয়া লওয়া কিন্তু বেশ কঠিন পর পৃষ্ঠায় দেখ আর একটি জন্তুর ছবি,

একটি জন্তুর ছবি—সিঙ্গনপুর

তাহার দ্রুতগতি ছবিতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। এই জন্তুটিকে তোমরা কি নাম দিতে চাও? এই নাম দেওয়ার ভারটা তোমাদের উপর দিলাম। তোমরাই একটা
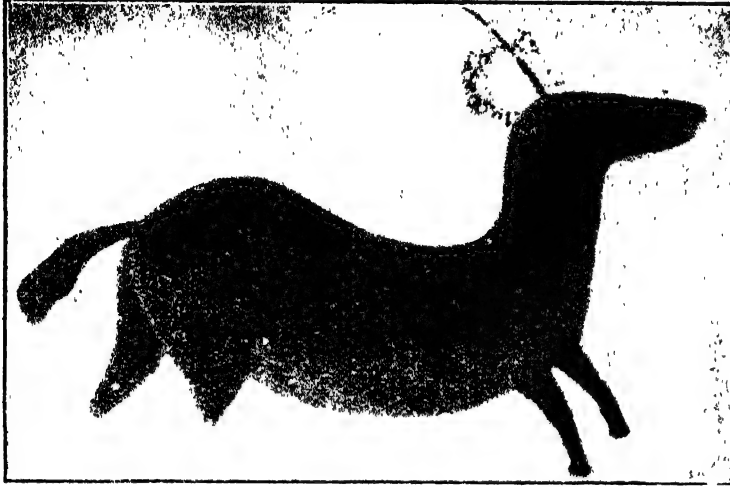
জানোয়ারের চিত্র— সিঙ্গনপুর

নাম ঠিক কর না? বাস্তবের সহিত কল্পনাকে মিলাইয়া হয়ত তাহারা এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। কিংবা হয়ত তাহারা বাস্তব কোনও জানোয়ারের ছবি আঁকিতে গিয়া নিজেদের অক্ষমতাবশতঃ ভালভাবে ফুটাইয়া তুলিতে না পারিয়া তাহাকে এক অদ্ভুত আকারে গড়িয়া তুলিয়াছে।

সেই যেমন ইউরোপের গুহাগুলির চিত্রের মধ্যে নানা শিকারের ছবি আছে, সিঙ্গনপুরের গুহাগুলির মধ্যে, যে সব চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যেও তেমনি সব শিকারের চিত্র আছে। সেকালের মানুষেরা বন্যপশু শিকার করিয়া জীবনধারণ করিত, গুহা-গৃহে বাস করিত, তাহাদের প্রতিবেশী বলিতে বনের পশুকেই বুঝাইত এবং বনের পশুরাই ছিল তাহাদের একমাত্র সঙ্গী, এজন্য শিকারের ছবিই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের মুখ পরিষ্কার ভাবে আঁকা কোন ছবিতেই নাই, গায়ের পোষাকও আলখাল্লার মত; কিন্তু কোন কোন চিত্রের গায়ে কোনরূপ পোষাক আছে, এইরূপ বোঝা যায় না। লাঠি লইয়া শিকারকে তাড়া করিতেছে এইরূপ ছবি সিঙ্গনপুরে অনেক আছে। নিম্নে একটি ছবি দেখ। ছবির জন্তুটি মহিষ বা বাইসন হইতে পারে। এই ছবিতে আমরা ছয়টি মানুষ দেখিতে পাইতেছি। চারিজনের গায়ে সেই ঢোলা পোষাক, দুইজনের গায়ে তাহা নাই। তিন জন লাঠি লইয়া জানোয়ারটিকে তাড়া করিতেছে। দুইজন

লাঠি লইয়া জানোয়ার তাড়া— সিঙ্গনপুর

পেছনে, একজন সম্মুখে রহিয়াছে। সম্মুখের লোকটি জন্তুটির অতি কাছে আসিয়া লাঠি দিয়া আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে।

নিম্নের ছবিখানিতে তিনটি মানুষ দেখিতে পাইতেছি। যে বড় তাহাকে পরিবারের কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়। বড়টির পাশের ছেলেটি যেন অপর বালকটিকে আসিতে দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। যাহাকে আমরা কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেছি, তাহার বাম হাতে কি রহিয়াছে বোঝা যায় না, তবে সে যে সাদরে দূরের লোকটিকে আহ্বান করিতেছে, তাহা

স্বাগত—সিঙ্গনপুর
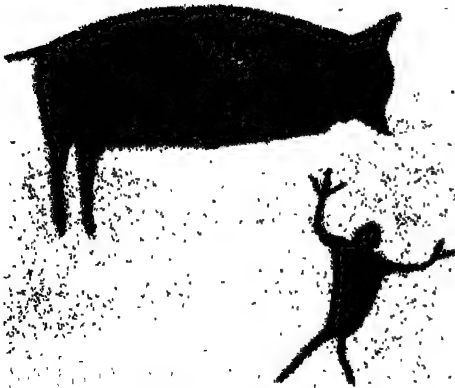
শিকারের তাড়া—সিঙ্গনপুর

ছবিতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঁদিকে সকলের উপরকার ত্রিশূলের চিত্রটি দিয়া কি

বুঝাইতেছে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। আর একটি চিত্রে নক্সা আঁকা দেখিতেছ।

রেখাচিত্র—সিঙ্গনপুর

এই রেখাচিত্রের মধ্যে বেশ নিপুণতা প্রকাশ পাইতেছে। প্রত্যেকটি রেখা সুস্পষ্ট, সরল এবং জোরালো। আর আদর্শটির মধ্যেও বিশেষত্ব রহিয়াছে। কোন্ শিল্পী কিসের জন্য এইরূপ ভাবে এই রেখা-চিত্র আঁকিয়াছিল, শুধু কি গুহার শোভা-বৃদ্ধির জন্য, না আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল, কিংবা কোন একটা বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্ন ইহাতে রহিয়াছে, তাহা এখন শুধু অনুমান করা ছাড়া আর কিছুই কি আমরা বলিতে পারি? বাম পার্শ্বে যে চিত্রটি দেখিতেছ, তাহা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে একটা জন্তু একজন মানুষকে তাড়া করিতেছে, লোকটি ভয়ে ছুটিয়া পলাইতেছে,

তাহার পায়ের গতি এবং হাতের গতি হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে।

এখন এই যে, সিঙ্গনপুরের চিত্র দেখিলে ছবিগুলির বয়স কত? কত দিন পূর্ব্বে এই-গুলি অঙ্কিত ও খোদিত হইয়াছিল? এ কথাটি আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি যে, সিঙ্গনপুরের এই চিত্রগুলি একই যুগের নহে। গুহা-গৃহের উচ্চতম অংশে যে সমুদয় চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় সে গুলিই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ নাই। কতকগুলি ছবি অনেক পরবর্ত্তী কালের বলিয়াই মনে হয়। পুরাণো চিত্রগুলির বেশীর ভাগই জীবজন্তুর এবং শিকারের দৃশ্য লইয়া অঙ্কিত। সবচেয়ে আধুনিক চিত্রাবলির বয়সও ন্যূনপক্ষে নবম শতাব্দী কি দশম শতাব্দীর পরের নহে। আর সবচেয়ে পুরাণো শিকারের চিত্রগুলির বয়স অনায়াসেই পুরাতন প্রস্তর-যুগ ধরা যাইতে পারে। অনেকে এখানকার প্রাচীন চিত্রগুলির বয়স কুড়িহাজার বৎসর, এইরূপ অনুমান করেন।

গরাই নদী—মির্জ্জাপুর

(৪) মির্জ্জাপুর—মির্জ্জাপুর জেলার গুহাগুলির মধ্যে যে সকল চিত্র পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির সহিত স্পেন দেশের কগাল (Cogul) গিরি-নিকেতনের চিত্রের বহুল পরিমাণে সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। ইউরোপের অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত এই যে, মির্জ্জাপুরের গুহাবলির চিত্র হইতেই আমরা ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পের প্রাচীন ইতিহাসের প্রকৃত সন্ধান পাইতে পারি।

মির্জ্জাপুর, এলাহাবাদ ও কাশীর মধ্যে অবস্থিত একটি জেলা। যুক্ত প্রদেশের মধ্যে ইহা একটি বড় জেলা। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে। গঙ্গার তীরে তীরে যে ভূ-ভাগ তাহা বালুকাময় ও সমতল—আবার কোথাও পর্ব্বতশ্রেণী। বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণী মির্জ্জাপুর জেলার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। শোণ নদের উপত্যকা প্রদেশে যে সকল পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে বিন্ধ্য-পর্ব্বতশ্রেণী ও কাইমুর পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যেই বেশীর ভাগ গুহা-গৃহ-চিত্রাবলি দেখিতে পাওয়া যায়। এ জেলায় লিখুনিয়া (Likhunia), কোহবর (Kohbar), ভালদরিয়া (Bhaldaria), মহারারিয়া (Mahararia), এবং বিজয়গড় নামক স্থানের গুহার গায়ে অঙ্কিত চিত্রাবলি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল গুহা দেখিতে হইলে আহ্‌রাউরা (Ahraura) সহর হইতে যাইতে হয়। আহ্‌রাউরা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের প্রধান লাইনের (Main line) মধ্যস্থ একটি ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে সহর তের মাইল দূরবর্ত্তী। এই ষ্টেশন হইতে সহর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে। আহ্‌রাউরা (অরোরা)

হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী ছাটু Chhatu) ডাকবাংলো পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তা। এখান হইতে একটী আঁকা বাঁকা পথ ধরিয়া কাইমুর পাহাড়ে উঠিতে হয়। সেখান হইতে একটী রাস্তা রবার্টস-গঞ্জের(Robertsganj)দিকে গিয়াছে এবং আর একটী গিয়াছে মহারারিয়া গ্রামের কাছে দোনগিয়ার (Dongia) দিকে। এই মহারারিয়া গ্রামের কাছাকাছি গরাইয়ের নদীর উপরিভাগে পর্ব্বত-গাত্রে অনেক চিত্র অঙ্কিত আছে। পাহাড়ের উপর দিয়া আর একটী পথ আহরাউরা হইতে চৌদিশ মাইল দূরবর্ত্তী রবার্টসগঞ্জ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। (Inspection Bunglow) রবার্টসগঞ্জের কাছাকাছি ধানদ্রোল (Dhandraul) নামক স্থানে সেচন বিভাগের একটা ডাকবাংলো আছে। এই ডাকবাংলোর তিন মাইল দক্ষিণে পাহাড়ের উপরকার সমতলভূমিতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিজয়গড় নামে পার্ব্বত্য দুর্গ অবস্থিত।

বিজয়গড়ের পার্ব্বত্য দুর্গ

বিজয়গড় দুর্গ যে পাহাড়ের উপর অবস্থিত তাহার পশ্চিম দিকে কতকগুলি গুহা-গৃহ আছে। তাহার মধ্যে অনেক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে প্রাচীন চিত্রাবলি ব্যতীত গুপ্তদের রাজত্বকালের খোদিত লিপিও রহিয়াছে। বিজয়গড় দুর্গে যাইবার পথে পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত বীর-পুরুষের মূর্ত্তি ও সিংহের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে গরাই নদী প্রায় এক শত ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে পড়িয়া মহারারিয়া গ্রামের কাছ দিয়া কাইমুর অধিত্যকায় বেলে পাথরে গঠিত পর্ব্বত-গাত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ছাটু গ্রামের কাছাকাছি ভালদরিয়া

বিজয়গড়ের বীরপুরুষ ও সিংহের মূর্ত্তি

(Bhaldario) নামে একটি ছোট নদীর সহিত যাইয়া মিলিত হইয়াছে। এই গরাই

ভালদরিয়া পাহাড়ের গুহা

নদীর তীরে তীরে অতি মনোরম স্থানে কোবার এবং লিখুনিয়ার গিরি-গৃহ অবস্থিত। ভালদরিয়া নদীর তীরেও অনুরূপ তিনটি গিরি-গৃহ আছে। সেখানেও অনেক খোদিত ও অঙ্কিত চিত্রাবলি রহিয়াছে। এখানকার দৃশ্য দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। চারিদিকে নীল ও শ্যামল গিরিশ্রেণী, সবুজ-সুন্দর তরু-শ্রেণী, পুষ্পিত লতাকুঞ্জ, আর পাহাড়ের গায়ে গায়ে নদী ও নির্ঝরের কল-গীতি, বিচিত্র ও মনোহর। এখানকার বনভূমিতে চিতা বাঘ, নেকড়ে বাঘ, বন্যকুকুর, লিঙ্কস্ প্রভৃতি বন্য পশু অবাধে বিচরণ করে। সম্বর ও চিতল জাতীয় হরিণ এখানে অসংখ্য। মোগলরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বাবরের আত্মচরিত হইতে জানিতে পারা যায়, পূর্ব্বে এখানে কেশরহীন সিংহ, হাতী, গণ্ডার, বুনোমহিষ এবং বাইসন বিচরণ করিত।

আহরাউরার দৃশ্যও বেশ সুন্দর। এখানকার গিরিগৃহের সম্মুখভাগের দৃশ্যাবলী দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। মির্জ্জাপুরের এই সব গুহাগৃহের চিত্রের মধ্যেও বেশীর ভাগ শিকারের চিত্র। একটি ছবিতে দেখ কি একটা জন্তু ছুটিয়া পলাইতেছে আর তাহার পেছনে শিকারীর দল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এমন অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত যে, জন্তুটিকে চিনিয়া উঠা কঠিন। জানোয়ারটি হরিণ কিংবা মহিষজাতীয় হইবে। নিশ্চয়ই কোন হিংস্রজন্তু নহে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। (১৫৩৩পৃঃ) সেকালের গুহার গায়ে যাহারা ছবি আঁকিয়াছিল, তাহাদের সময়
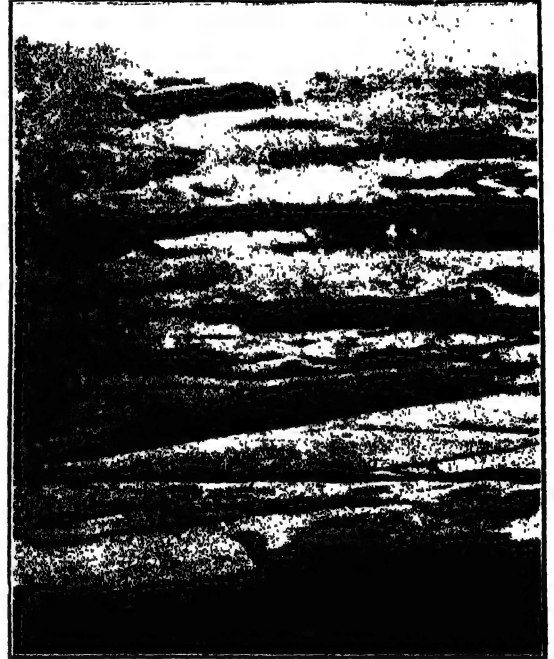
ভালদরিয়ার সাধারণ দৃশ্য—মির্জ্জাপুর

ঘোড়া যে মানুষের পোষ মানিয়াছিল, তাহা ছবি হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। ছবিতে

দেখ, একজন অশ্বারোহী বাম হাতে লাগাম ধরিয়া আর ডান হাতে মুগুরের মত একটা হাতিয়ার লইয়া কেমন বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে। সে ঘোড়ায় চড়িয়া এত বেগে কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছে, তাহার সন্ধান পাওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

মারামারি করিতেছে

ঘোড়সোয়ার

লিখুনিয়া পাহাড়ের চিত্র

আবার পাশের ছোট ছবিখানি দেখ। ছবিখানি দেখিয়া মনে হয়, যেন দুইজন লোকে মারামারি করিতেছে। দুইজনেই সশস্ত্র।

অপর একখানি ছবি—একটি বেষ্টনীর মধ্যে চারিজন লোক। আর উপরে তিনটি লোকের ছবি। (১৫৩৪ পৃঃ) মনে হয়, যেন কেহ পলায়ন করিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ধরিয়া আনা হইয়াছে। আর একটি গুহার গায়ে কয়েকটি লিপি রহিয়াছে। কয়েকটি স্পষ্ট এবং কয়েকটি অস্পষ্ট। এই লেখা কতদিনের প্রাচীন কিংবা উহা এমনি শুধু কয়েকটি রেখা মাত্র, তাহা অনুমান ব্যতীত সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা অসম্ভব। মির্জাপুরের গিরি-গুহার মধ্যে অঙ্কিত চিত্রাবলির সকল গুলির বয়স সমান নহে, কোনটির বয়স খুবই প্রাচীন, আবার কতকগুলির বয়স খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে, পণ্ডিতেরা এইরূপ অনুমান করেন।

(৫) হোসেঙ্গাবাদ—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত হোসেঙ্গাবাদ জেলার প্রধান সহরের নামও হোসেঙ্গাবাদ। হোসেঙ্গাবাদ সহর হইতে ১২ মাইল দূরে আদমগড় নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। এই পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া নানাস্থানে চালান দেওয়া হয়। এই

পর্ব্বতশ্রেণীর অনেক পাহাড়ের গায়ে নানা প্রকার খোদিত ও অঙ্কিত চিত্র আছে। কিরূপ পাহাড়ের গায়ে এই সব প্রাচীন চিত্র আছে, নিম্নের ছবি দুইখানি হইতে তাহা বুঝিতে পারিবে। এই সব পাহাড়ের গায়ে লাল ও পীতবর্ণের রঙ দিয়া নানা প্রকারের ছবি আঁকা রহিয়াছে। এই সকল ছবির ধরণধারণ একই প্রকারের।

যুদ্ধযাত্রা—হোসেঙ্গাবাদ

একখানি ছবিতে দেখ, চার জন লোক তরবারি হাতে লইয়া ও ঢাল হাতে করিয়া একটা ছোট দল গড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিন জন লোক যে ঘোড়সোয়ার তাহা ত বেশ বুঝা যাইতেছে। দলের একজন লোক হাঁটিয়া চলিয়াছে। যে লোকটি হাঁটিয়া চলিয়াছে, তাহার ডান হাতে তরোয়াল আর বাম হাতে ঢাল। ঢালের আকারটা একটু অদ্ভুত রকমের, নয়? অশ্বারোহীরা তাহাদের পিঠের দিকে ঢাল ঝুলাইয়া লইয়াছে, কি পোষাক-পরিচ্ছদ লইয়া চলিয়াছে তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। ঘোড়াগুলি যে বেশ তেজীয়ান্, তাহা তাহাদের মুখের ও পায়ের গতি-ভঙ্গী হইতেই বুঝিতেছি। বল দেখি ইহারা যুদ্ধে যাইতেছে, না, শিকারে যাইতেছে?

যুদ্ধযাত্রা বা শিকারযাত্রা—হোসেঙ্গাবাদ

আবার ঐ দেখ, চারিজন লোক তীর-ধনু হাতে করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এই লোক কয়টিও শিকার করিতে যাইতেছে, কি, যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে, তাহাও অনুমান করা ব্যতীত আর কি বলিতে পারি? কিন্তু ইহাদের গতি-ভঙ্গীর মধ্যে যে বেশ একটা সজীবতা আছে, তাহা দেখিতে পাইতেছ।

এই আদিম যুগের মানব-শিল্পীরা জীবজন্তুর চিত্র আঁকিতে বিশেষ দক্ষ ছিল। হোসেঙ্গাবাদের পর্ব্বতগাত্রে অঙ্কিত জীবজন্তুর চিত্রাবলির মধ্যে হস্তী, অশ্ব, মহিষ, হরিণ প্রভৃতির চিত্র যেন একেবারে জীবন্ত। হরিণের ছবিটির দিকে চাহিয়া দেখ, হরিণটি শিং বাঁকাইয়া কেমন ছুটিয়া চলিয়াছে। হরিণের অবয়বও প্রমাণানুরূপ হইয়াছে।

পর্ব্বত-গাত্রে কোথাও বা এক সঙ্গে অনেক কিছু অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে মানুষের ছবি আছে, জীবজন্তুর ছবি আছে এবং অনেকগুলি রেখাচিত্রও রহিয়াছে।

হোসেঙ্গাবাদের এই গুহার গায়ে অঙ্কিত ও পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত ও চিত্রিত ছবিগুলির মধ্যে কোন কোনটির বয়স খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ে হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন।

(৬) যোগীমারা গুহা—সিরগুজার অন্তর্গত রামগিরি পাহাড়ের যোগীমারা গুহার চিত্রাবলি অতিশয় প্রাচীন। সিরগুজা ও মধ্যপ্রদেশের একটি ছোট করদ রাজ্য। এখানকার দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত চিত্রাবলি খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বের বলিয়া অনুমান দেখা যায়। এইরূপ চিত্রাবলি কি উদ্দেশ্যে কেন যে চিত্রিত করা হইয়াছিল, সে কথা বলা কঠিন। বেলেরী ও নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত কয়েকটি গুহার গায়েও আদি-মানবের অঙ্কিত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।
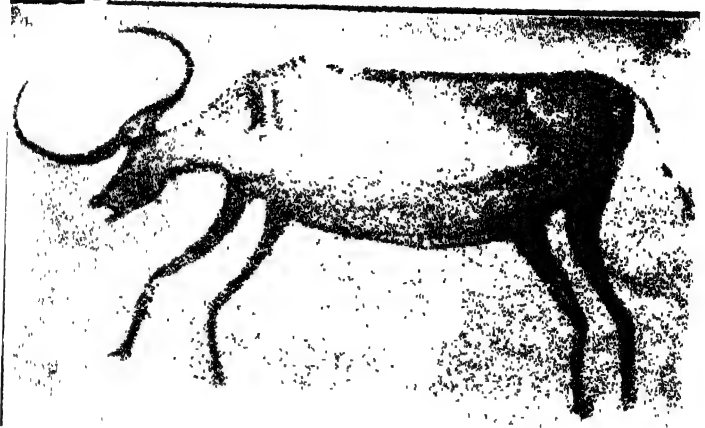
হরিণ ছুটিয়া চলিয়াছে

গিরি-গুহার প্রাচীরের গায়ে ছবি আঁকিবার রীতি ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল

শিকারীর দল শিকারের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে

করা হইয়াছে। এখানে নানা প্রকারের চিত্র আছে। জীব জন্তুর নানা রকমের ছবি এখানে রহিয়াছে। সে সকলের মধ্যে রথের, হাতীর ও নাচের ছবি যেমন আছে, তেমনি নানাজাতীয় মাছের ছবিও আছে, মকর ও অন্যান্য ভীষণাকৃতি কাল্পনিক জলজন্তুর চিত্রও হইতেই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের দরুণ সে সমুদয় চিত্র অনেক স্থলেই একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে কবে কোন্ সময়ে কিরূপে চিত্র-শিল্পের উদ্ভব হইয়াছিল, সে বিষয়ে অনেক গল্প আছে। একটি গল্প এই যে,

এক ব্রাহ্মণের ছেলের মৃত্যু হওয়ায়, ব্রাহ্মণ যমরাজকে অনেক স্তব-স্তুতি করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও সুফল হইল না, অবশেষে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার তপস্যা করায় ব্রহ্মা বলিলেন যে, তুমি তোমার পুত্রের একটি আলেখ্য অঙ্কিত কর। ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। ব্রহ্মার বরে চিত্র সজীব মানুষের আকার ধারণ করিল। বাণ রাজার কন্যা উষা, অনিরুদ্ধের চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে গল্পও হয়ত তোমরা শুনিয়া থাকিবে।

রামায়ণ ও মহাভারতে চিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। বৌদ্ধদের

আহরাউরা গিরি-গুহা

গুহার গায়ে অঙ্কিত চিত্র

বিনয়পিটক প্রাচীন গ্রন্থ। তৃতীয় বা চতুর্থ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ উহার রচনাকাল। বিনয়পিটকে সেকালের রাজাদের 'চিত্তঘর' বা চিত্রগৃহের কথা আছে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক

হোসেঙ্গাবাদের গিরি-গুহা

তারানাথ বুদ্ধদেবের মৃত্যু সময় হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় চিত্রাবলির ইতিহাস লিখিয়াছেন। সেকালের প্রাচীর-চিত্রকে তারানাথ দেবতাদের কাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের আদি-মানবের চিত্রকলা, যাহা বনের মধ্যে, পাহাড়ের গুহা-গাত্রে ও পাহাড়ের গায়ে অঙ্কিত ও খোদিত হইয়াছিল, তাহার বয়স নেহাৎ কম নয়। তাহার পরে ধীরে ধীরে শিক্ষা ও সভ্যতার আলো যেমন বিস্তার লাভ করিতে থাকিল, চিত্র-বিদ্যার আদর এবং প্রচারও তেমনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে লাগিল। বৌদ্ধযুগ ভারতের শিল্প-সম্পদের শ্রেষ্ঠ যুগ। বৌদ্ধযুগে চিত্রকলা বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সে যুগের চিত্রের নানা অপরূপ আদর্শ ভারতের নানা গিরিমন্দিরের আজিও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-গৌরবে বাঁচিয়া আছে। অজন্তা গুহার চিত্রকলার অপরূপ সৃষ্টি, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতীয় চিত্রকলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতেছে। সে সব কথা তোমরা ইহার পরে জানিতে পারিবে—বৌদ্ধযুগের চিত্র-কলার ইতিহাসে। বৌদ্ধ-যুগের সেই চিত্রকলার আদর্শ ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি এশিয়ার নানা দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল

পাহাড়ের গায়ে খোদিত লিপি

হোসেঙ্গাবাদ পাহাড়ের সাধারণ দৃশ্য

হোসেঙ্গাবাদের গুহার গায়ে আঁকা ছবি

ভ্রমণ ও আবিষ্কার

মঙ্গোপাক

১৪০৫ পৃষ্ঠার পর

উত্তর আফ্রিকা আবিষ্কারক-দের মধ্যে যিনি প্রথম পথ-প্রদর্শক, তাঁহার নাম মঙ্গো-পাক। ডেভিড লিভিংষ্টোনের কথা তোমরা পড়িয়াছ। লিভিংষ্টোন্ ভিক্টোরিয়া জল প্রপাত আবিষ্কার করিয়া যেমন অমর হইয়া গিয়াছেন তেমনি পাক নাইজারনদীর উৎস-সন্ধানে যাত্রা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

স্কটল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী সেলকার্কের (Selkirk) নিকটবর্ত্তী ফাউলসিলাস (Fowlshiels) নামে একটি ছোট গ্রামে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর এক দরিদ্রকৃষক-পরিবারে মঙ্গোপার্কের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার পড়াশুনার দিকে ঝোঁক ছিল। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে সম্বন্ধে শিখিবার ও জানিবার আগ্রহ ছিল তাঁহার খুবই বেশী। পাকের এক ভগিনীপতি ছিলেন উদ্যান-রক্ষক। পরে সেই সামান্য কাজ হইতে নিজের চেষ্টা, যত্ন অধ্যবসায়গুণে একজন সুপণ্ডিত উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন। পাক ইঁহার নিকট হইতে যে শুধু মৌখিক উৎসাহ পাইতেছিলেন, তাহা নহে; কার্য্যতও যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেন। এই ভদ্রলোকই মঙ্গোপার্কের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সৌভাগ্যের কারণ। অতঃপর ইনি পাককে সে সময়কার আফ্রিকা দেশ আবিষ্কার-সমিতির সদস্য, স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কসের (Sir Joseph Banks) সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। পার্কের বয়স যখন মাত্র পনের বৎসর, কেবল সে সময়ে তিনি সেলকার্কের একজন অস্ত্র-চিকিৎসকের নিকট কিছুদিন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

মঙ্গোপাক

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সলিলধারা

স্যার জোসেফের সহিত পরিচয় উভয় পক্ষেরই বিশেষ প্রীতির কারণ হইয়াছিল। তাঁহারই চেষ্টায় মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওরসেষ্টার (Worcestor) জাহাজের সহকারী চিকিৎসক হিসাবে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে পার্ক সুমিত্রা যাত্রা করেন। এক বৎসর পরে উদ্ভিদ-তত্ত্ব সম্বন্ধে এবং অজানা দেশ বেড়াইবার অদম্য উৎসাহ লইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে আফ্রিকা-আবিষ্কার সমিতি এপর্যান্ত আবিষ্কারের জন্য যত অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার সবগুলিই ব্যর্থ হইয়াছিল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মেজর হাউটন (Major Houghton) নামক একজন সাহসী ও উৎসাহী ভদ্রলোক নাইজার (Niger) নদী আবিষ্কার করিতে যাইয়া নানা বিপদ আপদের মধ্যে দস্যু-হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সমিতি পুনরায় এক নবীন অভিযান পাঠাইবার সঙ্কল্প করেন। এই বারই পার্কের প্রথম অভিযান। স্যর জোসেফের অনুমোদনে সুস্থ, বলিষ্ঠ দেহে নবীন উৎসাহে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে পার্ক অজানা দেশের অজানা নদীর উৎস-সন্ধানে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইংলাণ্ড হইতে যাত্রা করিলেন। সে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সে সময় অনেকটা আরব ও মবজাতীয় বণিকদের হাতে ছিল। ইউরোপীয় লোকেরা সেখানে গিয়া যদি তাহাদের ব্যবসা কাড়িয়া লয়, এই ভয়ে তাহারা সাহেব দেখিলেই নানারকম উৎপাত করিত।

মঙ্গোপার্ক প্রথমে গামবিয়া (Gambiya) নদীর তীরে অবতরণ করেন এবং সেখান হইতে পিসানিয়া (Pisania) নদী পর্য্যন্ত যাত্রা করেন। সেখানে ইংরাজ চিকিৎসক ডাঃ লেড্‌লে (Laidley) তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করেন। এখানে প্রায় ছয় মাস কাল থাকিয়া তিনি দেশীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার জ্বর হয়। কিন্তু এই জ্বর সারিবার পরেই তিনি আর অধিক কালবিলম্ব না করিয়া নাইজার নদী আবিষ্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথে পার্ককে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। কতবার বন্দী হইয়াছেন, প্রাণহানিরও আশঙ্কা হইয়াছে, তবুও তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তা ছাড়া,, দেশীয় লোকদের নানারকম কুসংস্কার। কেহ তাঁহাকে মনে ভাবিত যাদুকর, কেহ বা ভাবিত গুপ্তচর; সকলে তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। তাঁহার দেহের অতিরিক্ত সাদা রঙ্‌ দেশীলোকেরা মোটেই পছন্দ করিত না। একবার আফ্রিকার এক রাজা পার্ককে তাঁহার অসংখ্য রাণীদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। রাণীরা মঙ্গোপার্কের শুভ্রবর্ণ এবং উচ্চ নাসিকা এ দুইটি কৃত্রিম বলিয়া মনে করিলেন। একজন রাণী বলিলেন, 'বোধ হয় খুব ছেলে বেলায় এর মা একে দুধে স্নান করাতেন তাই এর রংটা এত শাদা, আর নাকটা রোজ টেনে টেনে এরকম বেখাপ্পা লম্বা করা হয়েছে।' আর একবার পার্ক সত্য সত্যই মানুষ কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহার হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলি গণনা করা হইয়াছিল। তা ছাড়া, তাঁহার চিকিৎসা-বিদ্যার জন্যও তাঁহাকে কম ভুগিতে হয় নাই। আফ্রিকার অসভ্যেরা কোন অসুখের জন্য অস্ত্র-

ডাঃ লারগি মঙ্গোপার্ককে অভ্যর্থনা করিতেছেন

চিকিৎসা করিয়া রক্তপাত করাটাকে খুবই পছন্দ করিত কিন্তু একবার একজন রোগীর হাতটা কাটিয়া না ফেলিলে সে আরোগ্য লাভ করিবে না, একথা যখন পার্ক বলিলেন, তখন রোগী এমন চীৎকার ও আস্ফালন করিয়া উঠিল যে, পার্ক পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। অনেকে তাঁহাকে যাদুকর মনে মনে করিত। তবু এত বিপদেও পার্ক হাল ছাড়েন নাই।

এদেশের লোকেরা নানারূপ ভয়-ভীতি ও কু-সংস্কারের বশীভূত ছিল। পার্কের নিগ্রো অনুচরেরাও নানা কু সংস্কারে বিশ্বাস করিত। এজন্য তাঁহাকে বহুবার বিপদে পড়িতে হইয়াছে। একবার ত তাহারা রওয়ানা হইবার মুখে বলিয়া বসিল যে, যদি একটা শাদা মুর্গী কাটিয়া দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা না হয়

তাহা হইলে তাহারা এক পাও অগ্রসর হইবে না। কেননা,ঐরূপ না করিলে তাহাদের যাত্রা শুভ হইবে না। তবু যা হ'ক, শেষটায় তাহারা যাত্রা আরম্ভ করিল। কয়েক সপ্তাহ বেশ নিরাপদে কাটিয়া গেল। পার্ক একটা গ্রামের পাশ দিয়া যাইবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, খুব বড় একটা গাছের ডালে কতকগুলি অদ্ভুত রকমের কাপড় চোপড় ঝুলিতেছে। তিনি এক জন অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলে—ঐগুলো কি? সে বলিল, জানেন না মশাই, এ গুলো হইতেছে 'মুম্‌বো জুম্‌বো'র পোষাক পরিচ্ছদ; ইনি হইতেছেন বনের দেবতা। গ্রামের কোন স্ত্রীলোক যদি স্বামীর অবাধ্য হয়, তাহা হইলে 'মুম্‌বো জুম্‌বো' দেবতা

মূরেরা পার্কের প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত

তাঁকে শাস্তি দেন অর্থাৎ দেবতার নামে গ্রামের লোকেরা সেই হতভাগিনী স্ত্রীলোককে যারপরনাই সাজা দিয়া থাকে।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জারা (Jarra) পৌঁছেন। মূরদের রাজ্যের সীমান্তের এই সহরটিতে পার্ক যে সাদর অভ্যর্থনা পান নাই,একথা সহজেই বুঝিতে পার একে ইউরোপীয়, তাতে খৃষ্টান; কাজেই, মূরেরা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া একাকী ও অসহায় পার্কের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। পার্ক এ সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"আমি এ সময়ে যেরূপ কষ্ট পাইয়াছি, এ জীবনে আর কখনও ঐরূপ ক্লেশ পাই নাই। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মূরেরা আমাকে অসহ্য ক্লেশ দিত। আমাকে তাহারা গরুর গামলায় করিয়া জল খাইতে দিত। এখানে পার্ক প্রায় চারি মাস কাল বন্দী অবস্থায় থাকার পর উদ্ধার পাইয়াছিলেন। এক নতন শত্রুদল মূরদের রাজ্য আক্রমণ করে, সেজন্য তাহারা অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত থাকার সময় সুযোগ পাইয়া পার্ক পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি মরুভূমির দারুণ গ্রীষ্মে একাকী সহায়-সম্বলহীন ও খাদ্যহীন অবস্থায় যাত্রা করিলেন। এ সময়ের অবস্থা কি ভীষণ। অনাহারে অনিদ্রায় পথ চলিতেছেন, কষ্টের অবধি নাই! একদিন পথের ধারে একটি ছোট গ্রাম দেখিতে পাইয়া খাদ্য সংগ্রহের জন্য পার্ক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কোনও খাদ্য মিলিল না—একান্ত নিরাশ মনে যখন ফিরিতেছিলেন, তখন গ্রামের ধারে একটি ছোট কুঁড়ে ঘরের মধ্যে একজন বৃদ্ধা নিগ্রোরমণীকে চরকা কাটিতে দেখিতে পাইলেন বৃদ্ধা নিগ্রোরমণী পার্ককে খাবার দিল এবং ঘোড়াকেও দানা দিল। পার্ক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ ঐ রমণীকে তাঁহার একখানি রুমাল উপহার দিলেন। এ সময়ে গ্রামের লোকেরা বৃদ্ধার কুটীরের পাশে আসিয়া জড় হইতেছিল। পার্ক দেখিলেন যে, ঐ দলের মধ্যে অনেক মূরও রহিয়াছে, এজন্য আর এক মুহূর্ত্তও কালবিলম্ব না করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। সে রাত্রিতে পার্ক নিবিড় বনের মধ্যে ঘোড়ার জিন মাথায় দিয়া শুইয়া কাটাইলেন।

তিন সপ্তাহকাল এইরূপ নানা যন্ত্রণা ও ক্লেশ সহ্য করিয়া পার্ক বাম্‌বারা(Bambara)-র সীমায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানকার স্থানীয় লোকেরা খাদ্য ও আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। পার্ক এখানে একটু নিশ্চিন্ত মনে দুই তিন দিন বিশ্রাম করিলেন এবং পরে একদল সেগো (Sago)-যাত্রী নিগ্রোর সহিত সেগো রওয়ানা হইলেন। সেগো বাম্‌বারার রাজধানী। নিগ্রোরা সব তাহাদের ঘোড়ায় চড়িয়া বেগে যাইতেছিল, কিন্তু এ সময়ে পার্কের ঘোড়াটি একান্ত দুর্ব্বল ও অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ একটি মৃতপ্রায় প্রাণীর পৃষ্ঠে আরোহণ না করিয়া তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া হাঁটিয়া চলিলেন,
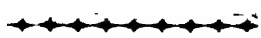
সেগোর কাছাকাছি আসিয়া তাঁহার সঙ্গে একদল দাস-ব্যবসায়ীর দেখা হইল। তাহারা কতকগুলি ক্রীত-দাস লইয়া মরক্কো (Morocco) যাইতেছে। সে দলে সত্তর জন লোক ছিল। এ সময়ে দাস-ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় ছিল। পশ্চিম আফ্রিকার নানা-দেশীয় দাস-বণিকেরা আসিয়া হতভাগা নিগ্রোদের ও অসভ্য অধিবাসীদের ক্রয় করিয়া আমেরিকায় চালান দিত। ঐ সময়ে খৃষ্টান জগৎ হইতে দাস-ব্যবসায় তুলিয়া দেওয়া হইলেও এই অঞ্চল হইতে তখনও উহা একেবারে উঠিয়া যায় নাই।

সেগোর কয়েক মাইল আগে হঠাৎ একজন নিগ্রো চীৎকার করিয়া বলিল—'ঐ দেখ জল!' পার্ক দেখিলেন, প্রভাতের সূর্য্যালোকে সমুজ্জল বিশাল নাইজার (Niger) নদী উত্তর-পূর্ব্ব মুখে প্রবাহিত হইতেছে। দেখিয়া তাঁহার প্রাণে অপূর্ব্ব উৎসাহ ও আনন্দ জাগিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, এইবার সমুদয় শ্রম সার্থক হইয়াছে। পার্কের এই আবিষ্কার টলেমির (Ptolemy) আমলের ধারণা একেবারে বদলাইয়া দিল। সকলে এইবার হইতে জানিল, নাইজার নদী পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে। তিনি তাড়াতাড়ি নদীর পাড়ে দৌড়াইয়া আসিলেন এবং অঞ্জলি ভরিয়া নাইজারের জল পান করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, হে দয়াল প্রভু! তোমারই অনুগ্রহে আজ সমুদয় আপদ-বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

নাইজার নদীর দক্ষিণ পাড়ে সেগো (Sego) সহর। এই সহরের লোক-সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০। এ পাড় হইতে সহরের মাটির সমতল ছাদের মাথার উপর দিয়া মস্‌জিদের চূড়াগুলি দেখা যাইতেছিল। রাজার সঙ্গে দেখা করিবার আদেশ না পাওয়ায় তাঁহার আর নদী পার হওয়া হইল না। কেননা, রাজার অনুমতি ব্যতীত পার্কের নদী পার হওয়া সম্ভবপর ছিল না। সেগোর লোকদের নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার ও আশ্রয়ের জন্য পার্ক নদীর এ পাড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে লাগিলেন। যেখানে যান, সেখানেই বিপদ! সকলেই এই আশ্চর্য্য বিদেশী ও শাদা রঙের লোকটিকে দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া যায়।

তিনি যে বাড়ীতেই যান, লোকে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়! ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া পার্ক একটা গাছের তলায় বসিয়া রহিলেন। এই সময় বৃষ্টি পড়িতেছিল। রাত্রিকালে, বৃষ্টির ধারায় ও শীতে কাতর পার্ককে মূর্ত্তিমতী দয়ার ন্যায় দুইজন

মঙ্গোপার্ক নাইজার নদী পার হইতেছেন

নিগ্রো স্ত্রীলোক গৃহে আনিয়া আশ্রয় ও খাদ্য দিয়াছিল। মঙ্গোপার্ক দেশীয় ভাষা জানিতেন। সে দেশের মেয়েরা সন্ধ্যার পর ঘরে বসিয়া চরকায় সূতা কাটে, আর গান গায়। মঙ্গোপার্কের নামে তাহারা গান তৈয়ারী করিয়া গাহিয়াছিল,—পার্ক তাহার যে ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা এখানে দিলাম :—

The winds roared and the rains fell,
The poor white man, faint and weary,
Came and sat under our tree.
He has no mother to bring him milk,
no wife to grind his corn.

বাতাস গরজায়, বৃষ্টি পড়ে;
পথিক দরজায়, বিদেশী অসহায়,
কাতর সে যে হায়, বিষম ঝড়ে!
কাছে মা নাই তার, দুধ কে দেবে আর?
গরম ক'রে আর আদর ক'রে?
বধূ সে কাছে নাই, গম কে ভাঙে ভাই;
রুটি কে গড়ে বল তাহার তরে?
বিদেশী অসহায়, কোথা সে যাবে হায়?
আমরা তারে আয় বাঁচাই ঝড়ে;
নাই মা, বধূ নাই, খেতে কে দিবে ভাই?
কে তারে দেবে ঠাঁই? বৃষ্টি ঝড়ে! *

মঙ্গোপার্ক তাঁহার রোজনামচায় লিখিয়াছিলেন যে, "আমার সমস্ত অভিযানের পথে, দেশীয় মেয়েরা—সে যতই গরীব হউক না কেন, আমাকে খাদ্য, পানীয় এবং শয়ন করিবার জন্য নিজেদের সাধ্যমত মাদুর আনিয়া দিয়াছে।"

এই ভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেলে পর এক দিন বাম্বারার রাজা মানসোঙ্গের (Mansong) নিকট হইতে উপহার স্বরূপ ৫০০ কড়ি লইয়া এক জন দূত আসিয়া বলিল, তুমি এই মুহূর্ত্তে সেগো অঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যাও। কেন এই শাদা লোকটি এ অঞ্চলে আসিয়াছে এবং আবিষ্কার বলিতে কি বুঝায়, এ বিষয়ে রাজার কোন ধারণাই ছিল না। রাজা পার্ককে কোন পার্শ্ববর্ত্তী দেশের রাজার গোয়েন্দা মনে করিয়াই হয়ত ঐরূপ আদেশ দিয়াছিলেন।

একজন পথ প্রদর্শক সঙ্গে লইয়া মঙ্গোপার্ক সেগো পরিত্যাগ করিলেন। এইবার তাঁহারা উত্তর পূর্ব্ব দিকের পথ ধরিয়া চলিলেন। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা ছোট পাহাড়ের ধারে ঝোপের কাছা কাছি আসিয়া তাঁহার পথ প্রদর্শক থমকিয়া দাঁড়াইল! সে পার্ককে আঙ্গুল দিয়া দেখাইল যে, ঝোপের পাশে মস্ত বড় একটা সিংহ থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে—তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিয়া। ঐখানে চুপ করিয়া না থাকিয়া তাঁহারা দুইজনে আস্তে আস্তে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সিংহ তাহাদিগের কোনও ক্ষতি করিল না। পর দিন প্রাতঃকালে ঘোড়া এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িল যে, সে আর নড়িতে পারে না। নিরুপায় পার্ক ঘোড়ার লাগাম ও জিন নিজে কাঁধে করিয়া লইয়া চলিলেন, আর ঘোড়াটাকে চড়িয়া খাইবার জন্য ছাড়িয়া দিলেন। এই ভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে কিয়া (Kea) নামে নাইজার নদীর তীরে একটি গ্রামে আসিলেন। এখান হইতে তাঁহার পথ-প্রদর্শক চলিয়া গেল।

* এই গানটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ

কিয়া হইতে সিলা (Silla) হইয়া ক্রমাগত ছয় সপ্তাহ কাল চলিতে চলিতে বামবারা রাজ্যের সান্সান্ডিঙ্গ (Sansan ding) গ্রামে আসিলেন। এখানে আসিয়া শুনিলেন যে, মানসোঙ্গের লোক তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। কাজেই তাড়াতাড়ি সেই গ্রাম ছাড়িয়া আর একটি গ্রামে আসিলেন। এগ্রামের লোকেরা বলিল যে এখনই পলাইয়া যান, মানসোঙ্গের

সর্দ্দার পার্কের ছাতাটি ও কোটটি কাড়িয়া লইল

লোকেরা এ গ্রামেও আপনাকে ধরিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই ভাবে গ্রামের পর গ্রামে---যে গ্রামে যান, শুধু ঐ এক কথা, মানসোঙ্গের লোকেরা আসিতেছে। মাঝে মাঝে গ্রামের সর্দ্দারেরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার সঙ্গের জিনিষ-পত্র সব কাড়িয়া লইয়া তবে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিত। একবার এক সর্দ্দার তাঁহার ছাতাটি কাড়িয়া লইল! ছাতাটা বার বার খুলিয়া ও বন্ধ করিয়া তাহার মহা আনন্দ! ছাতা কি কাজে লাগে, সে কথাটা বুঝিতে কিন্তু তাহার অনেকখানি সময় লাগিয়াছিল। আসিবার সময় সর্দ্দার মহাশয় মঙ্গোপার্কের নীল কোট ও তার সোনালী বোতাম দেখিয়া সেই কোটটিও চাহিয়া লইল। কিন্তু এই সর্দ্দার লোকটি ভালই ছিল। সে ছাতা ও কোটের বদলে অনেক জিনিষপত্র দিয়া তাঁহার চলা-ফেরার সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। এইরূপভাবে অনাহারে ও নানা অশান্তি সহ্য করিতে করিতে অবশেষে পার্ক কুলিকোরো (Koolie korro) নামক গ্রামে আসিলেন। এখানকার হাটে লবণ বেচা-কেনা চলিত। একজন লবণ-ব্যবসায়ী তাঁহাকে আশ্রয় ও খাদ্য দিলেন। এই বনিক্ পূর্ব্বে একজন মূরের ক্রীতদাস ছিলেন। পথে এবারও বিপদ ঘটিয়াছিল। লুডামার নামক স্থানের সর্দ্দার আলি পার্কের সাহায্য প্রার্থনায় তাঁহার নিজের লোক দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত নিরাপদে পথ চলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এত দিন ক্লেশ সহিবার পর, অবশেষে এখানে তাঁহার সুখাদ্যও যেমন মিলিল, তেমনি তাঁহার সুনিদ্রাও হইয়াছিল।

মাঙ্গোপার্ক কুলিকোরো ছাড়িয়া আবার চলিতে লাগিলেন। চারিদিন পরে ম্যান্ডিঙ্গ (Manding) নামক একটি ছোট সহরের কাছাকাছি একদল ডাকাতের হাতে পড়িলেন। ডাকাতেরা তাঁহার কাপড় চোপড় ও ঘোড়াটি লইয়া চলিয়া গেল। তাঁহার গায়ের জামার পকেটে রোজ-নামচার খাতাখানা ছিল; সেখানা রক্ষা পাইল বলিয়া তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন! অবশেষে সিবিডুল (Sibidooloo) নামক স্থানে আসিলে এখানকার শাসনকর্ত্তার সহায়তায় তিনি তাঁহার লুণ্ঠিত পোষাক-পরিচ্ছদ ও ঘোড়াটি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। এ সময়ে এদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল।
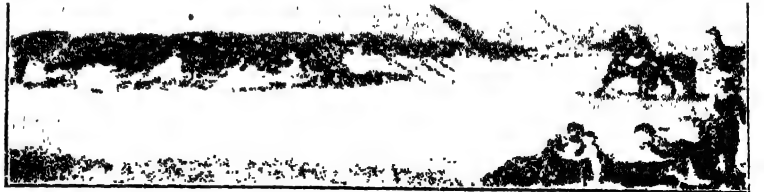
সর্দ্দার আলির শিবির

মা খাদ্যের জন্য সন্তান বিক্রয় করিত। স্বামী স্ত্রী বিক্রয় করিত; এইরূপ দুর্দশার মধ্যেও শাসনকর্তার অনুগ্রহে তাঁহার খাদ্যাদির কোনও অসুবিধা হয় নাই।

সিবিডুলু হইতে পার্ক কামালিয়া (Kamalia) নামক স্থানে আসেন। এখানে তাঁহার খুব জ্বর হয় কিন্তু কার্ফা তৌরা (Karfa Taura) নামক একজন দাসব্যবসায়ীর পরিচর্য্যার গুণে তাঁহার কোনও ক্লেশ বা অসুবিধা হয় নাই।

এখান হইতে গাম্বিয়া পর্য্যন্ত ৫০০ শত মাইল যাইতে যাইতে পার্ক ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের দাসগণের প্রতি নির্য্যাতন করিতে দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার রোজ নামচাতে (Diary) লিখিত আছে। পার্ক লিখিয়াছেন, "প্রত্যেক ক্রীতদাসকে বড় বড় বোঝা মাথায় লইয়া চলিতে হইত। সে বোঝা সে বহিতে পারুক বা না পারুক, তাহাকে বহন করিতেই হইবে। যদি সে ক্লান্ত হইয়া পড়িত, তবে তাহার পিঠে চাবুক পড়িত। একটি বালিকা গুরুভার বহন করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ায়, তাহাকে এইরূপ প্রহার করা হয় যে, তাহার সারা গা বহিয়া রক্তের ধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু কে বলিবে? শেষটায় তাহাকে একটা গাধার পিঠে বাঁধিয়া দেওয়া হইল তবুও যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না, তখন তাহাকে পথের ধারে ফেলিয়া দেওয়া হইল। মানুষ যে মানুষের উপর কিরূপ অত্যাচার করিতে পারে, আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম।"

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন অবশেষে পার্ক পিসানিয়া (Pisania) তে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ডাঃ লেডলে (Laidley) তাঁহাকে নূতন পোষাক দিলেন। গোঁফ-দাড়ি কামাইয়া সুন্দর নূতন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিবার পর তাঁহার চেহারা একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল। এখন আর তাঁকে কে বলিবে যে, ইনিই সেই মঙ্গোপার্ক! সেই লম্বা দাড়ি গোঁফওয়ালা ছেঁড়া পোষাকপরা লোকটি যেন যাদুমন্ত্রবলে এক নূতন মানুষ হইয়া পড়িল।

পাঁচদিন এখানে থাকিবার পরে এক দাস-ব্যবসায়ীর জাহাজে তিনি দেশে যাত্রা করিলেন। পথে ঝড়-জলে এই জাহাজ পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে গিয়া পড়ে। সেখান হইতে অন্য জাহাজে দেশে রওয়ানা হন এবং দীর্ঘ দুইবৎসর সাতমাস পরে লণ্ডনে পৌঁছেন।

বহুদিন পরে আকস্মিক ভাবে আবার পার্কের ভগ্নীপতির সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সকলে এতদিন পার্ককে মৃতই ভাবিয়াছিলেন। মঙ্গোপার্কের হঠাৎ আগমনে এবং আশ্চর্য্য আবিষ্কার কাহিনী ক্রমে আফ্রিকা-আবিষ্কার-সমিতির কর্ণগোচর হইলে তিনি যথেষ্ট অভিনন্দিত হইলেন। লোকের অনুরোধে এসময়ে তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিতে আরম্ভ করেন। একাজে তাঁহার প্রায় পনেরো মাস সময় লাগে।

মঙ্গোপার্কের রচিত ভ্রমণ-কাহিনী যেমন সুলিখিত তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। ইহা আজ পর্য্যন্ত একখানা শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-কাহিনী বলিয়া বিবেচিত হয়।

দেশে ফিরিয়া মঙ্গোপার্ক কিছুদিন চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন এবং পরিবার পরিজন লইয়া সুখে বাস করিতে থাকেন। মঙ্গোপার্ক লোকসমাজ তত ভালবাসিতেন না—তিনি নির্জ্জনতাপ্রিয় ও স্বল্পভাষী ছিলেন। আফ্রিকার বিজন প্রদেশে বহুদিন বাসের ফলে তিনি লোকসঙ্গবিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাছাড়া তিনি অবসর সময় উদ্ভিদ-বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন। একবার স্কট নামক একজন প্রতিবেশী বন্ধু পার্কের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া তাঁহাকে পাইলেন না। কিছুদূর যাইয়া দেখিলেন, ডাঃ পার্ক একটি ছোট নদীতে পাথরের নুড়ি ফেলিয়া মনোযোগের সহিত দেখিতেছেন জলে কি রকম শব্দ হয়। ভদ্রলোক প্রথমে পার্ককে এরকম ছেলেমানুষী খেলা করিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, পরে কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলে,'ডাঃ পার্ক এ কি করিতেছেন?' একটু হাসিয়া ডাঃ মঙ্গোপার্ক উত্তর দিলেন, 'আফ্রিকায় থাকিতে কোন নদী পার হইবার আগে আমি এরকম করিয়া জল মাপিয়া দেখিতাম।'

ক্রমে মঙ্গোপার্কের আর নিরীহ, শান্ত গৃহীর জীবন ভাল লাগিল না। সেই অজানা প্রান্তরে পাড়ি দিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এক একজন মানুষের মনে কেমন নেশা থাকে, বিপদের মুখে হইলেও নূতন দেশের নামে ছুটিয়া যায়। আবার সুযোগ মিলিয়া গেল। এই পার্কের শেষ যাত্রা। ১৮০৩ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট পুনরায় 'নাইজার অভিযানে' লোক পাঠাইতে চাহিলে মঙ্গোপার্ক সাগ্রহে সম্মত হইলেন। কিন্তু মাঝে গোলমাল হওয়াতে কিছুদিন এই ব্যাপারটি বন্ধ থাকিয়া পরে ১৮০৫ খৃঃ যাওয়া একেবারে স্থির হয়। এইবারের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, যত দূর

পর্য্যন্ত সম্ভব, নাইজার নদীর গতি আবিষ্কার করা এবং ইহার তীরের অধিবাসী দেশীয়দের সহিত ব্যবসায়ের আদান-প্রদান সম্বন্ধ স্থাপন করা। পার্ক এই উদ্দেশ্য সফল করিবার পক্ষে পথের বিপদ, প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতি বিষয় খুব ভাল করিয়াই জানিতেন। তথাপি ভীত হইলেন না। চুয়াল্লিশ জন শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় এবং ক্ষুদ্র নিগ্রো সঙ্গী লইয়া সেই বিপদ-সঙ্কুল পথে যাত্রা করিলেন। বাহিরে দেখিতে মঙ্গোপাককে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী সহাস্যমুখ মনে হইতেছিল।

কিন্তু এবার পার্ক একটি বিষম অদূরদর্শিতার কাজ করিয়াছিলেন। বর্ষায় আফ্রিকা অভিযানের মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হইতে পারে না। নদী পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পথেই তাহার সঙ্গীদের মধ্যে তেত্রিশজন ইউরোপীয়ান মারা যান। সেই মুষ্টিমেয় দল লইয়া মঙ্গোপাক যাত্রা করিলেন। পথ মোটেই সমতল ছিল না। তাছাড়া নানা জীবজন্তুর উৎপাত তো ছিলই। একবার পঙ্গপালের মত এক মৌমাছির ঝাঁক পার্কের দল আক্রমণ করিয়া দংশন করিতে থাকে।

আর একবার ইসায়াকো (Issaaco) নামক একজন দেশীয় পুরোহিত তাঁহাদের পথ-প্রদর্শকরূপে সঙ্গী হয়। পথে নদী পার হইবার সময় সেই লোকটিকে কুমীরে ধরে। অসাধারণ বুদ্ধিবলে কুমীরের চক্ষে আঘাত করিয়া লোকটি বাঁচিয়া যায়। তাছাড়া নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আক্রমণও মাঝে মাঝে হইত। স্থির মস্তিষ্কে বন্দুক হস্তে পার্ক বিপদে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেন।

এবার দল বাছিয়া লওয়াও ভুল হইয়াছিল। দলের বেশীর ভাগই 'গরী' (Goree) নামক সেনা-নিবাস হইতে বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই সব সৈন্য বিপদে তেমন অভ্যস্ত অথবা কষ্টসহিষ্ণু ছিল না।

দেশীয়দের বিশ্বাসঘাতকতা, বন্য জন্তুর আক্রমণ, রোগ, ভীষণ বর্ষা—সব মিলিয়া এই সব সৈন্যদের কাবু করিয়া ফেলে। ইহারা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেই অভ্যস্ত, এই সব অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণ ইহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। কিছু দিনের মধ্যে দলে গোলমাল, অশান্তি ও কলহ দেখা দিল। তথাপি পার্ক নিরাশ হন নাই। এসময়ের বিবরণ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। মঙ্গোপাক ডাইরিতে লিখিতেছেন, ৬ই জুলাই—"দলের বেশীর ভাগই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। একজন একটু ভাল দুধ কিনিয়া আনিয়াছে।" আর একদিনের খবর দেখিতেছি "মিঃ এণ্ডারসন মৃতপ্রায় হইয়া ঝোপের ধারে পড়িয়া আছেন। পিঠে করিয়া নদী পার হইলাম। আজ ষোল বার এই ছোট নদীটি পার হইয়া বেশ খানিকটা ক্লান্তি বোধ হইতেছে।"

নাইজার নদীর তীরে পৌঁছিয়া সাময়িক বিশ্রাম মিলিল। ব্যামবাকু (Bambakoo) পৌঁছিয়া পার্ক দুইখানি 'ক্যানো' নামক নৌকা করিয়া ইসাকো (Issaaco) রাজার নিকট নাইজার-তীরবর্ত্তী রাজ্য দিয়া যাইবার অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। রাজা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবশেষে অনুমতি দিলেন এবং সান্‌সানডিঙ্গ (Sansanding) পর্য্যন্ত একজন লোককে সঙ্গে দিলেন। এখানে পার্ক দুইমাস রহিলেন। তিনি দেশীয়দের সহিত ব্যবসা করিতেন এবং পুনরায় যাত্রার আয়োজন করিয়া একটি বিশেষ নৌকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন।

"মিঃ এণ্ডারসনের মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার মনে বিশেষ কোন আশঙ্কা হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর আমার মনে হইল, আমি আবার অসহায় একাকী, বন্ধুহীন। এই বিজন আফ্রিকার মধ্য প্রদেশে আমার আর কেহই নাই।" এই ঘটনার পাঁচ মাস পরে মাঙ্গোপার্ক তিনজন নিগ্রো, চারজন ইউরোপীয়ান (একজন পাগল) শেষ যাত্রা করেন। তাঁহার ডাইরির শেষ বিবরণ ১৬ নভেম্বর—"সমস্ত প্রস্তুত, আমরা কাল ভোরে কিংবা সন্ধ্যায় যাত্রা করিব।" সেই মাসেই তাঁহার শেষ চিঠি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌঁছে। তারপর পৃথিবীর সহিত সমুদয় সম্বন্ধ তাঁহার শেষ হইয়া গেল।

মঙ্গোপার্কের মৃত্যুর গুজব অবশেষে ইংলণ্ডে পৌঁছিল। কিন্তু এখনও এগুজব সম্পূর্ণ সত্য কিনা, লোকে তাহা মানিয়া লয় নাই। ১৮১০ খৃঃ আবিষ্কারকের অদৃষ্টে কি ঘটিল, তাহা জানিবার জন্য অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অবশেষে সমস্ত ব্যাপারটি জানিতে পারা গেল। প্রায় ১০০০ মাইল পর্য্যন্ত নাইজার নদীর গতি অভিমুখে চলিয়া অবশেষে পার্ক বাসা (Bussa) পৌঁছিলেন। এখানে একজন দেশীয় সর্দ্দারের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহারা একদল অসভ্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। পার্ক ও তাহার সঙ্গীরা আত্মরক্ষার জন্য নদীতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এই বিপদের মধ্যে একজন মাত্র নিগ্রো ও ঐ দেশীয় পথপ্রদর্শক বাঁচিয়াছিল—শুধু এই দুঃসংবাদ পৃথিবীতে প্রচারের জন্য! মঙ্গোপার্কের নাম প্রথম আবিষ্কর্ত্তারূপে চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে।

জলের কাজ

১২৭৮ পৃষ্ঠার পর

তরল অবস্থার জলের সহিত আমরা সম্যক্ ভাবে পরিচিত। জল যে আমাদের কত প্রয়োজনীয় বস্তু, তাহা ইহাকে অনায়াসে কাছে পাই বলিয়া তত বুঝিবার চেষ্টা করি না।

সভ্যতার ইতিহাস

সভ্যতার ইতিহাস জলের ধারেই গঠিত হইয়াছে। আদিম মনুষ্য জলের ধারেই বাসা বাঁধিয়াছে, জলের ধারেই কৃষিকার্য্য করিয়াছে, ক্রমে কূপাদি খনন করিতে শিখিয়াছে, জল ধরিয়া রাখিবার বৃহৎ চৌবাচ্চা ও তাহার পর জল সরবরাহের বৃহৎ কল-কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছে।

কাব্য

কবি জলের সৌন্দর্য্যে আত্মহারা। মেঘ, নদী ও সমুদ্রের সৌন্দর্য্য সত্যই অবর্ণনীয়।

মৃত্তিকা

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জলের কাজ কোথায় নাই, তাই খুঁজিয়া পাই না। আমরা যে মৃত্তিকায় বাস করি, তাহারও সৃষ্টিতে জলের হাত রহিয়াছে। পৃথিবীর আদি যুগে ইহা গলিত প্রস্তরে গঠিত ছিল। তাহার পর, লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া বৃষ্টির জল, অঙ্গারাম্ল ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়, তাহাদের বিরাট পরিমাণের দ্বারা সংসাধিত রাসায়নিক আক্রমণে, সেই অগ্নিজাত প্রস্তর হইতে বালি ও বিশুদ্ধ চীনামাটির মত মাটির সৃষ্টি করে। এইগুলি জলপ্রবাহে বাহিত হইয়া এখানে সেখানে স্তরের উপর স্তর সৃষ্টি করিতে থাকে। ক্রমে তরুলতার জন্ম, মৃত্যু ও পচনে তাহাদের দেহ এই স্তরগুলির সহিত মিশিতে থাকে। এইরূপে বহুবিধ জৈবিক বস্তুর সহিত মিলিয়া, সেই বালি, চূর্ণ, খড়িমাটি ইত্যাদি সাধারণ মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। এখনও এই উপায়ে পর্ব্বত হইতে অনবরত মৃত্তিকা প্রস্তুত হইতেছে।

আরও এক কারণে পর্ব্বতগুলির প্রস্তর অনবরত চূর্ণ হইতেছে। জল জমিলে তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয়, সেই কারণে পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জল জমিলে প্রস্তরের চাপটাকে ফাটাইয়া ফেলে।

বেলে পাথর

সাধারণ পাহাড়ে যে প্রস্তর আমরা দেখি তাহা অগ্নিজাত প্রস্তর নহে। এই সাধারণ পাথরই আমরা সচরাচর ব্যবহার করি। অগ্নিজাত প্রস্তর হইতে উপরিউক্ত রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন বালি, স্তরে স্তরে চাপের প্রভাবে জমাট হইয়া, এইরূপ প্রস্তরের সৃষ্টি করে। ইহাকে বেলে-পাথর বলে ও স্তরে স্তরে সৃষ্ট বলিয়া ইহা সহজেই স্তরে স্তরে কাটিতে পারা যায়। ইহাও পরোক্ষভাবে, জল হইতে উৎপন্ন বলিতে হইবে।

জলের দ্বারা সংসাধিত উপরিউক্ত রাসায়নিক বিধ্বংসতায়, অগ্নিজাত প্রস্তর হইতে বহু পোটাসিয়ম্ লবণের সৃষ্টি হয়। তাহা নদীর জলে ও তথা হইতে তীরে, পলিমাটিতে আসিয়া পড়ে। ইহা উদ্ভিদের একটি প্রধান খাদ্য, সেইজন্য নদীর তীর ও পলিমাটি এত উর্ব্বর।

চড়া ও বদ্বীপ

নদীর জলের মৃত্তিকায় চড়া ও বদ্বীপের সৃষ্টি করে। যেখানেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, ধরণীর বহির্গঠনে সর্ব্বত্রই জলের দেখা পাই।

সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটাও জলের খেলা। চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণে ও পৃথিবী ঘূর্ণমান থাকায় ইহা সৃষ্ট হয়।

জোয়ার ভাঁটা

জীবের সৃষ্টি ব্যাপারেও জলের প্রাধান্য উপলব্ধি করি। সমুদ্রের জল হইতেই জীবের প্রথম সৃষ্টি। ক্রমবিকাশে মানব উৎপন্ন, তাই আজও তাহার শরীরের দুই-তৃতীয়াংশ পদার্থই জল। শুধু তাহাই নহে, সমুদ্র-জলে যে সকল লবণ পাওয়া যায়, আমাদের শরীরে সেইগুলিই সেইরূপ আপেক্ষিক পরিমাণে আছে। চিকিৎসায় যে লবণাক্ত জল ব্যবহার হয়, তাহাও সমুদ্র-জলের অনুরূপ করিয়া প্রস্তুত হয়।

জীবের সৃষ্টি ব্যাপার ও জীব-শরীর

বাতাসের পরেই আমাদের শরীরে জলের কি পরিমান প্রয়োজন, জল-পিপাসার সময়ে আমরা তাহা কতকটা বুঝিতে পারি। লোকে পিপাসায় কি না পান করিয়াছে, পিপাসার কষ্টে পাগল পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। জল-বঞ্চিত অবস্থায় আমরা কয়েক দিনেই মৃত্যুমুখে পতিত হই।

পানীয়

আমাদের সকল খাদ্যেই জল আছে ও বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আমরা জলে সিদ্ধ করিয়া খাই। সিদ্ধ করায়, তাহাদিগের ভিতর ভৌতিক ও রাসায়নিক অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। চালে ও ভাতে, কাচা মাংসে ও সিদ্ধ মাংসে অনেক তফাৎ, তাহা তোমরা বেশ বোঝ। বড় হইয়া রসায়ন পাঠ করিলে তোমরা ইহা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

খাদ্য

মানুষ জল চাহে, কারণ তাহার শরীরের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক জল। খাদ্য তরল অবস্থায় পরিণত না হইলে তাহার শারীর-যন্ত্র তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়না। শরীরের ক্লেদ ও দূষিত পদার্থ সমূহ জলীয় রূপেই নির্গত হয়। তাহার প্রত্যেক দৈহিক প্রয়োজনে জল আবশ্যক হয়।

শারীর ক্রিয়া

দেশের জল-বাতাস মানুষের স্বাস্থ্য ও প্রকৃতির উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে, তাহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত "আবহাওয়া" বা "জল-বাতাস" কথা দুইটি হইতেই বোঝা যায়।

জল, বাতাস ও প্রকৃতি

বৃক্ষ-লতাদির উৎপত্তি ও তাহাদের চাষবাসের মূলেও জলের ক্রিয়া উপলব্ধি করি। বৃক্ষ-লতাদির পচনাবশেষ ও বালি, চূণ ইত্যাদির ন্যুনাধিক্যে বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা হয়। মিশ্রণটি ঠাসা না হওয়ায় তাহার গঠনে বিভিন্ন প্রকারের শত সহস্র নালিকা বা সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকিয়া যায়। এই নালিকাগুলি বাহিয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরের জল উপরে উঠে এবং এইরূপে জলের চলাচল হয়। বায়ু প্রবন্ধে সমুদ্র হইতে মেঘের, ও মেঘ হইতে বৃষ্টির সৃষ্টির কথা পড়িয়াছ। বাতাসে কিরূপে ও কোন্ সময়ে কতখানি জল প্রবেশ করে, কিরূপে মেঘ, কুয়াসা ও বৃষ্টির সৃষ্টি হয়, কখন বৃষ্টি হয়, কিরূপ বস্তু সমস্ত বাতাস হইতে জল টানে ও কিরূপ বস্তু বাতাসে নিজের শরীরের জল বাহির করিয়া দেয়, এইরূপ বহুবিধ কথার ঐ প্রবন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এইগুলির জন্য সেই প্রবন্ধটি আর একবার পড়িয়া লও। এ স্থলে, সেইগুলি ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

বৃক্ষলতাদির উৎপাদন

কুয়াসা, মেঘ ও বৃষ্টি

কোথায় কত বৃষ্টি হয়, তাহা নিকটস্থ পর্ব্বত, বায়ুর গতি, বায়ুর তাপ, মেঘের সঞ্চার ইত্যাদি বহুবিধ ব্যাপারের উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষে, আসামের চেরাপুঞ্জীতে সকল স্থান অপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হয়। তোমরা খবরের কাগজ দেখ কি ? তাহাতে বিভিন্ন স্থানে কতটা বৃষ্টি হইয়াছে ও সাধারণতঃ কতটা হয়, তাহা লেখা থাকে। সরকারী একটি বিভাগ শুধু তাপ-বৃষ্টির পরিমাণ ও তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করে। বৃষ্টির জলের পরিমাণ মাপিবার জন্য একপ্রকার যন্ত্র আছে।

বৃষ্টি

মৃত্তিকা পরিমিত ভাবে আর্দ্র ও উর্ব্বর রাখিবার জন্য কৃষকেরা তাহার উপর পাতা, খড়, পুরাতন আবর্জ্জনা প্রভৃতি বিছাইয়া রাখে।

জলের, কৈশিক নালিকাতে প্রসারিত হইবার ঝোঁক আছে। ইহার আরও উদাহরণ আমরা স্পঞ্জে, গামছায় এবং ব্লটীং কাগজে পাই। কালি শুষ্ক করিতে ব্লটীং কাগজের ব্যবহারে তোমরা দেখিয়াছ কি যে কালির জলীয় অংশ ব্লটীং কাগজের সূক্ষ্ম নালিকা-গুলিতে কিরূপ ভাবে প্রসারিত হইয়া যায়।

গামছা ও ব্লটিং কাগজ

তরু-লতার শিকড়গুলি তাঁহাদের খাদ্য মাটি হইতে পায়। তাহারা মাটি খায় না। সার প্রভৃতি তাহাদের

খাদ্যসমূহ উপরিউক্ত জলে দ্রবীভূত অবস্থায় মাটিতে থাকে। শিকড় সেই রস ভৌতিক রসায়ন ক্রিয়া যোগে নিজের কোষগুলির ভিতর গ্রহণ করে। মৃত্তিকার অভাবে, এমন কি কাঠের গুঁড়ির ভিতর বীজ অঙ্কুরিত করা যায়, যদি তাহা বীজের খাদ্যমিশ্রিত জলে আর্দ্র রাখা হয়।

তরু-লতার খাদ্য আহরণ

নদীর তীরে গাছ-পালার সরসতা

যে স্থানে জল নাই,তাহা মরুভূমিতে পরিণত হইয়া পড়ে। নদীমাতৃক দেশ কিরূপ উর্ব্বর হয়, তাহা তোমরা সকলেই জান। বোধ হয় এই জন্যই গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, নীল প্রভৃতি বহু নদ-নদীর এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়। জল বিনা বৃক্ষলতাদি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। চাষবাসের জন্য কত রকমের জলসেচন প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। নদ, নদী, কূপ ও পুষ্করিণী ত আছেই,ইহার উপর কতরকমের বিল ও খাল নির্ম্মিত

খাল

হইয়াছে। খাল খনন ও তাহা বজায় রাখা পূর্ত্ত-বিভাগের একটি প্রধান কাজ। এই খাল খননে কত রকমের এঞ্জিনিয়ারী বুদ্ধির প্রয়োগ হইয়াছে। কোথাও নদীর উপর দিয়া আড়াআড়ি ভাবে ইহা আনীত হইয়াছে, আবার কোথাও বা ভূগর্ভের ভিতর দিয়া চালিত হইয়া অন্য স্থানে আনয়ন করা হইয়াছে। জল নিজের উপরিতল সমান রাখিবার চেষ্টা করে

মরুভূমির ধারের গাছ-পালার অবস্থা

বলিয়া, এইরূপ খালে একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে জল লইয়া আসা সম্ভবপর হইয়াছে।

জল সেচনের জন্য কত প্রকারের যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের ভিতর দুই একটি যন্ত্র, গ্রামে কৃষকদিগের ব্যবহারে তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে। পিচকারী, জলনিষ্কাশনী যন্ত্র ইত্যাদির কথা তোমরা বায়ু প্রবন্ধে পড়িয়াছ। এখানে আর তাহার বর্ণনা করিলাম না।

জলসেচন যন্ত্র

বানিজ্যের উন্নতির জন্য আমরা জলের দাস। তরণী সংযোগে যে বাণিজ্য হয়, তাহার অল্পাংশ মাত্রও রেল বা গাড়ী বা বাহক সংযোগে হয় না ; হইতেও পারে না। কেন, তাহা আশা করি, বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। জলের উপকণ্ঠেই সমৃদ্ধশালী নগরীগুলি গঠিত হইয়া ওঠে।

বাণিজ্য

জলের কথায় জল-ঘটিকার কথা মনে পড়িয়া গেল। ঘটিকা যন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্ব্বে জল-ঘটিকা ও বালুকাযন্ত্রের দ্বারা সময় পরিমিত হইত। একটি পাত্রের তলদেশে সূক্ষ্ম একটি ছিদ্র করিয়া জলে ছাড়িয়া দিলে, তাহাতে ক্রমে

জলঘটিকা
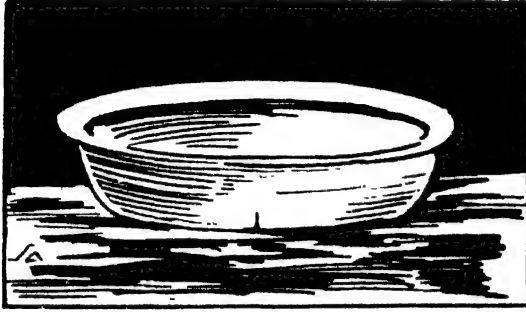
জলের ঘড়ি

জল উঠিতে থাকিবে ও কিছু সময়ের পরে জলপূর্ণ হইয়া বাটিটি ডুবিয়া যাইবে। পূর্ব্বকালে দিনমানের ভিতর কয়বার সেই বাটিটি ডুবিতে পারে জানিয়া লইয়া, নিমজ্জনের সংখ্যা গণনা করিয়া দিনমানের কতক্ষণ অতিবাহিত হইল, বলিয়া দেওয়া হইত।

জলের ব্যবহারের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

পর্ব্বত-গাত্র হইতে ধাতব পদার্থ নিষ্কাশন করিতে জলের ব্যবহার করা হয়। ধাতুপূর্ণ শিরাগুলির উপর পাইপে করিয়া প্রচণ্ড বেগে জল প্রপাতিত করা হয় সেই বেগে প্রস্তর-চূর্ণ হইয়া ধাতুও প্রস্তর-চূর্ণ জলের সহিত প্রবাহিত হইয়া আসে।

পর্ব্বত হইতে ধাতু নিষ্কাশন

প্রস্তর-চূর্ণ হইতে ধাতু-কণাগুলি পৃথক করিতেও জল ব্যবহৃত হয়। ধাতু-কণাগুলির অপেক্ষিক গুরুত্ব অনেক বেশী ও প্রস্তর চূর্ণের অপেক্ষাকৃত অনেক কম হওয়ায় মিশ্রণটি ঢালু চৌতারার উপর ফেলিয়া তাহার উপর জল প্রবাহিত করাইলে প্রস্তর-চূর্ণ অনেক দূরে স্থানান্তরিত হইয়া যায়, কিন্তু ধাতু-কণাগুলি বেশী দূরে বাহিত হইয়া যায় না।

ধাতু-কণা পৃথক্‌ করণ

জল-চিকিৎসা নামক এক রকম চিকিৎসা-পদ্ধতি আছে। আমরা শ্রান্তি দূর ও শরীর শীতল করিতে ও শরীরের বাহ্যিক ক্লেদাদি ধুইয়া ফেলিতে জলের ব্যবহার করি। এই চিকিৎসায় নানারূপ ভাবে স্নানের, অঙ্গ-

জল চিকিৎসা

পাইপে পর্ব্বত-গাত্র ধৌত করিয়া ধাতু-কণা বাহির করা হইতেছে

নিমজ্জনের ও সিক্ত কম্বলাদি দিয়া দেহ আচ্ছাদনের ও গরম এবং শীতল জলের নানারূপ ব্যবহারের বিধি আছে। বিবিধ ব্যাধিতে অনেকে এই চিকিৎসায় সুফল পাইয়াছেন।

মাটির নীচে জল সন্নিকটে কোথায় আছে, তাহা জানিবার জন্য একটি অদ্ভুত প্রক্রিয়া অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয়। বেদেরাই নাকি এই বিদ্যা কিছু কিছু জানে। গাছের একটি ডাল হাতে সাম্যাবস্থায় রাখিয়া তাহারা পরীক্ষণীয় প্রদেশটিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে স্থানে ডালটি অসাম্যাবস্থা প্রদর্শন করে, সেই স্থানে জল সন্নিকটেই আছে, বুঝিতে হইবে।

জল খোজা

এখানে আমরা জলের আরও গুণের বিষয় আলোচনা করিব।

আপেক্ষিক উত্তাপ

পারদ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুসমূহ, একই পরিমাণ উত্তাপে, সম ওজনের জল হইতে উত্তপ্ত হইয়া পড়ে। জলকে উত্তপ্ত করিতে অপেক্ষাকৃত বেশী উত্তাপের প্রয়োজন হয়।

ধাতু কণা পৃথক্‌করণ

জল গরম হইতে যে তাপ গ্রহণ করে, শীতল হইবার সময় সেই তাপ সম্পূর্ণভাবে বাহির করিয়া দেয়। এই কারণে গরম জলের বোতল (hot water bottle) হইতে আমরা অনেকক্ষণ অবধি তাপ পাই। বিশেষতঃ, রবারের আবরণ থাকায়, এই তাপ ধীরে ধীরে আরামপ্রদ ভাবে বাহির হয়।

তাপের প্রবাহ

জলের ভিতর দিয়া তাপের প্রবাহ বড়ই মন্দ গতিতে হয়।

উত্তপ্ত লৌহের পাটার উপর জল দিলে জলের ফোঁটা যেন নাচিতে থাকে

একটি সুদীর্ঘ পরীক্ষা-নলীতে খানিকটা জল লইয়া তাহাতে এক টুকরা বরফ ডুবাইয়া রাখা হয় ও যদি নলিটির উর্দ্ধাংশ এরূপ ভাবে গরম করা হয় যে, জলের উপরের ভাগটাই শুধু গরম হইতে থাকে, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উপরের খানিকটা জল বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু, নীচে বরফটি ঠিক তেমনই পড়িয়া আছে। সেইজন্য, জল গরম করিতে হইলে পাত্রের তলা উত্তপ্ত করিতে হয়। তলাকার জল গরম হইয়া উপরে উঠিতে থাকে ও উপরকার শীতল জল তাহার স্থানে আসিতে বাধ্য হয়। এইরূপে, জলের ভিতর একটি আবর্ত্তন চলিতে থাকে; যাহার ফলে সমস্ত জলটা উত্তপ্ত হইয়া ওঠে।

আগুনে জল দিলে তাহা নিবিয়া যায়। কারণ জল মাঝে আসিয়া দাহ্যমান পদার্থটিকে অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইতে দেয় না। তাহা ছাড়া, দাহ্যমান পদার্থ হইতে, জল নিজে অনেকখানি তাপ টানিয়া লয়। যে তাপাঙ্কে সেই পদার্থটির দহন-ক্রিয়া বজায় থাকিতে পারে, উপরি উক্ত কারণে তাহা হইতে স্খলিত হইয়া পড়ায় তাহার দাহক্রিয়া স্থগিত হইয়া যায়। দমকলের দ্বারা কিরূপে অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হয়, তাহা নিশ্চয়ই তোমরা দেখিয়া থাকিবে।

বাষ্পের ভিতর তাপের মৃদু প্রবাহ
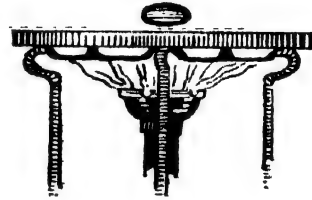
বাষ্পের ভিতর দিয়া তাপের প্রবাহ মৃদু গতিতে চলে। তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহের পাটার উপর দু এক ফোঁটা জল ফেলিলে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। খানিকটা জল বাষ্প হইয়া উঠে, কিন্তু সেই বাষ্পের স্তরটি যতক্ষণ ছড়াইয়া না পড়ে, তাহার উপর জলের ফোঁটা কয়টি বেশ বর্ত্তুলাকারে নৃত্য করিতে থাকে। লৌহের উপর বাষ্প ও বাষ্পের উপর বর্ত্তুলটি থাকায়, বর্ত্তুলটি ঠিক যেন শূন্যে রহিয়াছে, মনে হয়।

তোমরা জলে তরঙ্গের খেলা দেখিয়াছ। নিশ্চয়ই মনে হইয়াছে যে, জলও তরঙ্গের সহিত বাহিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহা নহে।

জলের উপর তরঙ্গ

তরঙ্গ জলের বুকের উপর শুধু খেলিয়াই যায়। জলে প্রবাহ না থাকিলে যেখানকার জল সেইখানেই থাকিয়া যায়। তরঙ্গিত জলের উপর একটি কুটা রাখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তরঙ্গের সহিত তাহা ভাসিয়া চলিয়া যায় না, মাত্র দোলা লাগিয়া উপর-নীচে হইতে থাকে।

নদী, পুষ্করিণী বা কোনও জলাধারের তলদেশ বাস্তবিক যত গভীর, উপর হইতে দেখিলে তাহা তত মনে হয় না। ইহা লক্ষ্য করিয়াছ কি? একটি ছড়ি জলে বাঁকাভাবে ডুবাইয়া ধর। তাহার জল নিমজ্জিত অংশ ছড়িটির অংশ বলিয়া যেন মনে হইবে না। রামধনু কি সুন্দরই না দেখিতে হয়, কি চমৎকার রংয়ের খেলাই না তাতে হয়! কি আশ্চর্য্য ভাবেই না তাহাতে সাতটি রংয়ের পর পর সমাবেশ থাকে। ঐ পরীর রাজ্যের ধনুও জলের সৃষ্টি। মেঘ যখন শত সহস্র ক্ষুদ্র জলের বিন্দুতে পরিণত, তখন সেই ফোঁটাগুলির ভিতরে সূর্য্যালোকের তির্য্যক্ গমন, বিচ্ছুরণ ও প্রত্যাবর্ত্তনে এই রামধনু উৎপন্ন হয়। ফোঁটার ভিতর সূর্য্যালোক নিজেকে সপ্তবর্ণে ভাঙ্গিয়া আবার আমাদের চোখে ফিরিয়া আসে। তোমরা আলোক প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা পাইবে।

আলোক

রামধনু

তরল বলিয়া অন্যান্য তরল পদার্থের ন্যায় ইহার বিন্দুগুলিও বর্ত্তুলাকার হয়। ইহার কারণ, বাহিরের অণুগুলি সর্ব্বদাই ভিতর দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় ও তরল পদার্থের অণুগুলি পরস্পর সুদৃঢ়বদ্ধ হওয়ায় তাহারা সকলে মিলিয়া গোলাকার হইয়া পড়ে।

জল-বিন্দুর বর্ত্তুলাকার

এক সময়ে ইহা ধরা হইত যে, চাপা দিয়া জলকে সঙ্কুচিত করা যায় না; চাপ দিলে তাহা অন্যদিকে ঠেলিয়া উঠিবে। বস্তুতঃ ইহাও সামান্যভাবে ঠাসা যায়। এই গুণটি জানার পর এক রকম জল-কামান নির্ম্মিত হইয়াছে। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে বায়ুপোত ধ্বংসের কাজে এই কামানগুলি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

জল চাপে সঙ্কুচিত করা

তোমরা জলের শক্তির কথা পড়িয়াছ। জলচক্র-যন্ত্র যোগে (turbine) এই শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা হয়। অথবা সেই বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে মোটর সহযোগে কত সহস্র প্রকারের কলকব্জা চালান হয়। আজকাল ভারতবর্ষেও কয়েক স্থানে এইরূপে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিবার কথা চলিতেছে।

জলের গুণের অনেক কথাই বলিলাম এবং পরে আরও কিছু বলিব। কিন্তু যে জল মানুষের এত উপকারী, সেই জল হইতে আবার কত বড় ভয়ানক বিপদ যে ঘটে, সে-কথাও তোমরা শুনিয়া রাখ। যাহাদের বাড়ী নদীর ধারে বা নিম্ন বঙ্গে, তাহারা দেখিতে পায় যে, বর্ষার সময় নদীর জল বাড়িতে থাকে বাড়িতে বাড়িতে একেবারে মাঠ, ঘাট, পথ, গ্রাম সব ডুবাইয়া দেয়। সময়ে সময়ে নদীতে ভীষণ বন্যা হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-বঙ্গে একবার ভীষণ বন্যা হইয়া বহুলোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল। দামোদরের বন্যার কথা ত প্রায়ই শুনা যায়। আসামেও প্রায়ই বন্যা হইয়া থাকে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মিসিসিপি নদীর বন্যায় প্রায় ৭০ মাইল জায়গা জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। গ্রাম ও সহরের লোকেরা বাড়ীর ছাদে ও উঁচু গাছের শাখায় উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। হাওয়াই জাহাজের উপর হইতে তাহাদের খাদ্য যোগান হইত। কাজেই, যে নদী দেশের কল্যাণ-প্রবাহিণী, সেই নদীই আবার বন্যা আনিয়া কতই না অনিষ্ট করিয়া থাকে এইভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে কল্যাণ ও অকল্যাণ পাশাপাশি চলিয়াছে।

দর্শন

যম ও নচিকেতা

১০৯৫ পৃষ্ঠার পর

কঠ উপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানেও আমরা সে সময়ের দার্শনিকদের একটা পরিচয় পাই। নচিকেতার বাবা একজন বড় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। একবার তিনি বহু দান দক্ষিণা দিয়া এক বড় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে অনেক গাভী দক্ষিণাস্বরূপ দেওয়া হয়। গাভীগুলিকে লইয়া যাইতে দেখিয়া বালক নচিকেতার মনে প্রশ্ন জাগিল, "বাবা গরুগুলি দান করিয়া ফেলিতেছেন, আমায় দিবেন কাকে?" অবশেষে তিনি বাবাকে জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলিলেন, "বাবা, আপনি আমাকে দান করিবেন, কাহাকে?" একবার, দুইবার, তিনবার জিজ্ঞাসা করায় পিতা বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তোমাকে যমকে দিব!"

মহাতেজা, পবিত্র, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ! মুখের কথা মিথ্যা হইবার নয়! নচিকেতা সত্য সত্যই যমগৃহে উপস্থিত হইলেন।

শাস্ত্রে বলে, অতিথি বৈশ্বানরের প্রতীক। যার গৃহে অতিথি অনাদৃত হয়, তার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয়। তিন দিন তিন রাত্রি নচিকেতা যমের বাড়ীতে অনাহারে বসিয়া রহিয়াছেন, যমের কোন খোঁজ নাই! তিনি অন্য কোথাও কাজে চলিয়া গিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া উপবাসী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং কহিলেন, "আপনি আমার নমস্য অতিথি; তিন রাত্রি উপবাস করিয়া আমার গৃহে কাটাইয়াছেন; আমার এ অপরাধ ক্ষমা করুণ। আর, এই তিন রাত্রির কষ্টের জন্য যে কোন তিনটি বর আমার নিকট লইতে পারেন।"

সন্তুষ্ট হইয়া নচিকেতা বর চাহিলেন। প্রথম বরে তিনি চাহিলেন, যমপুরী হইতে ফিরিয়া গেলে পিতা যাহাতে আর তাঁহার প্রতি রাগ না করেন; আর দ্বিতীয় বরে যম প্রতিশ্রুতি দিলেন, একটি যজ্ঞীয় অগ্নি নচিকেতার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। কাঠ দিয়া আগুন জ্বালিলে সব আগুনই দেখিতে এক রকম হয়; কিন্তু বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণেরা এরই মধ্যে বিভিন্ন নামের অগ্নি কল্পনা করিতেন এবং ভিন্ন ভিন্ন হোমে ভিন্ন ভিন্ন অগ্নির আবাহন করিতেন। নচিকেতা নামক অগ্নি যজ্ঞবিশেষে আহূত হইবার বিধি আছে।

এই দুইটি বর যম রাজা অতি সহজেই দিলেন; কিন্তু তৃতীয় বর লইয়া একটু মুস্কিল হইল। নচিকেতা কহিলেন, "পরলোক আছে কি না? তাহা লইয়া মানুষের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়; কেহ বলে, আছে, কেহ বলে নাই; এ সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, তাহা আমায় বলুন।" যম মুস্কিলে পড়িলেন, এ যে অত্যন্ত গুহ্য বিদ্যা, সকলের কাছে বলা চলে না! তিনি কহিলেন, "এ অতি জটিল প্রশ্ন, দেবতারাও এ সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকেন; অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব, সহজে বুঝিবার মত নয়; তার চেয়ে আপনি অন্য যে কোন

বর নিন না! দীর্ঘ আয়ু, বহু অর্থ, বিত্ত, পুত্র-পৌত্র, সংসারের যাবতীয় সুখ-সৌভাগ্য যাচ্ঞা করুন না!"

নচিকেতা হাসিয়া কহিলেন, "আয়ু? আপনার যত দিন খুসী আমাকে পৃথিবীতে রাখিবেন, তার বেশী আমি বাঁচিতে চাই না। আর বিত্ত-সম্পত্তি আপনারই থাকুক—আমি চাই না। আমার তৃতীয় বর ঐ বিদ্যা, দিবেন কিনা বলুন!" যম বিপদে পড়িলেন, কথা দিয়াছেন, এখন আর সে কথা রক্ষা না করিয়া উপায় নাই! বাধ্য হইয়া এই গূঢ় তথ্য নচিকেতার নিকট তাঁহাকে বলিতে হইল।

"শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ দুইটি পৃথক্ বস্তু। মানুষের কাছে যাহা প্রিয়, তাহা হইতেই তাহার মঙ্গল হয় না। যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ বস্তুর অনুসরণ করে। যাহারা বলে পরলোক নাই, তাহারা ভ্রান্ত। এ অতি সূক্ষ্ম বিদ্যা, লোককে সহজে বুঝান যায় না। আর এ ত শুধু তর্কের বিষয় নয়!"

"অক্ষর পরম-ব্রহ্ম, জগতের আদি। সমস্ত বেদ তাঁহারই কথা বলে।"

"জন্ম মৃত্যু? জন্ম মৃত্যু ত আত্মার নয়! আত্মা নিত্য, তার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। যে মনে করে 'আমি মরিলাম' সে ভ্রান্ত; কারণ, আত্মার যে জন্ম-মরণ নাই! এই আত্মাকে জানা বড় কঠিন। ইহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং স্থূল হইতে স্থূলতর। ইহা বসিয়া থাকিয়া দূর দেশে গমন করিতে পারে, শুইয়া থাকিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারে। ইহার তত্ত্ব শুধু তর্ক দ্বারা জানা যায় না, নিবিষ্ট হইয়া ধ্যান করিতে হয় এবং এই আত্মার অনুগ্রহ লাভ হইলেই তাঁহাকে জানা যায়।"

"মানুষের দৃষ্টি সাধারণতঃ বাহিরের দিকেই থাকে। ভিতরের দিকে, নিজের দিকে দৃষ্টি দেওয়া কঠিন। যে সব ধীর ব্যক্তি তাহা পারেন, তাহারাই আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন।"

যম ও নচিকেতা

যম-রাজার নিকট এই সব উপদেশ লাভ করিয়া নচিকেতা হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

'প্রশ্ন'—উপনিষদে কয়েকজন ব্রহ্মবিৎ দার্শনিকের কাহিনী পাওয়া যায়। তাঁহারা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া পিপ্পলাদ ঋষির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার শিষ্য হইতে চাহিলেন। পিপ্পলাদ কহিলেন, আরও, এক বৎসর তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আমার নিকট আসিও, উপদেশ দিব।" জিজ্ঞাসু ঋষিরা তাহাই করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জনের নাম ছিল কবন্ধী কাত্যায়ন; তিনিই প্রথম গুরু পিপ্পলাদকে প্রশ্ন করিলেন,—"ভগবন্, এই সব প্রাণী ও জগৎ কোথা হইতে আসিয়াছে ?"

পিপ্পলাদ কহিলেন, "প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করিলেন এবং ক্রমে এই সমস্ত জীব-জগৎ সৃষ্টি করিলেন।"

আর এক জনের নাম ছিল বৈদর্ভি ভার্গব, তিনি জানিতে চাহিলেন, "এই জীবলোক কোন্ দেবতারা ধারণ করিয়া আছেন, কে ইহাদিগকে প্রকাশিত করেন এবং সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?"

পিপ্পলাদ উত্তর করিলেন, "সকল দেবতারাই মনে করিতেন যে, তাঁহারাই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন এবং প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। কিন্তু প্রধান প্রাণ একদিন সকলকে কহিলেন, "ভুল করিবেন না, আমি নিজেকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া পঞ্চ-প্রাণরূপে জীবদেহে বর্ত্তমান আছি এবং আমিই প্রধান।" কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না; তখন প্রধান প্রাণ দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যোগ করিলেন। দেখা গেল, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেই দেহ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হন। ইহা হইতেই প্রমাণ হইল, প্রধান প্রাণ,—তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই সকল ধারণ করিয়া আছেন, এবং যাহা কিছু জগতে আছে তাহা সমস্তই প্রাণেতে প্রতিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য, এই প্রাণ অর্থ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্ম বা ভগবান্।

এইরূপ অন্যান্য ঋষিরাও নানারূপ প্রশ্ন করিলেন এবং পিপ্পলাদ সকলের যথাসম্ভব উত্তর দিলেন। ইহাদের মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয় সুকেশা বলিয়া একজন ছিলেন। তিনি কহিলেন, "ভগবন্, সেদিন কোশল দেশের রাজকুমার আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পুরুষ' কাহাকে কহে? আমি ইহার কোন উত্তরই দিতে পারি নাই। আমায় কি ইহার উত্তর বলিয়া দিবেন ?"

পিপ্পলাদ কহিলেন, "প্রত্যেকের দেহের ভিতরই পুরুষ রহিয়াছেন। তিনি নিজেকে নানাভাবে বিভক্ত করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্তই আবার তাঁহাতেই লয় পায়। নদী সকল সমুদ্রে পড়িলে যেমন সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তাহাদের আর পৃথক নাম কিংবা রূপ থাকে না, তেমনি সমস্ত জগৎ পুরুষে বিলীন হইলে আর তাহার ভিন্ন সত্তা থাকে না।"

ঋষিরা অতঃপর সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মহাপণ্ডিত শীলভদ্র

[বৌদ্ধ-যুগে ভারতবর্ষে অনেক বড় বড় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিত হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহারা দেশ বিদেশে জ্ঞান প্রচারের জন্য গিয়াছিলেন। এখানে বৌদ্ধ যুগের দুইজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের কথা বলা হইল।]

য়ুয়াং-চুয়াং চীনদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময়ে জাপান, কোরিয়া, মোঙ্গোলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। য়ুয়াং চুয়াং বৌদ্ধধর্ম্ম ও যোগ শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি যাহা শিখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী শিখিয়া যান। যাহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

ইঁহার নাম শীলভদ্র, সমতটের এক রাজার ছেলে। য়ুয়াং-চুয়াং যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তিনি নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ। বড় বড় রাজা এমন কি সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন পর্য্যন্ত, তাহার নামে তটস্থ হইতেন। কিন্তু সে পদের গৌরব,—মানুষের নহে। শীলভদ্রের পদের গৌরব অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অনেক বেশী ছিল। য়ুয়াং-চুয়াং একজন বিচক্ষণ, বহুদর্শী লোক ছিলেন। তিনি গুরুকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "নানা দেশে. . নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধ-শাস্ত্রের ও বৌদ্ধ যোগের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া আমার যে সকল সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই, শীল-ভদ্রের উপদেশে সেই সকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরে প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত আমার যে সমস্ত

শীলভদ্রের পরিচয়

১৪১২ পৃষ্ঠার পর

সংশয় দূর করিতে পারেন নাই, শীলভদ্র তাহা এক কথায় দূর করিয়া দিয়াছেন।" শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পড়া ছিল। এ ত অনেক বৌদ্ধেরই থাকিতে পারে, বিশেষ, যাঁহারা বড় বড় মহাযান বিহারের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাদের থাকাই ত উচিত। কিন্তু শীলভদ্রের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল, তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি তাহার বেশ অভ্যাস ছিল, এবং সে সময়ে উহার যে সকল টীকা টিপ্পনী হইয়াছিল, তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণের আদিগ্রন্থ যে বেদ, তাহাও তিনি য়ুয়াং চুয়াংকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহার মত সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ভারতবর্ষেও আর দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মনের উদারতা ছিল। য়ুয়াং-চুয়াঙের পাণ্ডিত্য ও উৎসাহ দেখিয়া যখন নালন্দার সমস্ত পণ্ডিত তাঁহাকে দেশে যাইতে দিবেন না, স্থির করিলেন, তখন শীলভদ্র বলিয়া উঠিলেন, "চীন একটি মহাদেশ, য়ুয়াং-চুয়াং ঐখানেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবেন, ইহাতে তোমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। সেখানে গেলে ইঁহার দ্বারা সধর্ম্মে অনেক উন্নতি হইবে, এখানে বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না।" আবার যখন ভাস্করবর্ম্মা য়ুয়াং-

চুয়াংকে কামরূপ যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যাইতে রাজী হইলেন না, তখনও শীলভদ্র বলিলেন, "কামরূপে এখনও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, সেখানে গেলে যদি বৌদ্ধধর্ম্মের কিছুমাত্র বিস্তার হয়, তাহাও পরম লাভ।" এই সমস্ত ঘটনায় শীলভদ্রের ধর্ম্মানুরাগ, দূর-দর্শিতা ও নীতিকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।
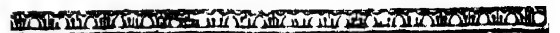
শীলভদ্রের পাণ্ডিত্য ও উদারতা

তাঁহার বাল্যকালের কথাও কিছু এখানে বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি সমতটের রাজার ছেলে, তিনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিদ্যায় অনুরাগ ছিল এবং খ্যাতি ও প্রতিপত্তিও খুব হইয়াছিল। তিনি বিদ্যার উন্নতির জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বোধিসত্ব ধর্ম্মপালই তখন সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি ধর্ম্মপালের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ধর্ম্মপালের সমস্ত মত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই সময় দক্ষিণ হইতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধের রাজার নিকট ধর্ম্মপালের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। রাজা ধর্ম্মপালকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধর্ম্মপাল যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি কেন যাইবেন?" তিনি বলিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের আদিত্য অস্তমিত হইয়াছে, বিধর্ম্মীরা চারিদিকে মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদিগকে দূর না করিতে পারিলে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি নাই।" শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি।"

শীলভদ্রের বাল্য শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ

শীলভদ্রকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী হাসিয়া উঠিলেন, "এই বালক আমার সহিত বিচার করিবে!" কিন্তু শীলভদ্র অতি অল্পেই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দিলেন। তিনি শীলভদ্রের যুক্তি না খণ্ডন করিতে পারিলেন, না বচনের উত্তর দিতে পারিলেন, লজ্জায় অধোবদন হইয়া সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে একটি নগর দান করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "আমি যখন কাষায় গ্রহণ করিয়াছি তখন অর্থ লইয়া কি করিব?" রাজা বলিলেন, "বুদ্ধদেবের জ্ঞানজ্যোতিঃ ত বহুদিন নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, এখন যদি আমরা গুণের পূজা না করি, তবে ধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা হইবে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।" তখন শীলভদ্র তাঁহার কথায় রাজী হইয়া নগরটি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার রাজস্ব হইতে একটি প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। য়ুয়াং-চুয়াং এক জায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ নিষ্ঠা প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি দশ কুড়িখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি যে সকল টীকা টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরিষ্কার ও তাহার ভাষা অতি সরল।

শীলভদ্রের ত্যাগ ও মহত্ব

য়ুয়াং-চুয়াংএর গুরু শীলভদ্র বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত অতি বিরল।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ

বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বৌদ্ধজগতে দীপঙ্করের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাকে অল্প লোকেই জানে। তিব্বতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপাল মহাত্মা ব্রহ্মতন দীপঙ্করের শিষ্য ছিলেন। এখনও তিব্বতের প্রধান লামা ও চীনের সেকালের সম্রাটেরা ও এযুগের ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিরা তাঁহার নাম শুনিবামাত্র সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তিনি বঙ্গদেশে পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমণীপুর বজ্রযোগিনী গ্রামে (বিক্রমপুরে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। দীপঙ্করের পিতামাতা তাঁহাকে চন্দ্রগর্ভ বলিয়া ডাকিতেন। শৈশবে তিনি জিতারি নামক একজন অবধূতের নিকট বাল্য শিক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে বর্ণশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা লাভ করেন। তারপর তিনি দর্শন ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে মনোযোগী হইয়াছিলেন। দীপঙ্করের যেমন বয়স বাড়িতে লাগিল তেমনি তাঁহার যশও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে পণ্ডিতগণ, তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য আসিয়া শেষটায় নিজেরাই পরাজিত হইয়া যাইতে লাগিলেন। পঁচিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম কালে তিনি একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণকে তর্কে পরাজিত

জন্ম ও শিক্ষা

করিয়াছিলেন। তিনি ওদন্তপুরের বৌদ্ধাচার্য্য শীল রক্ষিতের নিকটে 'শ্রীজ্ঞান' উপাধি লাভ করেন।

শ্রীজ্ঞানের উপাধি লাভ

একত্রিশ বৎসরের সময় তিনি ভিক্ষু হইয়া বিক্রমশীল বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা) ছিল বৌদ্ধধর্ম্মের একটি

দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান

প্রসিদ্ধ স্থান। কাহার কাহার মতে সুবর্ণদ্বীপ—(পেগুর) সুধর্ম্মপুর, বর্ত্তমান থাটোন্ (Thaton)। সেখানে চন্দ্রকীর্ত্তি নামক একজন আচার্য্য ছিলেন, তাহার বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান ছিল। বিক্রম শীলার মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণ দ্বীপে পাঠাইলেন।

সুবর্ণদ্বীপ গমন

একখানি বৃহৎ নৌকারোহণে কয়েক জন বণিকের সঙ্গে দীপঙ্কর সুবর্ণ দ্বীপ গমন করেন। যাইবার পথে সমুদ্রের মধ্যে তাঁহাকে ভীষণ ঝড়ে পড়িতে হইয়াছিল।

দীপঙ্কর বার বৎসর কাল 'সুবর্ণ দ্বীপে' থাকিয়া সেখানকার বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন এবং সেখানকার বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তখন নালন্দার চেয়েও বিক্রমশীলার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অধিক ছিল। অনেক বড় বড় লোক, অনেক বড় বড় পণ্ডিত, বিক্রমশীল হইতে লেখাপড়া শিখিয়া, শুধু ভারতবর্ষে নয়, তাহার বাহিরেও বিদ্যা ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিক্রমশীলা বিহারের রত্নাকর শান্তি একজন খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। প্রজ্ঞাকর মতি জ্ঞান শ্রীভিক্ষু প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের নাম বিক্রমশীলার মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। এরূপ বিহারের অধ্যক্ষ হওয়া সৌভাগ্যের কথা। দীপঙ্কর অনেক সময় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক ও বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও তাহাতে জয়লাভ করিতেন।

এই সময় তিব্বত দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়া আসে। এইজন্য তিব্বত দেশের রাজা বিক্রমশীলা

তিব্বত যাত্রা

বিহার হইতে দীপঙ্করকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। দীপঙ্কর কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, একদিন তিব্বতের রাজা (লামাও) তাঁহাকে 'অতীশ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) বলিয়া পূজা করিবেন। সে সময়ে থোলিং নগর ছিল লামার প্রধান রাজপীঠ। এই লামার সময় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কারের জন্য তাঁহার একান্ত আগ্রহ ছিল। এইজন্য তিনি ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধবিহারে কয়েক জন তরুণ শ্রমণ (ভিক্ষু) কে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা কাশ্মীর প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অবশেষে বিক্রমশীলায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারাই দেশে যাইয়া দীপঙ্করের পাণ্ডিত্যের কথা প্রচার করায় রাজা তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। দীপঙ্কর দুই একবার যাইতে অস্বীকার করিয়া অবশেষে বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া সেখানে যাইতে স্বীকার করিলেন। তিব্বতের রাজা দীপঙ্করকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার ভ্রাতা বীর্য্য-চন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন। এ সময়ে দীপঙ্করের বয়স সত্তর বৎসর ছিল। এই বয়সে বরফে-ঢাকা দুর্গম্য পন্থা আরোহণ করা যে কি ক্লেশজনক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যাইবার পথে তিনি কয়েকদিন নেপালে স্বয়ম্ভু ক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে হইতে বরফের পাহাড় পার হইয়া তিব্বতের সীমানায় যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন। যে রাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার রাজধানী পশ্চিম তিব্বতে ছিল। দীপঙ্কর যখন তিব্বতের গু-জে (Gu-ge) নামক স্থানে যাইয়া পৌঁছিলেন, তখন রাজার প্রেরিত একশত শ্বেত পরিচ্ছদ পরিহিত

অশ্বারোহী পুরুষ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে ছোট ছোট নিশান ও সাদা রঙের কুড়িটা ছাতা ছিল। আর ছিল নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র। এই অশ্বারোহীরা অতি মধুর স্বরে বাদ্যযন্ত্রের সহিত 'ওঁ মণি পদ্মে হুম্' এই গান গাহিয়া রাজার নামে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তিব্বতের এক মঠের গায়ে অতীশের এই অভ্যর্থনা চিত্র অঙ্কিত আছে। এখানে অতীশকে চা পান করিতে দেওয়া হয়—তিনি চা পান করিলেন। পূর্ব্বে তিনি আর কখনও চা পান করেন নাই। তিব্বতে যাইয়া দীপঙ্কর যে সকল বিহারে বাস করিয়াছিলেন, সে সকল বিহার এখনও লোকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে।

গু-জের রাজধানী থে ডিং মুখে যাইবার পথে মানস-সরোবর তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি সেখানে সাত দিন বাস করিয়াছিলেন। রাজধানী থে-ডিংএ রাজা চান্ চুব্ নিজে তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। দীপঙ্করকে দেখিয়া লামা ও রাজধানীর সমুদয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। জংপা নামে একজন বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করেন নাই—কিন্তু যখন দীপঙ্করের জ্ঞানের পরিচয় পাইলেন, তখন ঐ বৃদ্ধ লামাও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইখানে তিনি দুই বৎসর ছিলেন, পরে মধ্য তিব্বতে গিয়াছিলেন।

মহাপুরুষ দীপঙ্করের শিক্ষাগুণে তিব্বতের বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মধ্যে নূতন জীবনের ধারা সঞ্চারিত হইয়াছিল। সেখানে যাইয়া তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহার পরে

দীপঙ্করের শিক্ষা

তিব্বতে নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে। তিব্বতে যে কখনও বৌদ্ধধর্ম্মের লোপ হইবে, এরূপ আশঙ্কা আর হয় নাই। তিনি তিব্বতে মহাজান মতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে তিব্বতীরা বিশুদ্ধ মহাজান ধর্ম্মের অধিকারী নয়; কেননা তখনও তাহারা দৈত্যদানবের পূজা করিত, তাই তিনি অনেক ভাল ভাল বইয়ের তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। অনেক পূজা-পদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়াছিলেন। আজও সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। অনেকে মনে করেন, তিব্বতীয়দিগের যা কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা—এ সমুদয়ের মূল কারণ তিনিই। এরূপ লোককে যদি বাঙ্গালার গৌরব মনে না করি, তবে মনে করিব কাকে?

তিব্বতের রাজা দীপঙ্করকে "অতীশ" (শ্রেষ্ঠ) বলিয়া স্বীকার করিলেন। বৌদ্ধ-জগতে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা দীপঙ্কর লাশা হইতে কোন এক বৌদ্ধ বিহারে যাইবার সময় লাশা নগরীর নিকটবর্ত্তী "ঙেয়ঙ্গ" বা ঙ্গেয়ঙ নামক নগরে দেহত্যাগ করেন।

অতীশের সমাধি-মন্দিরের নাম—সেগ্রোম (Sagroma) যে ঘরের মধ্যে তাঁহার দেহাবশেষ আছে তাহার বাহিরের দিকটা হরিদ্রা রঙে রঞ্জিত। এখন তাঁহার সমাধি-ভবন ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। এই সমাধির চারিদিকে কতকগুলি উইলো (Willow) গাছ মাথা উঁচু করিয়া আছে। অতীশ, বজ্রযান ও কাল-চক্র যানের উপর অসংখ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

শব্দ

জানোয়ারের শব্দ

১১৭১ পৃষ্ঠার পর

গৃহপালিত জীবজন্তুদের মধ্যে কুকুর, বিড়াল, গরু প্রভৃতি জন্তু সকল দেশেই পাওয়া যায়। এই সকল প্রাণীর খাওয়া দাওয়া, চলা-ফেরা, বাস করিবার প্রথা চালচলন প্রভৃতি সকল দেশেই সমান। আমরা এখানে এই সব জন্তু-জানোয়ারের শব্দের বিষয়ই প্রথম আলোচনা করিব।

এই সকল মূক প্রাণী কেমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শব্দ করে এবং কোন্ শব্দের দ্বারা সঙ্গী ও সাথীকে ডাকে এবং কেমন করিয়া শত্রুর আক্রমণে বাচ্চাদের সতর্ক করিয়া দেয়, এ সকল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখনও ভাল করিয়া হয় নাই। কিন্তু আমরা সকল সময়ই দেখিতে পাই যে, এই সকল জন্তুর ঐ সব কার্য্যের যখন প্রয়োজন হয়, তখন শব্দ করিয়া বা ডাকিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। তোমরা দেখিয়া থাকিবে গাভী নিজের বাছুরের খোঁজে বা তাহাকে দুধ খাওয়াইতে একটু বিলম্ব হইলে হাম্বা হাম্বা শব্দে চীৎকার করিয়া গৃহ-স্বামীকে ব্যস্ত করিয়া তোলে। যদি মাঠে বাছুরকে অনেকটা সময় দেখিতে না পায়,—কিম্বা যদি দেখে সে এমন কোন জায়গায় যাইতেছে যেখানে বিপদের আশঙ্কা আছে, তবে গাভী হাম্বা রব করিয়া বাছুরকে নিকটে ডাকিয়া আনিতে চেষ্টা করে।

আমাদের মানুষের শরীরে যেমন শব্দকারী যন্ত্র আছে, সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্তুর এবং পাখীর শরীরেও সেইরূপ শব্দকারী যন্ত্র বিদ্যমান্ আছে। তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গলার মধ্যে একটি ঝিল্লীর পর্দ্দা আছে (Vibratory membranous reed)। ফুসফুস্ হইতে বায়ু নিঃসৃত হইয়া ঐ ঝিল্লীকে কম্পিত করে, তাহাতেই শব্দ হয়।

মানুষের নানা প্রকারে শব্দ উচ্চারণ এবং গান করিবার ক্ষমতা সেই ঝিল্লীর সঙ্কোচন (Contraction) এবং মুখের ভঙ্গী দ্বারা সম্পাদিত হয়। জন্তুদের মধ্যে কিন্তু সেই ক্ষমতা অতি অল্প। সেইজন্যই একই জন্তু নানা প্রকার শব্দ করিতে পারে না। গাভী কেন 'হাম্বা' রব করে, এবং কুকুরই বা কেন 'ঘেউ ঘেউ' শব্দ করে, ইহাই আমাদের প্রথম প্রশ্ন। শব্দের বিভিন্নতা কতকটা জন্তুর গলার আকার, গঠন, দৈর্ঘ্য, মুখের হাঁ এবং অন্যান্য ছোট ছোট শব্দকারী ঝিল্লী সংযুক্ত পেশীর উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে আমরা বিশেষ ভাবে কিছুই জানি না।

কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ এবং শৃগালের 'হুয়া হুয়া' চীৎকারের মধ্যে কিছু কিছু সামঞ্জস্য আছে। কুকুর এবং শৃগাল উভয়েই এক জাতীয়। তবে কুকুর গৃহ-পালিত হওয়ায় তাহার আচার-ব্যবহারে এবং শব্দে অনেকটা তফাৎ হইয়া গিয়াছে। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শ্রুতিমধুর না হইলেও তাহার দ্বারা গৃহ-স্বামীর অনেক উপকার হয়। দিনের বেলা ও রাত্রিতে অনেক সময় তাহাকে চুপটি করিয়া ঘুমাইয়া থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহার ঘুম খুবই পাৎলা, একটু শব্দ হইলেই, সামান্য একটু পাতা পড়িবার শব্দ হইলেই জাগিয়া উঠে। রাত্রিতে সামান্য একটু শব্দ শুনিয়াই চোরের অনুসরণ করে। কুকুরের শ্রবণ-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। কোন কোন দেশে রাত্রি শেষে মেষ-পালক মাঠে তাহার মেষগুলিকে একত্র করিয়া

কুকুরের পাহারার উপর নির্ভর করিয়া সুখে নিদ্রা যায়। প্রহরী কুকুর মেষগুলিকে চোরের হাত হইতে এবং হিংস্রজন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। কুকুরের

ঘেউ ঘেউ করিয়া চোর তাড়াইতেছে

শ্রবণ শক্তি যেমন প্রখর, তাহার ঘ্রাণ শক্তিও তেমনি প্রখর। অনেক স্থলে পুলিশ এবং শিকারীরা ঘটনা-স্থলে শিকারী কুকুর লইয়া যায় এবং তাহার সাহায্যে হত্যাকারী ব্যক্তি কিংবা শিকারের প্রাণীকে খুঁজিয়া বাহির করে। কুকুর গীত-বাদ্য শুনিতে ভালবাসে না। ঘণ্টার শব্দ ঢাক ঢোল ও অন্যান্য বাজনার শব্দ বা গান শুনিলে হাউ হাউ শব্দে চীৎকার করিয়া অসোয়াস্তি জ্ঞাপন করে।

আমরা শৃগালের সম্বন্ধে বেশী কিছু জানি
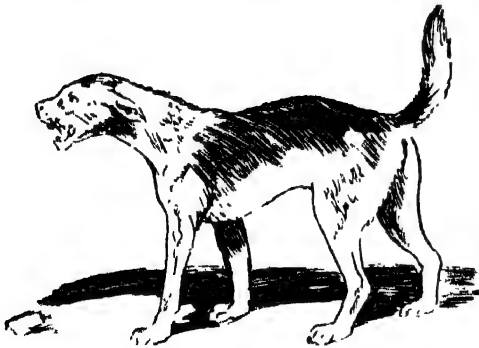
গান বাজনা শুনিয়া হাউ হাউ করিতেছে

না। তাহাদের ঘ্রাণ শক্তি কুকুরের মতই তীক্ষ্ণ। কিন্তু রাত্রিকালে তাহাদের চোখের দীপ্তি ও দেখিবার শক্তি কুকুরের অপেক্ষাও অনেক বেশী হইয়া থাকে। শৃগাল কুকুর অপেক্ষা অনেক বেশী ধূর্ত্ত। ইহারা চুপি চুপি অগ্রসর হইয়া শিকার ধরে।

তোমরা হয়ত কলিকাতা কিংবা অন্য কোন স্থানের চিড়িয়াখানায় ওরাং-ওটাং দেখিয়া থাকিবে। তাহারা অনেকটা বানরের মত দেখিতে কিন্তু আকারে বানর অপেক্ষা দীর্ঘ এবং অত্যন্ত বলশালী। শিকারী-দের মুখে শুনা যায় যে, বন্য অবস্থায় ইহারা ভয়ানক হুঙ্কার দিয়া চীৎকার করে। সেই হুঙ্কারে অন্যান্য বন্য জন্তুরা পর্য্যন্ত ভীত হইয়া থাকে। এইরূপ হুঙ্কার তাহার গলার ভিতরকার বায়ুস্থলী হইতে নির্গত হয়। যেমন হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়া শব্দ করিলে জোরে শব্দ করা যায়, সেইরূপ ঐ থলির সাহায্যে ওরাংওটাং খুব জোরে হুঙ্কার দিতে পারে। মানুষের শব্দকারী যন্ত্রের সহিত ইহাদের গলার যন্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে।

হুক্কাহুয়া—হুক্কাহুয়া

সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তুরা প্রায়ই 'হালুম হুলুম' শব্দ করে। যখন ক্ষুধার্ত্ত হয় তখন মুখ ব্যাদান করিয়া অতিশয় জোরের সহিত 'হুলুম' শব্দ করিয়া থাকে। মনে হয় যেন পেটের ভিতর হইতে শব্দ বাহির হইতেছে। সিংহের হুলুম শব্দ অনেক দূর হইতে শোনা যায়। এই শব্দ শুনিয়া অন্যান্য বন্য জন্তুরা, এমন কি বাঘ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া থাকে।

গর্জ্জন—হালুম

পক্ষীদের মধ্যে আমরা চিল, কাক এবং অন্যান্য উপকারী পাখীর কথাই আলোচনা করিব। পক্ষীদের শব্দও কম্পন-কারী ঝিল্লীর পর্দ্দার সাহায্যে নির্গত হয়। এই ঝিল্লীর পর্দ্দার সহিত অনেকগুলি ছোট পেশী ও (Muscle) সংযুক্ত আছে এবং সেইজন্যই ভিন্ন ভিন্ন পক্ষী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শব্দ করিতে পারে। গলার দৈর্ঘ্য ও মুখ গহ্বরের বিভিন্নতায়ও নানা প্রকারের শব্দ বাহির হয়। কোন পেশী বর্ত্তমানে মধুর শব্দ হয় বা তাহার অভাবে কর্কশ শব্দ হয়, এ সত্য কোনরূপ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হয় নাই।

নাদ—হুলুম

কাকের গলা লম্বা। আর তাহার মুখের মধ্যে কোনও প্রকার বায়ু-কুঠুরি নাই বলিলেই হয়, এজন্য কাক, কা কা-কা এইরূপ কর্কশ শব্দ করে। হাঁসও এই জাতীয়। কিন্তু টিয়া, ময়না, কোকিল প্রভৃতি পক্ষী সুমধুর স্বরে গান করিতে পারে।

ডাক—প্যাক্ প্যাক্

ইহাদের শব্দ শ্রুতিমধুর। মুখের আকার প্রায় কাকেরই মতন। কিন্তু কণ্ঠ-নালীর দৈর্ঘ্য এবং বিস্তার অল্প। আর উহাদের ঝিল্লীর সংযুক্ত সূক্ষ্ম পেশীগুলি অতি

কা—কা—কা—কা

মনোরম ভাবে অবস্থিত। এইজন্য টিয়া, কোকিল প্রভৃতি পক্ষী সুমধুর শব্দ করিতে পারে। কোকিলের গান বসন্তকালেই বেশীর ভাগ শুনিতে পাওয়া যায়। শীতকালে কেন তাহারা গান করে না, তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয়, এ সময় ইহারা অন্যত্র চলিয়া যায়। শীতকালেও দুই একটি কোকিল বাঙ্গালা দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের গান শুনা যায় না। মনে হয়, শীত এবং বর্ষাকালে তাহাদের শব্দকারী সূক্ষ্ম পেশীগুলি কাজ করে না।

তোমরা সকলেই বানর দেখিয়াছ। তোমরা কি মনে কর, বানর অমনি অমনিই কতকগুলি শব্দ করে? তাহা একেবারেই নয়। ডাক্তার গার্ণার (Dr. Garner) নামে একজন সাহেব আফ্রিকার বনে-

কুহু—কুহু—কুহু—কুহু

জঙ্গলে যাইয়া বানরের ভাষা আয়ত্ত করিয়া একখানি বই লিখিয়াছেন। তাহাতে বানরদের ভাষার কথা আছে। সাধারণতঃ বানর কোন্ শব্দ করিয়া কি বুঝায়, এখানে তাহার কয়েকটি শব্দ দিলাম। তোমরা বানরের শব্দ শুনিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়া দেখিও। বানর যখন বিপদে পড়ে, তখন তাহারা বলে—আ হ র্-র্-র্—অর্থ কি না, বড় বিপদ। তাহারা যখন উচ্চারণ করে—ক্রি ই, তাহার অর্থ, কোথায়? এ-উন্-হ,—এই যে এইখানে! ঘি ইউন্ হুঁসিয়ার! চহ্—শোনত! কি-উ—কোথায়?

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পাহাড়ের চূড়া—সিনিয়োলচু, সিকিম

পেরুর প্রাচীরের অন্যদিক

ওয়াৎচেঙের মন্দির—ব্যাঙ্কক্, শ্যামদেশ

হিব্রুজাতি ও ওল্ড টেষ্টামেণ্ট

৩৭৬ পৃষ্ঠার পর

সেলোমন রাজা হইয়া আদোনিজ্জের নীচতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বধ করেন। তারপর তিনি আবিয়েথাবকে পোরোহিত্য হইতে অপসৃত করেন। জোয়াবেরও ভিান প্রাণদণ্ডেব আদেশ দেন। জোয়াব যিহোবার মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তাহাকে হত্যা করা হয়। এবার আসিল শিমির পালা। তাহার অবাধ্যতার জন্য তাহাকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এইরূপে সোলোমন তাঁহার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিলেন।

সোলোমন মিশরের ফ্যারাওয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন।

একদিন তিনি গিবিয়নে যিহোবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতে গেলেন। সেখানে মহাধূমধামে ভগবানের আরাধনা করা হইল। রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, ভগবান্ তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে আসিয়াছেন। সোলোমন তাঁহার কাছে এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন সর্ব্বদা ন্যায়বিচার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার এই প্রার্থনায় ভগবান্ বিশেষ প্রীত হইয়া বলিলেন, "তথাস্তু। কিন্তু তুমি যে দীর্ঘ জীবন অথবা ধন সম্পদ প্রার্থনা কর নাই, তাহাতে আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি। আমি এই বর দিতেছি যে, তুমি অসাধারণ জ্ঞানী ত হইবেই এবং তা-ছাড়া বিপুল অর্থ ও যশের অধিকারী হইবে। আর আমার বিধান মত চলিলে দীর্ঘ জীবনও পাইবে।"

সোলোমনের প্রার্থনা

সোলোমনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি জেরুসালেমে ফিরিয়া আসিয়া যিহোবার আর্কের সম্মুখে যজ্ঞ করিলেন।

ইহার পরে দুইজন স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার কাছে বিচার প্রার্থনা করিল। একজন বলিল, "মহারাজ, আমি ও এই স্ত্রীলোকটি এক বাড়ীতে বাস করি। প্রথমে আমার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিল। তিন দিন পরে উহারও একটি ছেলে হইল। রাত্রিকালে উহার ছেলেটি মারা গেল। কিন্তু আমি ঘুমাইয়া পড়িলে ও আমার ছেলেটিকে লইয়া গেল ও উহার মৃত-সন্তানটি আমার বুকের উপর রাখিয়া গেল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি, আমার কাছে মৃত

সোলোমনের বিচার

সন্তান। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম উহা আমার ছেলে নয়।" তখন অন্য স্ত্রীলোকটি বলিল, "না মহারাজ, আমার সন্তানটিই জীবিত আছে; ও মিথ্যা কথা বলিতেছে।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সোলোমন বলিলেন, "বেশ, একটি তরবারী লইয়া আইস।" তাঁহার অনুচর তরবারী আনিলে তিনি আদেশ দিলেন, "জীবিত ছেলেটিকে আধাআধি কাটিয়া একখণ্ড ইহাকে, অন্য খণ্ড উহাকে দাও।"

তখন যে স্ত্রীলোকটি প্রকৃত জননী, সে বলিয়া উঠিল, "প্রভো, উহাকে কাটিবেন না। আমি চাই না। ছেলেটি উহাকেই দিন।" অন্য স্ত্রীলোকটি বলিল, "না না উহাকে কাটা হউক।"

তখন রাজা বলিলেন, যে স্ত্রীলোকটি কাটিতে বারণ করিতেছে উহাকেই ছেলে দেওয়া হউক। সে-ই প্রকৃত জননী।

এখন হইতে সোলোমনের ন্যায়বিচারের খ্যাতি সমগ্র ইস্রেলে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি ইউফ্রেটিস্ নদী হইতে মিশরের পূর্ব্বসীমানা পর্য্যন্ত সমগ্র দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের তুলনা ছিল না। সেকালে তাঁহার মত জ্ঞানী কেহ ছিল না। তিনি তিন হাজার প্রবাদ-বাক্য এবং ১০০৫টি গান রচনা করিয়াছিলেন। নানা স্থান হইতে কত লোক তাঁহার কাছে পরামর্শ লইতে আসিত।

ডেভিডের বন্ধু টায়ারের রাজা হিরাম সোলোমনের নিকট দূত পাঠাইলেন। সোলোমনও তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়া সিডার বৃক্ষ ও সূত্রধর পাঠাইতে বলিলেন। কারণ তিনি যিহোবার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইবেন। হিরাম খুসী হইয়াই ইহা পাঠাইলেন। সোলোমনও তাঁহাকে গম ও তেল পাঠাইলেন। এইরূপে দুই রাজা বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ হইলেন।

যিহোবার মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যে সোলোমন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিলেন। এইজন্য তিনি ইস্রেলের হাজার হাজার লোককে বেগার খাটিতে বাধ্য করিলেন লেবানন পর্ব্বত হইতে প্রচুর সিডার বৃক্ষ আনা হইল। নানা স্থান হইতে দামী দামী পাথর আসিল। সোনাও প্রচুর পরিমাণে যোগাড় করা হইল। তারপর হিরাম ও সোলোমনের মিস্ত্রীরা একটি সুন্দর মন্দির ও একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল।

এইবার সোলোমন ইস্রেলের সমস্ত নেতাদের ও সাধারণ লোকদের সমবেত করিয়া যিহোবার আর্ক আনিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ও ভগবানের উদ্দেশ্যে এক বিরাট যজ্ঞ করিলেন। কত পশু যে হত্যা

করা হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। বলির রক্তে মন্দিরের প্রাঙ্গণে স্রোত বহিয়া গেল। তারপর চৌদ্দ দিনব্যাপী উৎসব চলিল।

একদিন ভগবান্ সোলোমনের নিকট দেখা দিয়া বলিলেন, "তোমার প্রার্থনা আমি শুনিয়াছি। তোমার এই মন্দির আমার উপস্থিতিতে পবিত্র হইয়াছে। চিরদিন ইহা আমার প্রিয় থাকিবে। তুমি যদি সর্ব্বদা আমার আদেশ পালন কর ও ধর্ম্মপথে চল, তবে তোমার বংশ চিরদিন সমগ্র ইস্রেলের উপর রাজত্ব করিবে। আর তুমি অথবা তোমার সন্তান-সন্ততিরা যদি আমার আদেশ অমান্য অথবা অন্য দেবতার ভজনা কর বা করে, তবে ইস্রেল-সন্তানদের এই দেশ হইতে বিতাড়িত করিব; এই মন্দির আমি পরিত্যাগ করিব। ইস্রেলের নামে লোকে ধিক্কার দিবে।"

সোলোমন খুব পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে দেশ খুব সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। তিনি অনেক সহর নির্ম্মাণ করেন। হিটাইট্ আমোরাইট, হিভাইট্ প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিত ও কর দিত। তিনি একটি নৌ-বাহিনীও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দেশ বিদেশে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানের বার্ত্তা প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া সেবার রাণী (Queen of Sheba) অনেক লোকজন ও উপঢৌকন লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি সোলোমনের সঙ্গে অনেক বিষয়ের আলোচনা করেন। তাঁহার অনেক দুরূহ প্রশ্নের সমাধান সোলোমন করিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার জ্ঞানের পরিধি হৃদয়ঙ্গম করিয়া ও রাজসভার জাঁকজমক দেখিয়া সেবার রাণী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন ও তাঁহার নিকট নিজের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! দেখিতেছি আপনার বিষয়ে আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, সবই সত্য। পূর্ব্বে আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। এখন স্বচক্ষে দেখিয়া ধন্য হইলাম। বাস্তবিক আপনার প্রজাদের মত সুখী জগতে আর কেহ নাই। অনেক সুকৃতির ফলে আপনার ন্যায় রাজা পাইয়া তাহারা ধন্য হইয়াছে। ভগবানের অশেষ করুণা আপনার প্রতি।" তারপর তিনি সোলোমনকে নানাবিধ মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করিলেন। ইস্রেলরাজও তাঁহাকে তাঁহার ঈপ্সিত দ্রব্যাদি প্রদান করেন। অতঃপর সেবার রাণী নিজদেশে ফিরিয়া গেলেন।

সোলোমনের অনেক মহিষী ছিলেন। পাটরাণী ছিলেন মিশরের রাজকন্যা। অন্যান্য সবাই ছিলেন ভিন্ন দেশীয়। কেহ ছিলেন মোয়াব কন্যা, কেহ অ্যামন কন্যা, কেহ বা ইদম জাতীয়, কেহ হিটাইট্। তিনি তাঁহাদের সকলকেই খুবই ভালবাসিতেন। তাঁহাদের জন্য না করিতে পারিতেন এমন কোন কাজ ছিল না। এমন কি, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের প্ররোচনায় আষ্টোরেত, মিলকম্ প্রভৃতি নানা দেব-দেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের জন্য জেরুসালেমে অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কাজেই, যিহোবার প্রতি তাঁহার আর পূর্ব্বের মত ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল না। ইহাতে ভগবানের অতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হয়। তিনি দুইবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাবধান করেন। তাহাতে কোনই ফল হইল না। তখন যিহোবা তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন, "তুমি

সেবার রাণী

যখন আমার আদেশ অমান্য করিয়াছ,তখন তোমার রাজ্য আমি তোমার এক ভৃত্যকে দিব। তবে তোমার পিতা ডেভিডের খাতিরে তোমার জীবদ্দশায় ইহা ঘটিবে না। তোমার পুত্রের হাত হইতেই রাজ্য কাড়িয়া লইব। তথাপি তাহার প্রতি এইটুকু করুণা আমি দেখাইব—সে একেবারে রাজ্যচ্যুত হইবে না। জেরুসালেম তাহার অধীনেই থাকিবে, আর ইস্রেলের একশাখা তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিবে।"

এদিকে সোলোমন নেবাতের পুত্র জেরোবোয়াম্‌কে (Jeroboam the son of Nebat)শিল্পকর্ম্মচারীদের কার্য্যপরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বক্তা (prophet) আহিজার (Ahijah) দেখা হয়। তিনি জেরোবোয়ামের দেহ হইতে তাহার নূতন উত্তরীয় তুলিয়ালইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সর্ব্বসমেত বারটি টুকরা বাহির হইল। তিনি জেরোবোয়াম্‌কে বলিলেন, "দশটি টুকরা লও। কারণ ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি সোলোমনের পুত্রের হাত হইতে ইস্রেলরাজ্য কাড়িয়া লইবেন। তবে ডেভিডের খাতিরে তাহাকে একেবারে পথে বসাইবেন না। ইস্রেলের একটি শাখা তাহাকে রাজা বলিয়া মানিবে। আর তুমি যদি ভগবানের আদেশ মানিয়া চল ও ধর্ম্মপথে বিচরণ কর, তবে ভগবান তোমার সহায় হইবেন, তোমাকে ইস্রেলের রাজা করিবেন।'

এই সংবাদ সোলোমনের কাণে গেলে তিনি জেরোবোয়াম্‌কে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কাজেই সে ইস্রেল হইতে পলাইয়া গিয়া মিশরের রাজা শিশাকের (Shishak) আশ্রয় লইল। যতদিন পর্য্যন্ত না সোলোমনের মৃত্যু হয় সে মিশরেই রহিল,

সোলোমনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রেহোবোয়াম্ (Rehoboam)সিংহাসন অধিকার করেন ও সেকেমে (Shechem) ইস্রেল সন্তানদের সঙ্গে দেখা করিতে যান। এদিকে সোলোমনের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া জেরোবোয়াম্‌ও মিশর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেখানে উপস্থিত হয়। সমবেত জনতা রেহোবোয়াম্‌কে জিজ্ঞাসা করে—"তোমার পিতা আমাদের উপর নানারূপ কর-ভার চাপাইয়াছিলেন। তুমি যদি তাহার লাঘব কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে রাজা বলিয়া মানিব।"

তখন রেহোবোয়াম তাহাদের বলিলেন, "এখন যাও; তিন দিন পরে ইহার উত্তর পাইবে।" জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া গেল।

রেহোবোয়াম তাঁহার পিতার বৃদ্ধ কর্ম্মচারীদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে প্রজাদের মনোরঞ্জন করিতে উপদেশ দিলেন। তারপর তিনি তাঁহার সমবয়সী পার্শ্বচরদের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কিন্তু ঠিক বিপরীত পরামর্শ দিল—"আপনি বলিবেন যে, আপনি তাহাদের ভার লাঘব ত করিবেনই না বরং আরও বেশী কিছু করিবেন।" শেষোক্ত পরামর্শই তাঁহার মনঃপূত হইল।

তিনদিন পরে জেরোবোয়ামের নেতৃত্বে ইস্রেল-সন্তানেরা তাঁহার উত্তর শুনিতে আসিলে তিনি তাহাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করিলেন। পার্শ্বচরদের পরামর্শমত তিনি বলিলেন, "আমার পিতা তোমাদের স্কন্ধে যে বোঝা চাপাইয়াছেন, আমি তাহা আরও অধিকতর ভারী করিব।"

এই উত্তরে সমবেত জনতার মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। তাহারা সবাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ আলয়ে চলিয়া গেল। শুধু জুদার লোকেরা রেহোবোয়ামকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। পরে অবশ্য বেঞ্জামিন-সন্তানেরাও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল।

রেহোবোয়াম তাঁহার কর্ম্মচারী আদোরামকে ইস্রেল সন্তানদের নিকট কর আদায় করিতে পাঠাইলে তাহারা তাঁহাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিল। এই ব্যাপারে সাতিশয় ভীত হইয়া রেহোবোয়াম্ জেরুসালেম পলাইয়া গেলেন। এদিকে জুদা ব্যতীত সমগ্র ইস্রেলবাসীরা জেরোবোয়ামকে রাজা বলিয়া মনোনীত করিল।

জেরোবোয়াম দেখিলেন যে, যদি তাঁহার প্রজারা জেরুসালেমের মন্দিরে পূজা দিতে যায়, তবে আস্তে আস্তে তাহারা হয়ত আবার রেহোবোয়ামের দলে যোগ দিবে। কাজেই, তিনি দুইটি স্বর্ণ গোবৎস তৈয়ারী করিয়া, একটিকে বেথেলে ও অন্যটিকে ডান নগরে স্থাপিত করিয়া তাহাদের পূজা করিতে আদেশ প্রচার করিলেন। তাহাদের জন্য পীঠস্থানও নির্ম্মিত হইল।

একদিন যখন জেরোবোয়াম বেথেলে পূজা দিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন ভগবৎ-প্রেরিত মহাপুরুষ সেখানে উপস্থিত হইয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন —"আজ যে বেদীতে ধূপ-ধূনা দেওয়া হইতেছে একদিন সেখানে জোশিয়া (josia) নামে ডেভিডের এক বংশধর এই বেদীর পুরোহিতদের উৎসর্গ

করিবে।" জেরোবোয়াম বেদীর উপর হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "উহাকে বন্দী কর।" আশ্চর্য্যের বিষয়, তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত একেবারে শুকাইয়া গেল; তিনি তাহা আর নড়াইতে পারিলেন না। বেদীটিও মাঝামাঝি ফাটিয়া গেল। জেরোবোয়াম অনেক কাকুতি মিনতি করিলে মহাপুরুষ ভগবানের নিকট তাঁহার হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন রাজার হাত আবার পূর্ব্বের ন্যায় হইল।

এদিকে জুদাতেও রেহোবোয়াম যিহোবার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া নানা দেবদেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাদের জন্য নানা স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব মন্দিরে তাহাদের মূর্ত্তি স্থাপনা করা হইল। ইহাতে ভগবানের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় কাজেই, মিশরের রাজা শিশাক্ জেরুসালেম আক্রমণ করিয়া যিহোবার মন্দির ও রাজার প্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন।*

রেহোবোয়াম ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবিজাম (Abijam) রাজা হন। মোটে ৩ বৎসর রাজত্ব করিবার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার পুত্র (Asa) পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় যিহোবার শরণাপন্ন হন। তাহার ৪১ বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার পুত্র জেহোসাফাট (Jehoshaphat) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এদিকে ইস্রেল জেরোবোয়াম ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নাদাব রাজা হন। কিন্তু এক বৎসর রাজত্বের পরে তাঁহার সেনাপতি বাশা (Baasha) তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজা হন। বাশার সঙ্গে ইস্রেলরাজ আশার যুদ্ধ হয়। আশা সিরিয়ারাজ বেনহাদাদকে অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। বেনহাদদ ইস্রেল আক্রমণ করিলে বাশা জুদা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হন।

বাশার পর তাঁহার পুত্র এলা রাজা হন। কিন্তু অল্পদিন পরে তাঁহার সেনাপতি জিম্রি (Zimri) তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু মাত্র দিন কয়েক রাজত্বের পর প্রজারা বিদ্রোহ করে। প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিয়া জিম্রি আত্মহত্যা করে। তখন ইস্রেলসন্তানেরা তাহাদের নেতা ওম্রিকে (Omri) রাজা করে। ওম্রি সামারিয়া (Samaria) নগর স্থাপনা করেন। ওম্রির মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র আহাব (Ahab) রাজা হন। এই সমস্ত খারাপ রাজাদের মধ্যে আহাবের মত পাপী আর কেহ ছিল না। তিনি সিদনরাজ King of the Zidonians) এথ্বালের (ইথোবাল) কন্যা জেজ্বেলকে বিবাহ করেন ও বালের পূজা আরম্ভ করেন। সামারিয়ায় বালের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে বালের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনা করা হয়।

একদিন আহাবের নিকট এলিজা (Elijah) নামে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা আসিয়া বলিলেন "যিহোবা যেমন সত্য, আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীও সেইরূপ সত্য হইবে—আমার আদেশ ব্যতীত তিন বৎসর ইস্রেলে মোটেই বৃষ্টি হইবে না—এমন কি, এক ফোঁটা শিশির পর্য্যন্ত পড়িবে না।" এই বলিয়া তিনি পলাইয়া গেলেন। তখন সত্য সত্যই তাঁহার কথা ফলিল। আহাব কত জায়গায় তাঁহাকে খুঁজিলেন কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান মিলিল না। তিন বৎসর পরে একদিন আহাবের ভৃত্য ওবেদিয়ার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। এলিজার নির্দ্দেশ মত সে রাজাকে খবর দিল। রাজা তাঁহার নিকট আসিলে তিনি বলিলেন "ইস্রেলের প্রজাদের কার্ম্মেল পাহাড়ে সমবেত কর। বাল ও আষ্টার্টের পুরোহিতদেরও আনিতে ভুলিও না।" সবাই তাহার কথামত কার্মেলে আসিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "আর কতকাল তোমরা দুই নৌকায় পা দিবে? যদি যিহোবাই ঈশ্বর হন, তবে তাঁহার শরণাপন্ন হও। আর বাল যদি ভগবান্ হইয়া থাকেন, তবে তাহার আরাধনা কর।" তারপর বালের পুরোহিতদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আইস, তোমরা একটি বৃষ তোমাদের দেবতার নিকট উৎসর্গ কর—আমি একটি যিহোবার নিকট উৎসর্গ করি। দেখা যাউক কাহার ভগবান্ সত্য।"

তখন বালের পুরোহিতেরা তাহাদের বলি গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে লাগিল। তাহাতে বিফল হইয়া তাহারা তাহার করুণা উদ্রেক করিবার জন্য অস্ত্রের আঘাতে নিজেদের শরীর হইতে রক্তপাত করিতে লাগিল। কিন্তু কোন ফলই হইল না, এলিজা সন্ধ্যার সময় বলি উৎসর্গ করিয়া যিহোবাকে ডাকিলে

* এই সময় হইতে হিব্রুদের ইতিহাসের অনেক ঘটনা মিশর, অ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলনের ইতিহাসে পাওয়া যাইবে।

পর আকাশ হইতে অগ্নিশিখা নামিয়া আসিয়া তাঁহার বলি পোড়াইয়া নিঃশেষ করিল। ইহাতে সমবেত জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল "যিহোবাই ভগবান্— যিহোবাই ভগবান্।" তারপর তাঁহার আদেশ অনুসারে তাহারা বালের পুরোহিতদের বন্দী করিল। এলিজা কিশন নদীর পারে তাহাদিগকে হত্যা করিলেন।

ইহার পর এলিজা কার্মেল পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিয়া বৃষ্টির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভৃত্যকে বলিলেন "যাও সর্ব্বোচ্চ শিখরে যাইয়া দেখ মেঘ আসিতেছে কিনা!" সে আসিয়া বলিল"আকাশ একেবারে পরিস্কার, মেঘের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই।" সাতবার এলিজা তাহাকে পাঠাইলেন। শেষবার সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দূরে সাগর-বক্ষ হইতে এক হস্ত পরিমিত একখণ্ড মেঘ আসিতেছে।" তখন তিনি আহোবের কাছে খবর পাঠাইলেন যে, বৃষ্টি আসিল বলিয়া। হঠাৎ সমস্ত আকাশ কাল মেঘে ছাইয়া গেল আর ভীষণ বেগে ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আহার তাঁহার রথে চড়িয়া জেজ্রীলে রাণীর কাছে গেলেন। রাণী জেজবেল ত বালের পুরোহিতদের হত্যার সংবাদ শুনিয়া রাগিয়া আগুন। এলিজার নিকট খবর পাঠাইলেন "কালের মধ্যে তোমার মৃত্যু হইবে।" সুতরাং ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই এলিজা পুনরায় পলায়ন করিলেন।

একদিন ক্লান্ত হইয়া এলিজা ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়া হতাশভাবে ভগবান্কে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রভো আর যে পারি না! আমাকে তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে টানিয়া লও।" এই বলিয়া তিনি সেখানে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, একজন দেবদূত বলিতেছেন, এলিজা ওঠ। তোমার সম্মুখে খাবার রহিয়াছে। তৃপ্তিসহকারে খাইয়া লও, কারণ তোমাকে অনেক দূরে যাইতে হইবে।" ঘুম ভাঙ্গিলে তিনি দেখিলেন যে, মাথার কাছে একখণ্ড গরম পিষ্টক ও এক কলসী জল রহিয়াছে। তিনি তাহা খাইয়া পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। ৪০ দিন পরে তিনি হোরেব পর্ব্বতে পৌছিলেন। এখানে তিনি ভগবানের বাণী শুনিতে পাইলেন, "এলিজা, ডামাস্কাসে যাও। সেখানে হাজেলকে (Hazael) রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবে। তারপর ইস্রেলে যাইয়া নিমসির পুত্র জেহুকে(Jehu) রাজা করিবে। আর তোমার পদে শাফাতের পুত্র এলিসাকে (Elisha) অভিষিক্ত করিবে।"

আবার এলিজা পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। বেথ্শানের কাছে তাঁহার সঙ্গে এলিজার দেখা হইল। এলিসা তখন ক্ষেত্রকর্ষণ করিতেছিলেন। এলিজা তাঁহার উপর নিজের উত্তরীয় ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। এইবার এলিসা তাঁহার বলদ দুইটি মারিয়া মস্ত এক ভোজ দিলেন। আহারান্তে তিনি পিতামাতার আশীর্ব্বাদ লইয়া এলিজার সঙ্গে চলিলেন।

এদিকে ডামাস্কাস-রাজ বেনহাদাদ ইস্রেল আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে আহাব তাঁহাকে বারবার ভীষণ ভাবে পরাজিত করিলেন। শেষবার বেনহাদাদ আহাবের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। আহাব তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহার সঙ্গে সন্ধি করিলেন ও স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

জেজ্রীল নগরে আহাবের প্রাসাদের সংলগ্ন একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল। এই ক্ষেত্রের মালিকের নাম নাবোথ (Naboth)। একদিন আহাব নাবোথকে বলিলেন, "দেখ, তোমার ক্ষেতটি আমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, আমি ইহার পরিবর্ত্তে তোমাকে খুব ভাল একটি ক্ষেত দিব। আর তুমি যদি চাও তবে রৌপ্য মূল্য দিতেও প্রস্তুত আছি।" নাবোথ উত্তর করিল, "সে হয় না। এই জমিটুকু আমার চৌদ্দপুরুষের সম্পত্তি। প্রাণ গেলেও আমি ইহা হাতছাড়া করিতে পারিব না।" এই উত্তর শুনিয়া আহবের খুব ক্রোধ হইল। তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন ও অন্নজল ত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী জেজ্বেল তাঁহার দুঃখের কারণ জানিতে পারিয়া হাসিয়াই আকুল, এই সামান্য কারণে তোমার এই দুশ্চিন্তা! আচ্ছা খাও দাও, স্ফূর্ত্তি কর। আমি ঐ ক্ষেতটুকুর দখল তোমাকে দিব।"

তারপর জেজ্বেল তাঁহার লোকজন দ্বারা মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া নাবোথের নামে রাজদ্রোহের মামলা রুজু করিলেন। বিচারে নাবোথের প্রাণদণ্ড হইল। তখন আহাব তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ জেহু ও বিদাকারকে সঙ্গে লইয়া নাবোথের ক্ষেত্র অধিকার করিতে গেলেন। হঠাৎ দ্রাক্ষাকুঞ্জ হইতে এলিজা বাহির হইয়া আসিয়া রাজাকে বলিলেন, "তুমি নাবোথকে হত্যা করিয়া তাহার দ্রাক্ষাক্ষেত অধিকার করিতে আসিয়াছ। বেশ যিহোবার অভিশাপ শ্রবণ কর। যেখানে নাবোথের রক্তপাত করিয়াছ সেখানে তোমার রক্ত কুকুর চাটিয়া খাইবে। তুমি নির্ব্বংশ

হইবে। আর জেজ্‌বেল্‌কে নগরের বাহিরে কুকুরেরা ছিঁড়িয়া খাইবে।" ইহা শুনিয়া আহাবের খুব ভয় হইল। সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল।

ইহার কিছু দিন পরে জুদারাজ জোহোসাফাটের সঙ্গে যোগ দিয়া আহাব সিরিয়া রাজের হাত হইতে রামোথ উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধে গেলেন। কিন্তু যুদ্ধে আহাবের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃতদেহ রথে করিয়া সামারিয়ায় আনা হইল। যখন রথ হইতে রক্ত পরিষ্কার করা হইতেছিল তখন কুকুরেরা সেই রক্ত চাটিয়া খাইল।

আহাবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আহাজিয়া ইস্রেলের রাজা হইলেন। কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতে অপঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার ভ্রাতা জেহোরাম রাজা হন।

এদিকে এলিজার মহাপ্রস্থানের সময় উপস্থিত হইল। তিনি এলিসাকে সঙ্গে লইয়া বেথেলে গেলেন। সেখানকার ভবিষ্যদ্বক্তাদের শিষ্যরা এলিসাকে বলিল, "জানেন, এলিজাকে আজ ভগবান্ তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় দিবেন!" এলিসা উত্তর করিলেন, "চুপ! আমি সব জানি।" তারপর তাঁহারা জেরিকোতে গেলেন। সেখানকার শিষ্যরাও এলিসাকে ঐরূপ বলিল। এইবার তাঁহারা জর্দন নদ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পঞ্চাশ জন শিষ্য জেরিকোর নিকটস্থ পাহাড়ের শিখর দেশ হইতে তাঁহাদের দেখিতে লাগিলেন। এলিজা ও এলিসা জর্দনের তীরের নিকট আসিলে এলিজা তাঁহার উত্তরীয় দ্বারা জলস্রোতকে আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ জল সরিয়া গিয়া শুষ্ক রাস্তা বাহির হইল। তখন তাঁহারা ঐ পথে নদী পার হইলেন। অন্য পারে উপস্থিত হইয়া এলিজা এলিসাকে বলিলেন, "বৎস, আমার যাইবার সময় হইয়াছে। কোন বর প্রার্থনা কর।" এলিসা বলিলেন, "এই বর দিন্ যে, আপনার আত্মা যেন আমাকে প্রভাবান্বিত করে।"

তাঁহারা কথা বলিতে বলিতে চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা আগুনের রথ আসিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিল এবং ঘূর্ণীবাত্যা আসিয়া এলিজাকে স্বর্গে তুলিয়া লইল। তখন এলিসা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং এলিজার উত্তরীয় তুলিয়া লইয়া জর্দন অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিতে পাইয়া ভবিষ্যদ্বক্তাদের শিষ্যগণ তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত করিল।

সুনেমে (Shunem) একজন ধনবতী মহিলা বাস করিত। এলিসা যখন এখান দিয়া যাতায়াত করিতেন তখন এই মহিলার আগ্রহে তিনি তাহার অতিথি হইতেন। সে তাঁহার জন্য একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিল এবং তাহাতে প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র দিয়া সাজাইল। একদিন এলিসা এই নিঃসন্তান মহিলাকে বর দিলেন যে, এক বৎসর পরে তাহার একটি পুত্র সন্তান জন্মিবে। তাঁহার কথামত ছেলে হইল এবং দিন দিন ছেলেটি বড় হইতে লাগিল। একদিন হঠাৎ ছেলেটির মৃত্যু হইল। পুত্রের মৃতদেহ এলিসার কুটীরে রাখিয়া পুত্রহারা মা মহাপুরুষের খোঁজে কার্মেল অভিমুখে রওনা হইল। সেখানে এলিসা তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞসা করিলেন। সব কথা শুনিয়া তিনি তাহার সঙ্গে সুনেমের দিকে রওয়ানা হইলেন। মহিলার বাড়ী পৌছিয়া তিনি মৃতদেহ যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। তারপর যিহোবার আরাধনা করিয়া মৃতদেহটি আলিঙ্গন করিলেন। আস্তে আস্তে মৃত ছেলেটির হিমশীতল দেহ উষ্ণ হইল। আবার কিছুক্ষণ পরে সে হাঁচিল এবং চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তখন এলিসা তাহার জননীকে ডাকিয়া পুনর্জ্জীবিত পুত্রকে দিলেন। রমণী ভক্তিনম্রচিত্তে আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

দেশ-বিদেশের জাতীয় সঙ্গীত

ভারতবর্ষ

["বল বল বল সবে শত বীণা বেণু রবে"—এই শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীতটি স্বর্গীয় অতুলপসাদ সেন মহাশয়ের লিখিত। অতুলপ্রসাদ বাঙ্গালা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। এই গানের স্বরলিপি করিয়াছেন—শ্রীসাহানা দেবী। অতুলপ্রসাদের কবিতা ও সঙ্গীত যেমন ছিল উচ্চ শ্রেণীর, তেমনি ছিল প্রাণের দরদ মাখানো। কি বাঙ্গালা দেশে, কি বাঙ্গলার বাহিরে, সকলেরই ছিলেন তিনি প্রিয়জন। তাঁহার রচিত 'মা মরি বাংলা ভাষা' গানটি বোধ হয় তোমরা সকলেই শুনিয়া থাকিবে। বাঙ্গালা ১২৭৮ সনের কার্ত্তিক মাসের এক রবিবারে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৩৪১ সালের ৯ই ভাদ্র রবিবারে তিনি পরলোক গমন করেন।

যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়,
যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
যে পথে মোদের হবে অভিসার
শেষ তিমির-রাতে।
আমি সেই পথে যাব সাথে ॥

—গান গাহিতে গাহিতে কবি নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন।

আর্মেনিয়া, অষ্ট্রীয়া, নিউজিল্যাণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ, কবিশেখর কর্ত্তৃক অনুদিত।]

স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন

"বল বল বল সবে"

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

কোরাস্—বল বল বল সবে
শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগত সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

কর্ম্মে মহান্ হবে,
ধর্ম্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার
পুরাতন এ পূরবে !
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক্ নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী
এখনো অমৃত-বাহিনী—
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন
কহিছে গৌরব-কাহিনী !
বিদুষী মৈত্রেয়ী, খনা লীলাবতী,
সতী ও সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা, বীরেন্দ্র-প্রসূতি,
—আমরা তাদেরই সন্ততি !
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতি-পুত্রতরে সুখে ত্যজে প্রাণ
আমরা তাঁদেরই সন্ততি !
ভোলেনি ভারত ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল যেথা,
নানক নিমাই করেছিল ভাই
সকল ভারত নন্দনে—

ধর্ম্মদ্বেষ জাতি অভিমান,
ত্রিশ কোটি দেহ হবে একপ্রাণ
এক জাতি প্রেম-বন্ধনে !

মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজকুল জনমেনি মিছে,
দুদিনের তরে হীনতা বহিছে
জাগিবে আবার জাগিবে—

আসিবে শিল্প, ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা, বিনয়, বীর্য্য,
—আসিবে আবার আসিবে।

এস হে কৃষক কুটীরনিবাসী,
এস হে অনার্য্য গিরিবনবাসী,
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী,
মিল হে মায়ের চরণে—

এস অবনত, এস হে শিক্ষিত—
পরহিতে সবে হইয়া দীক্ষিত,
মিল হে মায়ের চরণে—

এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পারসী বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান—
—মিল হে মায়ের চরণে ॥

স্বরলিপি

(দ্রুত লয়)

	+					+
II	ধা ধা ধা |	ণা মা ণা	ণা ধা -া |	-া -া -া		মধা ধা ধা
	ব ল ব	ল ব ল	স বে -			শ ত বী

৩				+		৩
ধা ধা ণা	ধা পা -া |		I	রপা পা পা |		পা ধা ধা
ণা বে ণু	র বে -	- - -		ভা র ত		আ বা র

	১	+	৩	৩
পা মা গা |	গা পা -া I	মা -া সা |	রা গা পা |	পা মা -া |
জ গ ত	স ভা য়	শ্রে - ষ্ঠ	আ স ন	ল বে -

২ + ৩ ০ ২

-া -া -া I মা -া সা | র্সা র্রা র্রা | র্মা ণা -া | -া -া -া I

- - - ধ - র্ম্মে ম হা ন্ হ বে - - - -

+ ৩ ০ ২ +

ণা -া ণা | ণা র্রা | র্সা ধা -া | -া -া -া I মধা ধা ধা |

ক - র্ম্মে ম হান হ বে - - - - ন ব দি

৩ ০ ২ + ৩

ধা ণা ধা | পা পা পা | সা সা সা I সা সা রা | গা মা পা |

ন ম ণি উ দি বে আ বা র পু রা ত ন এ পূ

০ ২

ধা মা -া | -া -া -া II

র বে - - - -

(বিলম্বিত লয়)

+ ৩ ০ ১

II মা মা ণা | ধা ধা না | ণা ণা ণা | ণা সা র্সা I

আ জও গি রি রা জ র য়ে ছে প্র হ রী

বি দ্ধ্য গী মৈ ত্রে য়ী খ না লী লা ব তী

ভো লে নি ভা র ত ভো লে নি সে ক থা

মো দে র এ দে শ না হি র বে পি ছে

এ স হে কৃ ষ ক কু টী র নি বা সী

+ ৩ ০ ১

না না না | না সা সা | না সরা সা | ণা ধা ধা I

গি রি তি ন্ দি ক না চি ছে ল হ রী

স তী ও সা বি ত্রী সী তা অ রু ন্ধ তী

অ হিং সা র বা ণী উ ঠে ছি ল যে থা

ঋ ষি রা জ কু ল জ ন মে নি মি ছে

এ স হে অ না থা গি রি ব ন বা সী

+ ৩ ০ ১

পা ধা পা | মা গপা মগারেগা | মা মা পা | পা পর্সা ধপা I

যা য় নি শু কা ··যে·· গ ঙ্গা গো দা ব রী

ব হু বী র বা ···লা··· বী রে ন্দ্র প্র সূ তি

না ন ক নি মা ···ই··· ক রে ছি ল ভা ই

দু দি নে র ত ···রে··· হী ন তা স হি ছে

এ স হে সং সা ···রী··· এ স হে স ন্ন্যা সী

\+ ৩ ০ ১

গা গা মা | পা ধা ধা | প ধ ণ র্সা-া ণা | ধা -া -া I

এ খ নো অ মৃ ত বা - - - - তি নী - -

আ ম রা তাঁ দে রি স - - - - ন্তু তি - -

স ক ল ভা র ত ন - - - - ন্দ নে - -

জা গি বে আ বা র জা - - - - গি বে - -

মি ল হে মা যে র চ - - - - র ণে - -

\+ ৩ ০ ১

র্মা র্মা র্গা | া র্গা র্গা | র্গা র্গর্মা র্রা | র্র র্গ র্রা র্সণা র্সা I

প্র তি প্রা ন্তু র প্র তি গু হা - - ব ন

অ ন লে দ হি য়া বা খে যা রা - - মা ন

ভু লি ধ র্ম্ম দে ষ জা তি অ ভি - - মা ন

আ সি বে শি - ক্ষা ধ ন বা ণি - - - জ্য

এ স অ ব ন ত এ স হে শি - - ক্ষি ত

এ স হে হি - ন্দু এ স মু সল্ - - মা ন

\+ ৩ ০ ১

না না না | না র্সা র্মা | ণা র্স র্স র্রা র্সা | ণা ধা ধা I

প্র তি জ ন প দ তী র্থ - - অ গ ণ ন

প তি পু ত্র ত রে সু খে - - ত্য জে প্রা ণ

ত্রি শ কো টি দে হ হ বে - - এ ক্ প্রা ণ

আ সি বে বি দ্যা - বি ন - - য় বী - র্য্য

প র হি তে স বে হ ই - - য়া দী ক্ষি ত

এ স হে পা র সী বৌ - - - দ্ধ খৃ ষ্টি য়ান্

\+ ৩ ০ ১

পা পপধা পা | মা গমা গা | গা -া গা | মা -া -া II

ক হি ছে গৌ র ব কা - হি নী - -

আ ম রা তাঁ দে রই স - ন্তু তি - -

এ ক জা তি প্রে ম ব - ন্ধ নে - -

আ সি বে আ বা র আ - সি বে - -

মি ল হে মা য়ে র চ - র ণে - -

মি ল হে মা য়ে র চ - র ণে - -

আর্ম্মেনিয়া

নিত্য স্বাধীন বন্ধনহীন বিশ্বনাথ
প্রথম যেদিন করিলেন দেহ জীবনময়,
সেদিন হতেই বাড়ায়েছি আমি সে ক্ষীণ হাত
তোমারে বক্ষে ধরিতে, মুক্তি, না করি ভয়।

বিভুর স্বাধীন ইচ্ছা যেদিন অনশ্বর
আত্মারে মোর করিল এ দেহে সন্দীপন,
সেদিন হতেই বাড়ায়েছি আমি এ ক্ষীণ কর,
তোমারে হৃদয়-মাঝারে ধরিতে মুক্তি ধন!

জননীর কোলে শিশুটি যখন, কিছু না জানি,
কথা কহিবার শকতিটুকুও ছিল না হায়,
তখন হতেই বাড়ায়েছি আমি সে ক্ষীণ পাণি,
তোমারে হৃদয়ে ধরিতে, মুক্তি, ব্যগ্রতায়।

অষ্ট্রিয়া

বিক্রমে বীর জ্ঞানে গুণে ধীর রাজাধিরাজ,
মহান্ উদার, কীর্ত্তি তাঁহার গাহি হে আজ।
ভগবান্ তাঁর বিঘ্ন হর',
পরায় শান্তি-মালা প্রেম তাঁর মৌলিটিতে,
মণ্ডিত করে তাঁয় অপূর্ব্ব রাজশ্রীতে,
ভগবান্ তাঁকে রক্ষা কর।
সুখ-পুষ্পিত দেশ ভরি' রাজদণ্ড তাঁর
সঞ্চারে শুভ হরে দিকে দিকে দুঃখভার।
ন্যায় ও করুণা দুইটি মোহন বিশাল থাম।
ধরে' থাকে তাঁর রাজাসনখানি কীর্ত্তিধাম।
সবার উপরে বিরাজে তাঁহার শস্ত্রত্রাণ,
তারকার মত বিভা বিস্তারি জ্যোতিষ্মান্।
ভগবান্ তাঁর বিঘ্ন হর'।
ধর্ম্মই তাঁর বর্ম্ম কবচ, ধর্ম্ম ধন,
অর্জ্জিতে তিনি সজ্জিত র'ন অনুক্ষণ।
শুধু প্রজাগণে বাঁচাতে অরাতি আশঙ্কায়,
অসিলতা তাঁর জ্বালাময়ী হয় গগন-গায়।
তাদেরি আশিস্ জাগায় দিব্য হর্ষ তাঁর
তাদেরি আশিসে লভেন নিত্য পুরস্কার।
ভগবান তাঁরে রক্ষা কর।

ভেঙ্গেছেন তিনি দেশের দাস্য নিগড় ভার,
বীর চূড়ামণি, সত্যে অগাধ নিষ্ঠা তাঁর
ভগবান্ তাঁর বিঘ্ন হর'!

শেষ দিন এলে স্বর্গদূতেরা, গাহিয়া গান
যেন গো ত্রিদিবে বরি' লয়ে যায় হে ভগবান্।
ভগবান তাঁরে রক্ষা কর'।

নিউজিল্যাণ্ড

জাতির ভাগ্যবিধাতা হে প্রভু
তোমার চরণে মিলেছি মোরা,
হাতে বাঁধা প্রেম-রাখীর ডোরা।
শোন আমাদের আবেদন বাণী
মোদের সকল দৈন্য হর,'
এদেশে সতত রক্ষা কর'।

ত্রিতারা খচিত কেতন উজল
প্রশান্ত মহাসিন্ধু-স্রোতে,
ত্রাণ কর তারে কল্যাণ করে
রণ-দ্বন্দ্বের আঘাত হ'তে।
কীর্তিতে তার দিগ্‌দিগন্ত
দেশ-দেশান্ত ভর' হে ভব'।
এ দেশে, হে প্রভু রক্ষা কর'।

তোমার চরণে ভক্তি মোদের
দিন-দিন বাড়ে যেন হে প্রভু,
আশিসের ধারা না থামে কভু।
দাও দাও প্রভু অমল শান্তি
সকল দৈন্য হর হে হর।'
হে প্রভু এদেশে রক্ষা কর'।

হর' প্রভু তার সকল কালিমা,
সব অপমান লজ্জা-গ্লানি,
রাখ রাখ তার নিষ্কলঙ্ক
সুনামের পরে তোমার পাণি।
অমল যশের ময়ূর-মুকুটে
কর তার শির ধন্যতর,
হে প্রভু, এ দেশে রক্ষা কর'।

হোক গিরিমালা রক্ষিত তব
স্বাধীনতা ধন কাম্যতম—
সিন্ধুর কূলে প্রাকার সম।

তোমার চরণে সেবক করিয়া
আমাদের প্রভু ভাঙ্গিয়া গড়',
হে প্রভু, এ দেশে রক্ষা কর'।
সত্যপ্রেমের বাণী প্রচারিতে
সকল স্বাধীন জাতির আগে

চালাও মোদের, তোমার কৃপায়
শক্তি সাহস যেন গো জাগে।
গৌরবময় তোমার বিধান
পালি যেন হই সবার বড়।
হে প্রভু, এদেশে রক্ষা কর'।

বাঙ্গলার আদি কবি

বৌদ্ধগান ও দোহা বাঙ্গলাদেশের সাহিত্যে প্রথম সৃষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিবার মত। তাহার পর আমাদের দেশে ময়নামতীর গান প্রভৃতি সমাজে চলতি ছিল। সুতরাং বাঙ্গলার আদি কবির রচনা বলিতে হইলে এগুলিকেই বলা উচিত। কিন্তু দোহাকার বা ময়নামতীর গান যিনি বা যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম আমরা ভুলিয়া গিয়াছি; বাঙ্গলার আদি-কবি বলিতে আমরা তাঁহাদের কথা মনে করি না,—আমরা যাঁহাদের কথা মনে করি তাঁহাদের নাম **জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস**।
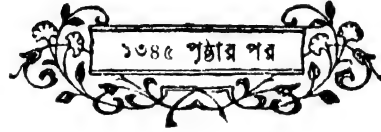
ইহাদের মধ্যে জয়দেব কিন্তু বাঙ্গলায় রচনা করেন নাই। তাঁহার প্রধান কাব্য গীত-গোবিন্দ সংস্কৃতে লেখা। গীত-গোবিন্দের ভাষা অতি সুন্দর, উহার মধুর কোমলকান্ত পদাবলী পড়িলে তাহার সুন্দর ভাষা ও সুর কাণে যেন লাগিয়া থাকে।

মাইকেল মধুসূদন জয়দেবের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে, তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীতধড়া গলে,
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে।
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে।
ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে—
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে,—
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর লহরী,—
মৃদুতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে। আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী?
মাধবের রব কবি ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবে মনে?

জয়দেবের কাব্য পড়িতে গেলে চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে গোকুল, সেখানে তমালতলে কৃষ্ণ নাচিতেছেন, সঙ্গে রাধা, কৃষ্ণের চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, গলায় পীতধড়া, রূপ দেখিয়া ভুল হয়—বুঝি বা মেঘে বিজলী চমকাইতেছে। কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া যমুনা যেমন কল কল বহিয়া যাইত, কোকিল মিষ্ট গান গাহিত, ময়ূরী নাচিত, জয়দেবের সুন্দর বাঁশী শুনিয়াও লোকের মনে সেইরূপ ভাবের উদয় হইবে।

বীরভূম জেলায় অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলী) নামে এক গ্রাম আছে। এই কেঁদুলীতে জয়দেবের বাস ছিল। এখনও মাঘ মাসে এখানে বৎসরে বৎসরে মেলা হয়, দেশবিদেশ হইতে কত সাধু সন্ন্যাসী

এখানে আসেন, জয়দেবের বাড়ী তীর্থের মত সকলে দর্শন করে। এখানে বসিয়া জয়দেব অনেক কাব্য রচনা করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল পদ্মাবতী। জয়দেব গীত-গোবিন্দে সংস্কৃত ভাষায় গোবিন্দের গীত গাহিয়াছেন। সে সংস্কৃতের মধ্যে কিন্তু অনুস্বার বিসর্গ প্রভৃতির পরিমাণ এত কম যে মাঝে মাঝে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাঙ্গলা পদ বলিয়া ভুল হইতে পারে। এই সকল পদের ধ্বনি এত মধুর যে, জয়দেবের কাব্যকে "কোমলকান্ত পদাবলী" বলা হয়; এ নাম তিনি নিজেই দিয়া গিয়াছেন।

জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র আমাদের দেশে খুব প্রচলিত। এমন কি, কোনও কোনও স্থানে পল্লীগ্রামের নিতান্ত নিরক্ষর ভিক্ষুকের মুখেও ইহার আবৃত্তি শুনিয়াছি। সেই দশাবতার স্তোত্র হইতে একটি পদ এখানে দেওয়া গেল।

প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।

এই দশাবতার স্তোত্র কিন্তু গীত-গোবিন্দ হইতে লওয়া; আর কয়েকটি পদ সেই গীত-গোবিন্দ হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি :—

দিনমণি মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন মুনিজন মানসহংস
কালিয় বিষধর-গঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিন-দিনেশ
মধুমুরনরক বিনাশন গরুড়াশন সুরকুল-কেলিনিদান
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান।

জয়দেব যেমন রসিক ছিলেন, যেমন সুন্দর ও মিষ্ট পদ্য রচনা করিতে পারিতেন এবং তেমনই পণ্ডিত ছিলেন। তখনকার দিনে অনেক বড় কবি রাজসভায় থাকিতেন,—উমাপতিধর বিস্তর বড় বড় কবিতা লিখিতে পারিতেন, অল্প কথা বাড়াইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল; শরণ নামে এক কবি খুব কঠিন কথা দিয়া তাড়াতাড়ি পদ রচনা করিতেন বলিয়া তাঁহার খুব মান ছিল; আচার্য্য গোবর্দ্ধন প্রেমের কবিতা রচনায় কুশলী ছিলেন; ধোয়ী নামে এক শ্রুতিধর পণ্ডিত বড় বড় কবিতা শুনিবামাত্র তাহা কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন; কিন্তু জয়দেব তাঁহাদের সকলের চেয়ে দোষরহিত অথচ সুন্দর কবিতায় ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে জানিতেন। সুতরাং পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, ভক্তি—সব মিলাইয়া জয়দেব ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

জয়দেবের পরেই বিদ্যাপতির নাম করিতে হয়। বিদ্যাপতি পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় পুরুষ-পরীক্ষা নামে যে পুস্তক লিখেন, এখন হইতে প্রায় সওয়া শত বৎসর পূর্ব্বে তাহার বাঙ্গলায় অনুবাদ হয়। বিদ্যাপতির নিবাস ছিল মিথিলাদেশে দ্বারভাঙ্গা জেলায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁহার জন্ম। মিথিলায় রাজা শিবসিংহের নিকট হইতে কাব্য রচনার জন্য তিনি একখানি গ্রাম পুরস্কার পান। তাঁহার রচনার মধ্যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এই পাণ্ডিত্যে ভাব চাপা পড়ে নাই। যেমন,—

জোজন মন মাহ সে নহ দূর।
কমলিনি বন্ধ হোয় জইসে সূর॥

এক যোজনও দূর নহে, যদি মনের মধ্যে থাকে; সূর্য্য যেমন কমলিনীর বন্ধু,—বহু দূরে থাকিলেও মনের মিল রহিয়াছে।

কমল শুখায়ল ভমর নই আব।
পথিক পিয়াসল পানি না পাব॥
দিন দিন সরোবর হোই অসারি।
অবহু নই বরিষই মহীভর বারি॥
যদি তোঁহে বরিষব সময় উপেখি।
কী ফল পাওব দিবস দিপ লেখি॥
ভনই বিদ্যাপতি অসময় বাণী।
মুরুছল জীবয় চুরত এক পানী।

পদ্ম শুকাইয়াছে, ভ্রমর আসে না; পথিকের পিপাসা পাইয়াছে, জল পায় না। দিন দিন সরোবর অগভীর হইয়া যাইতেছে, এখনও পৃথিবী ভরিয়া বৃষ্টি হয় না। যদি সময়ের দিক না চাহিয়া বৃষ্টি হয়, তবে তাহাতে কি ফল? দিনে প্রদীপ জ্বালিলে কি লাভ? বিদ্যাপতি অসময়ের কথা দুর্দ্দিনের কথা বলিতেছেন, এক আঁজলা জল পাইলেও মূর্চ্ছিত ব্যক্তি বাঁচে। অর্থাৎ সময়ে যোগাযোগ না হইলে কোন ফল নাই।

বিদ্যাপতির দুই একটি প্রসিদ্ধ পদ এইখানে দিতেছি।

নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মঝু পাস॥
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥

বিদ্যাপতির পদাবলীতে অনেক সময় তাঁহার রাজা শিবসিংহ ও রাণী লছিমা দেবীর নাম পাওয়া যায়। নিজের পিতা, মাতা, বন্ধু ইহাদের নামও করিয়া গিয়াছেন; সে সকল হইল ইসারায়। তখনকার পণ্ডিতেরা ও কবিরা কবিতায় হেঁয়ালী রচনা করিয়া শ্রোতৃবর্গের কৌতুক বিধান করিতেন,—বিদ্যাপতিও তাঁহাদের মত প্রহেলিকা লিখিয়াছেন। শিবের স্তব, গঙ্গার স্তুতি, এমন কি স্ত্রী-আচারের গানও তাঁহার নামে চলে। কিন্তু তাঁহার প্রধান কথা হইতেছে রাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দ। তাহার কথাই নানাপ্রকারে নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এত বড় কবি ছিলেন এবং এভাবে পদগুলি বাঁধিয়াছেন যে এতদিন চলিয়া গিয়াছে এবং মৈথিল ভাষার সহিত বাঙ্গলার ক্রমাগত বিচ্ছেদ বাড়িতেছে তাহা সত্ত্বেও পণ্ডিত রসিক এবং বৈষ্ণবেরা তাঁহার পদ পড়িয়া ও আবৃত্তি করিয়া আনন্দ পাইয়া থাকেন।

কি কহিব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে ন পাঠাই॥
শীতের ওড়নী পিয়া গিরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥

রাধা বলিতেছেন, সখি, আমার আনন্দের সীমা আর কি বলিব, বহুদিন পরে মাধব আমার মন্দিরে আসিয়াছেন। চন্দ্র দুষ্ট, সে যত দুখ দিয়াছে, কৃষ্ণমুখ দেখিয়া তত সুখ হইল। যদি শ্রেষ্ঠ রত্ন আঁচল ভরিয়া পাই, তাহা হইলেও আমি প্রিয়কে বিদেশে পাঠাইব না। সে যে আমার শীতের আবরণ, গ্রীষ্মের বায়ু, বর্ষার ছত্র, সমুদ্র পার হইবার নৌকা।

শেষ দুই পদে বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে বরনারি বা শ্রেষ্ঠ নায়িকা, শোন,—যে সুজন বা ভাল লোক, তাহার দুখ দুই চারি দিন মাত্র,—আর বেশী কাল থাকে না।

অল্প কয়টি কথায় বিদ্যাপতি কি সুন্দর ভাব ফুটাইয়াছেন, পরে সকল বৈষ্ণব কবি এই ভাবেই রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি নূতন পথ দেখাইলেন।

চণ্ডীদাস জয়দেবের পরবর্ত্তী এবং বিদ্যাপতিরই সময়কার কবি। তাঁহার জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে এবং কর্ম্মস্থান বীরভূম জেলার নান্নুর সিউড়ি হইতে ২৬, ২৭ মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে। নান্নুরে বাসুলী দেবীর মন্দিরে চণ্ডীদাস গান করিতেন, গান করিয়া দেবীর পূজা করিতেন, গানে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল; এরূপ গায়ক আরও অনেকে ছিলেন, চণ্ডীদাস তাঁহাদের

শীর্ষস্থানীয়। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাকে অশেষ ভক্তিভরে বন্দনা করিয়া গিয়াছেন,—

জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময়
মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ন
গাওত জগত জনে॥
বিপ্রকুলভূপ ভুবনে পূজিত
অতুল আনন্দদাতা।
যার তনু মন রঞ্জন না জানি
কি দিয়া করিল ধাতা॥

চণ্ডীদাস কঠিন শব্দ খুব অল্পই ব্যবহার করিয়াছেন ; প্রায় সহজ বাঙ্গলা শব্দ দিয়া কাজ চালাইয়াছেন। কিন্তু সহজ কথাগুলির
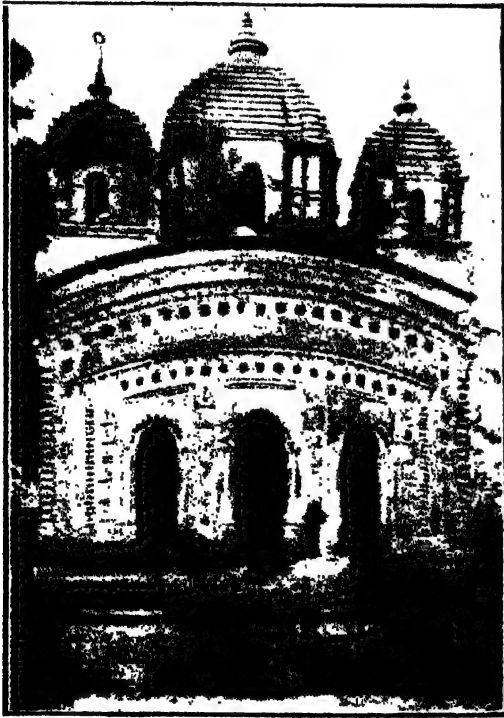
ছাতনায় বাশুলী মন্দির

মধ্যে ভাব কম নাই—ভাবে ভরা তাঁহার পদ, পড়িতে গেলে যে পড়ে তাহাকেও খানিকটা ভাবুক হইতে হয়।

অনেক সাধের পরাণ বন্ধুয়া
নয়ানে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণির শোভাতে গাঁথিয়া
হিয়ার মাঝারে লব॥
বাড়িতে বাড়িতে ফল না বাড়িতে
গগনে চড়ালে মোরে।
গগন হইতে ভূমে না ফেলাও
এই নিবেদন তোঁরে॥
এই নিবেদন গলায় বসন
দিয়া কহি শ্যাম পায়।
চণ্ডীদাস কয় জীবনে মরণে
না ঠেলিহ রাঙা পায়॥

আমার অনেক সাধের প্রাণের বন্ধু, তাহাকে চোখের মধ্যে লুকাইয়া রাখিব ; নয় তো প্রেমচিন্তামণির মালায় গাঁথিয়া হৃদয়ের মধ্যে লইব। সময় পূর্ণ না হইতেই আমাকে কত বাড়াইলে! একেবারে আকাশে উঠাইয়া দিয়াছ, এখন আমার নিবেদন যে, আকাশ হইতে মাটিতে ফেলিয়া দিও না, দয়া করিয়া সঙ্গে রাখিয়াছ, এখন দূরে বিদায় করিয়া দিও না ; গলায় কাপড় দিয়া এই অনুরোধ করি, রাঙ্গা পায়ে ঠেলিও না, আশ্রয় যেন আমার বরাবরই থাকে।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥

সখি, শ্যাম নাম কে শুনাইল? কাণের ভিতর দিয়া তাহা একেবারে মর্ম্মে প্রবেশ করিল, আমার প্রাণ আকুল করিল। শ্যাম নামে কত মধু আছে তাহা জানি না, মুখ যে তাহা ছাড়িতে পারে না, মিষ্টি না হইলে মুখে সে নাম এত কেন চাইবে? সে নাম জপ করিতে করিতে দেহ অবশ হইল, কোনও কাজে শক্তি রহিল না, এখন তাহাকে

পাইবার উপায় কি—এই অবশ দেহ লইয়া কোনও চেষ্টাই তো করিতে পারিব না।

রাধিকা যে কৃষ্ণকে ভুলিতে পারিতেছেন না, তিনি অন্তরের মধ্যে আছেন, তাঁহাকে ভুলিবেন কেমন করিয়া? কবি এই ভাব অতি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন:—

পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মন কেন টানে গো॥
খাইতে বসিয়ে যদি খাইতে কেন নারি গো।
কেশ পানে চাহি যদি নয়ান কেন ঝুরে গো॥
বসন পরিয়া থাকি চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মনে ঝাঁপে গো॥
ঘরে মোর সাধ নাই কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো॥
চণ্ডীদাস কহে মন নিবাইয়া থাক গো।
সে জন তোমার চিতে সদা লাগি আছে গো॥

তাহাকে ভুলিতে চাই, কিন্তু ভুলিতে তো পারি না। তাহার রূপ চোখে দেখি না, তবু মন কেন তাহার দিকে টানিতেছে? যদি খাইতে বসি, তাহা হইলে খাইতে পারি না; কেন এমন হয়? অন্যমনস্কভাবে মাথার চুলের দিকে তাকাইয়া আছি, চোখ দিয়া জল ঝরিতেছে; অন্যমনস্কভাবে কাপড়ের দিকে তাকাইয়া আছি, হঠাৎ চোখের সামনে তাহার রূপ ভাসিয়া উঠিল। ঘরে আমার কোনও টান নাই, আমি যাইব কোথায়, কোথায় গেলে তার সঙ্গ পাইব। চণ্ডীদাস কহে, মন নিবারণ করিয়া থাক, শান্ত হও. কারণ সে লোকটি যে তোমার মনে লাগিয়া আছে, সুতরাং বাহিরে চাহিবার দরকার নাই।

আর একটি পদ দিয়াই এখানে চণ্ডীদাসের কাব্য-কথা শেষ করিব।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি।
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর॥
বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥

বঁধু, কি মোহিনী শক্তি জান, তোমার মত আর কেহ এমনভাবে অবলার প্রাণ লইতে পারে না। রাত্রিকে দিন করিলাম, দিনকে রাত করিলাম, তবু হে বঁধু, তোমার প্রেম বুঝিতে পারিলাম না। ঘরকে বাহির করিলাম, বাহিরকে ঘর করিলাম, পরকে আপন করিলাম, আপনকে পর করিলাম, সবই তোমার জন্য। এখন হে বঁধু, তুমি যদি আমার প্রতি নিষ্ঠুর হও, আমাকে গ্রহণ না কর, তাহা হইলে তোমার সামনে মরিব, তুমি দাঁড়াইয়া থাক। বাশুলীর আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস বলেন, পরের জন্য কি আপনার লোক পর হইয়া যাইতে পারে? নান্নুরের মাঠে চণ্ডীদাস সাধনা করিতেন,—নির্জ্জনে কৃষ্ণ-প্রেমের সাধনা। প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে তাঁহার পাতার ঘর ছিল, সেই ঘরে তিনি থাকিতেন। লোকে তাঁহার নামে নানা কথা রটাইত, তাঁহার জীবন যাহাতে কষ্টময় হয় সেজন্য চেষ্টা করিত, নানা লাঞ্ছনা, গঞ্জনা দিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে চেষ্টা পাইত; কিন্তু চণ্ডীদাস কখনও সাধনার পথ ছাড়িয়া দেন নাই। তাঁহার সরল ভাষায় যে কঠিন ও গভীর ভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে সহজে বুঝিতে পারা সম্ভব নহে কারন তিনি যে ভাব লইয়া লিখিয়াছেন, সেই ভাবের ধারণা করিতে গেলে অনেক বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা প্রথমে দরকার। সুতরাং এই সকল উচ্চভাবের ভাবুকদের পদাবলী আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বুঝিতে চেষ্টা করিব। রাধা কৃষ্ণের কথা ইঁহাদের জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া থাকিত; প্রথম দেখা, পরস্পরকে চাওয়া, না পাওয়া এবং শেষে

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বাঙ্গলা বৈষ্ণব কাব্যের এই তিন জন আদিকবি। সংস্কৃত সাহিত্যে বাল্মীকিকেই আদিকবি বলা হয়। তিনি কাব্য রচনার যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী সকলে তাহার অনুসরণ করে। বাঙ্গলার বৈষ্ণব সাহিত্য খুবই বিস্তৃত, বিশাল; বহু সুকবি এই সাহিত্য লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যেমন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আশ্রয় ও অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন তেমনি এই কবি তিন জনের বন্দনা করিয়াছেন,—কারণ নূতন ধরণের কাব্য রচনার নূতন দিক জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস দেখাইয়া গিয়াছেন।

জয় জয়দেব কবি নৃপতি-শিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডী দাস রসশেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম॥

পাওয়া—ইহাদের লইয়া, ইহাদের প্রত্যেকটি স্পষ্টভাবে জীবনে বোধ করিয়া কবি অনুপম ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভাষায় লিখিয়াছিলেন তাহার অনেক নড়চড় হইয়াছে, সে সব পরিবর্ত্তন আমরা সব সময় বুঝিতে পারি না, সুতরাং এই সকল পদের মধ্যে ভাষা যে সর্ব্বত্র শুদ্ধ আছে, তাহা বলিতে পারি না, তথাপি ইহাদের সৌন্দর্য্য এবং আকর্ষণী শক্তি স্বীকার করিতে হয়।

চণ্ডীদাসের ভিটা—নান্নুর

পঞ্চদশ শতাব্দীর ঠিক প্রথম দিকে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই দুইজনে ভাগীরথী-তীরে একবার দেখা ও আলাপ হয়। দুই জনেই বড় কবি, দুই জনেই রাধা-কৃষ্ণভাবে বিভোর, দুই জনেই সাধক; নানা বিষয়ে ধর্ম্মের নানা দিক লইয়া ইহাদের নানা প্রশ্ন ছিল, নানা কথা বলিবার ছিল,—এই সুযোগে তাঁহারা মনের সাধ মিটাইয়া আলাপ করিয়া লইলেন, যে যে কথা লইয়া আলোচনা করে সেই কথা লইয়া আর কাহারও আলোচনা দেখিলে সুখ বোধ করিয়া নিজেদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় করিতে ব্যস্ত হয়;—হয়ত অনেক সন্দেহ মিটিয়া যায়; সুতরাং এই আলাপ কি কি লইয়া হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলে কত আনন্দ হইত! এই দুইজনের নাম এক সূত্রে গাঁথা,—একেবারে ইঁহাদের দেখা হইয়াছিল, তাহা অতি আনন্দের বিষয়।

বাঘের কথা

১৫১৮ পৃষ্ঠার পর

বিড়ালের কথা জানিতে পারিয়াছ। এইবার বাঘের কথা বলিতেছি। বাঘ যে বিড়াল-জাতীয় জন্তু, সে কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাঘের ন্যায় হিংস্রজন্তু পৃথিবীতে বড় একটা দেখা যায় না। বাঘ সিংহ অপেক্ষা আকারে কিছু ছোট ও পরাক্রমে কিছু ন্যূন হইলেও অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা অধিক বলবান্ ও শক্তিশালী,—সাধারণ ভাবে একথা প্রচলিত থাকিলেও অনেকের মতে বাঘের গায়েই শক্তি বেশী। সিংহের কেশর আছে বলিয়াই তাহাকে দেখিতে বিরাট ও গম্ভীর দেখায়। বাঘের কেশর নাই বলিয়া তাহাকে তেমন দেখায় না।

বাঘের শক্তি

বাঘ দেখিতে অতি সুন্দর। মুখ গোল, পেটের লোম শাদা, সর্ব্বাঙ্গ পীত-লোহিত বর্ণের লোমে আবৃত এবং সারা গায়ে কাল কাল ডোরা দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা অনেকে হয়ত নীচের ইংরাজী কবিতাটি পড়িয়াছ। বাঘের সম্বন্ধে অতি সুন্দর বর্ণনা ইহাতে আছে-

Tiger, Tiger, burning bright,
In the forests of the night.
What immortal hand or eye.
Dare frame thy fearful symmetry.

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও লিখিয়াছেন—

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে, দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন—রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের পরে
বিদ্যুতের বেগে;অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীব্র সে আনন্দ সে দীপ্তগরিমা

কোন কোন জাতীয় বাঘের পিঠে কৃষ্ণ-বর্ণ ও গোল গোল দাগ দাগ থাকে। লেজে আঙ্গুরীয়ের ন্যায় কাল কাল রেখা আছে এবং ইহার শেষ ভাগে একটি কাল টিপ আছে।

বাঙ্গালাদেশের সুন্দরবনের বড় বাঘের মত বলশালী জন্তু পৃথিবীতে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজেরা এই বাঘের নাম দিয়াছেন Royal Bengal Tiger বা "বাঙ্গলাদেশের রাজকীয় বাঘ।" বাঘের বাসস্থান এশিয়া মহাদেশে। পৃথিবীর আর কোনও দেশে বাঘ বাস করে না। চীন, মালয় ও সুমাত্রা দ্বীপে বাঘ থাকিলেও ঐ সব দেশের বাঘ বাঙ্গালার বাঘের ন্যায় দুরন্ত ও শক্তিশালী নহে। মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের বরফে-ঢাকা অঞ্চলেও বাঘ দেখা যায়। সেখানকার বাঘের গায়ে আমাদের দেশের বাঘের চেয়েও বেশী লোম হয়। এশিয়ার নানা দেশে এবং ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরভারত, সুন্দরবন এবং নীলগিরির বনে বাঘ বাস করে। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানে এবং পারস্য দেশের এলবার্জ পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে বাঘ নাই। সিংহল দ্বীপে বাঘ নাই। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, দক্ষিণ ভারতে পূর্ব্বে বাঘ ছিল না, অতি অল্প দিন হইতে দক্ষিণ ভারতে বাঘের বাস। এজন্যই সিংহলে বাঘ দেখা যায় না।

শিকার-সন্ধানে

তোমরা বিড়ালকে বল 'বাঘের মাসী।' কেন বাঘের মাসী বল, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাঘের নানা স্থানে নানা নাম। পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা বাঘকে বলে "সের"। সুন্দরবনে বলে 'শল বা শেয়াল'। আবার সেখানকার লোকেরা কোথাও কোথাও 'বড় কর্ত্তা' বলিয়াও বাঘকে অভিহিত করিয়া থাকে।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বাঘের শরীরের গঠনের সহিত বিড়ালের অঙ্গ-গঠনের আশ্চর্য্যরূপ সাদৃশ্য দেখিয়া বাঘকে বিড়ালজাতীয় জীব বলেন,—একথা তোমরা জান। বাঘের চোখ, মুখ, নাক, হাত-পা, পাকস্থলী, এমন কি কণ্ঠনালী, সমুদয়ই বিড়ালের মত। বাঘের ন্যায় সিংহও বিড়ালজাতীয় জন্তু। ইহাদের চক্ষুও বিড়ালের চক্ষুর ন্যায়। এই জন্য সন্ধ্যা হইলে ইহারা ভাল দেখিতে পায়। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধকারে আবার ভাল দেখিতে পায় না। বিড়াল যেমন চুপি চুপি চোরের মত শিকার ধরে, বাঘও তেমনি

বাঘের শিকারের রীতি

চোরের মত ধীরে ধীরে চুপি চুপি শিকার সন্ধানে বাহির হয়। ছবিতে দেখ, সুন্দরবনের বাঘের রাজা কেমন শিকার সন্ধানে চলিয়াছে! বাঘের থাবাও বিড়ালের থাবার মত। তোমরা অনেক সময়েই তোমাদের বাড়ীর পুসুমণিকে ইন্দুর মারিয়া মুখে করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছ। বাঘও তেমনি গরু, বাছুর, হরিণ এই সব শিকার করিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া লইয়া যায়। বিড়ালের জিহ্বা যেমন কর্কশ, সিংহ ও ব্যাঘ্রের জিহ্বাও তেমনি কর্কশ। উহাদের জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্ত কাঁটার ন্যায় পদার্থ আছে, তাহার সাহায্যে, তাহারা যে জন্তু শিকার করিয়াছে, তাহাদের গায়ের সমুদয় মাংস নিঃশেষে চাটিয়া লইয়া থাকে।

বাঘের চোখের মণি গোল। লেজ লম্বা লেজের শেষ দিকে লোম নাই। গালে দাড়ি ও জুলফির অনুরূপ কড়া লোম আছে। চিবুক ও ওষ্ঠে লোম আছে। বাঘ যখন রাগিয়া উঠে, তখন তাহার গোঁফ ও দাঁড়ি ফুলিয়া খাড়া হয়। বিড়াল রাগিলে যেমন করে, বাঘও রাগিলে তেমনি করিয়া থাকে। বিড়াল ও বাঘের স্নায়ু একই প্রকার।

বাঘের গায়ের রঙের কথা বলিয়াছি। পূর্ণবয়স্ক ও সুস্থ বাঘের বর্ণ অতীব সুন্দর। পাটকিলে রঙের উপর লম্বা লম্বা কাল কাল দাগ দেখিতে বেশ; কেমন, নয়? যে সকল বাঘ গভীর বনের মধ্যে বাস করে, তাহাদের গায়ের বর্ণ অধিকতর ঘোরাল ও গাঢ় হয়। আর যে সকল বাঘ অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় থাকে, তাদের গায়ের রঙ কিছু পাতলা ও ফিকে হয়। উত্তর দেশের বাঘের গায়ের রঙ এত ফিকে যে, সে প্রায় শাদা বলিলেও চলে। শাদা বাঘ ও কাল বাঘ কখনও কখনও দেখা যায়। একবার সে অনেক দিন আগে চট্টগ্রাম জেলায় এক কাল রঙের বাঘ দেখা গিয়াছিল। বাঘ ও বাঘিনীর আকৃতি, অবয়ব ও রূপলাবণ্যেও অনেক পার্থক্য আছে। বাঘিনীর শরীর এবং মাথা বাঘ অপেক্ষা ছোট হয়। বাঘিনী একবারে দুইটি হইতে চারি পাঁচটি শাবক প্রসব করে।

শাবকগুলি প্রথমতঃ খুব ছোট ছোট হয়। শীত বা বসন্ত কালেই বাঘিনীর বাচ্চা হয়। একশত পাঁচ দিনে বাঘিনী শাবক প্রসব করে। বাচ্চা হইবার পর বাঘিনীর প্রকৃতি অত্যন্ত ভীষণ হয়। যদি কোন প্রকারে বাঘিনীর শাবক নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার

বাঘ ও বাঘিনী

উপদ্রবে আশে পাশের গ্রামের লোকদের বাস করাই বিপজ্জনক হইয়া উঠে।

বাঘিনী অত্যন্ত সন্তান-বৎসলা। বাচ্চা হইবার পর শাবকের পালন, রক্ষা ও শিক্ষা লইয়াই সে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে। বাঘিনী অত্যন্ত সাহস, সতর্কতা ও প্রচণ্ড সাহসিকতা সহকারে শাবকদিগকে রক্ষা করে।

বাঘিনীর সন্তান স্নেহ

শাবকেরা যতদিন সম্পূর্ণরূপে সবল, সক্ষম ও আত্মরক্ষা করিবার মত শিক্ষা লাভ না করে, তত দিন তাহাদিগকে কাছ ছাড়া করে না। বাচ্চা যখন দুধ ছাড়ে, তখন বাছুর, কচি হরিণ, শূকর প্রভৃতি শিকার আনিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের বাঘের আকার ও আয়তন অতি বৃহৎ, এত বড় বাঘ আর কোথাও হয় না। ভারতবর্ষের বাঘের আকার সচরাচর বার ফিট পর্য্যন্ত হয়। এইরূপ গল্প আছে যে, হায়দর আলি আরকটের নবাবকে আঠার ফিট পরিমিত একটি বাঘ নজর দিয়াছিলেন! বাঘের ওজন সাধারণতঃ তিন মণ হইতে পাঁচ মণ পর্য্যন্ত হয়। বাঘ দ্রুতগমনেও বেশ দক্ষ। ইহারা অনায়াসে তিন চারিটি নদী পার হইয়া চৌদ্দ পনের ক্রোশ পথ চলিয়া যায়। বাঘ খুব সাঁতরাইতে পারে। এমন কি, সময় সময় ইহারা আট দশ মাইল সাঁতরাইয়া চলিয়া যায়। ব্রহ্মপুত্রের চর অঞ্চলের বাঘেরা শিকারের খোঁজে এক চর হইতে অন্য চরে এবং নদীর এক পাড় হইতে অন্য পাড়ে সাঁতরাইয়া যাইয়া আবার ভোরানা হইতেই বাসায় ফিরিয়া আসে।

বাঘের কাছে গৃহপালিত জীব জন্তুর মাংস অত্যন্ত প্রিয়। বাঘ তাহাদের মাংস পাইলে অন্য মাংস খাইতে চাহে না। এ মাংসের লোভেই তাহারা বন-জঙ্গল ছাড়িয়া শিকারের খোঁজে লোকালয়ে আসিয়া উৎপাত করে। বাঘ যদি কোথাও শিকারের সন্ধান পায়, তাহা হইলে সে স্থান সহজে ছাড়ে না। একটা বড় রকমের শিকার পাইলে সে তিন চার দিন ধরিয়া বেশ আরামের সহিত তাহা খাইয়া থাকে। বাঘ সাধারণতঃ পাহাড়ের গুহায়, ঘন বনে, ঘাসের ঝোপে, নদীর ধারে ও জলাভূমির পাশে থাকিতে ভালবাসে। ইহারা গ্রীষ্মের তাপ সহ্য করিতে পারে না। এজন্যই সমতলভূমির বাঘেরা জলার ধারে থাকিবার জায়গা ঠিক্ করিয়া লয়। গ্রীষ্মকালে ইহারা কাদা জলে শরীর ডুবাইয়া রাখে এবং পরে পাড়ের বালি মাটিতে গড়াগড়ি দেয়।

তোমরা হয় ত জান না, কিন্তু একথা সত্য যে, বাঘ যে কেবল মাংস খায়, তাহা নহে; ইহারা সময় সময় মাছও খায়। অনেক সময় সুন্দরবনের বাঘ মহাশয়েরা শিকারের জন্য না পাইলে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্য নদী, নালা ও খালে ভাটা সরিয়া গেলে তাহাতে নামিয়া মাছ ধরিয়া পেট ভরিয়া খায়। এইরূপ মাছ ধরিতে গিয়া সময় সময় জলের রাজা কুমীরদের সঙ্গেও যে লড়াই না হয়, তাহা নহে। সেইরূপ যুদ্ধে অনেক সময় বাঘকেই পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিতে হয়।

বাঘ ও কুমীর

ভারতবর্ষের নানাস্থানে বাঘের উৎপাত দেখা যায়। গৃহস্থ ও কৃষক ত সর্ব্বদাই তাহাদের গরু-বাছুর ও ছাগল-ভেড়া লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সুন্দরবনের কাছাকাছি আবাদ অঞ্চলে, দেরাদুন, নেপালের তরাই, পূর্ণিয়ার খড়িবনের আশে-পাশের গ্রামগুলিতে ব্যাঘ্রের অত্যন্ত অত্যাচার দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঘিনীরাই সাধারণতঃ মানুষ খাইয়া থাকে। তাহারা যখন বয়সের জন্য বন্যজন্তু শিকার করিতে পারে না, তখনই তাহারা মানুষ শিকার করিতে করিতে বাহির হয়। শিকারীরা বলেন—যে সকল বাঘ গরু, বাছুর শিকার করে, তাহারাই বেশীর ভাগ 'মানুষ খেকো' হয়।

বাঘ-শিকার

সেকালে ও একালে বরাবরই রাজা-মহারাজারা এবং বড় বড় লোকেরা বাঘ শিকার করিয়া আসিতেছেন। বাঘ শিকার বেশ আমোদজনক অনুষ্ঠান বলিয়াই শিকারীরা এই কার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করেন।

মানুষ খেকো বাঘ

ভারত-প্রবাসী সাহেবেরা বাঘ শিকার করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন। শিকারীরা সুশিক্ষিত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শিকারে যাইয়া থাকেন। এইরূপ শিকারে অনেক সময় নানা বিপদ ঘটে। অনেক শিকারী সামান্য অসতর্কতার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন। সুন্দরবনে হাতী লইয়া শিকার করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কাজেই, সেখানে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত শিকার করিতে হয়। সুন্দরবনে অনেক দেশী শিকারী আছে; তাহাদের নাম "সাঁই"।

যে সকল গ্রামে বাঘের উৎপাত বেশী, সেই সব গ্রামের লোকেরা বাঁশের বা কাঠের হুড়কা কলে ছাগল প্রভৃতি বাঁধিয়া রাখিয়া অনেক স্থলে বাঘকে বন্দী করিয়া পরে লাঠি-সোঁটা লইয়া বাঘ মারিয়া ফেলে। সাধারণতঃ লোকে মাচা বাঁধিয়া বাঘ শিকার করে।

বাঙ্গালা দেশ, মধ্য প্রদেশ এবং বোম্বাই অঞ্চলে বাঘের সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি। লোকসংখ্যা যেমন বাড়িতেছে, বন-জঙ্গল যেমন আবাদ হইতেছে, তেমনি বাঘের সংখ্যাও কমিতেছে। তার পর শিকারীদের উৎপাত ত আছেই। নিবিড় বনে-জঙ্গলে, ঘাসবন, জলার ধারে বাঘ থাকিতে পছন্দ করে। এজন্যই সুন্দরবনে, ব্রহ্মদেশ ও আসামের গভীর বনেই বেশীর ভাগ বাঘ দেখা যায়। ব্রহ্মপুত্রের চরে ঘাসের বনেও বাঘ থাকিতে দেখা যায়। সময় সময় তরাই অঞ্চলের বাঘেরা হিমালয় পর্ব্বতের ছয় হাজার

সাত হাজার ফিট উচ্চ শিখরেও বিচরণ করে। আসাম-মণিপুরে বাঘের উৎপাত খুব বেশী।

বাঘের চামড়া দেখিতে অতি সুন্দর। বাঘের চামড়ার লোভেও অনেক শিকারী বাঘ শিকার করেন। সার্কাসে বাঘের খেলা তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ।

বাঘের চর্ব্বি, বাঘের গোঁফ; বাঘের চোখ ও বাঘের নখ, থাবা প্রভৃতির মধ্যে দৈব শক্তি আছে বলিয়া প্রবাদ আছে। 'বাঘের কামড়ে আঠারো ঘা,' একথা অতি সত্য। ব্যাঘ্রের দংশন ও আক্রমণ অতি ভয়ঙ্কর। বাঘের নানা জাতিভেদ আছে; এখানে তাহাদের কথাও বলিলাম।

পুমা—উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় অধিক সংখ্যক পুমা দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে ইহাদের নাম 'আমেরিকার সিংহ' (American lion)। শাবককালে পুমার গায়ের রঙ, রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক হইলে ইহাদের

পুমা

গায়ের রঙ্ হরিণ-শিশুর ন্যায় দেখিতে হয়। ইহাদের গলা দেখিতে শাদা, লেজের রঙ্ ঈষৎ লাল, আগের দিকটা কালো হয়। সে সময়ে ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ ফুট হইয়া থাকে। ইহাদের লেজ প্রায় আড়াই ফুট লম্বা হয়।

পুমারা রাত্রিকালে শিকারের খোঁজে বাহির হয়। ইহারা শিকারের পূর্ব্বে গাছের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকে। যখন সেই গাছের তলা দিয়া কোনও জীব-জন্তু গমনাগমন করে তখন তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে এবং সম্মুখের পা দিয়া তাহার ঘাড় মোচড়াইয়া মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া ঐ জন্তুর রক্ত পান করে। পুমা অত্যন্ত হিংস্র জন্তু।

প্যান্থার—প্যান্থারও একজাতীয় ব্যাঘ্র-বিশেষ। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, পারস্য, চীন ও অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নিবিড় জঙ্গলে ইহাদের বাস। ইহারা আকারে সুন্দরবনের বাঘ হইতে অনেকটা ছোট। কিন্তু ইহারা অত্যন্ত ধূর্ত্ত ও সাহসী। প্যান্থার বিড়ালের মত অনায়াসে বৃক্ষে আরোহণ করিতে পারে। এইজন্য মানুষ, সিংহ অপেক্ষাও ইহাদিগকে বেশী ভয় করে। চিতা বাঘের ন্যায় ইহাদের গায়ে কাল কাল দাগ আছে। ইহারা শূকরের মাংস খাইতে বড় ভালবাসে। প্যান্থার অত্যন্ত নিষ্ঠুর স্বভাবের জন্তু। প্রয়োজন না হইলেও ইহারা প্রাণি-হত্যা করিয়া থাকে। কোনও জন্তু বা জানোয়ার হত্যা করিয়া ইহারা কোনও নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া দেয় এবং যে পর্য্যন্ত না সমস্ত মাংস খাওয়া হয়, সে পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ সেখানে আসিয়া থাকে।

প্যান্থার লেজ সহ দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে ছয় ফুট হয়। চিতা বাঘের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে প্যান্থার খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। প্যান্থারেরা এমন চতুর যে, ইহাদিগকে সহজে শিকার করিতে পারা যায় না। আমরা একবার চিত্রকূট পাহাড়ের জঙ্গলে, প্যান্থার শিকার করিতে গিয়াছিলাম। কয়েকজন ঝোপের মধ্যে একটি ছাগল বাঁধিয়া রাখিয়া শিকারের প্রত্যাশায় বসিয়াছিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথা হইতে একটা প্যান্থার আসিয়া ছাগলটাকে লইয়া গেল—আমাদের হাতের বন্দুক হাতেই রহিয়া গেল—শিকার করা আর হইল না!

জাগুয়ার—জাগুয়ারের বাসস্থান ও দক্ষিণ আমেরিকা। জাগুয়ার দেখিতে নেকড়ে বাঘের মত। ইহাদের গায়ের রঙ্ পীত, গায়ে কাল কাল দাগ ও কাল কাল রেখা আছে; এজন্য ইহাদিগকে দেখিতে অতি সুন্দর দেখায়। বুক ও পেটের রঙ্ শাদা। বাঘের সহিত ইহাদের আকারের অনেকটা সাদৃশ্য আছে দেখিয়া ইহাদিগকে অনেকে 'আমেরিকার বাঘ' এই নাম দিয়াছেন। জাগুয়ারেরা মানুষকে বড় একটা আক্রমণ করে না। যদি শিকার না পায়, তাহা হইলে মানুষকে আক্রমণ করে। জাগুয়ার শিকার করিতে যাইয়া অনেক সময় শিকারীদের খুব

বিপদ হয়। একবার যদি ইহারা ক্ষেপিয়া যায় তাহা হইলে বড়ই ভীষণ হইয়া উঠে। জাগুয়ার সাধারণতঃ জলার ধারে বাস করে এবং বেশ সাঁতরা-ইতে পারে। ইহাদের এককালে দুইটি হইতে চারিটি পর্য্যন্ত শাবক হইতে দেখা যায়।

চিতাবাঘ—চিতাবাঘ(Leopard)আকারে বাঘের চেয়ে অনেকটা ছোট কিন্তু দেখিতে বাঘের চেয়ে

চিতাবাঘ

কোন অংশেই কুশ্রী নয়। ইহাদের গায়ে কাল কাল গোল গোল দাগ থাকে। চিতাবাঘ পৃথিবীর প্রায় সব

কাল চিতাবাঘ

দেশেই আছে। ইহাদের অনেক জাতি আছে। লোকে সাধারণতঃ 'চিত্রব্যাঘ্র'কে চিতাবাঘ বলে। ইংরাজীতে এইজন্যই বোধ হয় ইহাদের নাম হইয়াছে (Chitta)।

বিড়াল জাতীয় অন্যান্য প্রাণীর দেহ যেমন চিক্কণ বোধ হয়, চিতাবাঘের শরীর সেরূপ নয়। ইহাদের শরীর চিক্কণ নহে। শরীরের উপরের দিক্‌টা হরিণ-শিশুর ন্যায় পীতবর্ণ, পেট শাদা এবং দুই দিকে—বিশেষতঃ পিঠে ইহাদের বড় বড় কাল কাল দাগ হয়। লেজ অত্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। উত্তমাশা
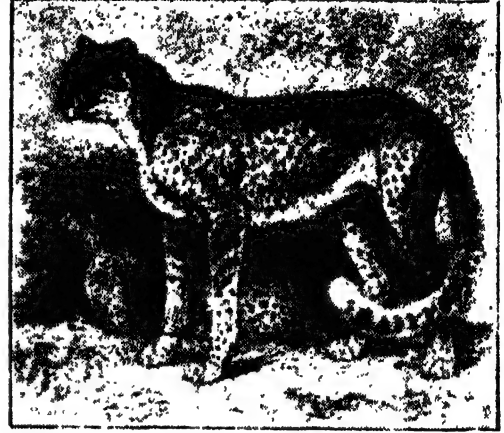
বাদামী চিতাবাঘ

অন্তরীপ(Cape of Good Hope)হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রায় সমুদয় দেশেই এবং ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতেও চিতাবাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। চিতাবাঘেরা শিকারে খুব পটু বলিয়া ইহাদিগকে শিকারী
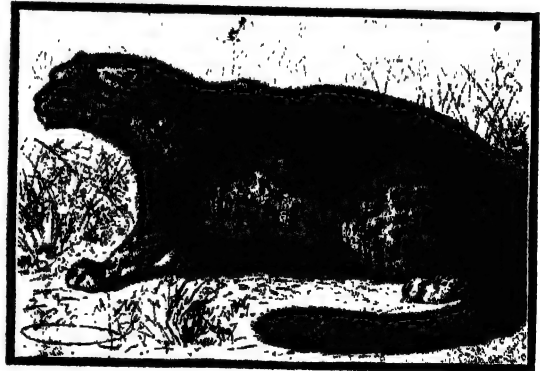
শাদা চিতাবাঘ

চিতাবাঘ বলিয়া থাকে। চিতাবাঘ সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই ইহাদের বাস আছে। ভারতবর্ষের বাঘ, ভালুক ও আফ্রিকার

সিংহ ছাড়া চিতাবাঘের মত ভয়ানক হিংস্র জন্তু পৃথিবীতে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

শাদা চিতাবাঘ এবং কাল চিতাবাঘও দেখিতে
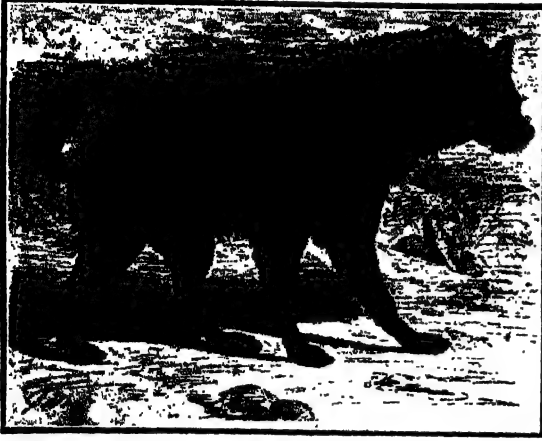
হায়েনা

পাওয়া যায়। কাল চিতাবাঘকে ইংরাজীতে বলে (Black Leopard)। ইহাদিগকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ও মালয় উপদ্বীপে দেখা যায়। শাদা চিতাবাঘ (Snow Leopard) সংখ্যায় বড় কম। ইহারা মধ্য এশিয়ার উচ্চতর ভূ-ভাগে, এবং আট নয় হাজার ফিট উঁচু পর্ব্বত-শিখরে বাস করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে শাদা চিতাবাঘেরা আঠার হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে চলিয়া যায়। আবার শীতের সময় নীচে নামিয়া আসে। ইহাদের গায়ে বড় বড় লোম আছে বলিয়া শীতে ইহাদের কোন কষ্ট হয় না।

হায়েনা—হায়েনাও বিড়ালজাতীয় জন্তু, ইহাদিগকে দেখিলে ভয় হয়। হায়েনা যখন প্রথম দৌড়াইতে থাকে, তখন মনে হয় যেন খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া যাইতেছে। কিন্তু কিছুকাল পরে আর সেইরূপ থাকে না। ইহারা রাত্রিকালে চড়িয়া বেড়ায় এবং কোন জন্তুর মৃতদেহ কিংবা মানুষের পরিত্যক্ত খাদ্যের অনুপযুক্ত মাংস খাইয়া জীবনধারণ করে। এশিয়ার দক্ষিণ ভাগে এবং আফ্রিকা মহাদেশের বন-জঙ্গলে ইহারা বাস করিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাল কাল দাগওয়ালা হায়েনারা অতি-ভীষণ হয়। ভারতবর্ষের হায়েনারা আফ্রিকার হায়েনার ন্যায় তত ভীষণ হয় না।

হায়েনারা মৃতদেহের মাংস খাইতে বড় ভালবাসে। এজন্য সময় সময় ইহারা কবর খুঁড়িয়া মৃতদেহ বাহির করিয়া তাহার মাংস খায়। যে সব দেশে হায়েনার বাস, সেখানে ইহাদের দ্বারা একটি উপকার এই হয় যে, কোন জীবজন্তুর পচা মাংস বা গলিত আবর্জ্জনা বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না, ইহারা সে সব খাইয়া নিঃশেষ করিয়া দেয়। হায়েনার দাঁতের গঠনে বিশেষত্ব আছে। ইহাদের উপরে পাঁচটি এবং নীচে পাঁচটি কপিয়া দশটি চর্ব্বণ-যন্ত্র আছে। কষের দাঁতগুলি আকারে একটু বড় ও এমন শক্ত হয় যে তাহার দ্বারা অনায়াসে অতি বড় কঠিনহাড়ও চিবাইয়া গুঁড়া করিয়া ফেলে। হায়েনা অতিরিক্ত মাত্রায় খাইতে ভালবাসে। ইহাদের ক্ষুধা এত বেশী যে, কিছুতেই যেন আর পেটের ক্ষুধা মিটিতে চায় না। কেবল খাইখাই করিয়া সারা রাত্রি খাদ্যের সন্ধানে ছুটিয়া বেড়ায়। আফ্রিকাবাসী হায়েনা পোকা-মাকড়, উই, ইন্দুর প্রভৃতি যাহা পায় তাহাই খায়।

ইউরোপে একজাতীয় হায়েনা আছে—তাহারা বেশীর ভাগ পাহাড়ের গুহার মধ্যে বাস করে। ইংলণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশেও এই জাতীয় হায়েনা অনেক আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ইউরোপে হায়েনার বাস ছিল। হায়েনা শিকার করা বিপজ্জনক।

বিড়ালীর বৃন্দাবন-যাত্রা

১৪১৬ পৃষ্ঠার পর

ভাগ্যমন্ত কোন এক গোয়ালার ঘরে
দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর আছে থরে থরে ;
দেখিয়া বিড়ালী লোভেতে অস্থির,
কেমনে খাইবে সেই দধি-দুগ্ধ ক্ষীর।
এদিক ওদিক চেয়ে চোরের মতন,
এক লাফে,খালি ঘরে করিল গমন।

সুগন্ধ ক্ষীরের ভাঁড় পাইয়া সম্মুখে,
চাটিতে লাগিল চক্ চক্ মনোসুখে।
ক্ষীরের যে ভাঁড় তার মুখ সরু ছিল,
কষ্টে-সৃষ্টে তার মধ্যে মাথা ঢুকাইল।

একে তো ক্ষীরের গন্ধে লোভে অন্ধপ্রায়,
তাতে আছে চক্ষু ঢাকা, দেখিতে না পায়

চক্ চক্ চক্ শব্দ করিয়া শ্রবণ,
গোয়ালা-গৃহিণী ঘরে আসিল তখন ;

বিড়ালীর কাণ্ড দেখি লয়ে এক লাঠি,
যথাযোগ্য শিক্ষা তারে দিল পরিপাটী।

অকস্মাৎ বজ্রপাত বিড়ালীর মাথে,
ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন ভাঁড় ভাঙ্গা সাথে।
ভাঙ্গা কলসীর কাণা গলায় রহিল ;
উচ্চ পুচ্ছ করি পুসী ছুটিয়া চলিল।
বহুদূর গিয়া এক বটবৃক্ষ তলে
বিশ্রামে বসিল হায়, পিঠ যায় জ্ব'লে।
ক্ষীরের মিষ্টতা আর লাঠির প্রহার,
কোন্‌টা কেমন মিষ্ট করিছে বিচার।
হেনকালে সেথা এক শেয়ালী আইল,
বিড়ালীকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল,--
"ওগো মাসী, হাসিখুসী দেখি না যে মুখ,
মুখ দেখে মনে হয় প্রাণে বড় দুখ।

গলায় হাঁড়ির কাণা, একি চমৎকার,
কি সাধে পরেছ বল হেন অলঙ্কার?"
বিড়ালী বলিছে, "বাছা কি বলিব আর!
ভাবিয়া দেখিনু চিত্তে অসার সংসার।
শেষকালে প্রাণপণে হরি বলে ডাকি,
মিছে সংসারের ফাঁদে পড়ে কেন থাকি।
বৈরাগ্যে আমার এবে পরিপূর্ণ মন,
কলসী বাঁধিয়া গলে যাচ্ছি বৃন্দাবন।"
শেয়ালী বলিছে—"মাসী, পিঠে কেন দাগ,
মুখে ক্ষীর মেখে কেবা করেছে সোহাগ ?"

বিড়ালী দেখিল সব বুঝেছে শেয়ালী,
খাটিল না খাটিল না মিছা চতুরালী।
মেউ মেউ করি সেই পিছু পানে হটে,
কথা কাটাকাটি হ'ল দুই শঠে শঠে।
শেয়ালী বলিছে, "মাসী, বৃথায় কোন্দল,
ভাঙ্গা ভাঁড় গলে দেখি বুঝেছি সকল।
দধি দুগ্ধ ক্ষীর সব চুরি ক'রে খাওয়া,
মা'র খেয়ে দুঃখ পেয়ে বৃন্দাবনে যাওয়া।
কাহার না পায় হাসি শুনে হেন বাণী,
চোরার মুখেতে সদা ধর্ম্মের কাহিনী।

ছেলে ভুলানো ছড়া

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
সূয্যি গেল পাটে,
খুকু গেছে জল আন্‌তে
পদ্ম দীঘির ঘাটে।

পদ্ম দীঘির কালো জলে
হরেক রকম ফুল,
হেঁটোর নীচে দুলছে খুকুর
গোছা ভরা চুল।

এস চন্দর আলো করে,
দীঘির জল কালো করে,
ধান ভান্‌লে কুঁড়ো দেবো,
মাছ কুট্‌লে মুড়ো দেবো

সোণার থালে ভাত দেবো,
চারিদিকে বাটি দেবো,
বস্‌তে পিঁড়ি দেবো,
খুকির সঙ্গে বিয়ে দেবো।

বাঁশপাতা নড়ে চড়ে
ননীর বর গয়না গড়ে।
বরকে দেখতে মজা,
গাঁদা ফুলের বাজনা বাজা!

বাসবদত্তা

[বাসবদত্তা গল্পটি আমাদের দেশের একজন প্রাচীন সংস্কৃত নাটককার ভাসের 'স্বপ্ন-বাসবদত্তা' নাটক হইতে গৃহীত। 'কথাসরিৎসাগরে'ও উদয়ন নামে এই গল্পটি দেখিতে পাওয়া যায়। ভাসের নাটক ও কথাসরিৎসাগরের আখ্যান ভাগ লইয়া এই গল্পটি রচিত হইয়াছে।

ভাসকবি ছিলেন দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণ। কোথায় কোন্ অঞ্চলে তাঁহার বাড়ী ছিল, বলা কঠিন ; তবে অনেকে বলেন, তিনি মালাবারের লোক। বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, তিনি কালিদাস প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণের অগ্রবর্ত্তী। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের আগে তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে ভাসের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বাণভট্টের রচিত 'হর্ষ-চরিতে,' রাজশেখর-রচিত, সুক্তি-মুক্তাবলী'তে ও 'প্রসন্নরাঘবে' ভাসকবির উল্লেখ আছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুরের রাজার পক্ষ হইতে সংস্কৃত হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিবার ভার পাইয়া নানাস্থানে পুঁথি অনুসন্ধান করিতে থাকেন। সে সময়ে তিনি 'মতালিকার' নামে একটি প্রাচীন মঠে কতকগুলি সংস্কৃত নাটকের পাণ্ডুলিপি পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে মলয়া ভাষায় লিখিত দশখানি রূপক ছিল। তাহাদের নাম (১) স্বপ্ন নাটক, (২) প্রতিজ্ঞা নাটক, (৩) পঞ্চরাত্র, (৪) চারুদত্ত, (৫) দূতঘটোৎকচ, (৬) অবিমারক, (৭) বাল-চরিত্র, (৮) মধ্যমব্যায়োগ, (৯) কর্ণভার, (১০) উরু-ভঙ্গ। তাহার মধ্যে একখানি অসমাপ্ত রূপকও ছিল এবং অভিষেক ও প্রতিভা নামে আর দুইখানি সম্পূর্ণ নাটকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপে ভাসকবির তেরখানি নাটকের কথা আমরা জানিতে পারি।

ভাসকবির সময় সম্বন্ধে নানাজনে নানাকথা বলেন। অনেকের মতে তিনি বৈয়াকরণিক পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে তিনি খৃঃ পূঃ তিন শতাব্দীর লোক। সুপণ্ডিত কিথ্ সাহেব কিন্তু তাঁহাকে তৃতীয় শতাব্দীর লোক বলিতে চাহেন। এ হইতেছে পণ্ডিতদের নানামতের নানাকথা।

আমরা কিন্তু দেখিতে পাই যে, শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে ভাসকবির রচিত 'চারুদত্ত' নাটকের অনেকখানি ছায়া পড়িয়াছে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকেও ভাসকবির 'স্বপ্ন-বাসবদত্তা'র সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, ভাসের নিকট তাঁহার পরবর্ত্তীর কবিগণ অনেকখানি ঋণী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন প্রাচীনকালের একজন প্রসিদ্ধ কবি।

কথাসরিৎসাগরের এই গল্পের সহিত মহাকবি ভাস-লিখিত স্বপ্ন-বাসবদত্তা নাটকের স্থানে স্থানে প্রভেদ লক্ষিত হইবে।]

বাসবদত্তা

১৪৭৫ পৃষ্ঠার পর

[১]

সেকালে শতানীক নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। স্বর্গের দেবতাদের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বিশেষ সমাদর করিতেন। কিন্তু এত সুখেও তিনি সুখী ছিলেন না। তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ন হইয়া থাকিতেন। শাণ্ডিল্য মুনির বরে তাঁহার এক পুত্র হয়। সেই পুত্রের নাম হয় সহস্রাণীক। সম্রাট শতানীকের রাজধানীর নাম ছিল কৌশাম্বী। এলাহবাদ হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে যমুনার তীরে বর্ত্তমান কোসাম্ নামক স্থানকেই আধুনিক পণ্ডিতগণ কৌশাম্বী বলেন। একবার স্বর্গে দেবতাদের সহিত অসুরদের যুদ্ধ বাধিয়া যায়। সেই যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র সম্রাট শতানীকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সারথি মাতলিকে পাঠাইয়া দেন। সম্রাট শতানীক, মন্ত্রী যুগন্ধর ও সেনাপতি সুপ্রতীকের উপর রাজ্যভার দিয়া অমরাবতীতে চলিয়া গেলেন। অসুরদের সহিত ভয়ানক যুদ্ধে আরম্ভ হইয়া গেল। দুঃখের বিষয়, এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও সম্রাট শতানীক নিহত হইলেন।

আপনার পিতার বীরত্বে আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি

অসুরদের সহিত যুদ্ধ জয়লাভ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অমরাবতীতে এক মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। সহস্রাণীক এই মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া মাতলির সহিত অমরাবতীতে গেলেন। নন্দনকাননে দেবতাদের সভা বসিয়াছে। বিজয় উৎসবে দেবতাগণ আনন্দে মগ্ন। দেবরাজ ইন্দ্র সহস্রাণীকের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আপনার পিতার বীরত্বে আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। আপনিও বিশেষ বীর্য্যবান্, এজন্য আপনার উপযুক্ত পত্নী দেবতাগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এবং আপনার সেই ভাবী পত্নী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার সেই ভাবী পত্নীর কথা বলিতেছি, শুনুন।—তিনি অযোধ্যার রাজা কৃতবর্ম্মার কন্যা মৃগাবতী। এই মৃগাবতীই আপনার মহিষী হইবেন। এই বলিয়া দেবরাজ সসম্মানে তাঁহাকে বিদায় করিলেন। ইন্দ্রসারথি মাতলি রথ সাজাইয়া আনিয়া সম্রাট সহস্রাণীককে লইয়া কৌশাম্বী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

(২)

সম্রাট কৌশাম্বীতে ফিরিয়া আসিয়া যুগন্ধর প্রভৃতি মন্ত্রিগণকে, ইন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা জানাইলেন। মন্ত্রিগণের পরামর্শে এই সংবাদ লইয়া এক রাজদূত অযোধ্যায় গমন করিল। অযোধ্যার রাজা কৃতবর্ম্মা ও তদীয় পত্নী লীলাবতী এই শুভ সংবাদে পরম পুলকিত হইয়া সম্বন্ধ স্বীকার করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই বিপুল আড়ম্বরে মৃগাবতীর সহিত সম্রাট সহস্রাণীকের বিবাহ হইয়া গেল। কিছু দিনের পর রাজমন্ত্রী যুগন্ধর, সেনাপতি সুপ্রতীক ও রাজ্য-অমাত্য প্রত্যেকেই এক এক পুত্র লাভ করিলেন। মন্ত্রী যুগন্ধরের পুত্রের নাম হইল যৌগন্ধরায়ণ, সেনাপতি সুপ্রতীকের পুত্রের নাম হইল রুমণ্বান্ ও রাজ অমাত্যের পুত্রের নাম হইল বসন্তক।

এক দিন রাণী মৃগাবতীর এক অদ্ভুত ইচ্ছা হইল। তিনি রাজার নিকট, মানুষের রক্তে স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সম্রাট সহস্রাণীক মহিষীর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আলতা গুলিয়া একটি পুকুরের জল রক্তবর্ণ করিয়া দিলেন। রাণী ঐ পুকুরে স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে মাংসপিণ্ড মনে করিয়া এক প্রকাণ্ড পক্ষী ছোঁ মারিয়া রাণীকে লইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। সম্রাট এই সংবাদ পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহিষীর শোকে সম্রাট হাহাকার করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ইন্দ্রের সারথি মাতলি আসিয়া বলিল,—মহারাজ! আপনি স্বর্গ হইতে আসিবার সময় অপ্সরা তিলোত্তমা আপনার সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাহা না শুনায় তিনি আপনাকে এই অভিশাপ দিয়াছিলেন—আপনার সহিত আপনার পত্নীর চৌদ্দবৎসর কাল বিচ্ছেদ ঘটিবে। সেই অভিশাপের জন্যই আপনাকে এই বেদনা সহ্য করিতে হইল। মন্ত্রিগণ সম্রাটকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু রাজার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। রাজা ঐ শাপাবসানের চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল প্রতীক্ষা করিয়া দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

[৩]

এদিকে ঐ পক্ষী যখন বুঝিতে পারিল যে, সে ছোঁ মারিয়া যাহা আনিয়াছে, তাহা মাংসপিণ্ড নয়—একটা জীবন্ত মানুষ, তখন সে তাহাকে নামাইয়া দিবার ইচ্ছা করিল। সেই সময়ে ঐ পক্ষী উদয়াচলের নিম্নে রাখিয়া দিয়া উড়িয়া গেল। সেই জনশূন্য স্থানে রাণী মৃগাবতী ভয়ে ও শোকে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাণী সহসা দেখিলেন, এক অজগর সর্প তথায় আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি অতিশয় ভয় পাইয়া গেলেন। কিন্তু হঠাৎ তথায় এক সুবেশ-সুন্দর পুরুষ আসিয়া সেই অজগরকে বিনাশ করিয়া চলিয়া গেল। আবার পাছে কোন বিপদে পতিত হন এই আশঙ্কা করিয়া মহারাণী মৃগয়াবতী আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছায় এক মত্ত হস্তীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু—ঐ হস্তীও তাঁহার কোন অপকারই করিল না—ধীরে ধীরে তথা হইতে চলিয়া গেল। জনশূন্য বিজন প্রান্তর! রাণী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রাণীর ক্রন্দনে পর্ব্বত, প্রান্তর, বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে এক ঋষিকুমার ফুল তুলিবার জন্য সেই বনে আসিয়াছিল। রাণীর ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া ঋষিকুমার তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, মা, কাঁদিবেন না, নিকটেই জমদগ্নি মুনির আশ্রম; আপনি আমার সঙ্গে আসুন। শোকাকুলা রাণী মৃগাবতী ঋষিকুমারের সঙ্গে জমদগ্নি মুনির আশ্রমে আসিলেন। রাণী ঋষিকে প্রণাম করিলেন। ত্রিকালজ্ঞ মুনি জমদগ্নি রাণীকে বলিলেন,

পক্ষী রাণীকে উদয়াচলে রাখিয়া উড়িয়া গেল

মা! তুমি আমার আশ্রমেই থাক—আমি যথাসাধ্য তোমার যত্ন করিব। তোমার এক সুন্দর পুত্র জন্মিবে এবং এই আশ্রমেই স্বামীর সহিত তোমার মিলন হইবে। এ যে বিধাতার বিধান, মা! কিছুদিন তোমাকে আশ্রমেই থাকিতে হইবে। সুতরাং কাঁদিয়া ত কোন ফল হইবে না।

আশায় বুক বাঁধিয়া রাণী মৃগাবতী জমদগ্নি মুনির আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। যথাকালে তাঁহার সূর্য্যের মত তেজস্বী এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। সহসা দৈববাণী হইল, বৎসে! শোক করিয়ো না। তোমার এই পুত্রের নাম হইবে 'উদয়ন'। তোমার

এই পুত্র ভবিষ্যতে অতি-প্রসিদ্ধ ও যশস্বী হইবে এবং অপূর্ব্ব ক্ষমতাবলে বিদ্যাধরদিগের রাজা হইবে। এই দৈববাণী শুনিয়া তাঁহার প্রাণের অন্ধকার কাটিয়া গেল এবং এক অপূর্ব্ব আশার আলোকে তাঁহার হৃদয় মন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

[৪]

জমদগ্নির আশ্রমে বালক উদয়ন দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। মুনি যোগবলে সমস্ত অবগত হইয়া বালকের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার সমাপন করিলেন এবং সমস্ত শাস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলেন। রাণী মৃগাবতীর হাতে রাজা সহস্রাণীকের নামাঙ্কিত এক হীরক বলয় ছিল। এক দিন রাণী ঐ হীরক-বলয় কুমার উদয়নের

এইবার সাপটিকে ছাড়িয়া দাও

হাতে পরাইয়া দিলেন। কুমার উদয়ন ঐ বালা পরিয়া শিকারের সন্ধানে এদিকে ওদিকে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইলেন, এক সাপুড়িয়া একটি সাপ ধরিয়াছে। উদয়ন সাপুড়িয়াকে ঐ সাপটি ছাড়িয়া দিবার জন্য বলিলেন। সাপুড়িয়া বলিল, আমি অতিশয় গরীব। সাপ ধরিয়া সাপের খেলা দেখানোই আমার ব্যবসা। আমার একটি সাপ ছিল, সেটি মরিয়া যাওয়ার আমি অনেক কষ্টে, মন্ত্র ও ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই সাপটি ধরিয়াছি। সাপুড়িয়ার কথা শুনিয়া উদয়নের অত্যন্ত দয়া হইল। তিনি হাত হইতে সেই হীরক-বলয় খুলিয়া সাপুড়িয়াকে দিয়া বলিলেন, এইবার সাপটিকে ছাড়িয়া দাও। সাপুড়িয়া সেই মহামূল্য হীরক বলয় পাইয়া সাপটিকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেই ঐ সাপ এক বীণাধারী পুরুষের রূপ ধারণ করিয়া বলিল, রাজকুমার উদয়ন! আমি নাগরাজ বাসুকির বড় ভাই; আমার নাম বসুনেমি। তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, এই জন্য আমি তোমাকে এই বীণা ও আমার গলার এই ফুলের মালা তোমায় দান করিতেছি। এই বীণার স্বর যে শুনিবে, সে-ই তোমার বশীভূত হইবে, আর এই ফুলের মালার ফুল কখনও শুকাইবে না। ইহা ভিন্ন আমি তোমার কপালে এমন একটি তিলক পরাইয়া দিতেছি, যাহা কখনও মলিন হইবে না। এই বলিয়া বসুনেমি রাজকুমার উদয়নের কপালে তিলক লাগাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। উদয়নও তাঁহার মাতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

[৫]

এদিকে সাপুড়িয়া ঐ হীরক-বলয় বিক্রয় করিবার জন্য কৌশাম্বীতে আসিল। ঐ হীরক-বলয়ে সম্রাটের নাম লেখা দেখিয়া এক রাজকর্ম্মচারী তাহাকে ধরিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে সাপুড়িয়া কিরূপে ঐ বলয় পাইয়াছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া দিল। সাপুড়িয়ার মুখ হইতে সব কথা শুনিয়া রাজা অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, "সম্রাট সহস্রাণীক। তিলোত্তমার শাপের চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। আপনি অচিরেই পুত্র ও রাণীর সহিত মিলিত হইবেন। রাজকুমার ও মহারাণী মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রমে রহিয়াছেন।" রাজা প্রসন্ন হইয়া ঐ সাপুড়িয়াকে সঙ্গে লইয়া সসৈন্যে উদয়াচলের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সম্রাট সহস্রাণীক সদলবলে উদয়াচলের দিকে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তাঁহারা এক পুষ্করিণীর তীরে সে রাত্রি যাপন করিলেন। ভৃত্য সঙ্গতক নানা গল্প শুনাইয়া সম্রাটের চিত্ত-বিনোদন করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া

আসিল। প্রাতঃকালে তাঁহারা সেস্থান ত্যাগ করিলেন। কিছুদিনের পরেই তাঁহারা মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্ মহর্ষিকে প্রণাম করিলেন। মহর্ষি সম্রাটের যথোচিত সৎকার করিয়া রাণী ও রাজকুমারকে সঙ্গে দিয়া রাজাকে বিদায় দিলেন। রাজা, রাণী, রাজকুমার মহর্ষির আশ্রম হইতে চলিয়া আসিলে আশ্রমের সকলেই যেন উদাস হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কোশাম্বীর প্রজারা রাজা, রাণী ও রাজকুমারকে দেখিয়া মহোৎসব করিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিনের পর সম্রাট সহস্রাণীক রাজকুমারকে রাজ্যপালনের উপযুক্ত দেখিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য আয়োজন করিলেন। যথাসময়ে উদয়ন যুবরাজ হইলেন। যৌগন্ধরায়ণ, রুমন্বান্ ও বসন্তকে যুবরাজ উদয়নের মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইল। এই সময়ে সহসা স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দৈববাণী হইল যে, এই মন্ত্রিগণের সাহায্যে উদয়ন সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন। কিছুদিনের মধ্যে মহারাজ সহস্রাণীক ও মহারাণী মৃগাবতী উদয়নের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তপস্যা করিবার জন্য হিমালয় পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন।

[২]

উদয়ন বৎসদেশের রাজা হইয়াছেন। কিন্তু রাজকার্য্য তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি তাঁহার মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার দিয়া আপনার খেয়ালে বিভোর হইয়া থাকিতেন। তিনি প্রতিদিন শিকার করেন, সর্ব্বদা বীণা বাজান এবং বীণার শব্দে অভিভূত করিয়া ভয়ঙ্কর বন্য হস্তী ধরিয়া আনেন। এই সব হইল তাঁহার প্রিয় কাজ। তিনি কিছুরই চিন্তা করেন না। চিন্তার মধ্যে এই ছিল যে, কিরূপে তিনি কুলশীল-সম্পন্না সুশীলা সুন্দরী পত্নী লাভ করিবেন। তিনি ভাবিতেন, উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডমহাসেনের কন্যা বাসবদত্তাই তাঁহার পত্নী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু এ ত দুরাশা! উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডমহাসেনও ভাবিতেন, বাসবদত্তার স্বামী হইতে পারে একমাত্র কোশাম্বী রাজ উদয়ন। কিন্তু উদয়নের সহিতই বা বাসবদত্তার বিবাহ কিরূপে হইতে পারে! আমি কিরূপে উদয়নের কাছে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিব। দারুণ অভিমান আসিয়া চণ্ডমহাসেনকে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু তথাপি চণ্ডমহাসেন তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন, উদয়ন শিকার করিতে বড় ভালবাসেন এবং হাতী ধরা তাঁহার একটা বিশেষ সখ; তার উপর সঙ্গীতেও তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য আছে। অতএব কৌশল করিয়া যদি তাঁহাকে কোন রকমে রাজধানীতে ধরিয়া আনিতে পারি, তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে। উদয়নকে আমার কন্যার সঙ্গীত-শিক্ষক নিযুক্ত করিলেই তিনি আমার কন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন এবং আমাদেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মহারাজ চণ্ডমহাসেন ভগবতীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভগবতীর পূজা করিয়া কৌশাম্বীরাজ উদয়নকে জামাতৃরূপে পাইবার জন্য বর প্রার্থনা করিলেন। দেবী সন্তুষ্ট হইয়া বর দান করিলেন, মহারাজ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। এখন মহারাজ চণ্ডমহাসেন তাঁহার মন্ত্রী বুদ্ধিদত্তের সহিত পরামর্শ করিলেন যে, উদয়ন বসুনেমির প্রদত্ত বীণা বাজাইতে বিশেষ নিপুণ হইয়াছেন। সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। অতএব বাসবদত্তাকে গান শিখাইবার কৌশলে দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে উজ্জয়িনীতে আনিতে হইবে। দূত কোশাম্বী নগরে পৌঁছিয়া রাজা উদয়নকে বলিল, উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডমহাসেনের কন্যা অপূর্ব্বসুন্দরী, তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করিতে অভিলাষিণী। আপনি বীণা বাজাইতে পটু এবং সঙ্গীত-বিদ্যাতেও পারদর্শী; এজন্য উজ্জয়িনী-রাজের ইচ্ছা যে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজকন্যা বাসবদত্তার সঙ্গীত গুরু হউন। দূতমুখে এই কথা শুনিয়া রাজা উদয়ন মন্ত্রিগণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন, মহারাজ! উজ্জয়িনীরাজের এই কথা ত আমাদের ভাল বোধ হইতেছে না। আমাদের মনে হয়, রাজকন্যাকে সঙ্গীত শিখাইবার ছলে আপনাকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া আপনাকে বন্দী করিয়া রাখাই তাঁহার অভিপ্রায়। এখন আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন। কথাটা উদয়নের মনঃপূত হইল। তিনি উজ্জয়িনী-রাজদূতকে বলিলেন, আমার পক্ষে উজ্জয়িনীতে গিয়া রাজকন্যাকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া অপমানকর ও অশোভন। অতএব আপনি উজ্জয়িনীরাজকে বলিবেন, যদি রাজকন্যাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে হয়, তবে তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে আমার ভবনে পাঠাইয়া দেন।

উজ্জয়িনী-রাজদূত চলিয়া গেলে উদয়ন বলিলেন, চণ্ডমহাসেনকে যদি আমি যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ধরিয়া

আনি, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন, কিন্তু মহারাজ! ইহা বড় কঠিন কথা। উজ্জয়িনীরাজ বিশেষ ক্ষমতাশালী। চণ্ডমহাসেন ভগবতীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আপনার শরীরের মাংস কাটিয়া কাটিয়া যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। রাজার এতদূর ভক্তি দেখিয়া ভগবতী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বজ্রের তুল্য এক খড়্গ ও ঐরাবতের তুল্য এক হাতী দিয়া বলিয়াছেন, এই খড়্গ ও হস্তীর সাহায্যে তুমি যুদ্ধে অজেয় হইবে। অতএব তাঁহার সহিত আপনার শত্রুতা করা উচিত হইবে না। আমি ত উজ্জয়িনীরাজার সহিত যুদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। রাজা চণ্ডমহাসেন তাঁহার ভুবনমোহিনী কন্যা আপনাকে সমর্পণ করিতে চান। রাজকুমারীকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার কথা একটা ছলনা মাত্র। দর্পিত রাজা প্রকাশ্যে এই কথা বলিতে না পারিয়া এইরূপ ছলনার আশ্রয় লইয়াছেন।

[৭]

দূত উজ্জয়িনীতে গিয়া চণ্ডমহাসেনকে রাজা উদয়নের কথা জানাইল। উজ্জয়িনীরাজ বুঝিলেন, সোজা কথায় কাজ হইবে না। উদয়ন এখানে আসিবেন না, আর রাজকুমারী বাসবদত্তাকেও সঙ্গীত শিক্ষার জন্য কৌশাম্বীতে পাঠানও অপমানকর। অতএব কৌশলে বন্দী করিয়া উদয়নকে এখানে আনিতে হইবে। তাঁহার মনে পড়িল, উদয়ন বিন্ধ্যারণ্যে হাতী ধরিবার জন্য আসিয়া থাকেন। চণ্ডমহাসেন তাঁহার নড়াগিরি হাতীর মত একটা কৃত্রিম হাতী তৈয়ার করিয়া তাহার পেটের মধ্যে কতকগুলি বড় বড় বীর যোদ্ধা বসাইয়া দিয়া তাহাকে বিন্ধ্যারণ্যে রাখিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার সময় উদয়নের ভৃত্যেরা খবর দিল, মহারাজ! ঐরাবতের মত একটা হাতী বিন্ধ্যারণ্যে উপস্থিত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া উদয়ন হাতী ধরিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকাল বেলায় উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও অনুচরগণ লইয়া রাজা উদয়ন হাতী ধরিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মন্ত্রিগণ তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। বড় বড় জ্যোতিষী আসিয়া বলিলেন, মহারাজ! এই সময়ে যাত্রা করিলে আপনি বন্ধন দশায় পড়িবেন, কিন্তু ইহাতেই আপনার উপযুক্ত পত্নী লাভ হইবে। কিন্তু রাজা কাহারও কথা না শুনিয়া জনকয়েক গুপ্তচর ও কিছু সৈন্য লইয়া বিন্ধ্যারণ্যের দিকে চলিয়া গেলেন। পাছে হাতী অনেক লোক দেখিয়া ভড়কাইয়া যায়, এজন্য তিনি সৈন্যদিগকে সেইখানে রাখিয়া একাকী বীণা বাজাইতে বাজাইতে সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। একে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর বীণার স্বরে রাজাও মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এজন্য সেটা যে কৃত্রিম হাতী, তাহা বুঝিতে না পারিয়া রাজা উদয়ন ঐ হাতীর খুব নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদয়নকে একাকী হাতীর নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার পেটের ভেতর হইতে বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী যোদ্ধা বাহির হইয়া

অস্ত্রধারী যোদ্ধারা উদয়নকে ঘিরিয়া ফেলিল

উদয়নকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তাঁহাকে ধৃত করিয়া চণ্ডমহাসেনের নিকট লইয়া চলিল। রাজা চণ্ডমহাসেন বিশেষ সমাদর করিয়া কন্যা বাসবদত্তার সঙ্গীত শিক্ষার ভার উদয়নের উপর দিলেন। উদয়ন সঙ্গীতশালায় থাকিয়া রাজকন্যা বাসবদত্তাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাসবদত্তার অপরূপ রূপ ও সঙ্গীত শিক্ষার অপূর্ব্ব অনুরাগ দেখিয়া রাজা উদয়ন বন্দিদশার ক্লেশ অনেকটা ভুলিয়া গেলেন।

এদিকে কৌশাম্বীর সৈন্যগণ উদয়নকে দেখিতে না পাইয়া অনেক খোঁজাখুঁজি করিল। অবশেষে তাহারা উজ্জয়িনী-রাজ্যের ছলনা বুঝিতে পারিয়া শূন্য মনে কৌশাম্বীতে ফিরিয়া আসিল। কৌশাম্বীতে একটা দুঃখের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। মন্ত্রিগণ রাজাকে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কৌশলে উদয়নকে মুক্ত করিয়া আনিবার জন্য মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বসন্তককে সঙ্গে লইয়া উজ্জয়িনী অভিমুখে

উদয়ন বাসবদত্তাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন

যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় রুমন্বান্‌কে বলিয়া গেলেন, দুর্গ-প্রাকার ভঙ্গ করিবার কৌশল, পায়ের বেড়ি খুলিবার মন্ত্র ও কোন স্থানে অপরের অদৃশ্য হইয়া থাকিবার উপায় আমি জানি। আমি এই সকল বিদ্যার সাহায্যে সম্রাটকে মুক্ত করিয়া আনিব। এই বলিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ বিন্ধ্যারণ্যে সম্রাটের বন্ধু ভীলরাজ পুলিন্দক বাস করিত। তিনি পুলিন্দককে বলিলেন, উজ্জয়িনীর রাজা কৌশল করিয়া উদয়নকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য যাইতেছি। ফিরিবার সময় হয়ত সৈন্যবলের প্রয়োজন হইতে পারে; অতএব তুমি এখন হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। ইহার পর তাঁহারা উভয়ে উজ্জয়িনীর মহাকাল শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যোগেশ্বর নামে এক ব্রহ্মরাক্ষস থাকিত। ঐ রাক্ষসের সহিত মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের বন্ধুত্ব হইয়া গেল। ব্রহ্মরাক্ষস যৌগন্ধরায়ণকে এক মন্ত্র শিখাইয়া দিল। ঐ মন্ত্রের প্রভাবে যৌগন্ধরায়ণ আপনার মূর্তি বদলাইয়া ফেলিলেন। তিনি বৃদ্ধ, পাগল ও কুব্জ হইয়া গেলেন। মুখের মধ্যে বড় বড় দাঁত গজাইয়া উঠিল। এই মূর্তি দেখিলেই সকলে হাসিয়া উঠিত। বসন্তক হইল পেট-মোটা, অস্থি-চর্মসার এক কিম্ভূত কিমাকার মূর্তি। বসন্তক রাজপ্রাসাদের নিকটে চলিয়া গেলেন, আর যৌগন্ধরায়ণ এদিকে ওদিকে নানাপ্রকার কৌতুক দেখাইতে লাগিলেন। যেখানে সেখানে লোকে তামাসা দেখিবার জন্য জড় হইতে লাগিল। রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে নানা প্রকার তামাসা হইতে দেখিয়া রাণীগণ বিশেষ খুসী হইয়া উঠিলেন। রাজকুমারী বাসবদত্তা ঐ পাগলকে সঙ্গীতশালায় ডাকিয়া আনি-লেন। ছদ্মবেশী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজা উদয়নের বন্ধনদশা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মন্ত্রীর সঙ্কেতে উদয়ন সব জানিতে পারিলেন। যৌগন্ধরায়ণ আপনার যোগবল বিস্তার করিলেন। ছদ্মবেশী মন্ত্রী সহসা অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রাজকুমারী ও তাঁহার সখীগণ ঐ পাগলকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, হঠাৎ ঐ পাগল কোথায় চলিয়া গেল। এই সময়ে উদয়ন সরস্বতী দেবীর পূজার উপযুক্ত জিনিষপত্র আনিবার জন্য বাসবদত্তা ও তাঁহার সখীগণকে পাঠা-ইয়া দিলেন। এখন উদয়নকে একাকী পাইয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজাকে বন্ধন কাটিবার মন্ত্র ও বীণা বাজাইয়া রাজকুমারী বাসবদত্তাকে বশীভূত করিবার কৌশল শিখাইয়া দিয়া বলিলেন, বসন্তক ছদ্মবেশে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে আপনি এখানে ডাকাইয়া আনুন। এই কথা বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ সেখান হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এই সময়ে বাসবদত্তা সরস্বতীর পূজার উপযোগী জিনিষগুলি লইয়া আসিলেন। রাজা উদয়ন সরস্বতী দেবীর পূজা শেষ করিয়া দক্ষিণা দিবার জন্য এক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। বসন্তক বাহিরে দাঁড়া-ইয়া ছিলেন। বাসবদত্তা তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন।

রাজাকে দেখিয়া বসন্তক কাঁদিতে লাগিলেন। উদয়ন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ, কাঁদিয়ো না। তুমি আমার কাছে থাক, আমি তোমাকে সুস্থ করিব। ব্রাহ্মণ সেইখানে বসিয়া পড়িল। একটু পরে রাজা উদয়ন বসন্তকের এই অপূর্ব্ব বেশ দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজাকে হাসিতে দেখিয়া সখীগণের সহিত রাজকুমারীও হাসিতে লাগিলেন। হাসির বেগ থামিলে বাসবদত্তা ব্রাহ্মণবেশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কাজ জান? ছদ্মবেশী বসন্তক বলিলেন, আমি খুব সুন্দর সুন্দর গল্প বলিতে জানি। রাজকুমারী গল্প শুনিবার আশায় ঐ ছদ্মবেশীকে সঙ্গীতশালায় রাখিয়া দিলেন।

[৮]

এই সময়ে একদিন যৌগন্ধরায়ণ অন্যের অদৃশ্যভাবে আসিয়া রাজা উদয়নকে বলিলেন, রাজন্! আর কত দিন আপনি এইরূপ অবস্থায় থাকিবেন; আপনার অদর্শনে প্রজারা বিশেষ কাতর হইয়া রহিয়াছে। আপনি যদি শীঘ্র কৌশাম্বীতে ফিরিয়া না আসেন, তবে কৌশাম্বীর প্রজারা বিদ্রোহ করিয়া উজ্জয়িনী-রাজ্য আক্রমণ করিবে। যুদ্ধে কি হইবে, বলা ত যায় না। এজন্য আমার পরামর্শ এই যে, আপনি রাজকুমারীকে লইয়া কৌশাম্বী চলিয়া আসুন। আর এইরূপ করিবার উদ্দেশ্যও আছে। চণ্ডমহাসেন আপনাকে কৌশলে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহার এই উদ্দেশ্যও আছে যে, রাজকুমারী বাসবদত্তার সহিত আপনার বিবাহ দিয়া সসম্মানে আপনাকে বিদায় করিবেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা লজ্জাকর। উজ্জয়িনী-রাজ ফাঁকি দিয়া যেমন আপনাকে বন্দী করিয়াছেন, তেমনি আপনারও উচিত যে, বিবাহের পূর্ব্বে রাজকুমারীকে লইয়া আপনার স্বদেশে প্রস্থান করা। এইরূপ হইলে সকলেই বুঝিতে পারিবে, চণ্ডমহাসেন যেরূপ কার্য্য করিয়াছে, কৌশাম্বীরাজ উদয়নও তাঁহাকে তদনুরূপ প্রতিদান দিয়াছেন। রাজকন্যা বাসবদত্তা আপনার বিশেষ অনুগতা; আপনি তাঁহাকে যাহা বলিবেন, তিনি তাহাই করিবেন। বিশেষতঃ, তাঁহার ভদ্রবতী নামে যে হস্তিনী আছে, সেই হস্তিনী খুব দ্রুত যাইতে পারে। আমি ঐ হস্তিনীর মাহুত আষাঢ়ককে ধন দিয়া বশীভূত করিয়াছি। আপনি এখানকার প্রহরীদিগকে মদ খাওয়াইয়া বেহুঁস করিয়া রাখিবেন। রাত্রিকালে সুযোগমত ভদ্রবতীর পিঠে চড়িয়া আপনারা রওনা হইবেন। চণ্ডমহাসেনের হাতী নড়াগিরি ভদ্রবতীকে কিছুতেই ধরিতে পারিবে না। মহারাজ! আপনি আজ রাত্রেই বাসবদত্তাকে লইয়া বাহির হইবেন। আমি আপনার বন্ধু পুলিন্দকে পথিমধ্যে সুসজ্জিত থাকিবার জন্য বলিয়াছি।

রাজা উদয়ন যথাসময়ে নিজের বন্ধন মোচন করিয়া বাসবদত্তা ও তাঁহার সখী কাঞ্চনমালা এবং বসন্তককে সঙ্গে লইয়া ভদ্রবতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজ-প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। তোরণদ্বারে বীরবাহু ও তালভট নামে দুইজন প্রহরী ছিল। তাহারা তাঁহাদের গতিরোধ করিলে উদয়ন তাহাদিগকে বধ

ভদ্রবতী দুর্গপ্রাকার ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া গেল

করিলেন। হস্তিনী ভদ্রবতী দুর্গপ্রাকার ভাঙ্গিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বাররক্ষকদ্বয় নিহত হইয়াছে, শান্তিরক্ষকের মুখে সংবাদ পাইয়া চণ্ডমহাসেন ক্রোধে প্রচণ্ড হইয়া উঠিলেন এবং উদয়ন রাজকুমারীকে হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলেন! রাজকুমার পালক নড়াগিরি হাতীর পিঠে চড়িয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। উদয়নের সহিত রাজকুমার

পালকের ভয়ানক যুদ্ধ হইল। এই সময়ে দ্বিতীয় রাজকুমার গোপালক পিতার আদেশে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পালককে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন মধ্যাহ্নকালে রাজা উদয়ন বিন্ধ্যারণ্যে পৌঁছিয়া বন্ধু পুলিন্দকের সহিত মিলিত হইলেন। এই সময়ে ভদ্রবতী হস্তিনী পিপাসার্ত্ত হইয়া জল পান করিল। কিন্তু জল পান করিয়াই ভদ্রবতী মরিয়া গেল। রাজা উদয়ন ও রাজকুমারী বাসবদত্তা ভদ্রবতীর জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আকাশবাণী হইল যে, হে মহারাজ উদয়ন! আমি হস্তিনী নই। আমি মায়াবতী নামে বিদ্যাধরী। শাপগ্রস্তা হইয়া হস্তিনী হইয়াছিলাম। আজ তোমার উপকার করিয়া আমার মুক্তি হইল। আমি তোমার পুত্রেরও উপকার করিব। রাজকুমারী বাসবদত্তাও সামান্যা নারী নহেন—ইনি দেবী। কোন কারণে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। রাজা উদয়ন এই কথা শুনিয়া যেন নববলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিলেন। রাজা উদয়ন ও রাজকুমারী বাসবদত্তা পুলিন্দকের আবাসে গিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে সেনাপতি রুমন্বান্ সসৈন্যে আসিয়া অপূর্ব্ব সমারোহে রাজা উদয়ন ও রাজকুমারী বাসবদত্তাকে সসম্মানে কৌশাম্বীতে লইয়া আসিবার উদ্যোগ করিলেন।

পর দিন মগধ রাজদূত আসিয়া মহারাজা উদয়নকে সমুচিত সমাদর করিয়া বলিল, মহারাজ উদয়ন! উজ্জয়িনী-রাজ চণ্ডমহাসেন বলিয়াছেন, আপনি বাসবদত্তাকে লইয়া আসিয়া ভালই করিয়াছেন। কেননা, বন্দি-অবস্থায় আপনাকে কন্যাদান করিলে আপনাদের নিন্দা হইত, আর তাহা মহারাজের পক্ষেও সুখ্যাতির কথা নহে। এইজন্য মহারাজ চণ্ড-মহাসেন আপনাকে বলিয়াছেন, আপনি কয়েক দিন অপেক্ষা করুন। তাঁহার পুত্র গোপালক শীঘ্রই আসিয়া বাসবদত্তার সহিত আপনার বিবাহ দিবেন। দূতের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া রাজা উদয়ন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং দূতকে বলিলেন, আপনি এখন কিছুদিন এইখানেই অবস্থান করুন। রাজকুমার এখানে আসিলে আপনি তাঁহার সহিত কৌশাম্বী যাইবেন।

রাজা ও রাজার ভাবী পত্নী কৌশাম্বীতে আসিয়াছেন জানিয়া প্রজারা ঘরে ঘরে মঙ্গলাচার করিতে লাগিল। কয়েকদিনের মধ্যে রাজকুমার গোপালক দূত সহ কৌশাম্বীতে আসিলেন। ভ্রাতাকে দেখিয়া বাসবদত্তা বিশেষ পুলকিত হইলেন। গোপালক শুভদিন দেখিয়া উদয়নের সহিত বাসবদত্তার বিবাহ দিলেন। রাজা উদয়ন রাজকুমারী বাসবদত্তার সান্নিধ্য লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইলেন।

[৯]

বাসবদত্তাকে বিবাহ করিয়া রাজা উদয়ন রাজকার্য্য এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। সর্ব্বক্ষণ বাসব-দত্তার মহলেই থাকেন। এইজন্য মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিলেন, মহারাজের এই মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিতেই হইবে। এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাঁহারা গোপনে তদুপযোগী ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথমেই মগধের রাজা প্রদ্যোতের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। মগধরাজ প্রভূত প্রতিপত্তিশালী, তাহাকে পরাজিত করা তত সহজ হইবে না, ভাবিয়া মন্ত্রিগণ কৌশলে কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে মগধরাজ তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কন্যা পদ্মাবতীর সহিত মহারাজ উদয়নের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাসবদত্তার সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়ায় তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই। এখন কৌশল করিয়া মগধ রাজপুত্রীর সহিত সম্রাট্ উদয়নের বিবাহ দিতে পারিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। মন্ত্রিগণ ইহারই সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। এইরূপ উপায় অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহাদের মনে পড়িল, রাজা উদয়নের সহিত বাসবদত্তার কিছু-দিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটাইতে হইবে এবং বাসবদত্তা মারা গিয়াছেন প্রকাশ করিয়া কৌশলে মগধরাজ-কুমারীর সহিত মহারাজের বিবাহ দিতে হইবে।

এইরূপ স্থির করিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ শিকার করি-বার জন্য মহারাজ উদয়নকে লাবণক নামক স্থানে যাইবার পরামর্শ দিলেন। ঐ স্থানে শিকারের বিশেষ উপযুক্ত ভাবিয়া মহারাজ উদয়ন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং বাসবদত্তাকে লইয়া সত্বর লাবণকে যাইবার জন্য আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন।

[১০]

মহারাজ উদয়ন লাবণকে আসিয়া শিকারে বাহির হইয়াছেন। এমন সময়ে মন্ত্রিগণ মহারাণী বাসবদত্তার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার আবাস-গৃহে ও সমস্ত গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিয়া প্রচার করিলেন, মহারাণী বাসবদত্তা ও মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ পুড়িয়া মরিয়াছেন।

সম্রাট উদয়ন সব কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মহারাণী বাসবদত্তা ও মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণের জন্য তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িল।

মন্ত্রীর এই চতুরতা সকলেই জানিত। এমন কি, মহারাণী বাসবদত্তাও ইহা জানিতেন। মন্ত্রীর উপরোধে এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তিনি এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উজ্জয়িনী-রাজকুমার গোপালকও মন্ত্রীর এই চতুরতা বুঝিতে পারিয়া কাতর হইয়া পড়েন নাই। মহারাণী বাসবদত্তার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে কেহই তেমন কাতর হইয়া পড়েন নাই, বরং সকলেই গোপনে গোপনে কি এক মতলব করিতেছে মনে করিয়া মহারাজ উদয়ন যেন কেমন এক ধাঁধায় পড়িয়া গেলেন।

এদিকে মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণ মহারাণী বাসবদত্তাকে লইয়া মগধরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। যোগন্ধরায়ণ মহারাণীকে ব্রাহ্মণীর বেশ পরাইয়া মগধরাজপুত্রী পদ্মাবতীর নিকট গিয়া বলিলেন, রাজকুমারী! আমি তীর্থ পর্য্যটক ব্রাহ্মণ; আর ইনি আমার ভগিনী অবন্তিকা। ইঁহার স্বামী ইঁহার কোন খোঁজ-খবর লন না। এজন্য ইঁহাকে আপনার নিকট রাখিয়া যাইতেছি। তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি ইঁহাকে লইয়া যাইব। ব্রাহ্মণীবেশধারিণী রাণী বাসবদত্তা মগধরাজপুত্রীর নিকট রহিয়া গেলেন।

এই সময়ে গুপ্তচর গিয়া মগধরাজ প্রদ্যোতকে মহারাণী বাসবদত্তার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ দিল। যোগন্ধরায়ণ প্রেরিত দূতও এই সময় মগধরাজ্যে গিয়া মহারাজ উদয়নের সহিত মগধ-রাজকুমারী পদ্মাবতীর বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিল। বাসবদত্তার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মহারাজ উদয়নকে কন্যাদানের পক্ষে মগধরাজের আর কোন বাধা রহিল না। মহারাজ প্রদ্যোত এ বিষয়ে সহর্ষে অনুমতি দিলেন। এই প্রস্তাবের পর সপ্তমদিনে মহাসমারোহে রাজকুমারী পদ্মাবতীর সহিত মহারাজ উদয়নের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের দিনে বাসবদত্তা সেই অম্লান পুষ্পমালা ও পুষ্প-মুকুট নির্ম্মাণ করিয়া রাজকুমারী পদ্মাবতীকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। পদ্মাবতীর গলায় সেই অম্লান কুসুমের মালা ও মাথায় মুকুট দেখিয়া মহারাজ উদয়নের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল, এই মালা ও মুকুট বাসবদত্তা ব্যতীত আর ত কেহ তৈয়ারি করিতে জানে না। তবে কে এ মালা ও মুকুট প্রস্তুত করিল!

যথাসময়ে মহারাজ উদয়ন ও মগধরাজকুমারী পদ্মাবতী কৌশাম্বীতে আসিলেন। অবন্তিকা নামে সখীও রাজকুমারী পদ্মাবতীর সহিত কৌশাম্বীতে আসিলেন। বাসবদত্তার চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার স্বামীগৃহের সকলই জাগিয়া উঠিল। বাসবদত্তা গোপনে মহারাণী পদ্মাবতীর সহিত মহারাজ উদয়নের মিলন-দৃশ্য দেখিলেন। তাঁহার চোখের কোণে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। কে বলিতে পারে, এ অশ্রু তার সুখের, না দুঃখের।

কয়েক দিন পরে উজ্জয়িনী হইতে ধাত্রী বসুন্ধরা দুই খানি ছবি ও অনেক যৌতুক উপহার লইয়া কৌশাম্বীতে উপস্থিত হইল। ধাত্রী ছবি দুই খানি মহারাজ উদয়নকে দিয়া বলিল, রাজন্! মহারাণী অঙ্গারবতী আপনাদের বিবাহ দেখিতে পান নাই, এজন্য তিনি আপনার ও রাজকুমারীর ছবি আঁকাইয়া তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই ছবি দুইখানি ও তৎসহ এই যৌতুক আপনি গ্রহণ করুন। রাজকুমারীর অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে; তার জন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত, তথাপি তিনি আপনাদের এই যৌতুক আমার হাত দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

রাজা বিস্মিত হইয়া মহারাণী বাসবদত্তার ছবি দেখিতেছেন—চোখের কোণে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে এমন সময়ে মগধ রাজকুমারী সেই ছবি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, এ ছবি যে আমার সখী অবন্তিকার! রাজা উদয়ন এই কথা শুনিয়া বলিলেন, তোমার সখী কোথায়, মগধরাজপুত্রী! পদ্মাবতী গৃহান্তর হইতে অবন্তিকাকে লইয়া আসিলেন। অবন্তিকাকে আসিতে দেখিয়া ধাত্রী বলিয়া উঠিল, ইনি যে আমার বাসবদত্তা। রাজাও বাসবদত্তাকে দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। এমনি আশ্চর্য্যভাবে উভয়ের মিলন হইল!

এই সময়ে একজন প্রতিহারী আসিয়া বলিল, এক ব্রাহ্মণ মগধরাজপুত্রীর নিকট হইতে তাঁহার ভগিনীকে লইতে আসিয়াছেন। রাজা প্রতিহারীকে বলিলেন, ব্রাহ্মণকে সসম্মানে লইয়া আইস। প্রতিহারী ব্রাহ্মণ-বেশী যোগন্ধরায়ণকে লইয়া আসিল। যোগন্ধরায়ণ আসিয়া পদ্মাবতীর নিকট বলিলেন, আমার ভগিনী অবন্তিকা কোথায়? পদ্মাবতী হাসিয়া বাসবদত্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। বাসবদত্তার সলজ্জ মুখখানির ঈষৎ হাসির মধ্য দিয়া এত বড় একটা সমস্যার সমাধান হইয়া গেল।

লোহার জিনিসও কি বিশ্রাম চায়?

১৫২০ পৃষ্ঠার পর

কি ছোট, কি বড়, সকল মানুষেরই ক্লান্তি আছে—অবসাদ আছে এবং সকলেরই বিশ্রামের দরকার হয়। কিন্তু বল দেখি, জড় পদার্থেরও কি এইরূপ অবসাদ হয়? তারাও কি ক্লান্ত হয়? বিশ্রাম চায়? উত্তরে বলা যেতে পারে, হাঁ চায়। তোমরা লোহা বা ইস্পাতের তৈয়ারী ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতির ব্যবহার কর, কিছুদিন ব্যবহার করিবার পর দেখিতে পাইবে তাহারা ভাল ভাবে কাজ করে না, নূতনের মত সে ধার নাই—তা তুমি এই সব যন্ত্রপাতির যতই যত্ন কর না কেন। কিছুদিন তাহাদের ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখ, তখন দেখিতে পাইবে, তাহাদের ধার যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কেন এইরূপ হয়? সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা নানারূপ আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাঁহারা ইহার কোনও মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, এই সব জড় পদার্থ যে সকল উপাদানে গঠিত, তাহার অতি ক্ষুদ্রতম কণিকাগুলি ধীরে ধীরে তাহাদের শক্তি হারাইতে থাকে। যদি সেগুলির মধ্যে পুনরায় শক্তি সঞ্চারিত করা যায়, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু কি ভাবে সেই শক্তির মূল সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে, সেজন্যই বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন। যদি তাহার সন্ধান মিলে, তাহা হইলে শুধু জড়ের নয়, জীবের জীবনেও এক নূতন জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

চুল, নখ কাটিতে ব্যথা পাইনা কেন?

ছোট একটি পিন, ছোট একটি সূচ, যদি তোমার শরীরের কোনও অংশে সামান্য ভাবেও বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তুমি বেদনায় অস্থির হইয়া উঃ! আঃ। করিতে থাক। কিন্তু তোমার মাথার চুল কাটিবার সময়, কিংবা তোমার হাত পায়ের নখ কাটিবার সময় ত তুমি কিছুই বল না, ইহার কারণ কি?

আমাদের দেহের প্রত্যেকটি অংশের স্নায়ুজাল বিস্তৃত টেলিগ্রাফের তার যেমন সংবাদ বহিয়া আনে, তেমনি আমাদের দেহের এই স্নায়ুজালও, যদি দেহের কোন ক্ষুদ্র স্নায়ুটির গায়েও আঘাত লাগে, তাহা হইলে তাহা আমাদের মস্তিষ্কে বহিয়া লইয়া যায়। সেখানকার স্নায়ু-কোষ, ঐ আঘাতের বেদনা অনুভব করে। কিন্তু যখন ক্লোরোফর্ম Chloroform প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের স্নায়ুর গতিশক্তি সাময়িক ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তখন আমরা কোনও বেদনা অনুভব করি না।

আমাদের নখ ও চুলের সঙ্গে যেখানে স্নায়ুর কোনও সম্বন্ধ নাই, সেখানে কেমন করিয়া বেদনা অনুভব করিব? কিন্তু কেশমূল অর্থাৎ চুলের গোড়া স্নায়ুর সহিত সংযুক্ত, সেখানে একটু সামান্য আঘাত লাগিলে আপনা হইতেই বেদনা বোধ করিবে কাজেই তোমরা বুঝিতে পারিলে যে, যেখানে স্নায়ু নাই তেমন স্থানে বেদনা অনুভব করিবার কোনও কারণই নাই। এজন্যই আমরা আমাদের চুল কাটিতে বা নখ কাটিতে বেদনা বোধ করি না।

(১৩৫৯ পৃষ্ঠার পর)

'শিশু-ভারতী'র ১৩৫৮ পৃষ্ঠার ছবির ধাঁধার উত্তরগুলি নীচে দেওয়া হইল :---

১। কলিকাতা, ২। কাশী, ৩। মই-মন সিং, (মৈমন-সিং) ৪। মুলতান, ৫। ধুবড়ি, ৬। সিকিম।

১৩৫৯ পৃষ্ঠায় চোখের ধাঁধার যে ছবি দেওয়া হইয়াছিল, উহা একটি গোলাকার ধাঁধা। 'ক' চিহ্নিত স্থান হইতে গোলক ধাঁধায় ভিতর প্রবেশ করিয়া উপরের শর-চিহ্নিত স্থান দিয়া গোলক ধাঁধার বাহিরে যাইতে হইবে। যাইবার রাস্তার মধ্যে মধ্যে গোলাকার বাধা রহিয়াছে ; সেগুলিকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া চলে না। একবার বাধা পাইলে আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

নূতন ধাঁধা

খোকাবাবু পুরীতে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যাইয়া বালি দিয়া একটা জন্তু তৈয়ারী করিয়াছেন। তোমরা যদি সেই জন্তুটা কি, জানিতে চাও, তাহা হইলে একটি পেন্সিল লইয়া ১ হইতে আরম্ভ করিয়া ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমে অঙ্কগুলির উপর দিয়া লাইন টানিতে থাক। তাহা হইলেই সেই জন্তুটা কি তাহা জানিতে পারিবে।